ইসলামীশিক্ষা ও সংস্কৃতিরবিকাশেহযরতমুহাম্মদ (স)-এরপবিত্র স্ত্রীগণেরভূমিকা

(THE ROLE OF THE HOLY WIVES OF HAZRAT MUHAMMAD (PBUH) IN THE EXPANSION OF ISLAMIC EDUCATION AND CULTURE)

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়েপিএইচ.ডিডিগ্রিরজন্য উপস্থাপিতঅভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুররশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজবিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোছা: জীবননিছা
পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৪২/২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজবিভাগ
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
জুন ২০১৭

cZ¨qbcÎ

এতদ্বারা প্রত্যায়ন করা যাচেছ যে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মোছাঃ জীবন নিছা আমার তত্ত্বাবধানে "ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (স) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা" (THE ROLE OF THE HOLY WIVES OF HAZRAT MUHAMMAD (PBUH) IN THE EXPANSION OF ISLAMIC EDUCATION AND CULTURE)শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ সুসম্পন্ন করেছে। এটি তার একক ও মৌলিক রচনা। আমি এই অভিসন্দর্ভটি ডিগ্রি লাভের নিমিত্তে জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

আমি তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০
Email: rashidnumani@yahoo.com

‡NvlYvcÎ

এতদ্বারা আমি ঘোষণা করছি যে, "ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (স) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা" (THE ROLE OF THE HOLY WIVES OF HAZRAT MUHAMMAD (PBUH) IN THE EXPANSION OF ISLAMIC EDUCATION AND CULTURE) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকঅধ্যাপক ড. আব্দুর রশীদ স্যারের নিবিড় তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। এটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। আরও অবহিত করছি যে, অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ বিশেষ কোথায়ও ডিগ্রি লাভ অথবা প্রকাশনার জন্যে জমা দেয়নি।

(মোছা: জীবন নিছা)
পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার :৪২/২০১৪-২০১৫
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞাতা স্বীকার

সর্ব প্রথম মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করার তৌফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি দু'জাহানের নেতা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি যিনি আল্লাহ তায়ালা নির্দেশিত পন্থায় মানবতার সত্যিকারের মুক্তির জন্যে আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা রহমত বর্ষণ করুন মহানবী (সা.) এর পুত:পবিত্র স্ত্রীগণের (রা.) উপর—যারা মহানবী (সা.) এর সাথে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার সাধনে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম ঠিক করা থেকে অভিসন্দর্ভটির কাজ সমাপ্ত করা পর্যন্ত যারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ প্রদান করে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি বিশেষ ভাবে আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যিনি আমাকে অভিসন্দর্ভটির শিরোণাম বাছাই করা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি গবেষণায় ভর্তির প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করা এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের একাডেমিক সভায় দু'টি সেমিনার দেওয়ার সহযোগিতাসহ অভিসন্দর্ভটি বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজানো ও তা নিবিড়ভাবে দেখে প্রয়োজনীয় পরার্মশ দিয়েছেন। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের প্রতি ও আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে তারা আমাকে সেমিনারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে অভিসন্দর্ভটির কাজ তরান্বিত করতে সহয়তা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের যে সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমাকে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত

করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। অভিসন্দর্ভটির কাজে যে সকল গ্রন্থাগারে যেতে হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি তাদেরকেও আজকে স্মরণ করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অভিসন্দর্ভটির কম্পোজ কাজে বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মচারী জনাব মো: আনিস হাওলাদার ও নীলক্ষেতের জনাব মোঃ বেলাল আমাকে যে দ্রুততার সাথে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে পিএইচ.ডি পর্যায়ে ভর্তির অনুমতি প্রদানের যে সুযোগ দিয়েছেন এ জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পরিশেষে আমার স্বামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মো: আবু সায়েম আমাকে অনুপ্রেরণা ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে চির কৃতজ্ঞতায় অবদ্ধ করে রেখেছেন। আজকের এ বিশেষ দিনে আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অভিসন্দর্ভটির কাজ করতে গিয়ে আমাদের দু'কন্যা সারাহ মালিহা সায়েম ও আমিনা মারিয়া সায়েমকে কিছু সময় আদর যত্ন থেকে বঞ্চিত রাখছিলাম বলে দু:খ প্রকাশ করছি এবং সেই সাথে উল্লেখ করছি যে এ দু'জনের সহাযোগিতা না পেলে অভিসন্দর্ভটির কাজ সমাপ্ত করা আসলেই ভীষণ কষ্ট হত। এ জন্যে আমি তাদের দু'জনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার পিতা জনাব মো: জাফর আলী সরকার ও মাতা মোছা : হাসমত আরা খানম যে সহাযোগিতা প্রদান করে আমার কাজটি হালকা করে দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ভাই ও বোনেরা বিভিন্ন সময়ে আমার পাশে থেকে আমাকে যে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন সে কারণে তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

পরিশেষে আল্লাহর সাহায্যে কামনা করছি, তিনি যেন যে উদ্দেশ্যে নিয়ে অত্র অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে তা কবুল করেন এবং মানবজাতীর উপকারে অভিসন্দর্ভটিকে কাজে লাগান।

মোছা: জীবন নিছা
৩০২, আন্তর্জাতিক হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

উৎসর্গ

সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের পবিত্র স্মৃতির প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে অত্র অভিসন্দর্ভটি উৎসর্গ করা হল।

সূচী পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা নং

প্রত্যায়নপত্র-- i

ঘোষণাপত্র -- ii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার -- iii

সংকেত পরিচয় -- xx

প্রতি বর্ণায়ন -- xxii

ধ্বনি চিহ্ন -- xxiii

ভূমিকা-- ১-৮

প্রথম অধ্যায় : ইসলাম: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি--- ৯-৩৬

১.১ ইসলাম ধর্মের নামকরণ --- ৯

১.২ ইসলাম শব্দের অর্থ-- ১০

১.৩ ইসলাম ধর্মের সংক্ষিপ্ত ক্রমবিকাশ-- ১৩

১.৪ ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহের পরিচয়------------------------------------ ১৪

১.৫ ইসলামে তাৎপর্য বিশ্লেষণ--- ১৪

১.৬ ইসলাম বা আত্ম-সমর্পনের কাজ --- ১৫

১.৭ পূর্ণাঙ্গ মুসলিম বা আত্মসমার্পনকারীর পরিচয়------------------------------ ১৭

১.৮ ইসলাম মেনে চলার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ---- ১৮

১.৮.১ মানুষ মূলত অনুস্বরণ করেই চলছে আল্লাহর বেধে দেওয়া নিয়ম কানুন---- ১৮

১.৮.২ মানুষকে ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করেন----- ১৯

১.৮.৩ আল্লাহকে ভয় করা ব্যক্তি ও ভয় করা না করা ব্যক্তির চিন্তা ও কর্ম------ ২০

১.৮.৪ মানব কল্যাণই মুসলিমের ইহকালীন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য----------------- ২১

১.৮.৫পৃথিবীর সব কিছুই মানব জাতির কাছে আমানত স্বরূপ ------------------ ২২

১.৮.৬ ব্যক্তিগত জীবনে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়াই ইসলাম----------------- ২৩

১.৮.৭ একজন মুসলিমই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত---------------------------------- ২৩

১.৮.৮ মুসলমান সবচেয়ে শক্তিশালী-- ২৪

১.৮.৯ মুসলিম ব্যক্তিই বড় ধনী ও সম্পদশালী------------------------------------- ২৪

১.৮.১০ মুসলিম ব্যক্তি সবার ঘনিষ্ট ও সর্বজন প্রিয়--------------------------------- ২৫

১.৮.১১ মুসলিম ব্যক্তি মাবনজাতির সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত মানুষ-------------------- ২৫

১.৮.১২ ইসলামে রয়েছে চিরন্তন সফলতার নিশ্চয়তা-------------------------------- ২৬

১.৮.১৩ ইসলামই হচ্ছে মানুষের স্বভাব ধর্ম-- ২৬

১.৯ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বা আকাইদ -- ২৭

১.১০ ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদত বা অনুশীলন ------------------------------------ ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বর্ণাঢ্য জীবন ও বহুমাত্রিক কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ---- ৩৭-৫৪

২.১ জন্ম ও শিশুকাল -- ৩৭

২.২ বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা -- ৩৮

২.৩ কৈশোর --- ৩৯

২.৪ খ্রিস্টান প্রাদীর ভবিষ্যৎ বাণী-- ৪০

২.৫ যুবক মুহাম্মদ (সা.) -- ৪০

২.৬ নবুয়্যাত লাভ --- ৪১

২.৭ গোপনে ও প্রকশ্যে ইসলাম প্রচার ও নির্যাতনের স্বীকার--

৪২

২.৮ মদীনায় হিযরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা-- ৪৩

২.৯ মদীনা সনদ-- ৪৩

২.১০ রাষ্ট্র ও ধর্ম রক্ষায় আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের নীতি গ্রহণ--৪৪

২.১১ হুদায়বিয়ার সন্ধি--- ৪৪

২.১২ মক্কা বিজয় ও সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা---৪৬

২.১৩ বিদায় হজ্জের ভাষণ: মানবধিকারের শ্রেষ্ট দলিল-- ৪৬

২.১৪ সংস্কার বৈপ্লিবিক ও আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)------------------------------- ৪৮

২.১৫ মহানবী (সা.) এর ইন্তিকাল --- ৪৯

২.১৬মহানবী (সা.) এর রেখে যাওয়া আদর্শই পথ দেখাবে চিরদিন---------------------------------- ৫২

তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামী শিক্ষা ও এর দর্শন -- ৫৪-৯৬

৩.১ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা --- ৫৪

৩.২ শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য-- ৫৫

৩.৩ ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা--- ৫৬

৩.৪ ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী-- ৫৬

৩.৫ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য--৫৮

৩.৬ ইসলামী শিক্ষা নীতির মৌলিক বৈশিষ্ট-- ৬০

৩.৬.১ জ্ঞানের মূল উৎস ‘ওহীর’ জ্ঞান-- ৬০

৩.৬.২ ইসলামী শিক্ষায় বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই ---৬১

৩.৬.৩ শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা-- ৬৩

৩.৭ ইসলামী শিক্ষার স্বরুপ ও প্রকৃতি--- ৬৫

৩.৭.১ স্বয়ং আল্লাহ হচ্ছেন শিক্ষক-- ৬৫

৩.৭.২ নবীদেরকে পাঠানো হয়েছে শিক্ষার আলো ছড়ানোর জন্যে---------------------------------------

৬৬

৩.৮ ইসলামী শিক্ষার পরিধি--- ৬৬

৩.৯ রাসূল (সা.) প্রদর্শিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা-- ৬৭

৩.১০ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি--৭০

৩.১১ শিক্ষায় ইসলমী দর্শন-- ৭৬

৩.১১.১ স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করা---৭৬

৩.১১.২ তিনটি বিশেষ সম্পর্ক জানা ও সমন্বয় করা--৭৭

৩.১১.৩ জ্ঞান লাভের নির্ভুল সূত্র ও মাধ্যম হচ্ছে ওহী বাণী ---৮০

৩.১১.৪ ইন্দ্রিয় ভিত্তিক জ্ঞান কখনও আসল সত্য ও বাস্তবতার সন্ধান দিতে পারে না------------------৮০

৩.১১.৫ শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ক ---৮২

৩.১১.৬ সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা---------------------------------

৮২

৩.১১.৭ কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা-- ৮৩

৩.১১.৮ শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে পবিত্র কুরআনের সার্বিক দর্শনের ভিত্তিতে ---------------------------- ৮৪

৩.১১.৯ ওহী ভিত্তিক জ্ঞানহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল ---৮৪

৩.১১.১০ মন, আত্মা ও বিশ্বাসের সঠিক নির্দেশনা ও গঠন করার জন্যে জ্ঞান চর্চা করা----------------- ৮৫

৩.১১.১১ অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন---৮৮

৩.১১.১২ শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে ঈমান দীপ্ত প্রত্যয়মূলক-- ৮৯

৩.১১.১৩ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সমন্বয় সাধন- ৯২

৩.১১.১৪ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমৃদ্ধি--- ৯৩

৩.১১.১৫ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের জ্ঞান অর্জন করা--- ৯৪

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামী সংস্কৃতি ও এর দর্শন -- ৯৭-১৫৯

৪.১ সংস্কৃতির সংজ্ঞা--

৯৭

৪.২ সংস্কৃতির উপাদান--

৯৯

৪.৩ ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় ও স্বরূপ --

১০০

৪.৪ ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ--

১০৩

৪.৫ ইসলামী সংস্কৃতির মূলভিত্তি-- ১০৮

৪.৬ ইসলামী সংস্কৃতির স্বরুপ ও প্রকৃতি-- ১০৯

৪.৬.১ আল্লহ প্রদত্ত বিধানের পরিপূরক---১০৯

৪.৬.২ আখিরাতমূখী--- ১১০

৪.৬.৩ মানবীয় সংস্কৃতি-- ১১১

৪.৬.৪ বিশ্বজনীন সংস্কৃতি-- ১১২

৪.৬.৫ সুশীল সমাজ গঠন---১১৩

৪.৬.৬ সৎ গুনাবলী সৃষ্টি--- ১১৩

৪.৭ ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য---১১৪

৪.৮ ইসলামী সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য--১১৬

৪.৯ ইসলামী সংস্কৃতির পরিধি--- ১১৮

৪.১০ ইসলামী সংস্কৃতিতে চিত্ত-বিনোদন ---১১৮

৪.১০.১ খেলা-ধুলা ও শরীর চর্চা ---

১২৩

৪.১০.২ নান্দনিক শিক্ষা বা শিল্পকলা --

১২৩

৪.১১ সংস্কৃতিতে ইসলামী দর্শন---

১২৫

৪.১১.১ ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে বিশ্বজনীন---

১২৫

৪.১১.২ জীবন যাপনের সহজীকরণের উপকরণ ও বিনোদনমূলক কর্ম-কান্ডকে মানব জীবনের লক্ষ্য না বানানো------------

১২৬

৪.১১.৩ বিশ্ব মানবতার সার্বিক ও সামাজিক কল্যাণ করাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য---------------------------

১২৭

৪.১১.৪ মূর্তি ও ভাস্কর্যের বিষয়ে ইসলামের আপত্তি অযৌক্তিক নয়---

১২৮

৪.১১.৫ মানুষের সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহর সৃষ্টিকে মূল্যহীন ভাবা যায় না--------------------------------------

১২৯

৪.১১.৬ ইসলামী সংস্কৃতি দ্বীনের সর্বাত্মক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত--------------------------------------

১৩০

৪.১১.৭ আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করা অসম্ভব---

১৩১

৪.১১.৮ ব্যক্তিদের উপর সামষ্টিকবাদের ভিত্তি--

১৩১

৪.১১.৯ ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণ দ্বীন ভিত্তিক--

১৩২

৪.১১.১০ ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে মানব জাতিকে পুত: পবিত্র করার ও যর্থাথ কল্যাণ করার সংস্কৃতি--------

১৩৩

৪.১১.১১ সংস্কৃতিতে ইসলামের মৌল ভাবধারা---

১৩৬

৪.১১.১১.১ সাম্য ও সমতার সংস্কৃতি--

১৩৭

৪.১১.১১.২ মৌলিক চাহিদা পূরণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা --

১৩৭

৪.১১.১১.৩ দেহ ও আত্মার ভারসাম্য বিধান করা--

১৩৮

৪.১১.১১.৪ ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতি--

১৩৯

৪.১১.১১.৫ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও সমাজের সংশোধন হতে হবে সমান্তরাল ভাবে-------------

১৩৯

৪.১১.১১.৬ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি: সমাজ ও বৈপরীত্য---

১৪০

৪.১১.১১.৭ ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে কল্যাণদৃষ্টির সংস্কৃতি-- ১৪০

৪.১১.১১.৮ পাশ্চত্য সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি-------------------------------------- ১৪১

৪.১১.১১.৯ জীবনদর্শ ও জীবন দর্শনের ভিন্নতার কারণে সংস্কৃতির ভিন্নতা আসে------------------------- ১৪৩

৪.১১.১১.১০ জাতীয়তাবাদের জীবন দর্শন স্বার্থবাদিতার সংস্কৃতি--- ১৪৪

৪.১১.১১.১১ পুজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের স্বার্থবাদিতার দ্বান্দ্বিক সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়----------------- ১৪৪

৪.১১.১১.১২ ইসলামী সংস্কৃতি দর্শনে রয়েছে সত্যিকারের ভাল মন্দের যাচাই-বাছাইয়ের ব্যবস্থা----------- ১৪৫

৪.১১.১১.১৩বস্তুবাদী দর্শনের সংস্কৃতিতে অধ্যাত্মিকতার কোন স্থান নেই, আছে চিত্তবিনোদনের নির্ভরতা--------------- ১৪৫

৪.১১.১১.১৪ পাশ্চত্য সংস্কৃতি হচ্ছে গান বাজনা ও নৃত্য নির্ভরতা-- ১৪৫

৪.১১.১১.১৫ পাশ্চত্য সংস্কৃতি হচ্ছে লজ্জাহীন সংস্কৃতি-- ১৪৭

৪.১১.১১.১৬ পাশ্চত্য সংস্কৃতি পশুত্ববাদীতার চেতনাকে সদা জাগ্রত করে ----------------------------- ১৪৭

৪.১১.১১.১৭ সংস্কৃতিতে ইসলামী দর্শন হচ্ছে অনন্য ও স্বতন্ত্র---

১৪৮

৪.১১.১১.১৮ পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্নতাই ইসলামী সংস্কৃতি--

১৪৯

৪.১১.১১.১৯ পরকাল নির্ভর আদর্শবাদী জীবন যাপনই ইসলামী সংস্কৃতির জীবনাচরণ-------------------

১৪৯

৪.১১.১১.২০ ইসলামী সংস্কৃতি ভোগবাদের সংস্কৃতি নয়--

১৫০

৪.১১.১১.২১ ইসলামী সংস্কৃতি সমগ্র জীবন ব্যাপী বিস্তীর্ণ --

১৫০

পঞ্চাম অধ্যায়: জাহিলী যুগে আরবের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থা--১৬০-১৭৬

৫.১ আরব দেশ ও জাতী ---

১৬০

৫.২ আইয়্যামে জাহেলিয়া--১৬১

৫.৩ শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা--- ১৬২

৫.৪ সাংস্কৃতিক অবস্থা--- ১৬৩

৫.৪.১ গোত্রপ্রীতি--- ১৬৪

৫.৪.২ কতিপয় সুকুমার গুণাবলী---১৬৪

৫.৪.৩ মরু আবহাওয়া ও পরিবেশের প্রভাব---

১৬৫

৫.৪.৪ শহরবাসী আরবের জীবনে সভ্যতার ছায়া--

১৬৫

৫.৪.৫ যাযাবর আরবদের সংগ্রামী জীবন--- ১৬৬

৫.৪.৬ দলপতির অধীনে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন-- ১৬৬

৫.৪.৭ যুদ্ধবিগ্রহ-- ১৬৮

৫.৪.৮ লুটতরাজ--- ১৬৮

৫.৪.৯ চুরি-- ১৬৯

৫.৪.১০ নিষ্ঠুরতা--- ১৬৯

৫.৪.১১ ব্যাভিচার--- ১৭০

৫.৪.১২ নির্লজ্জতা-- ১৭০

৫.৪.১৩ নারী উৎপীড়ন--- ১৭১

৫.৪.১৪ ইতরতা--- ১৭২

৫.৪.১৫ মদ্যপান--- ১৭২

৫.৪.১৬ জুয়া--- ১৭২

৫.৪.১৭ সুদখুরী--- ১৭৩

৫.৪.১৮ গনৎকার--- ১৭৪

৫.৪.১৯ ধর্ম বিশ্বাস-- ১৭৪

৫.৪.২০ পৌত্তলিকতা--১৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি পর্যালোচনা------- ১৭৭-১৯৭

৬.১ নবীজী (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলামী শিক্ষা-- ১৭৭

৬.১.১ হিজরতের পূর্বে মক্কায় ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা--- ১৭৭

৬.১.২ হিজরতের পর মদীনায় ইসলামী শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা-- ১৭৮

৬.১.৩ মহানবী (সা.) প্রেরিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা----------------------- ১৭৯

৬.১.৪ জায়গীরের ব্যবস্থা-- ১৮০

৬.১.৫ আল কুরআনের শিক্ষা ও শিখানোর ব্যবস্থপনা--১৮১

৬.১.৬ মসজিদ সমূহ ছিল ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র--- ১৮১

৬.২ মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলামী সংস্কৃতি-- ১৮২

৬.২.১ বিশ্বাসের পুনর্গঠন-- ১৮২

৬.২.২ বিশ্বাসের দাবী অনুযায়ী কর্ম গঠন-- ১৮৩

৬.২.৩ মানুষের বেড়াজাল হতে বের হয়ে আল্লাহর খলিফার আসনে বসানো---------------------------- ১৮৪

৬.২.৪ শিশুর নামকরণ ও আকীকাহ--- ১৮৪

৬.২.৫ কিশোর ও যুবকদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেওয়া--- ১৮৫

৬.২.৬ পিতা মাতার প্রতি যত্নশীল হওয়া-- ১৮৫

৬.২.৭ মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রশান্তি কামনা করা---১৮৬

৬.২.৮ সালামের প্রচলন-- ১৮৬

৬.২.৯ শালীন পোশাকে কাবা তাওয়াফ করা--- ১৮৭

৬.২.১০ হিযাবের অনুশীলন--- ১৮৭

৬.২.১১ রুচিশীল ব্যবস্থাপনায় বৈধ উপায়ে চিত্তবিনোদন-- ১৮৮

৬.২.১২ ভাস্কর্য, মূর্তি ও ছবি অংকনের বিষয়ে ইসলামী বিধান--- ১৮৮

৬.২.১৩ সীমিত পরিসরে গান বাজনা-- ১৮৯

৬.২.১৪ উলুর ধ্বনির পরিবর্তে আললাহর বড়ত্ব ও প্রশংসাসূচক শব্দের ব্যবহার----------------------- ১৮৯

৬.২.১৫ শরীর ও মনের পরিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা-- ১৯০

৬.২.১৬ হজ্জ তথা বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা-- ১৯০

৬.২.১৭ খাওয়ার সংস্কৃতি-- ১৯১

৬.২.১৮ পরিধান করার সংস্কৃতি-- ১৯১

৬.২.১৯ সৌন্দর্য চর্চা করার সংস্কৃতি--- ১৯২

৬.২.২০খাবাররের প্রতি যত্নশীল--- ১৯৩

৬.২.২১ ঘুমানোর সংস্কৃতি ও প্রত্যহিত রুটিন--- ১৯৩

৬.২.২২ অতিথি পরায়নতা ও পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়--- ১৯৪

৬.২.২৩ চলাফেরার সংস্কৃতি ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়-- ১৯৫

৬.২.২৪ মানুষকে মূল্যায়ন ও সম্মান দান করা--- ১৯৫

৬.২.২৫ মানবিক গুণাবলীর প্রশিক্ষন-- ১৯৬

৬.২.২৬ মানবিক অসৎ গুণাবলীর থেকে মুক্তকরণ-- ১৯৬

সপ্তম অধ্যায়: হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবন: সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা---------------------- ১৯৮-৩১১

৭.১ হযরত খাদিজা (রা.)-- ২০২

৭.২ হযরত সাওদা বিনতে যাম‘য়া (রা.)--- **২১৯**

৭.৩ হযরত আয়েশা (রা.)--- **২২৭**

৭.৪ হযরত হাফসা (রা.)-- **২৫৩**

৭.৫ হযরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা (রা.)-- **২৬৫**

৭.৬ হযরত উম্ম সালামা (রা.)-- **২৬৮**

৭.৭ যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)--- **২৭৮**

৭.৮ হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-- **২৮৫**

৭.৯ হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা.)--- **২৯০**

৭.১০ হযরত সাফিয়্যা (রা.)-- ২৯৬

৭.১১ হযরত মায়মুনা (রা.)-- ৩০২

৭.১২ হযরত রায়হানা (রা.)--- ৩০৬

৭.১৩ হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.)--- ৩০৯

অষ্ঠম অধ্যায়: হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বহু বিবাহ: তাৎপর্য বিশ্লেষণ--------------------------------------

৩১২-৩৩০

নবম অধ্যায়: ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা----------৩৩১-৩৬২

৯.১ হযরত খাদিজা (রা.)-- ৩৩১

৯.২ হযরত সাওদা (রা.)-- ৩৩৫

৯.৩ হযরত আয়েশা (রা.)--- ৩৩৬

৯.৪ হযরত হাফসা (রা.)-- ৩৪৩

৯.৫ হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.)-- ৩৪৬

৯.৬ হযরত উম্মু সালামা (রা.)-- ৩৪৭

৯.৭ হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)-- ৩৫২

৯.৮ হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-- ৩৫৪

৯.৯ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)-- ৩৫৫

৯.১০ হযরত সাফিয়্যা (রা.)-- ৩৫৭

৯.১১ হযরত মায়মুনা (রা.)-- ৩৫৯

৯.১২ হযরত রায়হান (রা.)--- ৩৬১

৯.১৩ হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.)--- ৩৬১

দশম অধ্যায়: ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর সহধর্মীনীদের কর্মপ্রয়াস-------- ৩৬৩-৩৯৭

১০.১ হযরত খাদিজা (রা.)-- ৩৬৩

১০.২ হযরত সাওদা (রা.)--- ৩৬৮

১০.৩ হযরত আয়েশা (রা.)-- ৩৭০

১০.৪ হযরত হাফসা (রা.)-- ৩৭৫

১০.৫ হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.)-- ৩৭৬

১০.৬ হযরত উম্মু সালামা (রা.)-- ৩৭৬

১০.৭ হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)--- ৩৭৯

১০.৮ হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)--- ৩৮৪

১০.৯ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)-- ৩৮৬

১০.১০ হযরত সাফিয়্যা (রা.)-- ৩৯০

১০.১১ হযরত মায়মুনা (রা.)--- ৩৯৩

১০.১২ হযরত রায়হান (রা.)-- ৩৯৫

১০.১৩ হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.)-- ৩৯৬

একাদশ অধ্যায়: আর্দশ শিক্ষা ও ব্যবস্থা গঠনে উম্মুহাতুল মোমেনীনদের ভূমিকার বিশ্লেষণ--------- ৩৯৮-৪১৪

১১.১ হযরত খাদিজা (রা.)-- ৩৯৯

১১.২ হযরত সাওদা (রা.)-- ৪০০

১১.৩ হযরত আয়েশা (রা.)-- ৪০০

১১.৪ হযরত হাফসা (রা.)-- ৪০১

১১.৫ হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.)-- ৪০২

১১.৬ হযরত উম্মু সালামা (রা.)-- ৪০৩

১১.৭ হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)-- ৪০৪

১১.৮ হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)-- ৪০৪

১১.৯ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)-- ৪০৫

১১.১০ হযরত সাফিয়্যা (রা.)-- ৪০৬

১১.১১ হযরত মায়মুনা (রা.)-- ৪০৫

১১.১২ হযরত রায়হান (রা.)-- ৪০৮

১১.১৩ হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.)-- ৪০৮

দ্বাদশ অধ্যায়: ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর সম্মনিত সহধর্মীদের কর্ম প্রয়াস-- ৪১৫-৪৩৩

১২.১ হযরত খাদিজা (রা.)-- ৪১৬

Dhaka University Institutional Repository

১২.২ হযরত সাওদা (রা.)--- ৪১৭

১২.৩ হযরত আয়েশা (রা.)-- ৪১৮

১২.৪ হযরত হাফসা (রা.)-- ৪২১

১২.৫ হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.)-- ৪২১

১২.৬ হযরত উম্মু সালামা (রা.)-- ৪২২

১২.৭ হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)--- ৪২৫

১২.৮ হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)--- ৪২৬

১২.৯ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)--- ৪২৭

১২.১০ হযরত সাফিয়্যা (রা.)-- ৪২৯

১২.১১ হযরত মায়মুনা (রা.)--- ৪৩১

১২.১২ হযরত রায়হান (রা.)-- ৪৩২

১২.১৩ হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.)--- ৪৩২

উপসংহার:-- ৪৩৪-৪৩৮

গ্রন্থপঞ্জি--- ৪৩৯-৪৮৪

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

১.	অনু.	: অনুবাদক
২.	অনূ.	: অনূদিত
৩.	আ.	: ‘আলায়হিস সালাম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হউক)
৪.	আল-কুর’আন, ১:২	: প্রথম সংখ্যাটি সূরা এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি আয়াতের নির্দেশক।
৫.	ই.ফা.বা.	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৬.	খ.	: খণ্ড
৭.	খ্রি.	: খ্রিষ্টাব্দ
৮.	জ.	: জন্ম
৯.	ড.	: ডক্টর
১০.	ডা.	: ডাক্তার
১১.	তা. বি.	: তারিখ বিহীন
১২.	দ.	: দরূদ পাঠ করুন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
১৩.	দ্র.	: দ্রষ্টব্য
১৪.	পূ.	: পূর্বোক্ত
১৫.	পৃ.	: পৃষ্ঠা
১৬.	মৃ.	: মৃত/মৃত্যু
১৭.	রহ.	: রাহমাতুল্লাহি ‘আলায়হি (তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক)
১৮.	রা.	: রাদ্বিআল্লাহু আনহু (মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক)

১৯.	বি.দ্র.	: বিস্তারিত দ্রষ্টব্য
২০.	সা.	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
২১.	হি.	: হিজরী
২২.	Ed.	: Edition
২৩.	Ibid	: Ibidem/The same
২৪.	Op. cit.	: Opus Citatum/Work Cited
২৫.	P.	: Page
২৬.	PP.	: Pages
২৭.	Vol.	: Volume

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণমালার (الحروف الهجائية العربية) বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে এ অভিসন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
أ-ء	’ উর্ধ্ব কমা	ز	য	ق	ক, ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ	ل	ল
ث	স, ছ	ص	স	م	ম
ج	জ	ض	য, দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত, ত্ব	و	ওয়া, ভ
خ	খ	ظ	য	ه ة	হ
د	দ	ع	‘ উল্টো কমা	ي	য়
ذ	য	غ	গ		
ر	র	ف	ফ		

ধ্বনি চিহ্ন

(الحركات)

হার্‌কাত	ধ্বনি চিহ্ন	হার্‌কাত	ধ্বনি চিহ্ন
َ-	আ	ٍ-	-ইন
ِ-	-ই=ি	ٌ-	-উন
ُ-	-উ=ু	-	আ (যুগ্ম ধ্বনি)
ْ-	হস্‌ চিহ্ন	-	ই (যুগ্ম ধ্বনি)
ً-	আন	-	উ (যুগ্ম ধ্বনি)

ء আলিফের ন্যায়। তবে সাকিন হলে উর্ধ্ব কমা (-’) ব্যবহৃত হয়। যথা تأويل = তা’বীল এবং ع = এর সাকিন হলে উল্টা কমা (‘-) ব্যবহৃত হয়; যথা نعت = না‘ত।

অভিসন্দর্ভের এ্যাবস্ট্রাক্ট (সার-সংক্ষেপ)

ইসলাম বলতে বুঝায় মহান আল্লাহ তায়ালার বিধি বিধানের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুস্বরণ ও অনুকরণ করা নবী রাসূলগণ বিশেষ করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর প্রদর্শিত পথ নির্দেশনার আলোকে। আর যে শিক্ষা ইসলামকে জানার ও মেনে চলার ব্যবস্থা করে তাই ইসলামী শিক্ষা। ইসলাম যেহেতু দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কথা বলে, তাই ইসলামী শিক্ষা কেবল একমূখী আধ্যত্ম শিক্ষা বা আখেরাতমুখী শিক্ষা নয়; বরং আখেরাতের জীবনে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহীতার কথা স্মরণ করে আল্লাহর রাজী সন্তুষ্টি কে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দুনিয়াতে সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার যথার্থ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য সকল ধরনের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করে। ইসলমী শিক্ষার মত ইসলামী সংস্কৃতিও তাই। ইসলাম প্রদর্শিত ও অনুমোদিত মানব জীবনের সকল ক্রিয়া-কর্মই ইসলামী সংস্কৃতিভূক্ত। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা যা চিন্তা করে ও এর বাস্তবায়ন ঘটায় সবই মানুষের সংস্কৃতি। মানুষের চিন্তা থেকে আরম্ভ করে কর্ম পর্যন্ত সকল কিছু যদি আল্লাহ তায়ালার বাণী পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুন্নাহ মোতাবেক করা হয় তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কর্মকাণ্ড মানুষ পূর্ব থেকেই করে আসছে। ইসলাম এসে মানুষের সাংস্কৃতিক দিকটিকে পরিশুদ্ধ ও পরিশালীত করেছে মাত্র।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মাধ্যমে জোরালো ভূমিকা রেখে আসছেন। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজক ব্যবস্থায়

যেহেতু পুরুষের ভূমিকাকে মূখ্য করে দেখা হয় সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পশ্চাতেই থেকে যায়।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এরুপ ঘটেছে আমরা মনে না করলেও মুসলমান পুরুষের মন-মনেন পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব পড়ে নি— সেটা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যাহোক, সাম্য ও মৈত্রীর ধর্ম ইসলামের প্রাথামিক পর্বে যেভাবে পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীদের ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে ও ভূমিকা রাখতে দেখা যায় তা পরবর্তীতে সেভাবে মুসলিম সমাজে আর সেভাবে দেখা যায় না। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান বর্তমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্যে নয়। অত্র অভিসন্দর্ভে কেবল ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে মহানবী (সা.) এর পুত পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিতে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি সাধারণ আলোচনায় এসেছে তা হচ্ছে উম্মুহাতুল মোমেনীনগণ মহানবী (সা.) এর স্ত্রী হয়েছেন এ নিয়েই পড়ে থাকেন নি; বরং তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্র থেকে নিজ মেধা ও যোগ্যতা বলে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা করেছেন এবং এর প্রচার ও প্রসার ঘটানর জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা মহানবী (সা.) কে যেভাবে কাছ থেকে দেখেছেন এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন তা কোন পুরুষ সাহাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনেক কিছুই তাঁরা যেভাবে অবলোকন, আয়ত্ব ও অন্তস্থ করেছেন তা সত্যিই বিরল ও অসাধারণ। ইসলামের এমন গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি উম্মুহাতুল মোমেনীনদের অবদানের আলোচনা ছাড়া কোনভাবেই ফলপ্রসূ হয় না। মানব গোষ্ঠীর অর্ধেক হচ্ছে নারী জাতি বা মায়ের জাতি। তাদের অবদান ও ভূমিকার আলোচনা ছাড়া কোন আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। নারী জাতির

আলোচনা বাদ দিয়ে মানব জাতির আলোচনাই হয় না। আর এটা ইসলামী সভ্যতার ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও সত্য ও প্রযোজ্য।

যা হোক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার সাধনে উম্মুহাতুল মোমেনীনদের অবদানের আলোচনার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক পর্বে নারী জাতির যে বিরাট ভূমিকা ছিল সে কথাই স্মরণ করে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে ভুল তথ্য ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় তার কিছুটা পরিসমাপ্তি ঘটবে; আর এতেই আমাদের সফলতা, আত্নতৃপ্তি ও আত্ন প্রশান্তির কারণও বটে। সে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান অভিসন্দর্ভটির শিরোণাম ঠিক করা হয়েছিল এবং ইসলাম ধর্মে নারী জাতীর অবদান, অবস্থান ও মর্যাদার বিষয়ে জানতে আগ্রহী জ্ঞান পিপাসুদের উদ্দেশ্য করে অভিসন্দর্ভের মত কঠিন দুর্ভেদ্য ও জটিল কাজে হাত দিয়েছিলাম। আশাকরি পাঠক মহলে অত্র অভিসন্দর্ভটি সমাদৃত হবে এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে ঢেকে থাকা বা আড়ালে থাকা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের যে অপরিসীম অবদান ছিল তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ প্রথম বাণীই ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত। মহানবী (সা.) নিজে শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। মূলত ইসলামে একটি শিক্ষিত মানব জাতি তৈরি করার কথাই বলা হয়েছে। আসলে শিক্ষাই হচ্ছে মানবজাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। অপরদিকে সংস্কৃতি বলতে কোন জাতির ধারণকৃত আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনকেই বুঝানো হয়ে থাকে। ইসলাম ধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের একটি উন্নত ও রুচিশীল সংস্কৃতি প্রদান করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দিক বা পরিমন্ডলই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির বাস্তবরূপ। তাঁর থেকে সরাসরি প্রভাবিত ও অনুশীলিত হয়েছিলেন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ। তাঁরাই অন্য সবার চেয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দিকসমূহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত ছিলেন। মূলত: একজন ব্যক্তিকে ভিতর থেকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে পারে সর্ব প্রথম তার স্ত্রী/স্ত্রীগণ ও এর পরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কিভাবে ও কোন ভঙ্গিতে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে ব্যবহার করতেন এবং তাঁরাই বা কিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাথে আচরণ করতেন— সে সম্পর্কে বাংলা ভাষায় বিস্তৃত তথ্যসমৃদ্ধ কোন অধ্যায়ন আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। অতএব, অলক্ষ্যে থাকা এ দিকটি নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়নের দরকার যাতে করে মহনবী (সা.) এর দাম্পত্য জীবন থেকে বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী অনেক কিছু জানার ও মানার সুযোগ পায়। মানুষের দাম্পত্য জীবনের অনেক সমস্যা রয়েছে। যার অনেকাংশই হয়ত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মনীষীগণের দাম্পত্য জীবনের ঘটনাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে সাধারন মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনের ঘটে যাওয়া অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যেতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা হল, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণও পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অন্বেষণ, অর্জন ও বিতরণের কাজ করেছেন। তাঁরা কেবলই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, বরং সমকালীন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়াবলী সম্পর্কে সজাগ ছিলেন ও চর্চা করতেন। যেমন, হযরত আয়েশা (রা.) হাদীসচর্চার পাশাপাশি কাব্যচর্চা, ইতিহাস, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

পারদর্শী ছিলেন। হযরত হফসা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিশেষ অনুপ্রেরণায় লেখা-পড়া শিখেছিলেন এবং পরবর্তীতে অন্যান্যদেরকে লেখা পড়া শিখিয়েছিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) হাদীসচর্চার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে দূরদর্শী ছিলেন। মূলত তাঁরই পরামর্শে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে সুকৌশলে তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

যা হোক, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পুরুষদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে নারীরাও ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে কাজ করেছেন। মোট কথা, এ বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করতে মহিলা সাহাবীগণ বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণের ভূমিকা অপরিসীম। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুয়্যাত ও রিসালাত এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)। সর্বপ্রথম নামাজ আদায় করেছেনও তিনি। তাই ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর স্ত্রীগণের অবদান অপরিসীম।

রাসূল (সা.) এর বাস্তব জীবন জেনে তা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন তার পুত-পবিত্র স্ত্রীগণ। তাঁর ৩৮ বছরের পারিবারিক জীবনে তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা পালনে উৎসাহ দিয়েছেন। আর ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে তাঁকে সার্বিকভাবে সাহায্য সহযোগীতা করেছেন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ। তাঁরা সকলে মুসলিম নারীদের জন্য আদর্শ এবং বিশ্ববাসীদের ‘মা’ (উম্মাহাতুল মু’মিনীন) নামে উপাধিত হয়েছেন। তাদের সংখ্যা মোট তের (১৩) জন। আমরা মুসলিমরা যখন পাশ্চত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত এবং ইসলামের ‘আকীদা’ বা বিশ্বাস, কৃষ্টি-কালচার, আইন-কানুন ইত্যাদি সবই তাদের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করছি, বিশেষত: নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির

নামে ইসলাম বিরোধী যে কর্মতৎপরতা প্রবল বেগে বয়ে চলছে এর জবাব দেয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই নবীজীর স্ত্রীগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। আর এ ব্যাপারে একমাত্র বাস্তব উদাহরণ হলো রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগণ। তাই অত্র অভিসন্দর্ভে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে।

একজন সত্যিকার মুমিনের অবশ্যই এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গোটা জীবন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ছিল। আর তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালের পর উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের অনেকেই দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন এবং নিরলসভাবে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বর্তমানে আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির নামে অবাধে অশ্লীলতার জয়লাভ দেখতে পাচ্ছি। এই বিশৃঙ্খল সমাজে সংস্কৃতির নামে বেহায়াপনা সীমা অতিক্রম করছে। ডুবন্ত এই সমাজকে রক্ষা করতে হলে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকল্প নেই। আর এর উপর রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগণের ভূমিকা নিয়ে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণাও হয়নি। ইসলমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগনের যে অপরিসীম ভূমিকা ছিল তা উপস্থাপন, বিশ্লেষণ এবং এর আলোকে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা বক্ষমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণের পাণ্ডিত্যের বিবরণ জানলে অবাক হতে হয়। তাঁরা অনেকেই কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসূল, ইজমা, কিয়াস, সাহিত্য, ইতিহাস, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যাসহ আরও অন্যান্য বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগই শিক্ষকতা ও বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন। এ কথা নিসন্দেহে বলা যায় যে তাঁরা সবাই ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

তাঁদের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের বিস্তার ও বিকাশ ঘটেছে। তাই তাঁদের জ্ঞান চর্চা ও এর বিতরণ এবং সংস্কৃতির অনুশীলন ও অনুকরণ করা মুসলমান হিসেবে আমাদের সবার দায়িত্ব। তাই বর্তমান অভিসন্দর্ভে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবন ও কর্মের সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের জন্য মোট বারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ইসলাম ধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বর্ণাঢ্য জীবন ও বহুমাতৃক কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা, স্বরূপ, প্রকৃতি, পরিধি ও বৈশিষ্ট নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং শিক্ষায় ইসলামী দর্শনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়, প্রকৃতি, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং সংস্কৃতিতে ইসলামী দর্শনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জাহেলী যুগে আরবের শিক্ষা ও সংস্কৃতিক অবস্থার উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বহু বিবাহের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর সম্মানিত সহধর্মীনীদের কর্ম-প্রয়াস বর্ণনা করা হয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীদের ভূমিকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর সম্মানিত সহ-ধর্মীনীদের কর্ম-প্রয়াস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার শেষে

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের সারাংশ উপসংহারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে একটি সুবিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপন করে অভিসন্দর্ভটির পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভের সুবিস্তৃত আলোচনা দ্বারা প্রমান করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ (রা.) ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে অসাধারণ ও কালজয়ী অবদান রেখেছেন। সে অবদানের শ্রোতধারা কাল অতিক্রম করে আজও বহমান। এছাড়া এ প্রমানও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের অবদান পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমানেও কলূষমুক্ত, সুন্দর ও সাবলীল সমাজ বিনির্মান করা সম্ভব।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে। গবেষক ও সাধারণ পাঠকগণ এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

মহান আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। আমীন॥

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা। অসংখ্য দরূদ ও সালাম মানবতার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.), তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ, বংশধর, সাহাবাগণ ও অনুসারীগণের প্রতি।

ইসলাম বলতে বুঝায় মহান আল্লাহ তায়ালার বিধি বিধানের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুস্বরণ ও অনুকরণ করা নবী রাসূলগণ বিশেষ করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর প্রদর্শিত পথ নির্দেশনার আলোকে। আর যে শিক্ষা ইসলামকে জানার ও মেনে চলার ব্যবস্থা করে তাই ইসলামী শিক্ষা। ইসলাম যেহেতু দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কথা বলে, তাই ইসলামী শিক্ষা কেবল একমূখী আধ্যত্ম শিক্ষা বা আখেরাতমুখী শিক্ষা নয়; বরং আখেরাতের জীবনে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহীতার কথা স্মরণ করে আল্লাহর রাজী সন্তুষ্টিকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দুনিয়াতে সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার যথার্থ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য সকল ধরনের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করে। ইসলমী শিক্ষার মত ইসলামী সংস্কৃতিও তাই। ইসলাম প্রদর্শিত ও অনুমোদিত মানব জীবনের সকল ক্রিয়া-কর্মই ইসলামী সংস্কৃতিভূক্ত। মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা যা চিন্তা করে ও এর বাস্তবায়ন ঘটায় সবই মানুষের সংস্কৃতি। মানুষের চিন্তা থেকে আরম্ভ করে কর্ম পর্যন্ত সকল কিছু যদি আল্লাহ তায়ালার বাণী পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুন্নাহ মোতাবেক করা হয় তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কর্মকান্ড মানুষ পূর্ব থেকেই করে আসছে। ইসলাম এসে মানুষের সাংস্কৃতিক দিকটিকে পরিশুদ্ধ ও পরিশালীত করেছে মাত্র।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মাধ্যমে জোরালো ভূমিকা রেখে আসছেন। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজক ব্যবস্থায় যেহেতু পুরুষের ভূমিকাকে মূখ্য করে দেখা হয় সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পশ্চাতেই থেকে যায়।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এরূপ ঘটেছে আমরা মনে না করলেও মুসলমান পুরুষের মন-মনেন পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব পড়ে নি—সেটা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যাহোক, সাম্য ও মৈত্রীর ধর্ম ইসলামের প্রাথামিক পর্বে যেভাবে পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীদের ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে ও ভূমিকা রাখতে দেখা যায় তা পরবর্তীতে সেভাবে মুসলিম সমাজে আর সেভাবে দেখা যায় না। এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান বর্তমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্যে নয়। অত্র অভিসন্দর্ভে কেবল ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে মহানবী (সা.) এর পুত পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিতে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি সাধারণ আলোচনায় এসেছে তা হচ্ছে উম্মুহাতুল মোমেনীনগণ মহানবী (সা.) এর স্ত্রী হয়েছেন এ নিয়েই পড়ে থাকেন নি; বরং তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্র থেকে নিজ মেধা ও যোগ্যতা বলে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা করেছেন এবং এর প্রচার ও প্রসার ঘটানর জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁরা মহানবী (সা.) কে যেভাবে কাছ থেকে দেখেছেন এবং গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন তা কোন পুরুষ সাহাবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কাজেই ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনেক কিছুই তাঁরা যেভাবে অবলোকন, আয়ত্ব ও অন্তস্থ করেছেন তা সত্যিই বিরল ও অসাধারণ। ইসলামের এমন গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি উম্মুহাতুল মোমেনীনদের অবদানের আলোচনা ছাড়া কোনভাবেই ফলপ্রসূ হয় না। মানব গোষ্ঠীর অর্ধেক হচ্ছে নারী জাতি বা মায়ের জাতি। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

অবদান ও ভূমিকার আলোচনা ছাড়া কোন আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। নারী জাতির আলোচনা বাদ দিয়ে মানব জাতির আলোচনাই হয় না। আর এটা ইসলামী সভ্যতার ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও সত্য ও প্রযোজ্য।

যা হোক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার সাধনে উম্মুহাতুল মোমেনীনদের অবদানের আলোচনার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক পর্বে নারী জাতির যে বিরাট ভূমিকা ছিল সে কথাই স্মরণ করে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে ভুল তথ্য ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় তার কিছুটা পরিসমাপ্তি ঘটবে; আর এতেই আমাদের সফলতা, আত্মতৃপ্তি ও আত্ম প্রশান্তির কারণও বটে। সে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বর্তমান অভিসন্দর্ভটির শিরোণাম ঠিক করা হয়েছিল এবং ইসলাম ধর্মে নারী জাতীর অবদান, অবস্থান ও মর্যাদার বিষয়ে জানতে আগ্রহী জ্ঞান পিপাসুদের উদ্দেশ্য করে অভিসন্দর্ভের মত কঠিন দুর্ভেদ্য ও জটিল কাজে হাত দিয়েছিলাম। আশাকরি পাঠক মহলে অত্র অভিসন্দর্ভটি সমাদৃত হবে এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে ঢেকে থাকা বা আড়ালে থাকা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের যে অপরিসীম অবদান ছিল তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ প্রথম বাণীই ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত।[১] মহানবী (সা.) নিজে শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

১. মহানবী (সা) এর উপর সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে সূরা আলাকের প্রথম আয়াত, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ -‘পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’ (আল কুরআন, ৯৬:১)। সুতরাং ইসলাম ধর্মের ওহীপ্রাপ্ত প্রথম আদেশই ছিল জ্ঞান চর্চার।

মূলত ইসলামে একটি শিক্ষিত মানব জাতি তৈরি করার কথাই বলা হয়েছে। আসলে শিক্ষাই হচ্ছে মানবজাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। অপরদিকে সংস্কৃতি বলতে কোন জাতির ধারণকৃত আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনকেই বুঝানো হয়ে থাকে। ইসলাম ধর্ম মুসলমানদের একটি উন্নত ও রুচিশীল সংস্কৃতি প্রদান করেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক দিক বা পরিমন্ডলই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির বাস্তবরূপ। তাঁর থেকে সরাসরি প্রভাবিত ও অনুশীলিত হয়েছিলেন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ। তাঁরাই অন্য সবার চেয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দিকসমূহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত ছিলেন। মূলত: একজন ব্যক্তিকে ভিতর থেকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করতে পারে সর্ব প্রথম তার স্ত্রী/স্ত্রীগণ ও এর পরে পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) কিভাবে ও কোন ভঙ্গিতে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে ব্যবহার করতেন এবং তাঁরাই বা কিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সাথে আচরণ করতেন— সে সম্পর্কে বাংলা ভাষায় বিস্তৃত তথ্যসমৃদ্ধ কোন অধ্যায়ন আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি। অতএব, অলক্ষ্যে থাকা এ দিকটি নিয়ে ব্যাপক অধ্যয়নের দরকার যাতে করে মহনবী (সা.) এর দাম্পত্য জীবন থেকে বাংলা ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী অনেক কিছু জানার ও মানার সুযোগ পায়। মানুষের দাম্পত্য জীবনের অনেক সমস্যা রয়েছে। যার অনেকাংশই হয়ত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মনীষীগণের দাম্পত্য জীবনের ঘটনাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে সাধারন মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনের ঘটে যাওয়া অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যেতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা হল, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণও পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অন্বেষণ, অর্জন ও বিতরণের কাজ করেছেন। তাঁরা কেবলই ইসলামী জ্ঞান-

বিজ্ঞান চর্চা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, বরং সমকালীন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়াবলী সম্পর্কে সজাগ ছিলেন ও চর্চা করতেন। যেমন, হযরত আয়েশা (রা.) হাদীসচর্চার পাশাপাশি কাব্যচর্চা, ইতিহাস, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। হযরত হফসা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিশেষ অনুপ্রেরণায় লেখা-পড়া শিখেছিলেন এবং পরবর্তীতে অন্যান্যদেরকে লেখা পড়া শিখিয়েছিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) হাদীসচর্চার পাশাপাশি রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে দূরদর্শী ছিলেন। মূলত তাঁরই পরামর্শে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে সুকৌশলে তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

যা হোক, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে পুরুষদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে নারীরাও ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে কাজ করেছেন। মোট কথা, এ বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করতে মহিলা সাহাবীগণ বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণের ভূমিকা অপরিসীম। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুয়্যাত ও রিসালাত এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)। সর্বপ্রথম নামাজ আদায় করেছেনও তিনি। তাই ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর স্ত্রীগণের অবদান অপরিসীম।

রাসূল (সা.) এর বাস্তব জীবন জেনে তা থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন তার পুত-পবিত্র স্ত্রীগণ। তাঁর ৩৮ বছরের পারিবারিক জীবনে তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা পালনে উৎসাহ দিয়েছেন। আর ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে তাঁকে সার্বিকভাবে সাহায্য সহযোগীতা করেছেন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ। তাঁরা সকলে মুসলিম নারীদের জন্য আদর্শ এবং বিশ্ববাসীদের ‘মা’ (উম্মাহাতুল মু’মিনীন) নামে উপাধিত

হয়েছেন।[২] তাদের সংখ্যা মোট তের (১৩) জন।[৩] আমরা মুসলিমরা যখন পাশ্চত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত এবং ইসলামের ‘আকীদা’ বা বিশ্বাস, কৃষ্টি-কালচার, আইন-কানুন ইত্যাদি সবই তাদের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করছি, বিশেষতঃ নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির নামে ইসলাম বিরোধী যে কর্মতৎপরতা প্রবল বেগে বয়ে চলছে এর জবাব দেয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই নবীজীর স্ত্রীগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। আর এ ব্যাপারে একমাত্র বাস্তব উদাহরণ হলো রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগণ। তাই অত্র অভিসন্দর্ভে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস করা হয়েছে।

একজন সত্যিকার মুমিনের অবশ্যই এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গোটা জীবন স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ছিল। আর তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশে সমাজে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইন্তিকালের পর উম্মুহাতুল মু’মিনীনদের অনেকেই দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন এবং নিরলসভাবে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বর্তমানে আমরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির নামে অবাধে অশ্লীলতার জয়লাভ দেখতে পাচ্ছি। এই বিশৃঙ্খল সমাজে সংস্কৃতির নামে বেহায়াপনা সীমা অতিক্রম করছে। ডুবন্ত এই সমাজকে রক্ষা করতে হলে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকল্প নেই। আর এর উপর রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগণের ভূমিকা নিয়ে

---

২. আল-কুরআন, ৩৩:৬ (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ- “তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা”)

৩. মুয়াল্লিমা মোরশদা বেগম (সম্পাদিত), *রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন*, (ঢাকা:পিস পাবলিকেশন্স, ২০১১), বইটিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীদের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে মোট তের জনের উল্লেখ করেছেন, (পৃ. ৭-৯ ও ১১-১৬৯)।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের (সা) জীবন কথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দশম প্রকাশ, ২০১৬) বইটিতে নবীজী (সা) এর পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যা ১১ জন বলেছেন। তিনি হযরত রায়হানা ও মারিয়া কিবতীয়ার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেনি। অনেক বইয়ে উপরোক্ত দু’জনকে রাসূলের দাসী হিসাবে উল্লেখ করলেও ড. এইচ এম মুজতবা হোসেইন, *হযরত মুহাম্মদ (সা) : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* বইটিতে কানীয হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবুল হাসান আলী নদবী তার বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ *আসসীতুন নবাবিয়্যা-* এ হযরত রায়হানা ও মারিয়া কিবতীয়াকে নবীজীর বিবাহিত স্ত্রীদের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণাও হয়নি। ইসলমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগনের যে অপরিসীম ভূমিকা ছিল তা উপস্থাপন, বিশ্লেষণ এবং এর আলোকে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা বক্ষমান অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণের পাণ্ডিত্যের বিবরণ জানলে অবাক হতে হয়। তাঁরা অনেকেই কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসূল, ইজমা, কিয়াস, সাহিত্য, ইতিহাস, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যাসহ আরও অন্যান্য বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগই শিক্ষকতা ও বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন। এ কথা নিসন্দেহে বলা যায় যে তাঁরা সবাই ছিলেন ইসলামী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাঁদের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের বিস্তার ও বিকাশ ঘটেছে। তাই তাঁদের জ্ঞান চর্চা ও এর বিতরণ এবং সংস্কৃতির অনুশীলন ও অনুকরণ করা মুসলমান হিসেবে আমাদের সবার দায়িত্ব। তাই বর্তমান অভিসন্দর্ভে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবন ও কর্মের সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের জন্য মোট বারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ইসলাম ধর্মের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বর্ণাঢ্য জীবন ও বহুমাতৃক কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা, স্বরূপ, প্রকৃতি, পরিধি ও বৈশিষ্ট নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং শিক্ষায় ইসলামী দর্শনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়, প্রকৃতি, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং সংস্কৃতিতে ইসলামী দর্শনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে জাহেলী যুগে আরবের শিক্ষা ও সংস্কৃতিক অবস্থার উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশায়

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বহু বিবাহের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর সম্মানিত সহধর্মীনীদের কর্ম-প্রয়াস বর্ণনা করা হয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীদের ভূমিকার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর সম্মানিত সহ-ধর্মীনীদের কর্ম-প্রয়াস ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার শেষে অভিসন্দর্ভের সারাংশ উপসংহারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। সবশেষে একটি সুবিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপন করে অভিসন্দর্ভটির পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভের সুবিস্তৃত আলোচনা দ্বারা প্রমান করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ (রা.) ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে অসাধারণ ও কালজয়ী অবদান রেখেছেন। সে অবদানের শ্রোতধারা কাল অতিক্রম করে আজও বহমান। এছাড়া এ প্রমানও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের অবদান পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বর্তমানেও কলূষমুক্ত, সুন্দর ও সাবলীল সমাজ বিনির্মান করা সম্ভব।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে। গবেষক ও সাধারণ পাঠকগণ এর দ্বারা উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। আমীন॥

প্রথম অধ্যায়

ইসলাম: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১.১ ইসলাম ধর্মের নামকরণ

ধর্মের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, প্রতিটি ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে অথবা যে জাতির মধ্যে এর জন্ম হয়েছে তার নামে। যেমন, খ্রিস্ট ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর প্রচারক হযরত ঈসা (আ.)-এর নামে।[৪] বৌদ্ধ ধর্মের্র নাম রাখা হয়েছে এর প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বুদ্ধের নামে।[৫] জরদশ্ত ধর্মের নামও হয়েছে তেমনি তাঁর প্রতিষ্ঠাতা জরদশ্তের নামে।[৬] ইয়াহুদী ধর্ম যদিও হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও মুসা (আ.) এর সাথে সর্ম্পকিত তথাপি এই ধর্মের নামকরণ করা হয়েছিল ইয়াহুদা নামে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে।[৭] ঠিক এভাবেই দুনিয়ায় অন্যান্য ধর্মের নামকরণ হয়েছে। তবে নামের দিক দিয়ে ইসলামের রয়েছে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব। কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা জাতির সাথে এর নামের সংযোগ নেই। বরং 'ইসলাম' শব্দটির অর্থের মধ্যে আমরা একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাই, সেই গুণই প্রকাশ পাচ্ছে এ নামে। সুতারাং

---

৪. গ্রিক ভাষায় ঈসা (আ.) কে নামকরণ করা হয়েছে জিসাস ক্রাইস্ট নামে। ক্রাইস্ট এর আরবী শব্দ মাসিহ বা পাপ মোচনকারী। এটি হযরত ঈসা (আ.) এর উপাধি। ক্রাইস্টের অনুসারীদেরকে বলা হয় খ্রিস্টান এবং তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে বলা হয় ক্রিশ্চিয়ানিটি বা খ্রিস্ট ধর্ম। উল্লেখ্য, খ্রিস্টান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ক্রাইস্ট বা ঈসা (আ.) এর পূজারী (worshipers of the Christ)। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মো: শাজাহান কবির, we‡ki ag cwiPwZ, ঢাকা: দিক-দিগন্ত, ২০০৯, পৃ. ৮২-১২৫)

৫. বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার আসল নাম হচ্ছে সিদ্ধার্থ গৌতম। বৌদ্ধ হচ্ছে তাঁর উপাধি। এর অর্থ হচ্ছে আলোকবর্তিকা। উল্লেখ্য, সিদ্ধার্থ গৌতম দীর্ঘ পাঁচ বছর বটবৃক্ষের তলে বসে ধ্যান ও আরাধনা করে চারটি আর্য সত্য (জগতে দু:খ আছে, দু:খের কারণ আছে, দু:খের নিরোধ আছে এবং দু:খ থেকে নিরোধের উপায় আছে)-এর জ্ঞান লাভ করেন। এরপরে তিনি উক্ত জ্ঞান প্রচারে বের হয়ে পড়েন এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে বহু অনুসারী পেয়ে যান। তাঁর অনুসারীরা তাকে বুদ্ধ নামে পরিচিত করান এবং বুদ্ধার শিক্ষা দর্শন ও ধর্মমতকে বৌদ্ধ নামে অভিহিত করেন। (সূত্র: ড. মোঃ শাজাহান কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২২৫)

৬. প্রাচীন পারস্যের এক মহা মনিষীর নাম হচ্ছে জরাদশত। তাঁর শিক্ষা দর্শন ও ধর্মমত অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে তিনি একজন নবী ছিলেন হয়তোবা। যতদূর জানা যায় তিনি এক আল্লাহর (আহোরা মাজদা) দিকে তাঁর জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীরা একত্ববাদ থেকে সরে এসে দ্বৈতবাদকে (দু' ঈশ্বরের মতবাদ) গ্রহণ করেছিল। যাহোক, তাঁর প্রচারিত ধর্মমতকে তাঁরই অনুস্বারীরা জরাস্ট্রিয়ানিজম বা জরাদশতি ধর্ম নামে অভিহিত করে। (সূত্র: ড. মোঃ শাজাহান কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮-২৭৩)

৭. মূসা (আ.) এর অনেক পরে বেবিলনদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ইয়াহুদা নামক স্থানে বণি ইসরাঈলের একটি গোষ্ঠী বসবাস করতে থাকে। উক্ত স্থানটি গোত্র প্রধান ইয়াহুদের নামে নামকরণ করা হয় যিনি হযরত ইয়াকুব (আ.) এর ছেলে ছিলেন বলে মনে করা হয়। যাহোক, উক্ত স্থানে বসবাসকারীরাই হযরত মূসা (আ.) এর শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী চলার চেষ্টা করতেন। যেহেতু তারাই উক্ত স্থানে বসবাস করে শত্রুদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তাদের ধর্মমতকে টিকিয়ে রেখেছিলেন, এজন্য তাঁরা তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও অনুশীলনকে ইয়াহুদী ধর্ম নামে অভিহিত করেছেন। (সূত্র: ড. মোঃ শাজাহান কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৮১)

নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন এক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, এবং কোন এক জাতির মধ্যে এ ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। তাই ইসলাম কোন বিশেষ ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। এই ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইসলামের গুণরাজি সৃষ্টি করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাত-গোষ্ঠীর যেসব খাঁটি ও সৎলোকের মধ্যে এসব গুণ পাওয়া গেছে, তাঁরা ছিলেন 'মুসলিম' বা আত্মসম্পর্নকারী।[৮] এ ধরনের লোক আজো রয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবেন।

১.২ ইসলাম শব্দের অর্থ

আরবী শব্দ (الإسلام) 'ইসলাম' এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'আত্মসমর্পন' করা বা আনুগত্যের চরম পরাকষ্ঠা প্রদর্শন করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম (আ.) কে বলেছিলেন:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

"স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, অনুগত হও। সে বলল, আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।"[৯]

আরবী ভাষায় 'ইসলাম' বলতে বুঝায় আনুগত্য। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া এ ধর্মের লক্ষ্য বলেই এর নাম হয়েছে 'ইসলাম'। ইসলাম আবার মূল আরবী শব্দ (سلم) সালমুন থেকে বের হয়ে আসছে যার অর্থ হচ্ছে সন্ধি বা চুক্তি। এ অর্থে ইসলাম বুঝায় মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যকার এক পবিত্র চুক্তি, সন্ধি বা বন্ধন যা মানবজাতি মেনে চলতে বাধ্য। আবার মূল ধাতু (سلم) সিলমুন থেকে (سلام) 'সালাম' শব্দটি আসছে যার অর্থ হচ্ছে শান্তি। এ অর্থে ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম; কেননা স্রষ্টা প্রদত্ত ও মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শিত বিধি বিধান মানার মধ্যেই রয়েছে সত্যিকারের শান্তি, সুখ ও সফলতার নিশ্চয়তা।

---

৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: Abul Hashim, *The Creed of Islam*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1950, PP. 11-20

৯. আল কুরআন, ২:১৩১

পরিভাষায় ইসলাম বলতে বুঝায় আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত ইসলামী বিধি বিধানকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে মেনে চলার নাম। জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছু গ্রহণ করার সুযোগ নাই। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"[১০]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[১১]

১০. আল কুরআন, ৩:৮৫
১১. আল কুরআন, ৫:৫

ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান যা ইসলামী পরিভাষায় পরিপূর্ণ দ্বীন।[১২] কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা ইমরানের ১১নং আয়াতে বলেন:

هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا

عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

“দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশত আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আর আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন।”[১৩]

পৃথিবীর সমস্ত নবী-রাসূল এই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্যে এসেছিলেন। তাঁরা ও তাঁদের সত্যিকারের অনুসারীরা হচ্ছেন মুসলিম। মুসলিম শব্দে অর্থ হচ্ছে আত্ম সমার্পণকারী। পবিত্র কুরআনে মুসলিমের গুণাবলী সর্ম্পকে বলা হয়েছে,

آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا

أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা,

১২. আল কুরআন, ৩:১৩৬
১৩. আল কুরআন, ৩:১১৯

ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।"[১৪]

সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে এ ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে ইসলামের শুরু হয়েছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.) থেকে। এমনকি, তাঁকে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা পর্যন্ত বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আর সমগ্র নবী-রাসূল হচ্ছেন এর প্রচারকর্মী মাত্র। তাই ইসলাম সর্বকালের জন্যে মানবজাতির এক অভিন্ন ধর্ম হয়ে রয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, নবী-রাসূলগণের অনুসারীরা পরবর্তীতে তাদের আসল ধর্ম (ইসলাম) কে বিকৃত করে নিজেরা এমন সব ধর্ম তৈরি করে নিয়েছে যা বর্তমানে বিভিন্ন নামে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে দেখ যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, হযরত ঈসা (আ.) যে ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন তা নি:সন্দেহে ছিল ইসলাম। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর অনুসারীরা হযরত ঈসা (আ.) কেই তাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে এবং তাঁর শিক্ষার সাথে নতুন নতুন বিধান মিশিয়ে এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি করেছে বর্তমানে যা খ্রিস্টান ধর্ম নামে দুনিয়াতে পরিচিত।

১.৩ ইসলাম ধর্মের সংক্ষিপ্ত ক্রমবিকাশ

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও রক্ষক। তিনি ফিরিশতাদের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের কাছে তাঁর হেদায়েতের বাণী মানব জাতির কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন যুগে যুগে। পৃথিবীর প্রথম মানব ও রাসূল হযরত আদম (আ.) থেকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকলেই ছিলেন আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ইসলামের প্রচারক ও প্রসারক।

---

১৪. আল কুরআন ২:১৩৬

কাজেই নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের পূণ্যবান সকল অনুসারী ছিলেন মুসলিম বা ইসলামের অনুসারী। তবে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে। বর্তমানে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের ভিতরেই ইসলামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় যদিও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহের ছিটা-ফোটাতে এখনও অবশিষ্ট আছে তবে তা অধিকাংশেই বিকৃতরূপে। আজকের বিশ্বে কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারীরাই মুসলিম জাতি হিসেবে অভিহিত এবং তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও অনুশীলনসমূহ (যা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর অবতীর্ণ পবিত্র কুরআন কর্তৃক স্বীকৃত ও রাসূলের সুন্নাহ কর্তৃক অনুমোদিত) ইসলাম নামে পরিচিত। এভাবে আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।[১৫]

ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহের পরিচয়

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রথমটি হচ্ছে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে যাকে ইসলামের পরিভাষায় (عقائد/إيمان) আকায়েদ বলা হয়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অনুশীলনে দিক দিয়ে যাকে (عبادة/أعمل) ইবাদত বলা হয়। বিশ্বাস (إيمان) ও অনুশীলনের (أعمل) সম্মিলিত রুপই হচ্ছে পরিপূর্ণ ইসলাম। পবিত্র কুরআনের সূরা আসরের ৩য় আয়াতে মহান আল্লাহ দ্ব্যার্থহীনভাবে ঘোষণা করেন,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحٰتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصبْرِ

“কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।”[১৬]

১৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ), *ইসলাম: ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি*, অনু. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ) ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৬, পৃ. ১৫-৩৬

১৬. আল কুরআন ১০৩:৩

যা হোক অনুশীলন ছাড়া বিশ্বাসের গুরুত্ব কমে গেলেও বিশ্বাস বা আকাঈদের গুরুত্ব অনুশীলনের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। বিশ্বাসের নির্ভুলতা ছাড়া অনুশীলনের কোনই গুরুত্ব নেই। বিশ্বাস ও অনুশীলনের সমন্বয়ই হচ্ছে পরিপূর্ণ ইসলামের পরিচয়।

১.৪ ইসলামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ

আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম মানতে বাধ্য সবাই। সকলেই দেখতে পাচ্ছে যে, চন্দ্র, সূর্য, তারা, নক্ষত্ররাজী এবং বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি চলছে এক অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয় বিধান মেনে। সেই বিধানের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই। সমগ্র দুনিয়া এক নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে চলছে এক নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। তার চলার জন্য যে সময়, যে গতি ও পথ নির্ধারিত রয়েছে, তাঁর কোন পরিবর্তন নেই কখনো। পানি আর হাওয়া, তাপ আর আলো সব কিছুই কাজ করে যাচ্ছে এক সঠিক নিয়মের অধীন হয়ে। জড়, গাছ-পালা, পশু-পাখীর রাজ্যেও রয়েছে তাদের নিজস্ব নিয়ম। সেই নিয়ম মুতাবিক তারা অস্বিত্বে আসে, বেড়ে ওঠে, ক্ষয় হয়, বাঁচে ও মরে। মানুষের অবস্থা চিন্তা করলে দেখা যায় যে সেও এক বিশেষ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এক নির্দিষ্ট জীবতাত্ত্বিক বিধান অনুযায়ী সে জন্মে, শ্বাস গ্রহণ করে, পানি, খাদ্য, তাপ ও আলো আত্মস্থ করে বেঁচে থাকে। তার হৃদপিণ্ডের গতি, তাঁর দেহের রক্তপ্রবাহ, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস একই বাঁধাধরা নিয়মের অধীন হয়ে চলছে। তাঁর মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, শিরা-উপশিরা, পেশীসমূহ, হাত, পা জিভ, কান, নাক-এক কথায় তাঁর দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে যাচ্ছে সেই একই পদ্ধতিতে যা তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।[১৭]

১.৬ ইসলাম বা আত্মসমর্পণের কাজ

১৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ইসলাম পরিচয়*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ৩১-৬৯

মহাবিশ্বের সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার বিধান মেনে তথা আনুগত্য করে চলছে। যে শক্তিশালী বিধানের অধীনে চলতে হচ্ছে দুনিয়া জাহানের বৃহত্তম নক্ষত্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম কণিকা পর্যন্ত সবকিছু- তা হচ্ছে এক মহাশক্তিমান বিধানকর্তার সৃষ্টি। সমগ্র সৃষ্টি জাহানের সবকিছুই বিধানকর্তার আনুগত্য স্বীকার করে এবং সবাই মেনেচলে তাঁরই দেয়া নিয়ম। আগেই বলা হয়েছে যে, মহাবিশ্বের প্রভু মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য ও তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম, তাই এদিক দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির ধর্মই হচ্ছে ইসলাম।[১৮] চন্দ্র, সূর্য, তারা, গাছ-পালা, পাথর ও জীব-জানোয়ার সবাই তারই কাছে আত্মসম্পূর্ণকারী তথা মুসলিম। যে মানুষ আল্লাহকে চেনে না, যে তাঁকে অস্বীকার করে, যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পূজা করে এবং যে আল্লাহর কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরীক করে, স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে সেও মুসলিম, কারণ তার জীবন-মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহর বিধানের অনুসারী। তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাঁর দেহের প্রতিটি অণু ইসলাম মেনে চলে কারণ তাঁর সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও গতি সবকিছুই আল্লাহর দেয়া নিয়মের অধীন। মুর্খতাবশত যে জিহ্বা দিয়ে সে শিরক ও কুফরের কথা বলছে, প্রকৃতির দিক দিয়ে তাও মুসলিম। যে মাথাকে জোরপূর্বক আল্লাহ ছাড়া অপরের সামনে অবনত করছে, সেও জন্মগতভাবে মুসলিম, অজ্ঞতার বশে যে হৃদয়ের মধ্যে সে অপরের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা পোষণ করে, তাও সহজাত প্রকৃতিতে মুসলিম। তারা সবাই আল্লাহর নিয়মের অনুগত এবং তাদের সব কাজ চলছে এ নিয়মের অনুসরণ করে।[১৯]

১৮. যেহেতু জগতসমূহের সবকিছুই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবকিছু তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। কাজেই হুকুম মানা ও আনুগত্যের অর্থে সৃষ্টির সব কিছুই হচ্ছে ইসলাম। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরুপ দেখুন সূরা আল ইমরানের ৮৩ নং আয়াতের অর্থ ও এর ব্যাখ্যা সমূহ। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। (আল কুরআন, ৩:৮৩)।

১৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক হাসনা আইয়ূব, *ইসলামী আকীদা*, কুষ্টিয়া: আসসুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭, পৃ. ৫৫-৬৯

এবার আরেকটি আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখি। প্রকৃতির লীলাখেলার মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের রয়েছে দু'টি দিক। এক দিকে সে অন্যান্য সৃষ্টির মতোই জীব-জগতের নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা রয়েছে। তাকে মেনে চলতে হয় সেই নিয়ম। অপরদিকে, তাঁর রয়েছে জ্ঞানের অধিকার, চিন্তা করে বুঝার অধিকার, কোন বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছার ক্ষমতা ইত্যাদি। তাঁর নিজের ক্ষমতা রয়েছে কোন বিশেষ মতকে মেনে চলার, আবার কোন বিশেষ মতকে অমান্য করার ইত্যাদি। জীবনের কার্য-কলাপের ক্ষেত্রে কখনো কোন নিয়ম-নীতিকে সে স্বেচ্ছায় তৈরি করে নেয়, কখনো বা অপরের তৈরি নিয়ম-নীতিকে নিজের করে নেয়। এদিক দিয়ে সে দুনিয়ার অন্যবিধ সৃষ্ট পদার্থের মতো একই ধরাবাঁধা নিয়মের অধীন নয়, বরং তাকে দেয়া হয়েছে নিজস্ব চিন্তা, মতামত ও কর্মের স্বাধীনতা।[২০]

মানবজীবনে এ দু'টি দিকেরই রয়েছে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। প্রথম বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মানুষ দুনিয়ার অপর সব পদার্থের মতই জন্মগত মুসলিম। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মুসলিম হওয়া বা না হওয়ার উভয়বিধ ক্ষমতা তার মধ্যে রয়েছে এবং এ নির্বাচন ক্ষমতার প্রভাবেই মানুষ বিভক্ত হয়েছে দু'টি শ্রেণিতে।

১.৭ পূর্ণাঙ্গ মুসলিম বা আত্মসমার্পণকারীর পরিচয়

এক শ্রেণির মানুষ হচ্ছে তাঁরা, যারা তাঁদের স্রষ্টাকে চিনেছে, তাকেই তাঁদের একমাত্র মনিব ও মালিক বলে মেনে নিয়েছে এবং যে ব্যাপারে তাঁদেরকে নির্বাচনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সেখানেও তারই নির্ধারিত কানুন মেনে চলার পথই তারা বেছে নিয়েছে, তাঁরা হয়েছে পরিপূর্ণ

২০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক হাসানা আইয়ুব, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি*, (অনু. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ১৯-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বা আত্ম-সমর্পণকারী। তাদের ইসলাম হয়েছে পূর্ণাঙ্গ। কারণ তাঁদের জীবনই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহতে সমর্পিত। না জেনে-শুনে যার নিয়মের আনুগত্য তাঁরা করছে জেনে-শুনেও তারই আনুগত্যের পথই তাঁরা অবলম্বন করেছে। অনিচ্ছায় তাঁরা আল্লাহর বাধ্যতার পথে চলেছিল, স্বেচ্ছায়ও তাঁরই বাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছে। তাঁরা হয়েছে এখন সত্যিকার জ্ঞানের অধিকারী। কারণ যে আল্লাহ তাঁদেরকে দিয়েছেন জানার ও শিখার ক্ষমতা, সেই আল্লাহকেই তাঁরা জেনেছে। এখন তাঁরা হয়েছে সঠিক যুক্তি ও বিচার ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, যে আল্লাহ তাঁদেরকে চিন্তা করার, বুঝার ও সঠিক সিদ্ধান্ত কায়েম করার যোগ্যতা দিয়েছে, চিন্তা করে ও বুঝে তাঁরা সেই আল্লাহরই আনুগত্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাঁদের জিহ্বা হয়েছে সত্যভাষী, কেননা সেই প্রভূত্বের স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে তারা, যিনি তাদেরকে দিয়েছেন কথা বলার শক্তি। এখন তাঁদের পরিপূর্ণ জীবনই হয়েছে পূর্ণ সত্যাশ্রয়ী। কারণ ইচ্ছা-অনিচ্ছার উভয় অবস্থায়ই তাঁরা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসারী। সমগ্র সৃষ্টির সাথেই তাঁদের মিতালী। কারণ সৃষ্টির সকল পদার্থ যার দাসত্ব করে যাচ্ছে, তাঁরাও করেছে তাঁরই দাসত্ব।[২১] দুনিয়ার বুকে তাঁরা হচ্ছে আল্লাহর সত্যিকারের খলীফা (প্রতিনিধি)[২২] ও রহমানের আদর্শ বান্দা।[২৩] সারা দুনিয়া এখন তাদেরই এবং তারা হচ্ছে আল্লাহর।

---

২১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ, *ইসলাম পরিচয়*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ১-৫

২২. সূরা আল বাক্বারাহ এর ৩১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

আর আল্লাহ তা'আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক"। (আল কুরআন, ২:৩১)

২৩. সূরা আল ফুরকানের ৬৩ থেকে ৭৬ নং আয়াত সমূহে মহান আল্লাহ তায়ালা আদর্শ বান্দার বেশ কিছু মৌলিক গুণাবলী সর্ম্পকে বলা হয়েছে: "রহমান এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তারা উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে; এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং

১.৮ ইসলাম মেনে চলার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ

১.৮.১ মানুষ মূলত অনুসরণ করে চলেছে আল্লাহর বেধে দেওয়া নিয়ম কানুন

এ দুনিয়ার প্রত্যেক দিকে ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহর কর্তৃত্বের অসংখ্য নিদর্শন। সৃষ্টির এ বিপুল কারখানা চলছে এক সুসম্পন্ন বিধান ও অটল নিয়মের অধীন হয়ে। সবকিছুই আসলে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তার স্রষ্টা ও পরিচালক এক মহাশক্তিমান শাসক যাঁর ব্যবস্থাপনায় কেউ অবাধ্য হয়ে থাকতে পারে না। সমগ্র সৃষ্টির মত মানুষেরও প্রকৃতি হচ্ছে তাঁর আনুগত্য।[২৪] কাজেই অসচেতনভাবে সে রাত-দিন তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে, কারণ তাঁর প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূল আচরণ করে সে বেঁচে থাকতে পারে না।

১.৮.২ মানুষকে ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করেন

আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা, চিন্তা ও উপলব্ধি করার শক্তি এবং সৎ ও অসত্যের পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা দিয়ে তাকে ইচ্ছাশক্তি নির্বাচন ক্ষমতার কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। আসলে এ স্বাধীনতার ভিতরেই রয়েছে মানুষের আসল পরীক্ষা। মূলত তাকে যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, কিভাবে সে তা ব্যবহার করছে, তারও পরীক্ষা এর মধ্যে রয়েছে। এ পরীক্ষায় কোন বিশেষ পদ্ধতি

ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্চিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসে এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন আসার অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায় এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শস্বরূপ কর। তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম!” (আল কুরআন, ২৫:৬৩-৭৬)

২৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

অবলম্বন করতে মানুষকে বাধ্য করা হয়নি কারণ বাধ্যতা আরোপ করলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই হয় ব্যাহত। এ কথা প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, প্রশ্নপত্র হাতে দেয়ার পর যদি পরীক্ষার্থীকে কোন বিশেষ ধরনের জবাব দিতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সে ধরনের পরীক্ষা ফলপ্রসূ হয় না। পরীক্ষার্থীর আসল যোগ্যতা তো কেবল তখনই প্রমাণিত হয়, যখন তাকে প্রত্যেক ধরনের জবাব পেশ করবার স্বাধীনতা দেয়া হয়। সে সঠিক জবাবদিতে পারলে হবে কৃতকার্য। আর ভুল জবাব দিলে হবে অকৃতকার্য এবং অযোগ্যতার দরুন নিজেই নিজের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করে ফেলবে।[২৫] ঠিক তেমনি করেই আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকেও পরীক্ষায় যে কোন পথ অবলম্বন করার স্বাধীনতা দিয়েছেন।

এ ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির কথা বলা যায়, যে নিজের ও সৃষ্টির সহজাত প্রকৃতি উপলব্ধি করেনি, স্রষ্টার সত্ত্বা ও গুণরাজি চিনতে যে ভুল করেছে এবং মুক্তবুদ্ধির যে স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে, তার সাহায্যে না-ফরমানী ও অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে চলেছে। এ ব্যক্তি জ্ঞান, যুক্তি, পার্থক্য-অনুভূতি ও কর্তব্য নিষ্ঠার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। সে নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সে প্রত্যেক দিক দিয়েই নিকৃষ্ট স্তরের লোক। সুতরাং উপরে বর্ণিত খারাপ পরিণামই তার জন্য প্রতীক্ষা করছে।[২৬]

অন্যদিকে রয়েছে আরেক ব্যক্তি, যে এ পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছে সে জ্ঞান ও যুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আল্লাহকে জেনেছে ও মেনেছে, যদিও এ পথ ধরতে তাকে বাধ্য করা হয়নি। সৎ ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে সে ভুল করেনি এবং নিজস্ব স্বাধীন নির্বাচন

২৫. প্রাগুক্ত
২৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, *ইসলামের সমাজ দর্শন*, (অনু. আব্দুল মান্নান তালিব), ঢাকা: খন্দকার প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৫৯

ক্ষমতা দ্বারা সে সৎ পথই বেছে নিয়েছে, অথচ অসৎ পথের দিকে চালিত হওয়ার স্বাধীনতা তার ছিল। সে আপন সহজাত প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেছে, আল্লাহকে চিনেছে এবং নাফরমানীর স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছে। সে তাঁর যুক্তিকে ঠিক পথে চালিত করেছে। চোখ দিয়ে ঠিক জিনিসই দেখেছে, কান দিয়ে ঠিক কথা শুনেছে, মস্তিষ্ক চালনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই পরীক্ষায় সে সাফল্য-গৌরবের অধিকারী হয়েছে। সত্যকে চিনে নিয়ে সে প্রমাণ করেছে যে, সত্য সাধক এবং সত্যের সামনে মস্তক অবনত করে দেখিয়েছে যে, সে সত্যের পূজারী। এ কথায় সন্দেহ নেই যে, যার মধ্যে এসব গুণরাজির সমাবেশ হয়, তাঁর মাধ্যমে সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যের অধিকারী হয়ে থাকে।[২৭]

১.৮.৩ আল্লাহকে ভয় করা ব্যক্তি ও ভয় না করা ব্যক্তির চিন্তা ও কর্ম

আল্লাহ ভয়কারী, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী লোক জ্ঞান ও যুক্তির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে, কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর সত্তাকে উপলব্ধি করেছে এবং তাঁর গুণরাজির পরিচয় লাভ করেছে, সেই জ্ঞানের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবকিছুই জেনেছে-এ ধরনের লোক কখনো বিভ্রান্তির পথে চলতে পারে না, কারণ শুরুতেই সে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সত্যের দিকে এবং তার সর্বশেষ গন্তব্য লক্ষ্যকেও সে জেনে নিয়েছে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে। এরপর সে দার্শনিক চিন্তা ও অনুসন্ধানের মারফতে সৃষ্টি রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সে কাফের দার্শনিকের মতো কখনো সংশয়-সন্দেহের বিভ্রান্তি স্তূপের মধ্যে নিমজ্জিত হবে না। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সে প্রাকৃতিক নিয়মকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে, সৃষ্টির লুক্কায়িত ধন-ভাণ্ডারকে নিয়ে আসবে প্রকাশ্য আলোকে। দুনিয়ায় ও মানুষের দেহে আল্লাহ যে শক্তিসমূহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তার সবকিছুরই সন্ধান করে সে জেনে নিবে। যমীন ও আসমানে যত জিনিস

২৭. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৬১

রয়েছে, তার সব কিছুকে কাজে লাগানোর সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান সে করবে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা তাকে প্রতি পদক্ষেপে ফিরিয়ে রাখবে বিজ্ঞানের অপব্যবহার থেকে। আমিই এসব জিনিসের মালিক, প্রকৃতিকে আমি জয় করেছি, নিজের লাভের জন্য আমি বিজ্ঞানকে কাজে লাগাব, দুনিয়ায় আনব ধ্বংস-তাণ্ডব; আর লুট-তরাজ ও খুন-খারাবি করে সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করব আমার শক্তির আধিপত্য- এ জাতীয় বিভ্রান্তিকর চিন্তায় সে কখনো নিমজ্জিত হবে না। এসব হচ্ছে কাফের বিজ্ঞানীর কাজ। মুসলিম বিজ্ঞানী যত বেশি করে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব অর্জন করবে, ততোই বেড়ে যাবে আল্লাহর প্রতি তাঁর বিশ্বাস এবং ততোই সে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হবে।[২৮]

১.৮.৪ মানব কল্যাণই মুসলিমের ইহকালীন কাজ-কর্মের মূল লক্ষ্য

অনুরূপভাবে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যবিধ শাখায় মুসলিম তাঁর গবেষণা ও কর্মতৎপরতার দিক দিয়ে কাফেরের পিছনে পড়ে থাকবে না, কিন্তু দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি হবে স্বতন্ত্র। মুসলিম ব্যক্তি জ্ঞানের চর্চায় থাকবে নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, তাঁর সামনে থাকতে হবে এক নির্ভুল লক্ষ্য এবং সে পৌঁছবে এক নির্ভুল সিদ্ধান্তে। ইতিহাসে মানব জাতির অতীত দিনের পরীক্ষা থেকে সে গ্রহণ করবে শিক্ষা, খুঁজে বের করবে জাতিসমূহের উত্থান-পতনের সঠিক কারণ, অনুসন্ধান করবে তাদের তাহযীব-তামাদ্দুনের কল্যাণকর দিক। ইতিহাসে বিবৃত সৎ মানুষদের অবস্থা আলোচনা করে সে উপকৃতহবে। যেসব কারণে অতীতের বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তা থেকে বেঁচে থাকবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের এমন অভিনব পন্থা সে খুঁজে বের করবে, যাতে সকল মানুষের কল্যাণ হতে পারে, কেবল একজনের কল্যাণ ও অসংখ্য মানুষের অকল্যাণ তার লক্ষ্য হবে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর পরিপূর্ণ মনোযোগ থাকবে এমন এক লক্ষ্য অর্জনের দিকে যাতে দুনিয়ায় শান্তি, ন্যায়-বিচার, সততা ও

---

২৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

মহত্বের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কোন ব্যক্তি বা দল আল্লাহর বান্দাহদেরকে নিজের বান্দায় পরিণত করতে না পারে, শাসন ক্ষমতা ও সম্পূর্ণ শক্তিকে আল্লাহর আমানত মনে করা হয় এবং তা ব্যবহার করা হয় আল্লাহর বান্দাহদের কল্যাণে। আইনের ক্ষেত্রে সে বিবেচনা করবে, যাতে ন্যায় ও সুবিচারের সাথে মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং কারুর উপর কোন প্রকারের অন্যায় বা যুলুম না হয়।[২৯] এভাবে প্রতিটি কাজ-কর্মের মাধ্যমে সে নিজেকে মানব জাতির যথার্থ কল্যাণকামী হিসেবে গড়ে তুলবে।

১.৮.৫ পৃথিবীর সবকিছুই মানব জাতির কাছে আমানত স্বরূপ

মুসলিম চরিত্রে থাকবে আল্লাহ ভীতি, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়নতা। সবকিছুরই মালিক আল্লাহ, এ ধারণা নিয়ে সে বাস করবে দুনিয়ার বুকে। তাঁর ও দুনিয়ায় মানুষের দখলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর দান। কোন জিনিসের এমন কি তার নিজের দেহের ও দেহের শক্তির মালিকও সে নিজে নয়। সবকিছুই আল্লাহর আমানত এবং এ আমানত থেকে ব্যয় করার যে স্বাধীনতা তাঁকে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা প্রয়োগ করাই হচ্ছে তাঁর কর্তব্য। একদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছ থেকে এ আমানত ফেরত নেবেন এবং সেদিন প্রতিটি জিনিসের হিসাব দিতে হবে।[৩০] এটাই হচেছ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দর্শন।

১.৮.৬ ব্যক্তিগত জীবনে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়াই ইসলাম

মৃত্যু পরবর্তী জগতে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি কর্মের জন্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ধারণা নিয়ে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বেঁচে থাকে, তার চরিত্র সহজেই অনুমান করা যায়। কুচিন্তা থেকে সে

---

২৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৩০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

তার মনকে মুক্ত রাখে, মস্তিষ্ককে দুষ্কৃতির চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখে, কানকে সংরক্ষণ করে অসৎ আলোচনা শ্রবণ থেকে, কারোর প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া থেকে চোখকে সংরক্ষণ করে, জিহ্বাকে সংরক্ষণ করে অসত্য উচ্চারণ থেকে। হারাম জিনিস দিয়ে পেট ভরার চেয়ে উপবাস থাকাকে সে শ্রেয় মনে করে। যুলুম করার চিন্তা তার মাথায় কখনও আসে না। সে কখনো তার পা চালাবে না অন্যায়ের পথে। মাথা কাটা গেলেও সে তার মাথা নত করে না মিথ্যার সামনে। যুলুম ও অসত্যের পথে সে তার কোন আকাঙ্খা ও প্রয়োজন মিটায় না। তার ভিতরে থাকে সততা ও মহত্বের সমাবেশ। সত্য ও ন্যায়কে সে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে অধিকতর প্রিয় মনে করে থাকে এবং তার জন্য সে তার সকল স্বার্থ ও অন্তরের আকাঙ্খা, এমনকি নিজস্ব সত্ত্বাকে পর্যন্ত কুরবান করে থাকে। যুলুম ও অন্যায়কে সে ঘৃণা করে সবচেয়ে বেশি এবং কোন ক্ষতির আশংকায় অথবা লাভের বশবর্তী হয়ে তার সমর্থন করে না। মূলত: দুনিয়ার সাফল্যও এ শ্রেণির লোকই অর্জন করে থাকে।[৩১]

১.৮.৭ একজন মুসলিম সবচেয়ে বেশী সম্মানিত

যার মাথা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে অবনত হয় না, যার হাত আল্লাহ ছাড়া আর কারোর সামনে প্রসারিত হয় না, মূলত: তার চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী, তার চেয়ে বেশি সম্ভ্রান্ত আর কেউ হতে পারে না। অপমান কি করে তার কাছে ঘেষবে? সে তো মহাশক্তিধর এক আল্লাহ তায়ালার সামনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছে। যেহেতু সে মহান আল্লাহর অস্তিত্বে ও তার বিশাল শক্তির সামনে নিজের অহমিকার বাতিকে চূর্ণ করে দিয়েছে কাজেই আল্লাহ তায়ালা তার সকল সৃষ্টির সামনে তাকে সম্মানিত করে তোলেন।[৩২]

---

৩১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাওলানা জয়নুল আবেদীন ফারুকী, *ইসলামে নৈতিক চরিত্রের ধারণা*, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৫, পৃ. ৭০-৭৯

৩২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাওলানা লুৎফর রহমান, *ইসলামে সুফি দর্শনের মূলকথা*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৭, পৃ. ১৪-১৯

১.৮.৮ মুসলমান সবচেয়ে শক্তিশালী

যার দিলে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ভয় স্থান পায় না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সে পুরষ্কার ও ইজ্জতের প্রত্যাশা করে না, তার চেয়ে বড় শক্তিমান আর কে হতে পারে? কোন শক্তি তাকে বিচ্যুত করতে পারে না সত্য-ন্যায়ের পথ থেকে, কোন সম্পদ ক্রয় করতে পারে না তার ঈমানকে; সে আসলে সকল ধরনের ভয় ভীতির উর্ধ্বে অবস্থান করে থাকে। বাহ্যিকভাবে তাকে দুর্বল ও সরল-সহজ মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সেই চালাক ও শক্তিশালী মানুষ; কেননা সে তো মহাশাক্তিশালী আল্লাহ তায়ালাকে চিনিয়েছে এবং তার শক্তির উপরই সে ভরসা করেছে।[৩৩]

১.৮.৯ মুসলিম ব্যক্তিই বড় ধনী ও সম্পদশালী

আরাম-আয়েশের পূজারী যে নয়, ইন্দ্রিয়পরতার দাসত্ব যে করে না, বল্গাহারা লোভী জীবন যার নয়, নিজের সৎ পরিশ্রমলব্ধ উপার্জনে যে খুশী, অবৈধ সম্পদের স্তুপ যার সামনে এলে সে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে তার চেয়ে বড় সম্পদশালী আর কেউ হতে পারে না। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ শান্তি ও সন্তোষ যে লাভ করেছে, দুনিয়ায় তার চেয়ে বড় ধনী, সে নিজের অসহায়ত্বকে ভয় করে না বরং তার দৃষ্টি মহান আল্লাহর সীমাহীন সম্পদে। দুনিয়ার যতটুকু সম্পদ তার আছে তাতে সে সন্তুষ্টি ও খুশি। সে নিজেকে কখনও সম্পদের কাঙ্গাল ও ভিখারী মনে করে না। আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে সে কখনও সম্পদ বা দুনিয়ার ভোগ বিলাসের জন্যে ধর্না দেয় না। যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তাহলে তার জন্যে সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে থাকে।[৩৪] এভাবে সত্যিকারের

৩৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাওলানা লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

৩৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জামান খান, *মুসলিম জীবনে সূফী দর্শনের প্রভাব*, ঢাকা: ইসলামী বই বিতান, ১৯৫৩, পৃ. ৫-৭

মুসলিম হিসাবে আল্লাহ তায়ালা উপর ভরসা করে সে নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখি সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করে।

১.৮.১০ মুসলিম ব্যক্তি সবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সর্বজন প্রিয়

যে ব্যক্তি প্রত্যেক মানুষের বৈধ অধিকার স্বীকার করে নেয়, কাউকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না; প্রত্যেক মানুষের সাথে যে ভাল আচরণ করে, কারো সাথে অসদাচরণ করে না বরং প্রত্যেকেরই কল্যাণ কামনা করে তার চেয়ে বড় বন্ধু ও সর্বজন প্রিয় আর কেউ হতে পারে না। মানুষের মন আপনা থেকে ঝুঁকে পড়ে তার দিকে, প্রত্যেক মানুষ বাধ্য হয় তাকে সম্মান করতে এবং হৃদ্যতা দিয়ে তাকে কাছে টেনে থাকে। কেননা সকল কিছুর স্রষ্টা মহান আল্লাহর সাথে তার মিতালী। মহান আল্লাহ তায়ালাই তাঁর সৃষ্টিকূলের কাছে এ রকম ব্যক্তিকে ঘনিষ্ট বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করান এবং তাঁকে সকলের কাছে প্রিয়পাত্রে পরিণত করেন।[৩৫]

১.৮.১১ মুসলিম ব্যক্তিই মানবজাতির সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত মানুষ

একজন সত্যিকারের মুসলিমের চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত মানুষ দুনিয়ায় আর কেউ হতে পারে না, কারণ সে কারোর আমানত বিনষ্ট করে না এবং ন্যায়ের পথ থেকে মুখ ফিরায় না। প্রতিশ্রুতি পালন করে এবং আচরণের সততা প্রদর্শন করে; আর কেউ দেখুক আর নাই দেখুক আল্লাহ তো সবকিছুই দেখছেন এ ধারণা নিয়ে সে সবকিছুই করে যাচ্ছে গভীর দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের সাথে। এমন লোকের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলা যায় না, কারণ সে মানুষের আমানত রক্ষা করে চলে আল্লাহ তায়ালার

৩৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

কাছে কঠিন জাবাদিহিতার ভয়ে সঙ্কিত হয়ে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দুনিয়ার কোন শক্তিই তার কাছ থেকে সে আমানতের দায়িত্ব পালনের পথে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে না।[৩৬]

১.৮.১২ ইসলামে রয়েছে চিরন্তন সফলতার নিশ্চয়তা

এভাবে ইসলামের বিধি বিধানের আলোকে জীবন পরিচালনা করার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা। দুনিয়ায় ইজ্জত ও সম্মানের সাথে জীবন অতিবাহিত করে যখন সে মৃত্যুর পরে তার প্রভুর সামনে হাযির হবে, তখন তার উপর বর্ষিত হবে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও রহমত; কারণ দুনিয়ার জীবনে যে আমানত আল্লাহ তার নিকট সোপর্দ করেছিলেন, সে তার পরিপূর্ণ হক আদায় করেছে এবং আল্লাহ যে পরীক্ষায় তাঁকে ফেলেছিলেন, সে কৃতিত্বের সাথে তাতে উত্তীর্ণ হয়েছে।[৩৭] এ হচ্ছে চিরন্তন সাফল্য যা ধারাবাহিকভাবে চলে আসে দুনিয়া থেকে আখেরাতের জীবন পর্যন্ত এবং তার ধারা কখনো হারিয়ে যায় না। এভাবে ইসলামের চিরন্তন বিধি-বিধান দুনিয়া ও আখিরাতের তথা উভয় জগতের শান্তি ও সুখের নিশ্চিয়তা প্রদান করে থাকে। কেননা আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে তার কাছে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

অর্থাৎ “হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।”[৩৮]

১.৮.১৩ ইসলামই হচ্ছে মানুষের স্বভাবধর্ম

৩৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাওলানা লুৎফর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২
৩৭. প্রাগুক্ত পৃ. ২৯-৩০
৩৮. আল কুরআন ২: ২০১

সৃষ্টি জগতের সবকিছু মহান স্রষ্টার বিধান মেনে চলছে এবং সৃষ্টি জগেতের সব কিছুর এ বিধান মেনে চলাকে মহান আল্লাহ স্বভাব পরিণত করে দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এ নিয়েম মেনে চলাই ইসলাম। সুতরাং ইসলাম কেবল মানুষেরই নয় বরং সৃষ্টি জগতের স্বভাব ধর্ম। কোন জাতি বা দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় এ বিধান। সকল যুগে সকল জাতির মধ্যে ও সকল দেশের যেসব আল্লাহ ভীরু ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ অতীত হয়ে গেছেন, তাদের ধর্ম ছিলো ইসলাম। তারা ছিলেন মুসলিম হয়তো তাদের ভাষায় সে ধর্মের নাম অপর কিছু ছিলো। কেননা জাতী-গোষ্ঠীকে মহান আল্লাহ তায়ালা সঠিক পথের দিশা বিহীন করেন নি। প্রত্যেক গোত্রের কাছেই তিনি নবী পাঠায়েছিলেন তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার জন্যে। আল্লাহ তায়ালা নবী রাসূল না পাঠালেও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে মানবজাতীর প্রতি কোন অন্যায় করা হতো না, কেননা মানব বিবেকের মধ্যেই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আর এ মানব বিবেকই হচ্ছে স্বভাব ধর্ম ইসলামকে বুঝা ও মেনে চলার জন্যে যথেষ্ট।

১.৯ ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বা আকাঈদ (عقائد)

কতিপয় মৌলিক বিষয়ের উপর গভীর ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকে ইসলামের পরিভাষায় ঈমান (إيمان) তথা আকাঈদ (عقائد) বলা হয়ে থাকে। যে সকল মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় তা হচ্ছে: ১. আল্লাহ তায়ালা একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন না করা। ২. সমগ্র ফেরেশতার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখা এবং এ বিশ্বাস রাখা যে ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমের সামনে সর্বদা আনুগত্যশীল। ৩. মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নবী রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ সকল ঐশী কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ৪. মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা যে সকল

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে নবী বা রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন তাদেরকে মহান আল্লাহর দূত বা বার্তাবাহক হিসাবে বিশ্বাস করা। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের দিবসের প্রতি এভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যে দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ জীবন নয় বরং মৃত্যুর পরে শুরু হবে মানুষের আসল জীবন যেখানে তাকে দুনিয়ার প্রতিটি কাজের জন্যে মহান আল্লাহ তায়ালার সামনে জবাবদিহী করতে হবে। তার ভাল কাজের পরিনাম হিসাবে সে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে আর খারাপ কাজের ফলাফলের দরুণ তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যেতে হবে।

৬. ভাগ্যের (تقدير) বা তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা যে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যতটুকু বরাদ্দ রেখেছেন ততটুকুই সে অর্জন করতে পারবে, তার চেয়ে বেশীও নয় আবার কমও নয়। তার অর্থ এই নয় যে মানুষ কেবলই নির্জীব পদার্থের মত কর্মবিমুখ হয়ে বসে থাকবে। বরং কর্ম প্রচেষ্টায় বলিয়ান হয়ে ভালো কাজের জন্যে এবং ভালো ফলাফল প্রাপ্তির আশায় তার সকল ধরনের শ্রম ও সাধনা অব্যাহত রাখবে মৃত্যু পর্যন্ত। তাকে এটা মনে রাখতে হবে যে তার দায়িত্ব হচ্ছে কেবলই ভালো কর্ম করে যাওয়া, আর ভালো কর্মের বিনিময় দেওয়ার কাজ হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার। জীবন চলার পথে যদি কখনও মন্দ কিছু ঘটে যায় অথবা দু:সহ বা কষ্টকর কিছু তার সামনে চলে আসে তাহলে তাকে ধৈর্যসহকারে তা মেনে নিতে হবে। আবার যখন তার জীবনে ভালো কিছু ঘটবে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা পোষন করতে হবে। এভাবে একজন মুসলিমকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে মানবজাতীর ভালো মন্দের চূড়ান্ত নির্ধারণ মহান আল্লাহ তায়ালাই করেন।

১.১০ ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদত (عبادت) বা অনুশীলন

মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবলই মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগী করার জন্যে। পবিত্র কুরআনের সূরা যারিয়াতের ৫৬নং আয়াতের বলা হয়েছে,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।”[৩৯]

আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছি এ জন্যে যে, তারা আমার ইবাদত করবে। ইবাদত এর আসল বাংলা অর্থ হলো দাসত্ব করা। দাসত্ব বলতে তাই বুঝায় যা করতে দাসকে আদেশ করা হয় অথবা যা করতে নিষেধ করা হয়। মনিবের আদেশ ও নিষেধ মেনে চলাই হচ্ছে দাসের দাসত্ব করা। একজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী ও আনুগত্যশীল মানুষের কাছে মহান আল্লাহর আদেশ নিষেধই হচ্ছে চূড়ান্ত ধাপ যার সাথে অন্য কিছুর তুলনা চলে না। সুতারাং নির্দ্বিধায় তার আদেশ নিষেধের সামনে মস্তক অবনত রাখতে হবে, কোন রকমের যুক্তি-তর্ক ছাড়াই যাকে বলা হয় নি:শর্ত আনুগত্য। তার নিজের জীবনে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের প্রতিফল ঘটতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি (خليفة) হিসাবে দুনিয়াবাসীর সামনে তার নমুনা বা দৃষ্টান্ত পেশ করতে হবে। এ রকমের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ নিয়েই একজন সত্যিকারের আল্লাহ ভীরু (متقى) ব্যক্তিকে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতে হবে তা না হলে ইবাদগুলো কেবলই অন্তসার শূণ্য হবে এবং তা কতিপয় আচার-আচরনের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়বে।

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি।[৪০] যথা ঈমান, সালাত (صلوة), যাকাত (زكوة), সাওম (صوم) ও হজ্জ (حج)।

১.সালাত (صلوة)

৩৯. আল কুরআন, ৫১: ৫৬

৪০. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.), *ইসলাম: ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি*, অনু. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ.), ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৬, পৃ.২৯

Dhaka University Institutional Repository

সালাত শব্দটি যদি আরবী শব্দ ওসলুন (وصل) থেকে এসেছে ধরে নেয়া হয়, তখন সালাত দ্বারা এমন ইবাদত বুঝায় যার মাধমে বান্দা সহজেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। আবার যদি সিল্লাহ (صلة) থেকে এসেছে ধরে নেওয়া হয় তখন এর দ্বারা এমন ইবাদত বুঝায় যার দ্বারা আল্লাহর ও বান্দার মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাত বা নামায। সালাতকে ইসলামের অন্যতম রোকন বা স্তম্ভ বলা হয়। হাদীসের ভাষায় মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যেকার পার্থক্য সৃষ্টিকারী (Line of Demarcation) হচ্ছে সালাত। কেননা বুখারী শরীফের হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, নবীজী (সা.) বলেছেন:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

"বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত পরিত্যগ করা।"[৪১]

মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"তোমরা সালাত কায়েম কর আর মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না।"[৪২]

দিনে ৫ বার (ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা) ১৭ রাকায়াত বিশিষ্ট সালাত (ফজরের ২ রাকায়াত, যোহরের ৪ রাকায়াত, আসরের ৪ রাকায়াত, মাগরিবে ৩ রাকায়াত ও ইশার ৪ রাকায়াত) আদায় করা প্রত্যেক বয়:প্রাপ্ত মুসলমান নর নারীর জন্য বাধ্যতামূলক। এছাড়া রয়েছে সুন্নাত ও নফল সালাত। বালেগ হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই সালাত পরিত্যাগের সুযোগ নাই। ফরয সালাত অনাদায়ে অবশ্যই গুনাহগার হতে হবে। নফল সালাত আদায়ের মাধ্যেমে আল্লাহর কাছে বান্দার মর্তবা বেড়ে যায় তবে তা অনাদায়ে গুনাহগার হতে হয় না।

৪১. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ (১ম খণ্ড)*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০, অধ্যায়: بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ, হাদীস নং-১৪৯, পৃষ্ঠা নং-১৩০

৪২. আল কুরআন, ৩০: ৩১

মুসাফিরের জন্যে চার রাকায়াত বিশিষ্ট সালাত দু রাকায়াতে আদায়ের অনুমতি আল্লাহ তায়ালা প্রদান করেছেন এবং যোহর ও আসর কিংবা মাগরিব ও ইশা একত্রে অথবা যে কোন একটির সময়ে অন্যটিকে আদায়ের সুযোগ ও দেয়া আছে। অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে দাড়িয়ে সালাত আদায় কষ্টসাধ্য হলে বসে কিংবা শুয়ে অথবা শুধু ইশারা করে সালাত আদায় করার অনুমিত দেওয়া আছে। ইসলামে সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাতকে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন কারী বলা হয়। হাদীসের ভাষায় সালাতকে (معراج المؤمنين) তথা মুমিনের মিরাজ/উর্ধ্ব আকাশে গমন বলা হয়।

যাকাত (زكوة)

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পবিত্র হওয়া ও বৃদ্ধি করা। ধনী ব্যক্তির সম্পদ থেকে বছরে ২.৫০% হারে গরীব ও অসহায় ব্যক্তি তথা যাকাতের ৮টি খাতের যে কোন একটি খাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দান করলে দাতার মন ও তার বাকী সম্পদ যেমন পুত পবিত্র হয় তেমনি সামষ্টিক অর্থে সম্পদের বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে সালাতের পরেই যাকাতের স্থান। কেননা পবিত্র কুরআনে সালাতের পরপরই যাকাতের কথা চলে এসেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) সালাত আদায় করতে লাগে শরীর ও মনের একনিষ্ট সাহায্য আর যাকতের মত ইবাদত সুসম্পন্ন করতে লাগে ধন সম্পদের ত্যাগ-তিতীক্ষা। সালাত যেখানে প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমানের উপর অপরিহার্য সেখানে যাকাত কেবল নিছাব পরিমাণ মালের অধিকারী ব্যক্তির উপরই অপরিহার্য। যাকাতের মাধ্যমে সমাজে ক্ষুধা দারিদ্রতা দূরীকরণ উদ্দেশ্য। যাকাত গরীব ও অসহায় মানুষদের জন্যে ধনীদের পক্ষ হতে ভিক্ষা বা দান নয়; বরং ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"এবং তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক আছে।"[৪৩]

অতএব একজন সচ্ছল মুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত আদায় জরিমানা মনে না করে সালাতের মতই গুরুত্ব দিয়ে সন্তুষ্টি চিত্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই আদায় করতে হবে। যাকাত অনাদায়ে ব্যক্তি গুনাহগার হতে হবে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার বড় খাত হচ্ছে যাকাত। অনেকে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাকে যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বলতেও দ্বিধা করেন নি। যা হোক, যাকাত ও অন্যান্য দান খয়রাতের মাধ্যমে সমাজকে দারিদ্রতা মুক্ত করাই ইসলামের উদ্দেশ্য। যদি যাকাত ও অন্যান্য নফল দান খয়রাতের মাধ্যমে সমাজকে অভাবমুক্ত রাখার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো না যায় তাহলে মুসলমানদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পর অবশিষ্ট সম্পদও এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে বলা হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

"আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে।"[৪৪]

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য হলো সম্পদ যেন কারো কাছেই পুঞ্জীভূত হয়ে না থাকে বরং ধন দরিদ্র সকলের মাঝেই যেন তা বিদ্যমান থাকে। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"যেন ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।"[৪৫]

তাই মহান আল্লাহ তায়ালা যাকাত, ফিতরাহ ও অন্যান্য সাদকাহ এর মাধ্যমে নি:স্ব অসহায় তথা সম্পদহীন ব্যক্তিকে কিছুটা সম্পদের মালিক হওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন। এভাবে যাকাত

৪৩. আল কুরআন, ৫১: ১৯
৪৪. আল কুরআন, ২: ২১৯
৪৫. আল কুরআন, ৫৯: ৭

ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার নমুনা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়; যদিও বর্তমান বিশ্বের মুসলমানগণ এ রকম সুন্দর ব্যবস্থাপনা থেকে এখন অনেক দূরে অবস্থান করছেন।

সাওম (صوم)

'সাওম' (صوم) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা। আবার কখনও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অর্থেও সাওম শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাওম এমন এক ধরনের ইবাদত যা মহান আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় নিষেধ থেকে ব্যক্তিকে বিরত রাখতে প্রস্তত করে। সাওমের মাধ্যমে ব্যক্তি তার রিপুকে জ্বালিয়ে পুড়ে ফেলে, তার অহমিকাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়, মনের মধ্যে লালায়িত লোক দেখানো প্রবণতা বা প্রদর্শনেচ্ছাকে দমন করে রাখে। বাহ্যিক ভাবে সাওম বলতে বুঝায় সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনচার থেকে বিরত থাকাকে। কিন্তু অন্তর্নিহিত গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে সর্বদা মহান আল্লাহর ভয়ে নিজেকে প্রস্তত রাখা, একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করা এবং আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে কোন কিছু না দেখানো। অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তি ব্যতিত সকল বয়প্রাপ্ত মুসলমান নর নারীকে পবিত্র রমযান মাসে পুরো সময়ই সিয়াম পালন করতে হয়। মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিরা তাদের সুবিধামত বছরের যে কোন সময়ে রমযানের কাযা সাওম আদায় করে নিতে পারে। রযমান মাসে ফরয সিয়াম পালন ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময় নফল সাওম রাখারও অনেক ফযিলত আছে। সাওম পালন করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকতে হয় বিধায় সাওম পালনকারী ব্যক্তি বাস্তবে বুঝতে পারে ক্ষুধা লাগলে কেমন কষ্ট লাগে ফলে তার পক্ষে গরীবের বা ক্ষুধার জ্বালায় কাতর ব্যক্তি কষ্টের কথা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় ফলে অভাবী ও নি:স্ব ব্যক্তিগণের জন্য তার অন্তর্মন কেঁদে উঠতে বাধ্য হয়। সুতরাং তার পক্ষে গরীব

অসহায় মানবতার জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে একজন দরদী মানুষ হওয়া সহজ হয়ে যায়। অপর দিকে সাওম পালনকারী ব্যক্তি গীবত, চোগলখুরী ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকে বিধায় সমাজ জীবনে সকলের সাথে তার সুসর্ম্পক গড়ে উঠে। এভাবে সমাজের সকল সদস্য যদি যথার্থ অনুপ্রেরণার সাথে সাওম পালন করে তাহলে সকলের প্রচেষ্টায় অতি সহজেই একটি শান্তি ও সুখের সমাজ বিনির্মান করা কঠিন হবে না। অন্যদিকে আধ্যাত্মিকভাবে সাওম পালনের অনেক মাহত্ম ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। সাওম পালনের মাধ্যমে একজন সত্যিকারের মুসলিম আল্লাহ তায়ালার অনেক কাছে পৌঁছাতে পারে। সাওমের প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিবেন বলে হাদীসে কুদসীতে জানা যায়।

হজ্জ (حج)

হজ্জ (حج) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা। স্বচ্ছল ও সামর্থ্যবান মুসলিম ব্যক্তিকে জীবনে একবার জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে পবিত্র কা'বা ঘর ও আরাফাতের ময়দানে কেন্দ্রিক কতিপয় অনুষ্ঠানাদি পালন করাকে মহান আল্লাহ তায়ালা বাধ্য করে দিয়েছেন। তাকেই শরয়ী ভাষায় হজ্জ বলা হয়। ইহরাম বাধা থেকে আরম্ভ করে হজ্জের কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত হজ্জ আদায়কারী ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত উপস্থিত বলে ঘোষণা করতে হয় এবং মনের গহীনে তার অনুভবও করতে হয়। সিলাই বিহীন সাদা পোশাক পরিধান করে আল্লাহর দরবারে নিজের অসহায়ত্বের প্রদর্শন করতে হয়। অপরদিকে হজ্জের মাধ্যমে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাঁর পুত্র হযরত ঈসমাইল (আ.) এবং স্ত্রী হযরত হাযেরা (আ.) এর স্মৃতিচারণ করা হয়ে থাকে। হজ্জ হচ্ছে মুসলিমদের জন্যে আন্তর্জাতিক বার্ষিক সম্মেলন যেখানে এসে মিলিত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সামর্থবান মুসলিমগণ যারা এক ধরনের আধ্যত্মিক জ্ঞান ও

প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে। হজ্জ কষ্ট সাধ্য কাজ বিধায় যৌবনের শক্তি থাকতেই সম্পন্ন করে ফেলা ভালো, নচেৎ পরে আদায় করতে গেলে ভীষণ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। হজ্জের পাশাপাশি ওমরাহ পালনও পবিত্র কাজ। তবে হজ্জের সাথে সাথে ওমরাহ পালন করা যায়। অধিকাংশই হজ্জ ও ওমরাহ একাসাথে পালন করে থাকে। আবার পৃথক ভাবেও হজ্জ ও ওমরাহ আদায় করা যায়। উপরোক্ত চারটি মৌলিক বা বুনিয়াদি ইবাদত ছাড়াও ইসলামে রয়েছে আরো অনেক ইবাদতের কথা। যেমন জিহাদ, পরপোকার, উত্তম চরিত্রের অনুশীলন, দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, জিহাদ নিয়ে সারা পৃথিবীতে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। কতিপয় মুসলিম নামধারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী জিহাদের মত পবিত্র কাজকে কলঙ্কিত করেছে নিজেদের স্বার্থে। মূলত: জিহাদ হচ্ছে এমন প্রান্তকর প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্যে সকল প্রকার বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করা। হাদীসের ভাষায় মনের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সঠিক ও সত্য-ন্যায়ের পথে টিকে থাককে বলা হয়েছে বড় জিহাদ আর যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর আক্রমনের হাত থেকে আত্নরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বলে ছোট জিহাদ। জিহাদ হচ্ছে মূলত এক অধ্যবসায় বা সাধনা। জিহাদের বাংলা অর্থ পবিত্র যুদ্ধ বা ধর্ম যুদ্ধ হতে পারেনা। যারা জিহাদকে ধর্মযুদ্ধ বা পবিত্র যুদ্ধ অনুবাদ করেছেন তারা মূলত অন্যায় করেছেন। কেননা পবিত্র যুদ্ধের আরবী পরিভাষা হচেছ (الحرب المقدسة) আল হারবুল মুকাদ্দাসাহ। কুরআন ও হাদীসের কোথাও এ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়নি। অথচ সর্বপ্রথম প্রাচ্যবিদরা বা পাশ্চত্যের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় জিহাদের অনুবাদ Holy War বা পবিত্র যুদ্ধ নামে অভিহিত করে জিহাদের অর্থকে তারা বিকৃত করেছেন।

আবার আবেগ তাড়িত কতিপয় মুসলিম উক্ত অর্থে জিহাদকে গ্রহণ করে তাদের দেয়া ফাঁদে পা দিয়েছেন। বর্তমান দুনিয়ায় কিছু কিছু উগ্রপন্থী মুসলিম যুবক এবং উগ্রপন্থী কিছু কিছু সংগঠন জিহাদের আরো অপব্যাখ্যা প্রদান করে ভুল জায়গাগুলোতে জিহাদ প্রয়োগ করে যাচেছ। যার ফলে সারা দুনিয়াতে মুসলিম অমুসলিম সাবার মাঝে জিহাদ নিয়ে এক মারাত্মক ভূল ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। অথচ জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাণন্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মগঠন ও আত্মরক্ষার মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে ব্যক্তিগঠন, পরিবারগঠন ও সমাজগঠনের মাধ্যেমে মানব জাতিকে সকল ধরনের গোড়ামীর বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে কেবল মহান আল্লাহর সাথে পরিচয় করে দেওয়া এবং আল্লাহর সাথেই সুসর্ম্পক সৃষ্টি করে দেওয়া। যে কাজটি যুগ যুগ ধরে সুফি সাধকেরা করে আসছেন এবং তাদের মাধ্যেমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। তবে হ্যাঁ প্রয়োজন পড়লে যেমন দেশ ও ধর্ম আক্রান্ত হলে সেক্ষেত্রে যথাযথ Authority বা কর্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি বর্গের (রাষ্ট্রীয় প্রধানের মত ব্যক্তি পর্যায়ের) অনুরোধ কিংবা আদেশে কেবল আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে অস্ত্র ধারনের কিংবা যুদ্ধের অনুমতি আছে। অন্যথায় যুদ্ধের মত কঠিন ও ধ্বংসযজ্ঞ যে কোন কাজকে পরিত্যাগ করতে হবে।

ইসলাম সর্বদা মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করতে বলে। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম আচরণ করার কথা ইসলামে জোরালোভাবে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টকারে বলা হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে।"[৪৬]

এখানে মুসলিম অমুসলিম পার্থক্য করার সুযোগ খুবই কম। পৃথিবীর সকল মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং হযরত আদম (আ.) এর সন্তান। সকলের দেহেই একই রঙয়ের রক্ত প্রবাহিত। সকলেই ব্যথা পেলে কষ্ট অনুভব করে এবং ভালো কাজে আনন্দ পায়। সকলের মাঝেই সমান্তরালভাবে ক্ষুধার জ্বালা রয়েছে। সকলেই আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। কাজেই সকলের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে ভাল ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনের সময় উপকার করা ইসলামের একটি গুরুত্ব পূর্ণ শিক্ষা। মূলত: এটাই ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও তাৎপর্য।

একজন মুসলমানের ব্যবহারিক জীবন যথা লেনদেন, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী (সা.) প্রদর্শিত বিধি-বিধানের আলোকে হতে হবে। একজন মুসলমানের কথা ও কাজ এতই সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে যে তা দেখে অমুসলিমদের মাঝে যেন ইসলাম গ্রহণের প্রতি আকাঙ্খা জাগে। কিন্তু অত্যন্ত দু:খজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান দুনিয়াতে সে রকমের আদর্শবান মুসলিম পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

৪৬. আল কুরআন, ৩:১১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বর্ণাঢ্য জীবন ও বহুমাতৃক কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিররণ

যে মহামানবের সৃষ্টি না হলে এ ভূ-পৃষ্ঠের কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না, যার পদচারণায় পৃথিবী ধন্য হয়েছে; আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা, অন্তরের পবিত্রতা, আত্মার মহত্ত্ব, ধৈর্য, ক্ষমতা, নম্রতা, সততা, বদান্যতা, আমানতদারী, সূরুচিপূর্ণ মনোভাব, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা ও কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল যার চরিত্রের ভূষণ; যিনি ছিলেন একাধারে ইয়াতীম হিসাবে সবার স্নেহের পাত্র, স্বামী হিসেবে প্রেমময়, পিতা হিসেবে স্নেহের আধার, সঙ্গী হিসেবে বিশ্বস্ত; যিনি ছিলেন সফল ব্যবসায়ী, দূরদর্শী সংস্কারক, ন্যায় বিচারক, মহৎ রাজনীতিবিদ এবং সফল রাষ্ট্র নায়ক; তিনি হলেন সর্বকালের সর্বযুগের এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি এমন এক সময় পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন আরবের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা অধ:পতনের চরম সীমায় নেমে গিয়েছিল।[৪৭]

2.1 Rb¥ I wkïKvj

প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়ালে, রোজ সোমবার প্রত্যুষে আরবের মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে মাতা আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ

---

৪৭. ইসলামের ইতিহাস সকল গ্রন্থে এ বিষয়ে কম-বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়রুল, মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত, (অনু. আব্দুল আউয়াল), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪, পৃ. ১১-৫৩

করেন।[৪৮] জন্মের ৫ মাস পূর্বে পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তিকাল করেন।[৪৯] আরবের তৎকালীন অভিজাত পরিবারের প্রথানুযায়ী তার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষন দায়িত্ব অর্পিত হয় বনী সা'দ গোত্রের বিবি হালিমার উপর। এ সময় বিবি হালিমার আরেক পুত্র সন্তান ছিল, যার দুধ পানের সময় তখনও শেষ হয়নি। বিবি হালিমা বর্ণনা করেন যে শিশু মুহাম্মদ (সা.) কেবল আমার ডান স্তনের দুধ পান করতেন। আমি তাকে আমার বাম স্তনের দুধ দান করাতে চাইলেও, তিনি কখনো বাম স্তন হতে দুধ পান করতেন না। আমার বাম স্তনের দুধ তিনি তাঁর অপর দুধ ভায়ের জন্যে রেখে দিতেন। দুধ পানের শেষ দিবস পর্যন্ত তাঁর এ নিয়ম বিদ্যমান ছিল। ইনসাফ ও সাম্যের মহান আদর্শ তিনি শিশুকালেই দেখিয়েছেন। মাত্র ৫ বছর তিনি ধাত্রী মা হালিমার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এরপর ফিরে আসেন মাতা আমেনার গৃহে।

২.২ বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা

বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালীন সময়ে চার কিংবা পাঁচ বছর বয়সে বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা ঘটে।[৫০] এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) এর বর্ণনায় জানা যায় যে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ

৪৮. আল্লামা ইদরীস কান্ধবী (র.), সীরাতুল মুস্তফা সা. (অনু. কালাম আসাদ), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চতুর্থ প্রকাশ: ২০১৩, পৃ-৫৩-৫৪; ছফিউর রহমান মোবারোকপুরী, A\i i\nxKj g\LZg, (অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী), ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন, ১৯৯৯, পৃ. ১৭-২৯
সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, সালমান মনসুরপী এবং মাহমুদ পাশা ফালকি গবেষণা করে বলেন যে মহানবী (সা.) ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ২০ অথবা ২২ এপ্রিলে রোজ সোমবার ৯ রবিউল আওয়ালে জন্মগ্রহণ করেন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন লেখক: কাযী মোহাম্মদ সোলায়মান সালমান মনসুরপী, রাহমাতুল্লিল A\j\wgb, দিল্লী: হানিফ বুক ডিপো, ১৯৩০, পৃ. ৫-২৯)

৪৯. *ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড*, পৃ. ১৫৬-১৫৮

৫০. অধিকাংশ সীরাত রচয়িতা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে উক্ত ঘটনাটি মুহাম্মদ (সা.) এর তিন বছর বয়সেই বিবি হালিমার গৃহে অবস্থান কালীন সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য: ইবনে হিশাম, *সীরাতুন নববীয়্যা*, বৈরুত: দারুল ফিকর, খন্ড. ১ম, তা.বি., পৃ.১৬৪-১৬৫

الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ

একদিন ফিরিশতা জিব্রাঈল (আ.) নবীজী (সা.) এর কাছে আগমন করলেন। এ সময় তিনি তাঁর সঙ্গী সাথীদের সাথে মাঠে খেলাধুলা করছিলেন। ফিরিশতা জিব্রাঈল (আ.) এক আগন্তুক লোকের রুপ ধরে তাকে সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে পৃথক করে একটুখানি দূরে নিয়ে গেলে এবং তৎপর তাকে শুইয়ে দিয়ে বুক চিরে কী যেন একটা কিছু বের করে নিলো এবং বললো এটা তোমার শরীরের মধ্যে শয়তানের একটা অংশ ছিল যা এখন বের করা হয়েছে পরিষ্কার করার জন্যে। অত:পর তা একটি প্লেটে রেখে যমযম কূপের পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে যথাযথ স্থানে স্থাপন করলেন। শিশু মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে এক অপরিচিত লোকের এমন ব্যবহার দেখে অন্য শিশুরা ছুটে গিয়ে বিবি হালিমার কাছে বলল যে, এক অপরিচিত ব্যক্তি মুহাম্মদ মেরে ফেলছে। উক্ত ঘটনার এ বিবরণ শোনা মাত্র পরিবারের লোকেরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ফিরে এসে দেখলেন যে মুহাম্মদ বিবর্ণ মুখে বসে আছেন।[৫১]

এভাবে মুহাম্মদ (সা.) কে ছোট বেলা থেকেই শয়তানের বিভিন্ন কু-মন্ত্রনা ও কু-চক্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে একেবারে ভিতর থেকে তাঁকে পুত-পবিত্র রাখা হয়েছে। শিশু বয়সে যেখানে শিশু মনে নানা রকমের খারাপ চিন্তা ভাবনা দোলা দিতে পারে তাঁর মননে সে রকমের কিছুরই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নি। তিনি ছিলেন জন্ম থেকেই একজন সত্যিকারের আদর্শ মানুষ।

২.৩ কৈশোর

---

৫১. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র), *মুসলিম শরীফ (১ম খণ্ড)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ; এপ্রিল ২০১০, অধ্যায়: হাদীস নং- ৩১০, পৃষ্ঠা নং-১৯৮।

ছয় বছর বয়সে তিনি মাতা আমেনার সাথে পিতার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা যান এবং মদীনা হতে প্রত্যাবর্তনকালে ‘আবওয়া’ নামক স্থানে মাতা আমেনা ইন্তিকাল করেন।[৫২] এরপর ইয়াতীম মুহাম্মদ (সা.) এর লালন পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় ক্রমান্বয়ে দাদা আবদুল মোত্তালিব ও চাচা আবু তালিবের উপর। পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ যে মহামানব আর্বিভূত হয়েছেন সারা জাহানের রহমত হিসেবে; তিনি হলেন আজন্ম ইয়াতীম এবং দু:খ বেদনার মধ্য দিয়েই তিনি গড়ে ওঠেন সত্যবাদী, পরোপকারী এবং আমাতনদার হিসেবে। তাঁর চরিত্র, আমানতদারী ও সত্যবাদিতার জন্যে আরবের কাফেররা তাঁকে, "الأمين" ‘আল-আমিন’ অর্থাৎ ‘বিশ্বাসী’ উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তৎকালীন আরবে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হত্যা, যুদ্ধ, বিগ্রহ ইত্যাদি ছিল নিত্ত-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ‘হরবে ফুজ্জার’এর নৃশংসতা বিভীষিকা ও তাণ্ডবলীলা দেখে বালক মুহাম্মদ (সা.) দারুণভাবে ব্যথিত হন এবং ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১৪ বছর বয়সে চাচা হযরত যুবায়ের (রা.) ও কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে অসহায় ও দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে গড়ে তোলেন ‘হিলফুল ফুজুল’ নামক একটি সমাজ সেবামূলক সংগঠন।[৫৩] বালক মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যত জীবনে যে শান্তি স্থাপনের অগ্রদূত হবেন এখানেই তার প্রমাণ মেলে।

2.4 wL÷vb cv'xi fwel¨r evYx

কিশোর বয়সে চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসায়িক কাজে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সিরিয়ায় যাওয়ার পথে পাদ্রী বুহাইরার সাথে দেখা হলে পাদ্রী উক্ত কাফেলার সবাইকে তার গীর্জায় দাওয়াত করে খাওয়ান এবং মুহাম্মদ (সা.) এর যাবতীয় নিশানা দেখে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করলেন

৫২. ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

যে তিনিই বহু প্রত্যাশিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। অত:পর চাচা আবু তালিকে সর্তক করলেন যে, তিনি যেন তাঁকে ইয়াহুদীদের হাত থেকে আড়াল করে রাখেন কেননা ইয়াহুদীরা জানতে পারলে তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে।

২.৫ যুবক বয়সে মুহাম্মদ (সা.)

যুবক মুহাম্মদ (সা.) এর সততা, বিশ্বস্ততা, চিন্ত-চেতনা, কর্ম-দক্ষতা ও ন্যায়-পরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন আরবের ধনাঢ্য ও বিধবা মহিলা খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ বিবাহের প্রস্তাব দেন। এ সময় বিবি খাদিজার (রা.) বয়স ছিল ৪০ বছর এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বয়স ছিল ২৫ বছর।[৫৪] তিনি চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে বিবি খাদিজার (রা.) প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বিবাহের পর বিবি খাদিজা (রা.) তাঁর ধন সম্পদ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাতে তুলে দেন। কিন্তু তৎকালীন আরবের কাফের মুশরিক ইহুদি নাসারা ও অন্যান্য ধর্ম মতাবলম্বীর অন্যায়, জুলুম, অবিচার, মিথ্যা ও পাপাচার দেখে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হৃদয় দু:খ বেদনার ভরে যেতো এবং পৃথিবীতে কিভাবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কারা যায়, সে চিন্তায় তিনি প্রায়ই মক্কার অনতিদূরে ‘হেরা’ নামক পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। বিবি খাদিজা (রা.) স্বামীর মহৎ প্রতিভা ও মহান ব্যাক্তিত্ব উপলদ্ধি করতে পেরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিশ্চিত মনে অবসর সময় ‘হেরা’ পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন।

২.৬ নবুয়্যত লাভ

হেরা গুহায় মগ্ন থাকা অবস্থায় তিনি নিজেকে প্রশ্ন করছিলেন: কেন তিনি পৃথিবীতে এলেন? কে তাকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করছেন? কি উদ্দেশ্যই বা তাঁর আগমন? স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির আসল

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

সর্ম্পটা কী? এভাবে চিন্তা করতে করতে ক্রমান্বয়ে তাঁর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হয় তখন তিনি নবুয়্যত লাভ করেন[৫৫] এবং তাঁর উপর সর্ব প্রথম নাযিল হয় পবিত্র কোরআনের সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

(৪) عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (৫)

“(১) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।”

---

৫৫. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, (অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী), ঢাকা: আল কুরআন একাডেমি লন্ডন, ১৯৯৯, পৃ. ৯০

২.৭ গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার ও নির্যাতন স্বীকার

নবুয়্যত প্রাপ্তির পর প্রথম প্রায় ৩ বছর তিনি গোপনে স্বীয় পরিবার ও আত্নীয়ের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেন। সর্ব প্রথম ইসলাম কবুল করেন বিবি খাদিজা (রা.)। এরপর যখন তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং ঘোষণা করেন, (لا إله الا الله محمد رسول الله)- "আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন আল্লাহর রাসূল" তখন মক্কার কুরাইশ কাফেররা তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করে। এতদিন বিশ্বনবী (সা.) কুরাইশদের নিকট ছিলেন (الأمين) 'আল-আমিন'- বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত; কিন্তু এ ঘোষণা দেওয়ার পর তিনি হলেন কুরাইশ কাফেরদের ভাষায় একজন জাদুকর ও পাগল। যেহেতু কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং আরববাসীদের ভাষাও ছিল আরবী, তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণীর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পেরেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) যা প্রচার করছেন তা কোন সাধারণ কথা নয়। যদি এটা মেনে নেয়া হয় তাহলে তাদের ক্ষমতার মসনদ টিকে থাকবে না। তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বিভিন্ন ভয়, ভীতি, হুমকি; এমনকি ধন-সম্পদ ও আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী যুবতী নারীকে বিয়ে দেয়ার লোভ দেখাতে শুরু করে। মুহাম্মদ (সা.) কাফিরদের শত ষড়যন্ত্র ও ভয় ভীতির মধ্যেও ঘোষণা করলেন "আমার ডান হতে যদি সূর্য আর বাম হতে যদি চাঁদও দেয়া হয়, তবু আমি সত্য প্রচার থেকে বিরত থাকব না।[৫৬]" কাফিরদের কোন লোভ-লালসা বিশ্বনবী (সা.) কে ইসলাম প্রচার থেকে বিন্দুমাত্র বিরত রাখতে পারেনি। মক্কায় যারা পৌত্তলিকতা তথা মুর্তি পূজা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল কুরাইশরা তাঁদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু ইসলামের শাশ্বত বাণী যাঁরা একবার গ্রহণ করেছে তাঁদেরকে শত নির্যাতন করেও ইসলাম থেকে পৌত্তলিকতায় ফিরিয়ে নিতে পারেনি। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন সঙ্গিনী বিবি খাদিজা (রা.) এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহরে

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

মধ্যে চাচা আবু তালিব ইন্তিকাল করেন। জীবনের এ সংকটময় মুহূর্তে তাদেরকে হারিয়ে বিশ্বনবী (সা.) শোকে দু:খে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।[৫৭] বিবি খাদিজা ছিলেন বিশ্বনবীর দুঃসময়ের স্ত্রী, উপদেষ্টা এবং বিপদ-আপদে সান্তনা প্রদানকারী। চাচা আবু তালিব ছিলেন শৈশবে অবলম্বন, যৌবনে অভিভাবক এবং পরবর্তী নবুয়্যত জীবনের একনিষ্ঠ সমর্থক। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্ব নবী স্বীয় পালিত পুত্র হযরত যায়েদ বিন হরেসকে সংগে নিয়ে তায়েফ গমন করলে সেখানেও তিনি তায়েফবাসী কর্তৃক নির্যাতিত হন। তায়েফবাসীরা প্রস্তারাঘাতে বিশ্বনবীকে জর্জরিত করে ফেলে।[৫৮]

২.৮ মদীনায় হিযরত ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

অবশেষে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে (নবুয়্যতের এয়োদশ বছর) হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মদীনাবাসীগণ মুহাম্মদ (সা.) এর সংস্পর্শে এসে এক সোনালী জীবনে পদার্পন করেন। এতদিন মক্কায় ইসলাম ছিল কেবলমাত্র একটি ধর্মের নাম; কিন্তু মদীনায় এসে তিনি দৃঢ় ভিত্তির উপর ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। এতদুদ্দেশে তিনি সেখানে চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলে দেন। তিনি যেমন মদিনাবাসীকে আপন করে নিয়েছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে মদীনাবাসীগণও মহানবী (সা.) কে আপন করে নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) এর ইন্তিকাল পর্যন্ত মদীনাবাসীগণ তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে। এখানে তিনি একাধারে আল্লাহর রাসূল ও রাষ্ট্রীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন এবং মানব জীবনে এনে দেন অনাবিল শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৫
৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

২.৯ মদীনা সনদ

সে সময় মদীনায় পৌত্তলিক ও ইহুদিরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। মুহাম্মদ (সা.) মনে প্রাণে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় লোকের বাস সেখানে সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই তিনি সেখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি আন্তর্জাতিক সনদপত্রও স্বাক্ষরিত হয় , যা ইসলামের ইতিহাসে, 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র বা সংবিধান।[৫৯] উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়। মুহাম্মদ (সা.) হন ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি। তিনি যে একজন দুরদর্শী ও সফল রাজনীতিবিদ এখানেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মদীনার সনদ নাগরিক জীবনে আমুল পরিবর্তন আনে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থাপিত হয় ঐক্য। বিশ্বনবী (সা.) তলোয়ারের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি বরং উদারতার মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৬০]

২.১০ রাষ্ট্র ও ধর্ম রক্ষায় আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের নীতি গ্রহণ

তাঁর ও নব দীক্ষিত মুসলমানগণের চাল-চালন, কথা-বার্তা, সততা ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে যখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন কুরাইশ নেতাদের মনে হিংসা ও শত্রুতার উদ্রেক হয়। অপরদিকে মদীনায় কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাধ্যন্য সহ্য করতে না পেরে গোপনভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্যেই মুহাম্মদ (সা.) তলোয়ার ব্যবহার করতে বাধ্য

---

৫৯. মাইকেল এইচ.হার্ট, *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী*, (অনু মো: মোখলেছুর রহমান), ঢাকা: আফতাব ব্রাদার্স, ২০০৫, পৃ. ২৭
৬০. প্রাগুক্ত

হয়েছিলেন। ফলে ঐতিহাসিক বদর, উহুদ ও খন্দক সহ অনেকগুলো যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং সকল যুদ্ধের প্রায় সবগুলোতেই মুসলমানগণ জয়লাভ করেন। বিশ্বনবী (সা.) মোট ২৭টি যুদ্ধের প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[৬১]

২.১১ হুদায়বিয়ার সন্ধি

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে মোতাবেক ষষ্ঠ হিজরীতে ১৪০০ নিরস্ত্র সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মদ (সা.) মাতৃভূমি দর্শন ও পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওনা দেন। কিন্তু পথিমধ্যে কুরাইশ বাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ইসলামের ইতিহাসে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তাবলির মধ্যে এ কথাগুলোও উল্লেখ ছিল যে, (১) মুসলমানগন এ বছর ওমরা আদায় না করে ফিরে যাবে, (২) আগামী বছর হজ্জের জন্যে আগমন করবে তবে ৩ দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না, (৩) যদি কোন কাফির স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুসলাম হয়ে মদীনায় গমন করে তাহলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে, (৪) প্রথম থেকে যে সকল মুসলমান মক্কায় বসবাস করছে তাদের কাউকে সাথে করে মদীনায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর মুসলমানগনের মধ্যে যারা মক্কায় থাকতে চায় তাদেরকে বিরত রাখা যাবে না। (৫) আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলোর এ স্বাধীনতা থাকবে যে, তারা উভয় পক্ষের (মুসলমান ও কুরাইশ) মাঝে যাদের সঙ্গে ইচ্ছে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে, (৬) সন্ধিচুক্তির মেয়াদের মধ্যে উভয় পক্ষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে যাতায়াতের সম্পর্ক চালু রাখতে পারবে। এছাড়া কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমার সন্ধিপত্র থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) এবং 'মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' (محمد رسول الله) বাক্য দু'টি কেটে দেয়ার জন্যে দাবি করেছিল। কিন্তু সন্ধি পত্রের লেখক হযরত আলী (রা.) তা মেনে নিতে রাজি

---

৬১. প্রাগুক্ত

হলেন না। অবশেষে বিশ্বনবী (সা.) সুহায়েল বিন আমরের আপত্তির প্রেক্ষিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) এবং 'মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ' (محمد رسول الله) বাক্য দুটি নিজ হাতে কেটে দেন[৬২] এবং এর পরিবর্তে সুহায়েল বিন আমরের দাবি অনুযায়ী 'বিছমিকা' (باسمك) অপমানজনক হলেও মেনে নেন। পরবর্তীতে এ সন্ধি তা মুহাম্মদ (সা.) কে অনেক সুযোগ-সুবিধা ও সাফল্য এনে দিয়েছিল। এ সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা মুহাম্মদ (সা.) এর রাজনৈতিক সত্ত্বাকে একটি স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে স্বীকার করে নেয়। সন্ধির শর্তানুযায়ী অমুসলিমগণ মুসলমানদের সাথে অবাদে মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে অমুসলিমগণ ইসলামের মহৎ বাণী উপলব্ধি করতে থাকে এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এ সন্ধির পরই মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৩]

২.১২ মক্কা বিজয় ও সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা

মুহাম্মদ (সা.) যেখানে মাত্র ১৪০০ মুসলিম সৈন্য হুদায়বিয়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে মাত্র ২ বছর অর্থাৎ অষ্টম হিজরীতে ১০,০০০ মুসলিম সৈন্য নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন।[৬৪] যে মক্কা থেকে বিশ্বনবী (সা.) নির্যাতিত অবস্থায় বিতাড়িত হয়েছিলেন সেখানে আজ তিনি বিজয়ের বেশে উপস্থিত হন এবং মক্কাবাসীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত ওমর ফারুক (রা.) কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে গ্রেফতার করে মুহাম্মদ (সা.) এর সম্মুখে উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি তার দীর্ঘদিনের শত্রুকে হাতে পেয়েও ক্ষমা করে দেন। ক্ষমার এ মহান আদর্শ

৬২. শায়খুল হাদীস মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ.এইচ এম মজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ৬৬৯-৬৭০

৬৩. ড.মো: শাজাহান কবির, *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, ঢাকা: দিক দিগন্ত, ২০০৯ পৃ. ১৩৫

৬৪. মাইকেল এইচ. হার্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

পৃথিবীর ইতিহাসে আজও বিরল।[৬৫] মক্কায় আজ ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডিয়মান। সকল অন্যায়, অসত্য, শোষণ ও জুলুমের রাজত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হল।

২.১৩ বিদায় হজের ভাষণ: মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ দলিল

৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে মোতাবেক দশম হিজরীতে মুহাম্মদ (সা.) লক্ষাধিক মুসলিম সৈন্য নিয়ে বিদায় হজ্জ সম্পাদন করেন এবং হজ্জ শেষে আরাফাতের বিশাল ময়দানে প্রায় ১,১৪,০০০ সাহাবীর সম্মুখে জীবনের অন্তিম ভাষণ প্রদান করেন যা ইসলামের ইতিহাসে "বিদায় হজ্জের ভাষন" হিসেবে পরিচিত।[৬৬] বিদায় হজ্জের ভাষণে বিশ্বনবী (সা.) মানবাধিকার সম্পর্কিত সনদপত্র ঘোষণা করে বলেন: "হে বন্ধুগণ স্মরণ রেখ আজকের এ দিন এ মাস এ পবিত্র নগরী তোমাদের নিকট যেমন পবিত্র তেমনি পবিত্র তোমাদের সকলের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ, রক্ত এবং তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের পরস্পরের নিকট। কখনো অন্যের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করবে না। মনে রেখ স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তোমাদের উপরও স্ত্রীদের তেমন অধিকার আছে। সাবধান, শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দিবে। মনে রেখ, যে পেট ভরে খায় অথচ তাঁর প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে প্রকৃত মুসলামন হতে পারে না। চাকর-চাকরাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না। তোমরা যা খাবে তাদেরকে তাই খেতে দিবে; তোমরা যা পরিধন করবে, তাদেরকে তাই (সমমূল্যের) পরিধান করতে দিবে। কোন অবস্থাতেই ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না।[৬৭] এভাবে মানবাধিকার সম্পর্কিত বহু বাণী তিনি বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে পেশ করে যান। মূলত: তিনি হলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী মানবজাতির একমাত্র

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
৬৭. মওনালা শিবলী নু'মানী, *সিরাতুন্নবী, আযমগড়: মাতক মা' আরিফ*, ১৯৫২, পৃ. ১৫৪-১৫৫

আদর্শ এবং বিশ্ব জাহানের রহমত হিসেবে প্রেরিত। কেননা পবিত্র কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"অবশ্যই আল্লাহর রাসূল (সা.) এর জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্যে অনুসরণীয় অনুকরণীয় তথা সর্বোত্তম আদর্শ"।[৬৮] পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থাৎ আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।[৬৯] যেহেতু তিনি ছিলেন সকলের জন্যে আল্লাহর পক্ষ হতে আদর্শ, আশীর্বাদ ও উত্তম চরিত্রের নমুনা, কাজেই তাঁর কথা, কাজ ও সর্বশেষ ভাষণে ফুটে উঠেছে মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ দলিল।

---

৬৮. আল কুরআন, ৩৩:২১
৬৯. আল কুরআন, ৬৮:০৪

২.১৪ সংস্কারক, বৈপ্লবিক ও আদর্শিক ব্যক্তি হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

বিশ্বনবী (সা.) তাঁর নবুওয়্যতের ২৩ বছরের আন্দোলনে মহাগ্রন্থ আল কুরঅনের দিক নির্দেশনায় আরবের একটি অসভ্য ও বর্বর জাতিকে একটি সভ্য ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেছিলেন।[৭০] তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় আন্তরিক কর্মকান্ডের ফলে আরবের সর্বত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার সাধিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিরাচরিত গোষ্ঠীর পার্থক্য তুলে দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের; কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের এ শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন পার্থক্য নেই। বরং তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে অধিক আল্লাহকে ভয় করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সুদকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে এমন একটি অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক তাদের আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন।[৭১] যেখানে সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর কোন মর্যাদা ও অধিকার ছিল না সেখানে বিশ্বনবী (সা.) নারী জাতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ঘোষণা করলেন "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত"। নারী জাতিকে কেবল মাতৃত্বের মর্যাদাই দেননি, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রের তাঁদের অধিকারকে করেছেন সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্রীতদাস আযাদ করাকে তিনি উত্তম ইবাদত বলে ঘোষণা করেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেখানে মুর্তিপূজা, অগ্নিপূজা এবং বিভিন্ন বস্তুর পূজা আরববাসীদের জীবনকে কলুষিত করেছিল সেখানে তিনি আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মোট কথা, তিনি এমন একটি অপরাধমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে কোন হানাহানি, রাহাজানি, বিশৃঙ্খলা, শোষণ, জুলুম, অবিচার, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি ছিল না।

৭০. মাইকেল এইচ. হার্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৭১. প্রাগুক্ত

২.১৫ মহানবী (সা.) এর ইন্তিকাল

মহানবী (সা.) যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁকে দুনিয়াতে প্রেরণের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে তখন থেকে তিনি ওফাতের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে বিদায় হজ্জের ভাষণও দিয়ে দিলেন। দশম হিজরীর রমযান মাসে তিনি অন্যান্য রমযানের মাসের তুলনায় দ্বিগুন ইবাদত করলেন। প্রতি বছর যেখানে ১০ দিন ইতেকাফ করেন এবার তিনি বিশ দিনের ইতেকাফ করলেন। হজ্জের সময় তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা আমার কাছে হজ্জের বিধি বিধানের যা কিছু আছে শিখে নাও। সম্ভবত এটাই আমার জীবনের শেষ হজ্জ। একাদশ হিজরীর সফর মাসে ওহুদ প্রান্তরে গমন করে ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণকারী সাহাবীদের জন্যে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন; এমনভাবে দোয়া করলেন যেন জীবিত লোকেরা মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছে। এরপর সেখান হতে ফিরে মিম্বরে উপবেশন করে বললেন, আমার মৃত্যুর পর আমার উম্মতের সকল লোকেরা শিরক করবে এ আশংকা আমি করি না; তবে আমার মনে এ আশংকা হচ্ছে যে তারা দুনিয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে। একদিন মধ্যরাতে নবীজী (সা.) জান্নাতুল বাকীর করবস্থানে গমন করে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন। এরপর কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমিও শীঘ্র তোমাদের সাথে মিলিত হব।[৭২]

একাদশ হিজরীর ২৯শে সফর তারিখে রোববার মহানবী (সা.) জান্নাতুল বাকীতে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ শেষে ফিরার পথে তাঁর মাথায় ব্যাথা অনুভব করেন এবং এর উত্তাপ এতোটা বেড়ে যায় যে তাঁকে মাথায় পট্টি বাঁধতে হয়েছিল। এ অবস্থায় তিনি এগার দিন নামায পড়েন। অসুখের মেয়াদ ছিল মোট ১৪ দিন। এ অসুখের ফলে নবীজী (সা.) ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়েন। ইন্তিকালের

৭২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, *আর রাহীকুল মাখতুম*, (অনু. খাদিযা আখতার রেজায়ী), ঢাকা: আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, ২০০১ পৃ. ৫২১-৫২২

পূর্ববর্তী কয়েকদিন তিনি হযরত আয়েশা (রা.) এর ঘরেই অবস্থান করেন। ভীষণ অসুস্থার কারণে তিনি মসজিদে জামাতে নামাযে শরীক হতে পারছিলেন না, এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) কে ইমামতি করার অনুমতি প্রদান করেন এবং ঘরে বসে নামাযের দৃশ্য দেখে কিছুটা সান্তনা খুজে পান যে এরকমের নামায কায়েম করার জন্যেই তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন। নবীজী (সা.) ইন্তিকালের পূর্ব দিনে তাঁর সকল দাস দাসিকে মুক্ত করে দেন, তবে তাঁর সাথে থাকা সাত দিনার সদকাহ করে দেন এবং তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র মুসলমানদেরকে হেবা করে দেন। মৃত্যুর দিবসে তিনি তাঁর সকল সহধর্মিনীকে ডাকলেন, কাছে বসালেন এবং তাদেরকে ওসিয়ত করলেন। হযরত ফাতিমা (রা.) ডেকে কানে কানে বললেন যে তিনি এ অসুখেই ইন্তিকাল করবেন। এ কথাটি শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদে ফেললেন। পরক্ষনেই নবীজী (সা.) তাঁকে কাছে ডেকে কানে কানে বললেন যে পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ফাতিমা (রা.)ই নবীজী (সা.) এর সাথে দেখা করবেন এবং তিনি হবেন জান্নাতের সরদার। একথাটি শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) মুচকি হেসে দিলেন।[৭৩] এদিকে কষ্ট ক্রমেই বাড়ছিল। মহানবী (সা.) এর কাছে মনে হচ্ছিল খায়বরে খাবারের মধ্যে তাঁকে যে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল সেই বিষের প্রতিক্রিয়া তিনি যেন কষ্ট অনুভব করছেন। এত কষ্টের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও নবীজী (সা.) সাহাবাদের উদ্দেশ্যে এভাবে ওসিয়ত করেন যে নামাযের ব্যাপারে যত্নশীল থাকবে এবং অধীনস্ত দাস-দাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। এছাড়াও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও সতর্ক করলেন। তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করলেন যে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর কবরকে যেন মসজিদ বানানো না হয়, কেননা অন্যান্য নবীর উম্মাতেরা তাদের নবীদের কবরকে পূজারস্থান বানানোর ফলে ধ্বংস হয়েছিল।

৭৩. প্রাগুক্ত

ওফাতকালীন অবস্থা শুরু হলো। হযরত আয়েশা সিদ্দিক (রা.) মহানবী (সা.) কে দেহে ঠেস দিয়ে ধরে রাখলেন। হযরত আয়েশা (রা.) নিজের দাত দিয়ে মেছওয়াক নরম করে দিলে মহানবী (সা.) সে মেসওয়াক দিয়ে শেষবারের মত দন্ত মোবারক পরিষ্কার করলেন। তাঁর সামনে রাখা পানির পাত্র থেকে হাত ভিজিয়ে নিজের চেহারা মুছছিলেন এবং বলছিলেন, লা ইলাহা ইল্লালা' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। মৃত্যু বড়ই কঠিন। এরপর মহানবী (সা.) ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! নবী , সিদ্দিক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তি যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছেন আমাকে তাদের দলভূক্ত কর, আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর এবং আমাকে 'রফিকে আলায়ে' পৌছে দাও। নবী করিম (সা.) শেষ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন। এর পরপরই তাঁর হাত বুকে পড়ল এবং পরম দয়ালু আল্লাহর কাছে চলে গেলেন।[৭৪] সে দিন ছিল একাদশ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার দুপুর বেলা।[৭৫] ঈসায়ী সালের হিসাবে ৬৩২ সনের জুন মাসের ৭ তারিখ। ওফাতের সময় মহানবী (সা.) এর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

নবীজী (সা.) এর ইন্তিকালের সংবাদ সাহাবীদের মাঝে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। তাঁরা তখন কী করবেন তা বুঝে উঠতে সময় লাগছিলো। এরপর মহনবী (সা.) এর উত্তরাধিকারী কে হবেন, সে প্রশ্নে প্রথম দিকে সাহাবীদের মাঝে কিছুটা বাক-বিতন্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে সকলের সম্মতিতে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হলেন। সোমবার দিন সকালে বেলায় নবীজী (সা.) ইন্তিকাল করেন। দিনের বাকী সময় সাহাবাদের মাঝে সান্তনা পেতে ও খলিফা নির্বাচনে চলে যায়, এরপরে রাত আসে আর রাত্রিতে মহানবী (সা.) এর পবিত্র

৭৪. প্রাগুক্ত
৭৫. ইবনে ইসহাকের মতে মহানবী (সা.) এর ইন্তিকালের সময় সোমবার দুপুর বেলা আবার বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে সময়টি ছিল দিনের শেষভাগে। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৩)

দেহ মোবারককে ইয়ামেনী চাদর দিয়ে আবৃত করে রাখা হয় এবং ঘরের লোকেরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। মঙ্গলবার দিন সকাল বেলায় মহানবী (সা.) এর দেহ মোবারক অনাবৃত না করেই গোসল দেওয়া হয়। গোসলের পর তিনখানি ইয়েমেনী সাদা চাঁদর দিয়ে কাফন দেওয়া হয়। নবী করিম (সা.) কোথায় দাফন করা হবে-সে সর্ম্পকে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন যে নবীদেরকে সেখানেই দাফন দেওয়া হয় যেখানে তাঁরা ইন্তিকাল করেন। সকলেই তাঁর কথায় সম্মত হলে হযরত আয়েশা এর গৃহের যে বিছানায় মহানবী (সা.) ইন্তিকাল করেন সে বিছানা উঠিয়ে কবর খনন করা হলো। এরপর দশজন করে সাহাবা হুজরায় প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে জানাযার নামায আদায় করেন। এ নামাযে কেউ ইমাম হন নি। সর্বপ্রথম বনু হাশেম গোত্রের লোকেরা, এরপর মোহাজের, আনসার, অন্যান্য পুরুষ, পুরুষদের পর মহিলারা এবং মহিলাদের পর শিশুরা জানাযার নামায আদায় করেন। জানাযার নামায আদায়ে মঙ্গলবার পুরো দিন অতিবাহিত হয়। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মহানবী (সা.) এর দেহ মোবারককে হযরত আয়েশা (রা.) এর গৃহে দাফন করা হয়।[৭৬]

২.১৬ তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শই পথ দেখাবে চিরদিন

তিনি হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) গোটা মুসলিম জাতিকে উদ্দেশ্যে করে বলে গিয়েছেন, “আমি তোমাদের জন্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দুটি জিনিসকে আকড়ে রাখবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হল আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কোরআন আর অপরটি হল আমার সুন্নাহ অর্থাৎ হাদিস।” বিশ্বনবী (সা.) এর জীবনী লিখতে গিয়ে খ্রিষ্টান লেখক ঐতিহাসিক

৭৬. আবুল হাসান ‘আলী নদভী, *আসসীরাতুন নববিয়া*, বৈরুত: দারুশশরুক, ১৯৮৩, পৃ. ৩৫৬; আল্লামা শিবলী নু‘মানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৫; ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৩

উইলিয়াম মুইর বলেছেন, “He was the master mind not only of his own age but of all ages”[৭৭] অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) যে যুগে পৃথিবীতে আর্বিভূত হয়েছিলেন তিনি শুধু সে যুগেরই কেবল একজন মনীষী নন; বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামনীষী। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুরই নন পৃথিবীর বুকে যত মনীষীর আর্বিভাব ঘটেছে প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে তাদের মূল্যবান বাণী পৃথিবীর বুকে রেখে গেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

دْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ

“তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”[৭৮] বর্তমান অশান্ত বিশৃঙ্খলা ও দ্বন্দ্ব মুখর আধুনিক বিশ্বে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শকে অনুসরণ করা হলে বিশ্বে শান্তি ও একটি অপরাধমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা নি:সন্দেহে সম্ভব।[৭৯]

---

৭৭. মাইকেল এইচ হার্ট, *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী*, (অনু. মো: মোখলেছুর রহমান)দ, ঢাকা- আখতাব ব্রাদাস, ২০০৫, পৃ. ২৯

৭৮. আল কুরআন, ৩৩:২১

৭৯. মাইকেল এইচ. হার্ট, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষা ও এর দর্শন

৩.১ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা

দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁরা সকলে শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন দার্শনিক এরিষ্টোটল, সক্রেটিস ও প্লেটো শিক্ষার তাৎপর্য বর্ণনা করে গেছেন। সেই থেকে পরবর্তী সকল যুগের চিন্তাবিদরাই শিক্ষা সম্পর্কে কথা বলেছেন। সবাই শিক্ষার পরিচয় এবং সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মূলত: শিক্ষা বলতে কোন কিছুকে জানা বুঝায়।

আল কুরআন থেকে জানা যায়, নবীগণ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবে নিজ নিজ জাতির সামনে পেশ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ আল কুরআন এবং তাঁর নিজের বাণী হাদীস থেকে শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়। তাঁর আগে জেনে নেয়া উচিত মূলত শিক্ষা বলতে কী বুঝায়। প্রথমে কয়েকটি শব্দ ব্যাখ্যা করা দরকার। যেসব শব্দ ব্যবহার করে শিক্ষা বুঝানো হয় সেগুলোর বিশ্লেষণ শিক্ষার মর্ম বুঝার জন্য সহায়ক হবে। যেমন কোনো বস্তুকে বুঝতে হলে তাঁর উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা একান্ত জরুরী।

কুরআন ও হাদীস এবং আরবী ভাষায় শিক্ষার জন্যে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে; সে শব্দগুলো এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। এক্ষেত্রে পাচটি শব্দের ব্যবহার সুবিদিত। এগুলো হলোঃ ১. তারবীয়াহ ২. তা'লীম ৩. তা'দীব ৪.তাদরীব ৫.তাদরীস।[৮০]

তারবীয়াহঃ তারবীয়াহ শব্দের অর্থ হলো প্রশিক্ষণ দেয়া।

তা'লীমঃ তা'লীম শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো শিক্ষা প্রদান করা।

তা'দীবঃ তা'দীব শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আচরণ শিক্ষা দেয়া।

তাদরীবঃ তাদরীব শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ভাল ও সুন্দর ব্যবহার শিক্ষা দেয়া।

তাদরীসঃ তাদরীস শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো শিক্ষা দান ও গ্রহণ উভয়কেই বুঝানো হয়।

উপরোক্ত পাঁচটি পরিভাষার অর্থগুলো একত্রে করলে শিক্ষা বলতে কী বুঝায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং সাধারণ অর্থে শিক্ষা বলতে একজন মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হওয়ার জন্য যা যা জানা দরকার তা প্রদান করাই মূলত শিক্ষা।

৩.২ শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য

প্রথমেই দেখা যাক শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনীষীদের মতামতঃ[৮১]

জন ডিউক বলেছেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি।"

প্লেটোর মত হলো, "শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্যে যা কিছুই প্রয়োজন তা সবই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।"

প্লেটো ও সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষার উদ্দেশ্যে হলো মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার।"

---

৮০. আব্দুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ৬৮
৮১. উদৃতিগুলো নেওয়া হয়েছে আব্দুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

Dhaka University Institutional Repository

এরিষ্টোটল বলেছেন, “শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা”

শিক্ষাবিদ জন লকের মতে, “শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্বকরণ।”

ড. খুরশীদ আহমদের মতে, “স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সুনাগরিক তৈরি করা---------- এবং জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নেই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।”

আল্লামা ইকবালের মতে, “পূর্ণাংগ মুসলিম তৈরি করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।”

৩.৩ ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞা

শিক্ষার আরবী পরিভাষা ও শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যবলীর সাথে ইসলাম ধর্মের মৌলিক দিক নির্দেশনাসমূহ যোগ করলেই আমরা ইসলামী শিক্ষার মোটামুটি একটি সংজ্ঞায় আসতে পারি এভাবে যে, ইসলামী বিধি বিধান মতে পরিপূর্ণ মানুষ তৈরির জন্যে যে স্বচ্ছ ও সুস্থ জ্ঞান জানা দরকার তাঁর শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা।

৩.৪ ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

ইসলামী শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী কি হবে সে সর্ম্পকে একটু আগেই আমরা কুরআন হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করেছি। তাঁর আলোকেই আমরা এখনে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্টাবলীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছি। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা নীতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্টসমূহ হবে নিম্নরুপঃ

১. শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ ও এই বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, আস্থাশীল, অনুগত ও বিনীত করে তোলার তথ্য প্রদান করে এক আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলা।

২. শিক্ষার্থীদেরকে রিসালাতে বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মাঝে মুহাম্মদ (সা.) কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মানার এবং তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিতা সৃষ্টি করা।

৩. শিক্ষার্থীদের পরকালের সফলতা ও ব্যর্থতাকে প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ করার স্বচ্ছ জ্ঞান ও বুঝ সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে পরকালের মুক্তির আকাংখা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করা।

৪. আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণতা সৃষ্টি করা।

৫. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্লাহর দাস ও প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রেরণা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র বিবেকবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক চেতনা জাগ্রত করে দেয়া।

৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মপোলব্ধি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপর্যালোচনার ভাবধারা সৃষ্টি করা।

৮. সময় ও সমাজ পরিচালনার যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা।

৯. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা।

১০. জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা।

১১. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবনতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করা।

১২. সৎ, চরিত্রবান, নীতিবান, ধার্মিক ও বিবেকবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা। উৎপাদন ও কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তি হিসেবে তৈরি করা।

১৩. আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জীবন, জগত ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের জন্য সমন্বিত চেষ্টা সাধনের যোগ্যতা অর্জন করে জীবনের পূর্ণতা অর্জন করা এবং জীবনের চুড়ান্ত সাফল্য অর্জন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

১৪. নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিক জানা এবং তা সংরক্ষণ ও বিকাশের যোগ্যতা ও প্রেরণা লাভ করা।

১৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিজস্ব বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির আলোকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

৩.৫ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা ইসলামী শিক্ষার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেন:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"তাদের (অধিবাসীদের) প্রত্যেক অংশ থেকেই যেনো কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভের জন্যে বেরিয়ে পড়ে, অত:পর ফিরে গিয়ে যেনো নিজ নিজ এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে যাতে করে তারা (ইসলাম বিরোধী কাজ থেকে) বিরত থাকতে পারে।[৮২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

৮২. আল কুরআন, ৯:১২২

"তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্যে থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শোনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে, আর তাদেরকে আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়।[৮৩]

এভাবে আল কুরআনের বহু আয়াতের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদেরকে সুস্পষ্ট করেছেন। আমরা এখানে উদাহরণ স্বরুপ মাত্র দু'টি আয়াত উল্লেখ করলাম। যা হোক, আল কুরআনের শিক্ষা সংক্রান্ত আয়াত গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. মানুষকে আল্লাহ তায়ালার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া।
২. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সর্ম্পকে পূর্ণ ধারণা দেওয়া।
৩. সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির করার মত উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করা।
৪. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা।
৫. বাস্তব জীবনের জন্যে যথাযথ কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতা অর্জন করা।
৬. মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ করা।
৭. প্রযুক্তিগত বিদ্যা অর্জন করে তাঁর সঠিক ব্যবহার করার জন্যে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হওয়া।
৮. মানব সভ্যতাকে সত্য, ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যথোপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র হাদীসগুলোতে শিক্ষার অনেক উপকারিতার কথা বলা আছে। এমনকি জ্ঞান অর্জন করাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেছেন, যেমন তিনি বলেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم

৮৩. আল কুরআন, ৬২:০২

Dhaka University Institutional Repository

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য কাজ।"[৮৪]

মহানবী (সা.) আরও বলেন,

تعلموا الفرائض و علموا ها الناس فانى مقبوض

"তোমরা যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করো এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও।"[৮৫] নবীজী জ্ঞানী ব্যক্তির কলমের কালীকে ইসলামের জন্যে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির রক্তের চাইতে মূল্যবান বলেছেন।[৮৬]

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসগুলোর আলোকে আমরা শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নোক্তভাবে জানতে পাারি:

১. শিক্ষা হবে নিরেট মানব কল্যাণে।

২. সুশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে সর্বত্র।

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানব কল্যাণই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৪. আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায় জানা।

৫. কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ববান হওয়া শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৬. সর্বপরি ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৩.৬ ইসলামী শিক্ষনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট

---

৮৪. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কায্বীনী (র), *সুনানু ইবনে মাজাহ্ (প্রথম খন্ড)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অধ্যায়: بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ, হাদীস নং- ২২৪, পৃষ্ঠা নং-১২০

৮৫. দারমি, সূত্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

৮৬. আল খাতিব আল বাগদাদী একে দুর্বল হাদীসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনেকেই একে মহানবী (সা.) এর বাণী হিসাবে নয় বরং সুফী-সাধক হযরত হাসান আল বসরী (রহ.) এর বাণী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (কাশফুল খাসা, হাদীস নং-২২৭৬)

ইসলাম যেমন মানবতার কল্যাণে নিবেদিত ঠিক তেমনিভাবে ইসলামী শিক্ষাও মানবতার উৎকর্ষ সাধনে সদা জাগ্রত। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলামী শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্টসমূহ তুলে ধরা হল:

৩.৬.১ জ্ঞানের মূল উৎস 'ওহী'র জ্ঞান

ওহী খোদায়ী জ্ঞান লাভের মাধ্যম। বাংলা ভাষায় জ্ঞানের বাহক বই। বই শব্দটিও এসেছে ওহী থেকে । মূলত বই ওহীর রুপান্তর। এভাবে ঃ ওহী>বহি> বই।[৮৭]

এই ওহীই জ্ঞানের মূল উৎস। ওহী হলো মানব জাতির ইহ ও পরলৌকিক সর্বাঙ্গীন উন্নতি, কল্যাণ ও সাফল্যের উদ্দেশ্যে যা মূলত নবী রাসূলদের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা বা হিদায়েত।

আল কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহী। এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নির্ভূল এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। সুতরাং আল কুরআনই মানজাতির জন্যে জ্ঞনের মূল সূত্র, মূল উৎস। আল কুরআনকেই শিক্ষার তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অত:পর ইসলামের গোটা শিক্ষানীতি, ও শিক্ষা ব্যবস্থা আল কুরআনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ হচ্ছে আল কুরআনেরই ব্যখ্যা। তিনি সে ব্যখ্যা করেছেন ওহীর ভিত্তিতে, নিজের খেয়াল খুশিমতো নয়। সুতরাং রাসূলের (সা.) সুন্নাহকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস ও মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৩.৬.২ ইসলামী শিক্ষায় বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই

৮৭. আব্দুস শহীদ নাসিম, প্রাগুপ্ত, পৃ: ৯৭

ইসলাম কখনও এ শিক্ষা প্রদান করে না যে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসার পাগল হতে গিয়ে দুনিয়ার বৈধ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা। বরং পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে যে বৈধ জিনিসের সুযোগ দিয়েছেন তা কিন্তু ভুলে যেয়ো না।[৮৮] কাজেই ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ তায়ালার বিধি বিধান মেনে চলে দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে সকল নেয়ামত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন তা অর্জন ও ভোগ করা যাবে, তবে কোন ভাবেই অপচয় ও অপব্যবহার করা যাবে না। ইসলামী শিক্ষা আখেরাতমূখী হলেও দুনিয়া বর্জনের কথা কোথাও বলা হয় নি। মহানবী (সা.) স্পষ্ট করে বলেছেন,

لا رهبانية في **الإسلام**

"ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই"।[৮৯] মহানবী (সা.) নিজে ঘর সংসার করেছেন, উপার্জন করেছেন, বিবাহ-শাদী করেছেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনিই ছিলেন মহান আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। বৈরাগ্যবাদ ব্যক্তিগত জীবনে কারো জন্যে মানানসই হলেও সামষ্টিক ভাবে এর দিকে আহ্বান করা ও এর শিক্ষায় কোন জাতীকে দীক্ষা দেওয়া বাড়াবাড়ি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারনে পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী জাতীসমূহের মধ্যে যারা বৈরাগ্যবাদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে- মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সমালোচনা করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ খ্রিষ্টান বৈরাগ্যবাদীদের বলেন,

رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

৮৮. আল কুরআন, ২৮:৭৭

৮৯. শায়খ তাব্বারসী তার মাজমাউল বয়ান ফি তাফসুরুল কুরআন গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন; তাফসীরে ইবনে কাছিরেও উক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে; মুফতী আব্দুল আজীজ ইবন আব্দুল্লাহ ইবনে বাজ হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

"আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটি তাদের উপর অবধারিত করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটি করতে গিয়ে যথাযথভাবে তা করতে পারেনি।"[৯০]

যদিও আপাতত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বৈরাগ্যবাদের মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যান বা সরা জীবন উৎসর্গ করা সহজতর পদক্ষেপ তথাপি এটা ইসলামের আদর্শ নয়, কেননা এটাতে সমাজ পরিবর্তনের পরিবর্তে কেবল ব্যক্তিগত যুক্তির কথা ভাবা হয়। আবার ইসলামের অনেক ইবাদত ব্যক্তিগতভাবে করা যায় না বরং দলবদ্ধভাবে করতে হয়, যেমন- দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জানাযার নামায, হজ্জ, আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি।[৯১] সুতরাং এটা স্পষ্ট হল যে, মানুষকে বৈরাগ্যবাদের শিক্ষা দেওয়া ইসলামী শিক্ষা দর্শনের মধ্যে পড়ে না। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবন, জগত, আধ্যাত্মিকতা ও পরকাল-সব কিছুতে সামঞ্জস্যতা ও ভারসাম্যতার কথা সুন্দরভাবে বলা হয়েছে।

৩.৬.৩ শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা

মাতৃভাষা তথা জাতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জ্ঞানের সকল উৎস এবং সব ভষাতেই জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে তা বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে জাতীয় ভাষায়। নবী রাসূলরা প্রত্যেকেই নিজ জাতির জনগণের ভাষায় শিক্ষাদান করেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

৯০. আল কুরআন, ৫৭:২৭
৯১. ড. জামাল আল বাদাবী, *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, (অনু. ডা. আবু খুলদুন আল মাহমুদ ও ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ), ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি), ২০১২, পৃ. ২৮০-২৮১

"আমি যখনই কোনো রাসূল পাঠিয়েছি সে রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছে স্বজাতির ভাষায় যেনো সে সমস্ত উপদেশ ও আহ্বান তাদেরকে খুলে বলতে পারে।"[৯২]

১. যেহেতু জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ ও সংরক্ষিত হয়েছে তাই আরবী ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষাদান করতে হবে। প্রাথমিক স্তরেই আল কুরআন পড়ানো ও শিখনোর ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরাসরি দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দান করা উচিত।

৩. উচ্চতর শ্রেণীতে এবং উচ্চ শিক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয় ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা দরকার। তাছাড়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞ তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.দ্বীনি ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে।

৫. ইসলামী শিক্ষা হবে সার্বজনীন, সহজলভ্য ও উন্মুক্ত।

৬. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা হওয়া উচিত বাধ্যতামূলক।

৭. শিক্ষা হবে প্রয়োগমূখী, জীবনমুখী ও কর্মমুখী।

৮. শিক্ষকতার পেশা হওয়া উচিত সব চেয়ে সম্মানীয় ও আর্কষনীয়, শিক্ষকরা হবেন সত্যের সাক্ষ্য।

৯. শিক্ষকদের নৈতিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ হবে বাধ্যতামূলক।

১০. পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সমকালীন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রযুক্তি তথ্য সম্ভার ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির সহায়ক বিষয়াবলী অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

১১. প্রাথমিক স্তর থেকেই সুন্দর আচার-আচরণ তথা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. পাঠ্যসূচীতে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করতে হবে।

---

৯২. আল-কুরআন, ১৪:০৪

১৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্বাস্থ্য ও সামরিক শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত।

১৪. পুরুষদের মতো নারীদের শিক্ষাও হবে বাধ্যতামূলক।

১৫. অবাধ সহশিক্ষা থাকলে তা থাকতে হবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে।

১৬. মসজিদ সমূহকেও শিক্ষায়তনে পরিণত করতে হবে।

১৭. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে চিরন্তন। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে গতিশীল। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যাতে করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠক্রম, পরিসর, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনের পূনর্বিন্যাস অনায়াসেই করা সম্ভব হয়।

১৮. শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র গঠনের ভিত্তি তৈরি করতে হবে

১৯. শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান উভয়টাই সমগুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হওয়া উচিত।

২০. শিক্ষাদান পেশা নয় মিশন।

২১. অর্জিত জ্ঞান অবশ্যই চরিত্র ও কর্মে প্রযোগ করতে হবে।

২২. ইসলাম আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষাকেই উৎসাহিত করে থাকে।

২৩. শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান উভয়টাই ইবাদত।

3.7 Bmjvgx wkÿvi ¯i/c I cKwZ

৩.৭.১ মহান আল্লাহ হচ্ছেন শিক্ষক

সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকৃত উৎস স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত কিছুই তাঁর জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নাই। সবকিছুর উপর তাঁর জ্ঞান পরিব্যপ্ত। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

نَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তায়ালা।[৯৩] যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জ্ঞানের উৎস, কাজেই তাঁর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"তিনি আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন।"[৯৪]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

"তিনি মানুষকে সুন্দরভাবে কথা বলতে শিখিয়েছেন।"[৯৫]

মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"তিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।"[৯৬]

---

৯৩. আল কুরআন, ৪৬:২৩;৬৭:২৬
৯৪. আল কুরআন, ০২:৩১
৯৫. আল কুরআন, ৫৫:০৪
৯৬. আল কুরআন, ৯৬:4-5

৩.৭.২ নবীদেরকে পাঠানো হয়েছে শিক্ষার আলো ছড়ানোর জন্যে

নবীদেরকে মানবতার প্রকৃত শিক্ষক হিসাবে পাঠানো হয়েছে। আর তাঁদের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে মানুষের জন্য প্রকৃত কল্যাণের শিক্ষা। নবীগণ সারা জীবন মানুষকে তাদের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই তাঁরাই ছিলেন মানব জাতীর আদর্শ শিক্ষক। পবিত্র কুরআনে তাঁদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য যে শিক্ষা প্রদানের জন্যে তা স্পষ্ট হয়েছে এভাবে:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনায়, তোমদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে, এবং তোমাদেরকে আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়। আর তোমরা যা কিছু জানো না, সেগুলো তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়।”[৯৭]

মহানবী (সা.) নিজে স্বীকার করেছেন যে, তাঁকে মহান শিক্ষক হিসেবে এ ধরাধমে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, মানব জাতীর চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধনের জন্যেই তাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.৮ ইসলামী শিক্ষার পরিধি

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান চর্চা করা এবং জাগতিক ও পরকালীন সকল বিষয়ের প্রতি সচেতনতা অর্জন করাই ইসলামী শিক্ষার পরিধির অর্ন্তভূক্ত। ইসলামী শিক্ষার পরিধির সাথে “শিক্ষার কোন বয়স নেই, জানার কোন শেষ নেই” শ্লোগানটি হুবহু মিলে যায়।

৯৭. আল কুরআন, ০২:১৫১

Dhaka University Institutional Repository

৩.৯ রাসূল (সা.) প্রদর্শিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

রাসূল (সা.) কতৃর্ক প্রদর্শিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে মানুষ বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টিকর্তা, শাসক ও পরিচালক এক 'লা শরীক আল্লাহ'র দাস। তাঁর দাসত্ব করার জন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাঁর দাস মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون

"আমি জ্বিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু মাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য।"[৯৮]

এই দাস মানুষকে পৃথিবীতে যে তাঁর প্রতিনিধিত্ব নিযুক্ত করবেন, একথা মানুষকে সৃষ্টি করার প্রাক্কালেই তিনি ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এভাবে,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

" যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন ঃ পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি পাঠাবো।"[৯৯]

মানুষের মধ্যে আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার চেতনা জাগ্রত করে নিয়ে তাকে আল্লাহর সত্যিকার দাস ও প্রতিনিধি রুপে গড়ে তোলাই এ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য। আর এটাই মানুষের প্রকৃত ও সত্যিকারের মর্যাদা। তাই নবুয়্যতি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য কেবল আদর্শ নাগরিক তৈরি নয়, বরং আদর্শ মানুষ তৈরি করা।

---

৯৮. আল কুরআন, ৫১:৫৬
৯৯. আল কুরআন, ০২:৩০

Dhaka University Institutional Repository

এই শিক্ষানীতি মানুষকে যেভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা দিয়েছে, তাহলো মানুষ 'এক লা শরীক আল্লাহ'র প্রতি ঈমান আনবে রাসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে তাঁর দাসত্ব করবে। সে শুধু নিজের একার মুক্তির জন্যেই কাজ করবেনা, বরং আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে গোটা বিশ্ব মানবতার পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ, মুক্তি ও উন্নয়নের জন্যে নি:স্বার্থভাবে কাজ করবে। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে আখিরাতে তাকে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে এবং পরিণতিতে চিরকাল যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে গেলে পরকালে আল্লাহর কাছ থেকে বিরাট পুরষ্কার লাভ করবে। চিরকাল জান্নাতে বসবাস করবে এই অনুভূতি নিয়েই দায়িত্ব পালন করবে। এক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। এভবেই মানুষ ইবাদত ও খিলাফতের সঠিক দায়িত্ব পালনের ম্যাধমে আদর্শ মানুষে পরিনত হবে। আর এ উদ্দেশ্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

نَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

"আরেকটি মানব দল আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে। মূলত আল্লাহ তাঁর এই বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।"[১০০]

মানুষকে এভাবে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য। কারণ এটাই মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ। মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা মানব জীবনের কোনো একটি বা দু'টি দিকের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং তাঁর শিক্ষা মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ পরিব্যাপ্ত। আধুনিক কালের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বৈষয়িক ও বস্তুগত শিক্ষার প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়। এই একমুখী বস্তুগত শিক্ষাই বর্তমান বিশ্বের সমস্ত

১০০. আল কুরআন, ০২:২০৭

বিপর্যয়ের মূল কারণ বলে মনে হচ্ছে। আসলে রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ভিত্তিক শিক্ষাই কেবল মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। ইসলাম মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ সাধন করতে চায়। কেননা ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম (الدين الفطرية)।

রাসূল (সা.) তাঁর সাথিদের একই সাথে আত্নিক, মানসিক, নৈতিক, শারীরিক, জৈবিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। এর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেননি বরং সমন্বয় করেছেন। সবগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাঁরা মানব জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করেননি বরং একটিকে আরেকটির অধীন করেছেন। মূলত জীবনের সকল দিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান ও উপলদ্ধির মাধ্যমে জীবনের ষোল আনা বিকশিত করতে পারলেই মানুষ আদর্শ মানুষে পরিণত হতে পারে। কেননা আল কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُ ...ا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

“পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানো আসল পূন্যের কাজ নয়। প্রকৃত পূন্যের কাজ তো সেই ব্যক্তি করলো, যে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনলো, ভালবাসা পাওয়ার জন্য নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করলো; আত্নীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন, পর্থিক, সাহয্যপ্রার্থী ও দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য অর্থ ব্যয় করলো। তাছাড়া সালাত কায়েম করলো এবং যাকাত পরিশোধ করলো আর এই পূণ্যবান

লোকেরা হয়ে থাকে প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী এবং দায়িত্ববান। বিপদ আপদ ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে ধৈর্যশীল এবং দৃঢ়তা ও অটলতা অবলম্বনকারী।”[১০১]

রাসূল (সা.) তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রকম সত্যপন্থী, ন্যয়বান, ও আর্দশ মানুষই তৈরি করেছিলেন। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী বিকশিত করে দিয়েছিলেন তাঁর সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। এ শিক্ষা মানুষকে কেবল বৈষয়িক দিক থেকেই যোগ্য করেনা, পরকালীন সাফল্যও প্রদান করে। তাইতো নবীর ছাত্ররা তাঁদের মনিবের দরবারে উভয় জগতের সাফল্য ও কল্যাণের ফরিয়াদ করার শিক্ষা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

“হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করো। আর পরকালের কল্যাণও দান করো এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের বাচাঁও।”[১০২]

বস্তুত: এই শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ কারণেই নবীর সাথীরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব দলে পরিণত হয়েছিলেন।

৩.১০ রাসূল (সা.) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের নিকট যে শিক্ষা নাযিল করেছেন এবং রাসূল (সা.) যে শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসের যে সেরা মানব দল তৈরি করেছেন রাসূল (সা.) নিজেই ছিলেন তাঁদের

১০১. আল কুরআন, ০২:১৭৭
১০২. আল কুরআন, ০২:২০১

শিক্ষক। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মানব জাতির শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করেছেন। রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন,

انما بعثت معلما

"আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"[১০৩]

রাসূল করীম (সা.) এর শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেই একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়েছে। হাদীস থেকে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি সর্ম্পকে যা কিছু জানা যায় তা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ধারণাকে ব্যাপক প্রশস্ত করে। আমরা খুটিনাটি আলোচনা পরিহার করে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কুরআন হাদীস ভিত্তিক একটি মৌলিক তথ্য এখানে পেশ করার চেষ্টা করবো। প্রথমেই তার শিক্ষা দান সংক্রান্ত বিখ্যাত আয়তটি পেশ করছি। আয়াতটি কুরআনের একাধিক স্থানে পুনোরুল্লেখ হয়েছে,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনায়, তোমাদের জীবনকে বিশুদ্ধ ও বিকশিত করে। তোমাদেরকে আল কিতাব শিক্ষা দেয়, কর্মকৌশল শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা কিছু জানতেনা তা তোমাদের জানিয়ে দেয়।"[১০৪]

এ আয়াত থেকে আমরা রাসূলের শিক্ষাদান পদ্ধতির যে মৌলিক দিকগুলো লাভ করি সেগুলো হলো:

(ক) তিনি কুরআন পাঠ করে শোনাতেন

১০৩. 'দারমী'; সূত্র: আব্দুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
১০৪. আল কুরআন, ০২:১৫১

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু কুরআন লিখিত আকারে নাযিল হয়নি, তাকে অবশ্যই পাঠ করে শোনাতে হতো। এটা শোনানের জন্যই শোনানো ছিলনা। মূলত এটা ছিল তাঁর পাঠ দান।

(খ) তাঁদের[১০৫] জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করতেন

অর্থাৎ তাঁদের আকীদা, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা চেতনার মধ্যে তাওহীদি ঈমানের দৃষ্টিকোন থেকে যেসব ভ্রান্তি ছিলো সেগুলো সংশোধন করে দিতেন। শুধু তাই নয়, সেই সাথে তাদের নৈতিক চারিত্রকে পরিশুদ্ধ করতেন।

(গ) আল কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন

আল কিতাব মানে আল কুরআন। অর্থাৎ তিনি তাঁদের পরিশুদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের জন্যে যে কাজ করেছেন, তা করেছেন তাঁদেরকে আল কুরআন শিক্ষা দানের মাধ্যমে। এ মহাগ্রন্থই সংস্কার-সংশোধন ও মানব প্রতিভা বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ।

(ঘ) তাঁদেরকে কর্মকৌশল শিক্ষা দিয়েছেন

কুরআনে হিকমাহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হিকমাহ মানে কর্মকৌশল, প্রজ্ঞা ও শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ বাস্তবায়ন, দক্ষতা ও কৌশল। অর্থাৎ নবী কুরআন তথা অহীর মাধ্যমে তাঁর সাথীদেরকে যেসব শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনাবলী প্রদান করতেন সেগুলো তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কার্যকর করার যোগ্যতা দক্ষতা এবং কর্মকৌশল তাঁদেরকে শিক্ষা দিতেন। সামাজ, রাষ্ট্র ও বৈষয়িক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পরিচালানার দক্ষতা সৃষ্টি কর্মকৌশল বা হিকমাহ দানের অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

(ঙ) যা তাঁরা জানতোনা তাও তাঁদের শিক্ষা দিতেন

রাসূল (সা.) যাদের মধ্যে আগমন করেছিলেন তারা ছিলো অসভ্য কুসংস্কার বিশ্বাসী। চাল-চলন ছিলো নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন। সদাচার তারা জানতোনা। কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হতো

১০৫. উল্লেখিত আয়াতে তাদের বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

তারা জানতোনা। উন্নত ও রুচিশীল সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহক তারা ছিলো না। রাসূল তাদের সভ্যতা সংস্কতি শিক্ষা দেন। সুন্দর ও অমায়িক আচার-আচরণ শিক্ষা দেন। পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেন। এভাবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেন।

৩.১০.১ শিক্ষা দানের বাস্তব পদ্ধতি

শিক্ষাদানের বাস্তব পদ্ধতিকে চারিত্রিক পদ্ধতিও বলা যেতে পারে। নবী (সা.) তাঁর সাথিদেরকে সারা জীবন এমন একটি কথাও শিক্ষা দেননি যেটি তিনি নিজের জীবন ও চরিত্রে বাস্তবায়ন করেননি। বরং তিনি তাঁদের যা কিছু মৌখিকভাবে শিক্ষা দিতেন সেটা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিতেন। আর এটাই তাদের জন্য সবচাইতে বড় শিক্ষা। মূলত জ্ঞান হলো বিশ্বাস বা ঈমান। আর জ্ঞানের বাস্তবায়ন হচ্ছে আমলে সালেহ। রাসূল করীম (সা.) একদিকে ছিলেন জ্ঞান ও ঈমানের শিক্ষক আর অপরদিকে ছিলেন আমলে সালেহের মূর্তপ্রতীক। তাঁর সাথিরা তাঁর কাছে শুনে শুনে বাস্তব জ্ঞানার্জন করতো আর তাঁর জীবন ও চরিত্র দেখে দেখে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করতো। তিনি নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বটে কিন্তু বলেছেন:

صلوا كما رأيتمونى أصلي

"তোমরা সেভাবে নামায পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো।"[১০৬]

তাঁর মৃত্যুর পর কিছু লোক তাঁর সম্পর্কে জানতে এলে তাঁর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁদের বলে দেন যে তাঁর জীবন ছিলো কুরআনেরই বাস্তবরূপ। এজন্যই তিনি বলেছিলেন:

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الأَخْلَاقِ

"উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।"[১০৭]

১০৬. সূত্র আব্দুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, ১২৩

আর তিনি যে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধন করেছিলেন সে স্বীকৃতি স্বয়ং তাঁর প্রভুই তাকে দিয়েছেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"তুমি অবশ্যই নৈতিক চরিত্রের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত।"[১০৮]

সাথীদের সামনে উন্নত নৈতিক চরিত্র পেশকরার মাধ্যমে তিনি সাহাবীদেরকে সঠিক শিক্ষা দান করেছিলেন, তাঁদের মন জয় করেছিলেন এবং তাঁদেরকেও আদর্শ মানবদল হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেবল মৌখিক শিক্ষার মাধ্যমে এটা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা।

৩.১০.২ মৌলিক শিক্ষাদান পদ্ধতি

রাসূল (সা.) এর মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতিও ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আধুনিক কালের শিক্ষাবিদরা শিক্ষাদানের যতো প্রকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, রাসূল করীম (সা.) তাঁর সাথীদেরকে এসব পদ্ধতিতেই শিক্ষা প্রদান করতেন। বরং তাঁর শিক্ষদান পদ্ধতি ছিলো আরো প্রশস্ত ও কার্যকারী। আমরা এখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির কয়েকটি মৌলিক দিক তুলে ধরবো।

রাসূল (সা.) যখনই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখতেন প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে বলতেন। প্রতিটি শব্দের বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার উচ্চারণ করতেন। কথা অনর্গল বলে যেতেন না, প্রতিটি শব্দ ও বাক্য পৃথক পৃথক করে উচ্চারণ করতেন। তিনি যখন কুরআন পাঠ করতেন তখনো এভাবেই পাঠ করতেন। এ ব্যাপারে একাধিক সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

১০৭. *ইমাম মালিক (র), মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক (র) (২য় খণ্ড)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০১, অধ্যায়: مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ, হাদীস নং-৭ , পৃষ্ঠা নং-৬২৩

১০৮. আল কুরআন, ৬৮-০৪

তিনি বিরতি দিয়ে শিক্ষা দিতেন। অনবরত উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করে যেতেন না। তাঁর বক্তব্য শোনা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেউ যাতে বিরক্ত না হয়ে সেদিকে তিনি পূর্ণ লক্ষ্য রাখতেন। আর এটা ছিলো তাঁর প্রতি পবিত্র কুরআনেরই নির্দেশ,

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

"এ কোরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি বিরতি দিয়ে দিয়ে তা লোকদেরকে শোনাও এবং এ গ্রন্থকে আমরা ক্রমশ নাযিল করেছি।"[১০৯]

এ প্রসঙ্গে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা জরুরী মনে করছি। জনৈক তাবিয়ী রাসূল (সা.)-এর সাথী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বলেন: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের শিক্ষা প্রদান করতেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রতিদিন শিক্ষা প্রদানের অনুরোধ করেন। এর জাবাবে তিনি বলেন: তোমাদের বিরক্তির আশংকায় এ কাজ থেকে আমি বিরত রয়েছি ঠিক সেভাবে যেভাবে রাসূল (সা.) আমাদের বিরক্তি উদ্রেক হয় কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন।

অপর এক হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: সপ্তাহে একবার উপদেশ দান করো, অথবা দুইবার কিংবা খুব বেশি করলে তিনবার।[১১০]

নবী করীম (সা.) বক্তব্যের বিষয়ে অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করতেন। শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলতেন। কারো সাধ্যের বাইরে তাকে কোনো কাজ বা দায়িত্ব দিতেন না। তিনি তাঁর সাথীদের বলতেন:

১০৯. আল কুরআন, ১৭:১০৬
১১০. আব্দুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ

"মানুষকে শিক্ষাদান করো এবং লোকদের সামনে সহজ করে পেশ করো (কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন) আর যখন তোমার মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক হবে তখন চুপ থাকবে।"[১১১]

তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট হলো সুসংবাদ দান ও সতর্ককরণ। তিনি কখনো তা সাথীদেরকে নিরাশ করতেন না। তিনি তাঁর সাথীদেরকে বলতেন মানুষকে সুসংবাদ দাও দূরে ঠেলে দিও না।

কখনো পারস্পরিক কথপোকথনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। কখনো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। কখনো শিক্ষাদান করতেন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে। আবার কখনো শিক্ষা দান করতেন বক্তৃতার মাধ্যমে। শ্রোতারা পরবর্তী কথাটি শোনার জন্যে গভীর আকর্ষণের সাথে মনোযোগ নিবদ্ধ করতো। অত:পর তিনি মূল বক্তব্য পেশ করতেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত কৌশল বিজ্ঞতা ও মর্মস্পর্শী পন্থায় মানুষের কাছে দ্বীনের শিক্ষা পেশ করতেন। আর এভাবে পেশ করার নির্দেশই তাঁর প্রভু তাঁকে দিয়েছিলেন। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে।"[১১২]

---

১১১. ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (র), *আল-আদাবুল মুফরাদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮, অধ্যায়: بَابُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ النَّاسِ, হাদীস নং- ২৪৫, পৃষ্ঠা নং- ১৩৬

১১২. আল কুরআন, ১৬:১২৫

৩.১১ শিক্ষায় ইসলামী দর্শন

ইসলাম কেবল ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে সীমিত নয় বরং এর রয়েছে প্রতিটি বিষয়ের দার্শনিক তত্ত্ব। মহান আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষায় ইসলামী দর্শন বা শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের ধারণা কিংবা দৃষ্টিকোণ কি, তার সংজ্ঞা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়ে কোন চূড়ান্ত ও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে প্রথমেই মানুষ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ও দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। নি:সন্দেহে মানুষ সকল সৃষ্টির মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাত।

৩.১১.১ স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করা

মানুষ দুনিয়ার অন্যান্য জীবজন্তু ও বস্তুর ন্যায় একটি সৃষ্টি হলেও মানুষ একটা বিশেষ সৃষ্টি যাকে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী বলা হয়। জন্ম, বৃদ্ধি, খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান গ্রহণ করে জীবনে বেঁচে থাকার দিক দিয়ে মানুষ অন্যান্য জীবের মত হলেও চিন্তার জগত ও কর্ম-কান্ডের দিক থেকে সে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষ মাটি বা প্রস্তরের ন্যায় নির্জীব, নিষ্প্রাণ বা স্থবির নয়। মানুষ প্রাণসম্পন্ন, সজীব ও চলৎ-শক্তি সম্পন্ন । এখানেই শেষ নয়; সাধারণ জীব ও জন্তু ও প্রাণীকূল থেকে মানুষ এই দিক দিয়েও ভিন্নতর যে মানুষের রয়েছে চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি, বাকশক্তি মনের ভাব প্রকাশ করার মত ভাষা। সে ভাষা যেমন মুখে ব্যবহৃত হয়, তেমনি ব্যবহৃত হয় কলমের দ্বারা। এই কারণে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রশ্ন কেবল মানুষের বেলায়, অন্যান্য জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে তার কোন প্রশ্ন উঠে না। সর্বোপরি মানুষের রয়েছে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ও পাপ-

পূণ্যবোধ। এই বোধ মানুষের স্বভাবগত ও জন্মগত। কিন্তু সাধারণ জন্তু-জানোয়ার এই বোধ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।[১১৩]

১১৩. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, "ইসলামের শিক্ষা দর্শন", *শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ, ১১

৩.১১.২ তিনটি বিশেষ সম্পর্ক জানা ও সমন্বয় করা

নি:সন্দেহে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-বিবেচনার ক্ষমতা রয়েছে। এই কারণেই মনে তীব্র হয়ে জেগে উঠে নিদারুণ জিজ্ঞাসা-নিজের সম্পর্কে, বিশ্বলোক সম্পর্কে। বিশ্বলোক সম্পর্কিত প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিশ্বলোক কি কোন বাস্তব সত্য, না সম্পূর্ণ অলীক ও অস্তিত্বহীন? যদি সত্য ও বাস্তব হয়, তাহলে এই বিশ্বলোক কি স্বয়ম্ভু, না এর স্রষ্টা কেউ আছেন? স্রষ্ট থাকলে তিনি কি এক ও অনন্য, না একাধিক বা বহুসংখ্যক? এবং স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্কই বা কি?

মানুষের সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন জাগে তা, মোটামুটি তিনটি পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ের নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে- সে কে? সে কি দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তু-বস্তর মতই কিছু, না সে সব থেকে কোন স্বতন্ত্র্য আছে তার নিজের বিবেচনায় সে যখন সার্বিকভাবে নিজের স্বাতন্ত্র প্রকট দেখতে পায়, তখন তার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুনিয়ায় তাকে যে জীবন দেয়া হয়েছে এই জীবনটাকে সে কোন্ কাজে কোন্ বাস্তবতায় এবং কীভাবে ও কী পদ্ধতিতে অতিবাহিত করবে? তার পার্শ্বে অবস্থিত অসীম-অশেষ প্রাকৃতিক শক্তি-সম্পদ ও উপকরণকে নিজের ও অন্যান্য মানুষের কল্যণে কিভাবে ব্যবহার করবে, কোন্ অধিকারে ও কোন মৌল দৃষ্টিকোণ নিয়ে এবং কোন উদ্দেশ্যে? আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তার জীবনে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব কি এই দুনিয়ায়ই শেষ ও চূড়ান্ত? না মৃত্যুর পরও তার কোন জের চলবে। যদি চলে, তা'হলে তার সাথে এই জীবনের ও জীবনব্যাপী কর্মধারার কি সম্পর্ক?[১১৪]

মূলত: এ সকল প্রশ্ন কোন জন্তু জানোয়ারের মনে জাগ্রত হওয়ার সুযোগ নেই । এ প্রশ্নগুলো জাগে কেবল মানুষের মনে। অতএব তাদের জন্য এই প্রশ্নের জবাব একান্তই অপরিহার্য। কেননা

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

এসব প্রশ্নের স্পষ্ট ও অকাট্য জবাব না পেলে এই দুনিয়ায় মানুষের পক্ষে সুষ্ঠু জীবন যাপন করা কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। এসব প্রশ্ন মানুষের মন থেকে কখনই নিঃশেষ ও বিলুপ্ত হয়ে যায় না। মানব জীবনের সাথে এ সকল প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। কাজেই মানুষকে এ প্রশ্নগুলোর সুষ্ঠজবাব খুজে পেতেই হবে।

কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব মানুষ কোথায় পেতে পারে? এর জবাব তাকে জানতে হয় অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে। অতএব জ্ঞানার্জন মানুষের জন্য অপরিহার্য। জ্ঞানার্জনের জন্য যে যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তা স্বভাবগতভাবে কেবল মানুষেরই রয়েছে। মানব প্রকৃতিতে নিহিত সেই শক্তি ও যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে হবে এই জ্ঞান অর্জনের জন্য। এই বিশ্লেষণের আলোকে মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম মানুষকে ৩টি মৌলিক বিষয়ে[১১৫] আবশ্যিক জ্ঞান রাখার কথা বলেছেন। যথা:

১. স্রষ্টা ও সৃষ্টিকর্মের নিয়ম ধারা এবং সৃষ্টি লোকে সদা কার্যক্রম নিয়মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশেষত্ব।
২. বিশ্বলোক ও বিশ্বলৌকিক যাবতীয় জিনিসের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য, বিশেষত মানুষের কল্যাণ এবং সে সবের প্রয়োগের নির্ভুল পদ্ধতি।
৩. এই দুনিয়ায় মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য ও জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং পরকালে জবাবদিহির ধারণা ও পরিণাম।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের সংজ্ঞায় মওলানা আব্দুর রহীম বলেছেন ঃ

“স্রষ্টা, তাঁর গুণাবলীর তত্ত্ব ও বাস্তবতা, আল্লাহ্ সৃষ্ট এ্ বিশ্বলোক, সদা কাল নিয়ম, বস্তুর গুণ ও মানুষের কল্যাণে তার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং সর্বোপরি নিজের বিশেষ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত,

১১৫. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষ সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৬২

নিজের দায়িত্ব কর্তব্য এবং জবাবদিহি সম্পর্কে এমনভাবে জ্ঞানার্জন করা যেন তার মন-মগজ ও জীবনে স্রষ্টার অনুগত এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভার্থে নিয়োজিত হতে পারে, কেননা, তার শেষ পরিণতি তাতেই।”[১১৬]

মূলতঃ যে মানুষ স্রষ্টাকে জানে না, স্রষ্টার মহান গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত নয়, তাঁর অসীম, অসাধারণ দয়া ও অনুগ্রহের অবদানের, বিষয়ে অজ্ঞ বা অন্ধ। কেননা যিনি জ্ঞানের উৎস তাঁকে যে চিনে না, জানে না সে তো মূর্খ হবেই। সব জ্ঞানের মূল এখানেই নিহিত। যে লোক তার নিজের জীবন যাপন পদ্ধতি ও ভাল-মন্দ জানে না, তার ভবিষ্যৎ পরিণতি সর্ম্পকে সচেতন নয়, সে তো সম্পূর্ণ অন্ধ ও অজ্ঞ। আর অন্ধ ও অজ্ঞ দ্বারা কখনও সুচিন্তা ও সুদর্শন বের হতে পারে না।

অন্ধত্ব ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে মানুষের জীবন কিছুতেই চলতে পারে না। সাধারণভাবে প্রত্যেকটি জীব ও জন্তুর চোখে একটা নিজস্ব আলো আছে। তাই দিয়ে তারা অন্ধকারেও নিজের পথ দেখে চলতে পারে। এজন্য তারা বাইরের আলোর মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু মানুষের চোখের ভিতরে নিজস্ব কোন আলো নেই। এই কারণে দেখার জন্য তারা বাইরের আলো বিচ্ছুরণের মুখাপেক্ষী। কিন্তু বাইরের আলো তার বৈষয়িক জীবনের পথ চলার জন্য যথেষ্ট হলেও মনোপযোগী জীবন যাপনের জন্য তা কিছু মাত্র যথেষ্ট নয়। মানুষের প্রয়োজন অর্জিত জ্ঞানের স্বচ্ছ আলো। এই আলো তাকে অর্জন করতে হয়। একমাত্র নির্ভুল ও সর্বপ্রকারের সংশয়মুক্ত সূত্রে অর্জনযোগ্য এই জ্ঞানের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে।[১১৭]

---

১১৬. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, “ইসলামের শিক্ষা দর্শন”, *শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ১২
১১৭. প্রাগুক্ত

অতএব মানুষের পক্ষে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, তাঁর স্রষ্টাকে জানা, স্রষ্টা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা। স্রষ্টাই স্বীয় অনুগ্রহে-স্বীয় ইচ্ছা ও কুদরতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি না করলে মানুষের পক্ষে এই জীবন লাভ করা কিংবা এই দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের কোন সুযোগ পাওয়া সম্ভবপর নয়। তাই স্রষ্টার গুণ (সিফাত) দয়া অনুগ্রহের কথা তাকে জানতে হবে। তাকে অবশ্যই জানতে হবে, তিনি কোন মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে এই দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং কিসে তিনি সন্তুষ্ট ও কিসে অসন্তুষ্ট তা জানতে না পারলে মানুষের পক্ষে এই দুনিয়ায় আল্লাহর মর্যী অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। যার ফলে পরকালে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হবে না। তাহলে মানুষের এই জীবনটা যেমন চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল মনে করতে হবে, তেমনি পরকালীন জীবনেও তাকে অনন্ত দুঃখ, দুর্দশা ও আযাবে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। তা থেকে সে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না।[১১৮]

৩.১১.৩ জ্ঞান লাভের নির্ভূল সূত্র ও মাধ্যম হচ্ছে ওহী

জ্ঞান লাভের একমাত্র সূত্র হচ্ছে আল্লাহর নাযিল করা কিতাব-কুরআন মজীদ, যা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর শেষ নবী ও শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর কিতাব দুনিয়ার মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন এবং নিজে তদনুযায়ী আমল করে তার বাস্তবতা দেখিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর ভাষায় মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্র ছিল আল কুরআন। পবিত্র কুরআন এবং মহান রাসূলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞানের মাধ্যম ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-উৎস। এই উৎস থেকেই মানুষ তার মনুষ্যত্বকে জানতে পারে, জানতে পারে কিভাবে তাকে একক ও সামষ্টিক জীবন যাপন করতে হবে। বিশ্ব-প্রকৃতিতে নিহিত জ্ঞান লাভের মৌল প্রেরণা সে এ

১১৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ৮০-৮৫

থেকেই পেতে পারে। কেননা স্রষ্টা, সৃষ্টিলোক এবং এই মানুষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল জ্ঞান কেবল স্বয়ং স্রষ্টারই থাকতে পারে। তাই তাঁর দেয়া জ্ঞানের তুলনায় অপর কোন উৎস থেকে পাওয়া জ্ঞান কখনই অধিক নির্ভুল, যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।[১১৯]

৩.১১.৪ ইন্দ্রিয় ভিত্তিক জ্ঞান কখনও আসল সত্য ও বাস্তবতার সন্ধান দিতে পারে না

কিন্তু আধুনিক শিক্ষা দর্শনে কেবল বিশ্ব-প্রকৃতি ও বস্তুলোক সংক্রান্ত জ্ঞানকেই একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় বলে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু তাতে মহান স্রষ্টাকে অস্বীকার করা হয়েছে আল্লাহর দেওয়া নির্ভুল জ্ঞান-উৎসকে সম্পূর্ণ উপক্ষো করে। এই জ্ঞানের প্রথম সূত্র হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয়-লব্ধ তথ্য ভিত্তিক চিন্তা গবেষণার ফসল। কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রাণী জগত নিতান্তই বাহ্যিক জগত। আসল ও প্রকৃত সত্য নিহিত রয়েছে এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে। সেই অন্তরালবর্তী নিগূঢ় সত্য জ্ঞানের ভিত্তিতেই ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের সত্য সত্য যাচাই করা সম্ভব। আর সে জ্ঞান মহান সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন আর কারোই থাকতে পারে না। ফলে নিছক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান-উৎসের উপর নির্ভরশীল মানুষ প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত-যা কিছু মানুষ জানে, তা ভুলভাবে জানে। এই কারণেই বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের পক্ষে যতটা কল্যাণকর হতে পারতো, তা হয়নি। সে জ্ঞান মানুষের মনুষ্যত্বকেও নানাভাবে ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত করেছে। আল্লাহ্ ছাড়া বস্ত-জ্ঞান মানুষকে বৈষয়িক সুখ শান্তি অনেক দিয়েছে, কিন্তু এই জ্ঞান একদিকে মানুষকে যেমন ধ্বংস করার সামগ্রী রচনা করেছে, তেমনি মানুষকে নৈতিকতার দিক দিয়ে চরম শূন্যতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এই জ্ঞান মানুষকে বুঝিয়েছে যে, মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তুর মতই একটা জীব মাত্র। বস্তুগত সুখ শান্তিই তার একমাত্র কাম্য। আর এই বস্তুগত জীবন ভিন্ন আর এমন কোন জীবন নেই মানুষের, যেখানে তার কারো নিকট জবাবদিহি করতে হতে পারে। কিন্তু এই ধারণা যেমন নিছক ইন্দ্রিয়লব্ধ, তেমনি ‘বস্তুর’

১১৯. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *ইসলামের পরিচয়*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ.৫৫-৫৯

সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে একান্তভাবে ভুল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নাস্তিক্যবাদকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমান করে এবং এই সত্য অনস্বীকার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে বিশ্বলোকের অন্তরালে এর মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব অপরিহার্য। তা ব্যতিরেখে এই বিশ্বলোকের অস্তিত্ব অসম্ভব। সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি সব কিছুর নিয়ামক, তেমনি সমস্ত বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানের উৎসও একমাত্র তিনি। মানুষের জীবন এক অবিভাজ্য ইউনিট! জীবনের যত দিক ও যত বিভাগ রয়েছে তা সবই এক অবিভাজ্য এককের অংশ হিসেবে সমানগুরুত্ব সহকারে ও পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে জীবন যাপন করতে হবে।[১২০]

১২০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭

৩.১১.৫ শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ক

মানুষ বস্তু ও রূহের সমন্বয়ে গঠিত। অতএব তার যে বস্তুগত চাহিদা আছে, তেমনি আছে রূহ বা আত্মার চাহিদা, যা পূরণ করতে হয় আল্লাহর উপর বিশ্বাস, ধর্ম বিশ্বাস ও পরকাল বিশ্বাস এবং তদানুযায়ী কাজের মাধ্যমে। কিন্তু মানব অস্তিত্বের আসল কর্তৃত্ব হচ্ছে রূহ বা আত্মার। মানুষকেই আত্মার দাবী পূরণ করতে হয়। আত্মা ও দেহের চাহিদা পূরণে যেমন সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন, তেমনি আবশ্যক ভারসাম্য রক্ষা করাও আবশ্যক। দু'য়ের মধ্যে বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্ব মানব জীবনের জন্য মারাত্মক। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে হতে হবে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন কল্যাণ সমন্বিত। পরকালের কথা ভুলে গিয়ে তার প্রতি উপক্ষো দেখিয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রচিত, তা মানুষের সার্বিক ও সামগ্রিক জীবনের কল্যাণের নিয়ামক হতে পারে না। কেননা দেহ ভিন্ন আত্মা এই জগতে অবাস্তব। আর আত্মাবিহীন দেহ মৃত লাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই মানুষকে এমন জ্ঞান শিখতে হবে, যার ফলে সে দেহ ও আত্মার, অন্য কথায় ইহকালের ও পরকালের দাবীকে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করে পূরণ করতে সক্ষম হবে। অতএব, আল্লাহর দেয়া দ্বীন ও পরকালীন কল্যাণের উপায় যেমন তাকে জানতে হবে, তেমনিভাবে জানতে হবে আল্লাহ্‌র দেওয়া দ্রব্য-সামগ্রীর গুণাবলীর ও ব্যবহার পদ্ধতি, যেন মানুষের বৈষয়িক জীবন সামগ্রিকভাবে নির্ভুল পথে ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অতিবাহিত হতে পারে।[১২১]

৩.১১.৬ সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা

মানুষ এই দুনিয়ায় একাকী জন্ম গ্রহণ করতে পারেনি, একাকী বেঁচে থাকাও তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ কারণেই মানুষকে বলা হয়েছে সামাজিক জীব। মানুষের এই সামাজিক জীবন শুরু হয় তার জন্ম মুহূর্ত থেকেই। কেননা পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভে তার জন্ম। এই পিতা ও মাতার দাম্পত্য

১২১. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, ১৩-১৪

জীবন সূচিত হয় শরীআত সম্মত বিবাহ ও সমাজের সমর্থনের মাধ্যমে। জন্ম লাভের পর তাকে বেঁচে থাকতে, লালিত-পালিত ও ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠতে হয় পিতার আশ্রয়ে, মায়ের কোলে, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফু ও দাদা-দাদীর পরিবেষ্টনে। এখানেই মানুষের পারিবারিক ও সামষ্টিক জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ সূচিত হয়। অতএব একদিকে পিতা-মাতার হক তাকে জানতে হবে, সেই সংগে জানতে হবে অন্যান্য নিকট ও দূরের আত্মীয়-স্বজনের অধিকার এবং তাঁদের প্রতি তার কর্তব্যের কথা। এ হচ্ছে মানুষের সামাজিক জীবনের প্রথম ধাপ। এরই মধ্যে মানুষের সামাজিকতা সীমাবদ্ধ নয় বরং তা তার স্থানীয় জনতা ও যে দেশে সে বাস করে-সে দেশের বিপুল জনতার মধ্যে সম্প্রসারিত। মানুষের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই এই বিপুল জনতা সমন্বিত, বৃহত্তর সমাজের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।[১২২]

৩.১১.৭ কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা

মানুষ যে রাষ্ট্রের প্রশাসনে নিরাপদ জীবন যাপন করে, তা এই সামাজিকতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাহায্যেই পাওয়া সম্ভব। মানুষ যে অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে স্বীয় বৈষয়িক সুখ-সুবিধা, আরাম-আয়েস ও প্রগতি লাভ করে, তা একদিকে যেমন এই বৃহত্তর সামাজিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যবস্থা থেকে পাওয়া যায়, তেমনি সেই অর্থ-ব্যবস্থা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। তাই মানুষকে জানতে হবে বৃহত্তর সমাজের সাথে তার কি সম্পর্ক, এর উপর তার কি অধিকার এবং তার কি কর্তব্য ও দায়িত্ব। অনুরূপভাবে তাকে জানতে হবে, কোন ধরনের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি তাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা দিতে সক্ষম। কেননা দুনিয়ায় এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা রয়েছে যা ব্যক্তি মানুষ তথা সমষ্টিকে নিতান্ত

---

১২২. মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, *ইসলামের সমাজ দর্শন*, (অনু: আব্দুল মান্নান তালিব), ঢাকা: খন্দকার প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ৮৯-৯০

গোলাম বানিয়ে রেখেছে-পরিণত করেছে কল্যাণহীন পশুতে, কিংবা বাকহীন জন্তুতে। সাধারণ মানুষকে কথা বলার, মত প্রকাশ করার ও ভালমন্দ বিচার করে সরকার কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করার কোন অধিকারই দেয় না। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানুষের মনুষ্যত্বের পক্ষে খুবই অপমানকর। দুনিয়ায় এমন অর্থ-ব্যবস্থা রয়েছে যা সম্পদের উপর ব্যক্তির নীতিভিত্তিক অধিকার স্বীকার করে না। সমাজ সমষ্টির দোহাই দিয়ে মানুষের সব কিছু কেড়ে নেয়। তার মানবিক স্বতন্ত্র সত্ত্বাকেও অস্বীকার করে। মানুষ সেখানে নিজের জন্য অর্থোপার্জনের কোন পন্থা নিজেই বাছাই করে অবলম্বন করতে পারে না। অর্থ ও রাষ্ট্র এই উভয় শক্তিরই একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীনরা। তারা দেশের সমস্ত মানুষকে এমনভাবে দমিয়ে রাখে এবং নিয়ন্ত্রণ করে, যেন তারা বিরাট একটা যন্ত্রের অংশ মাত্র, কিংবা নির্জীব কাঁচামাল বিশেষ। এরূপ অর্থ ব্যবস্থায় মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে নিতান্ত জীব ও জন্তুতে পরিণত হয়। কাজেই মানুষকে এই বিশ্ব প্রকৃতির বুকে তার জন্য ঘোষিত মর্যাদার দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং তার সংগে মানুষের সঠিক সম্পর্ক রক্ষা করে সুষ্ঠু বৈষয়িক জীবন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জন এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে সেই জ্ঞানে বাস্তব অনুশীলন সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে হবে।[১২৩]

৩.১১.৮ শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে পবিত্র কুরআনের সার্বিক দর্শনের ভিত্তিতে

যে শিক্ষাব্যবস্থা এ সকল দিক দিয়ে মানুষকে সুশিক্ষিত ও সৎকর্মশীল বানাতে পারে, মানুষের জন্য কেবল সে শিক্ষাব্যবস্থাই সর্বাত্মক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আর এই শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে কেবল তা-ই যা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব কুরআন মজীদের সার্বিক দর্শনের ভিত্তিতে রচিত।

৩.১১.৯ ওহী ভিত্তিক জ্ঞানহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল

১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে সারা বিশ্বে বিশেষভাবে মুসলিম জাহানে কুরআন ভিত্তিক সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু নেই। সারা দুনিয়ায় বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ও কার্যকর, তা থেকে মানুষ নিজেকে, নিজের স্রষ্টাকে, স্রষ্টার অশেষ অবদানকে এবং তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ককে নির্ভুলভাবে চিনতে পারে না। নিজের উপরোক্ত সার্বিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাও জানতে পারে না। সে জানতে পারে শুধু এতটুকু যে মানুষ সাধারণ জীব জন্তু থেকে ভিন্নতর কিছুই নয়। জানতে পারে কিভাবে কি উপায়ে ও পদ্ধতিতে এই বিশ্বের পরতে নিহিত উপকরণাদি নিঃশেষে নিংড়িয়ে নিজের জৈব সুখ-সম্ভোগের আয়োজন করা সম্ভব। কিন্তু এই জানা মানুষের উপযোগি জানা নয়। এই জানা কেবল জীব-জন্তুর জন্যই শোভন। বর্তমান মুসলিম জাহানের প্রধান কর্তব্য ছিল কেবল কুরআন ভিত্তিক সর্বাত্মক শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বস্তরে চালু করা। কিন্তু মুসলমানরাও এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ পরিহার করে আল্লাহ্-হীন ব্যক্তিদের রচিত ও তাদের কর্তৃক সারা দুনিয়ায় প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করে চলেছে। ফলে তার বংশধররা মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। মুসলিম পরিবারের ঈমানদার ও চরিত্রবান ছেলে-মেয়েরাও এ শিক্ষা অর্জন করে একই সাথে ঈমান ও চরিত্র উভয়ই হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ভবিষ্যতে 'মুসলিম জাতি' দুনিয়ায় টিকে থাকবে কি না তার আংশকা এখন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।[১২৪]

৩.১১.১০ মন, আত্মা ও বিশ্বাসের সঠিক নির্দেশনা ও গঠন করার জন্য জ্ঞান চর্চা করা

মানুষের মন অনুভূতিহীন দর্পণ নয়। দর্পণে প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা, অনুভূতি ও প্রকৃতির রঙ-বেরঙের বহিঃপ্রকাশ যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু মানুষের মন সেরূপ নয়।

১২৪. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, "ইসলামের শিক্ষা দর্শন", *শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ১৬

মানব মন কখনই নিষ্ক্রিয় থাকে না। তা সচেতন ও সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ভাবধারা ও উপাদান সংমিশ্রিত অবস্থা ও ঘটনাবলীর একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, আনন্দের চেয়ে এর অবস্থাসমূহের এই প্রতিবিম্ব ও প্রকৃতির চিত্র কি স্বতঃই গড়ে উঠতে থাকে এবং চেতনা নিজ থেকেই কি তাতে যেমন রঙ লাগায়, কিংবা চেতনা সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত হওয়ার জন্যে বাইরের প্রেরণার মুখাপেক্ষী? দুনিয়ার বিশেষজ্ঞদের নিকট একথা স্পষ্ট যে, নিছক চেতনার নিজস্বভাবে এ ধরনের কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই। মানব মন প্রভূত শক্তি ও প্রতিভার উৎস, সন্দেহ নেই। যাচাই, বাছাই, ছাঁটাই, গ্রহণ ও বর্জন, সুবিন্যস্তকরণ ও রূপায়নের বিপুল শক্তি নিহিত রয়েছে মানুষের মনে। তার হৃদয়ানুভূতিকে যতই নিরপেক্ষ (objective) বলা হোক এবং বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনাবলী ও পর্যবেক্ষণ থেকে যে ফল সে গ্রহণ করেছে, তার পটভূমির প্রতিচ্ছায়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও সুরক্ষিত বলে যত দাবীই করা হোক না কেন, সে দাবী নিরর্থক অহমিকা ও অন্তঃসারশূন্য আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছুই না-তা সহজেই বলা যায়।[১২৫]

কোন জীবন্ত সত্ত্বা মহাশূন্যে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে না, এ যেমন সত্য, অনুরূপভাবে এ-ও সত্য যে, মানুষের মন আদর্শিক শূন্যতার মধ্যে কাজ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও প্রত্যয় হচ্ছে তার একমাত্র অবলম্বন। এরই সাহায্যে তাকে অগ্রসর হতে হয় জ্ঞানান্বেষণের বিশাল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। যেসব সুধী নিজেদের চিন্তা-গবেষণার নিরপেক্ষতার (objective)- উপর গৌরববোধ করেন এবং যাঁরা দাবী করেন যে, তাঁরা আরোহী চিন্তা পদ্ধতি (Deductive)-এর আদিকারের পন্থা পরিত্যাগ করে অবরোহী চিন্তা পদ্ধতির (Inductive) বিজ্ঞান সম্মত পন্থা অবলম্বন করেছেন,

---

১২৫. প্রাগুক্ত, ১৬-১৭

তাঁদের জ্ঞান, তথ্য ও গবেষণালব্ধ ফল গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যয়ন ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হলে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, তাঁরাও হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের দ্বীপ জ্বালিয়েই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের বিশাল অসীম প্রান্তরে পদক্ষেপ গ্রহণের দুঃসাহস করেছেন। এ এমন এক মহা সত্য যা দুনিয়ার বড় বড় চিন্তাবিদরাও অস্বীকার করতে পারে না[১২৬]। এ পর্যায়ে John Gaird লিখিত *'An introduction to Philosophy of Religion'* গ্রন্থ থেকে একটি অংশ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"চিন্তা-গবেষণার প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের মনের নিভৃত গহীনে প্রচ্ছন্ন ধারণাসমূহ থেকেই পথ নির্দেশ লাভ করতে হয়। কেননা আমরা যা কিছুর সন্ধান করি, তার মূল্য ও গুরুত্ব সে সব ধারণা-বিশ্বাসের নিক্তিতে ওযন করেই অনুমান করা যায়। আর সে সব ধারণা রচিত মানদণ্ডে সে সবের সত্যতা ও যথার্থতা পরীক্ষা ও যাচাই করা সম্ভব হতে পারে। কোন চিন্তা গবেষণাই নিজস্ব ধারণা-বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসম্পর্ক ও নিরপেক্ষ হয়ে পরিচালিত করা কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিজের ছায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যেমন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি চিন্তা-গবেষণার ফল গ্রহণ করাও কারুর সাধ্য নেই।"[১২৭]

প্রখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা Bevan তাঁর *'Symbolism of Belief'* গ্রন্থে এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে লিখেছেনঃ "আমরা শুধুমাত্র বাস্তবতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাকতে পারিনি। আমরা যখন কোন বাস্তব জীবনের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তখন আমরা আমাদের কর্ম ক্ষমতা ও তৎপরতার যাচাই করার জন্য আমাদের নিজস্ব মৌল ধারণা ও বিশ্বাসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১২৭. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

করতে বাধ্য হই।"[১২৮] মূলত এটা এমন একটা সত্য, যার স্বপক্ষে বহু প্রখ্যাত চিন্তাবিদদের সমর্থন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এ থেকেই এ সত্য অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, মূলতঃ অবস্থা ও ঘটনাবলীর সুসংবদ্ধ অধ্যয়নই হচ্ছে শিক্ষা এবং তাকে কোন ব্যক্তি ও জাতির মৌল চিন্তা ও মতাদর্শ থেকে কোন অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না। এ কারণেই মৌল বিশ্বাসের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যের দরুন, তাকে স্বীকার করেই বিভিন্ন বিশ্বাস অনুসারীদের শিক্ষাও বিভিন্ন হতে বাধ্য। এ সত্যকে অস্বীকার করা হলে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং তার জন্য বিভিন্ন মৌল বিশ্বাস সম্পন্ন মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।[১২৯]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে অন্যান্য সব রকমের জ্ঞান শাখাকে বাদ দিয়ে কেবল জীব-বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও ইতিহাস অধ্যয়ন করলে তথা কথিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণার অমরতা ও সহজেই নির্ণয় করা যায়। প্রথমদিকে ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ বিজ্ঞানীদের নিকট সমর্থিত হলেও পরে আস্তে আস্তে সে তত্ত্বের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আসলে সকল প্রকার বিদ্বেষ, হৃদয়াবেগ ও আসক্তি আবিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অধ্যয়ন করলে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে এই ডারউনবাদ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের ফল নয়। এর অনেকগুলো ধারাই ইউরোপীয়দের নিজস্ব অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রসূত। ধর্মবিমুখ ইউরোপীয়রা একবার যখন নিজেদের মগজে এই ধারণা বদ্ধমূল করে নিয়েছে যে, এই বিশ্বলোক স্বয়ম্ভু, এর স্রষ্টা কেউ নেই; এই জগত একটি ধরাবাঁধা ও শাশ্বত নিয়মের অধীন, স্বতঃই চলমান ও প্রবহমান, তার পরিচালকও কেউ নেই; এই ক্রমবৃদ্ধি, ইচ্ছামূলক, গতিশীলতা, অনুভূতি, চেতনা, মন-

১২৮. প্রাগুক্ত
১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

মানসিক উন্মেষ ও স্বজ্ঞা সব কিছু বস্তুরই উন্নতিলব্ধ বিশেষত্ব, তখন ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত ডারউইনী মতবাদ তাদের নিকট হারানো স্বর্গের পুনঃপ্রাপ্তিরূপে বিবেচিত না হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। কেননা এই মতবাদেই তারা বিশ্বলোক সম্পর্কিত তাদের বিশেষ ধারণা ও দৃষ্টিকোণের বাস্তব ব্যাখ্যা পেয়েছে বলে মনে করা হয়। বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী-ই এই সত্যকে অকপটে স্বীকার করেছেন। এখানে মাত্র একজন বিজ্ঞানীর মত উদ্ধৃতি করা যথেষ্ট হবে। Arnold Luna Zuvi *'Revolt Against Reason'* গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, "ডারউইনবাদ বিজ্ঞান নয়। তা একটি পুরোপুরি ধর্ম-মত, তাতে যুক্তিসংগত সুসংবদ্ধতার দাবী যতই করা হোক না কেন[১৩০]।" এভাবে আর মানুষের নিজেদের রচিত এই ধর্মমতে যুক্তি প্রমাণের চেয়ে অন্ধ বিশ্বাস ও ভাবাবেগ অধিক প্রবল থাকে।

৩.১১.১১ অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন

প্রকৃত পক্ষে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন এবং সূক্ষ্ম ও সুকোমল হৃদয়াবেগ পরিমার্জিত করণের উদ্দেশ্যেই তা অর্জন করতে হয়। কিন্তু অধুনা এই ধারণা নিতান্তই পুরাতন এবং অনেক কাল আগের বলে বিবেচিত। আধুনিক কালের প্রবণতা হল, শিক্ষাকে ব্যবহারোপযোগী বানাতে হবে, ব্যবহারিক মূল্যের দৃষ্টিতে যা অধিক মূল্যবান, এমন শিক্ষা অর্জনই হবে জীবনের লক্ষ্য। শিক্ষার আলোতে হৃদয়কে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত ও জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তোলা আজ আর লক্ষ্য রূপে নির্দিষ্ট থাকেনি। অথচ আজকের দুনিয়ায়ও আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার, যা আমাদের মনকে সর্বপ্রকার রোগ থেকে মুক্ত করবে, মানসিক রোগের জীবাণু বিনষ্ট করে দেবে, মানবতার সকল দুঃখ দুর্দশা, বঞ্চনা ও শোষণ-লুণ্ঠন বন্ধ করে দেবে। আর মানবীয় প্রয়োজন পূরণার্থে প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ; ক্রমবর্ধমান

১৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খোরাক, পোশাক-বাসস্থানের ও তার ইনসাফপূর্ণ বণ্টনের ব্যবস্থা করার; প্রাকৃতিক বিপর্যয়-বন্যা প্লাবনের মাত্রা ক্রমাগত হ্রাস ও সীমাবদ্ধ রাখার এবং সকল শ্রেণির মানুষের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ স্ফূর্তি সম্পন্ন অবস্থা সৃষ্টি করার যোগ্য হবে। এগুলো একান্তই জরুরী। যে শিক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের মহৎ কাজ সম্ভব, তা যে মানবতার পক্ষে খুবই কল্যাণকর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে যে কেউই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য হবে যে মানব প্রকৃতিতে নিহিত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইত্যাদির স্বভাবজাত প্রবণতা তা করতে দিবে না। এর কোন একটিকেও নির্মূল করার প্রবণতা কারুর মধ্যে জাগাবে না। উচ্চতর শিক্ষার চরম লক্ষ্য যদি শুধু এতটুকুই হয়, তাহ'লে এ উচ্চ শিক্ষা তার আসল তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, মানবীয় উন্নতি বিধানে যারা জ্ঞানার্জনের জন্য নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত করে দিয়েছে, তারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে; এদের সংখ্যা যতই কম হোক না-কেন। কাজেই পূর্বোক্ত ধরনের শিক্ষাই মানুষের কাম্য। আর তা কেবল আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া জ্ঞান-তথা কুরআন ও সুন্নাহে্ বর্ণিত জ্ঞান ভান্ডার থেকেই পাওয়া যায়[১৩১]।

৩.১১.১২ শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে ঈমান দীপ্ত-প্রত্যয়মূলক

কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, মানুষের জ্ঞান-পরিধি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষের সমস্যা ততই জটিল হতে জটিলতর হতে যাচ্ছে। মানুষ বস্তুগত অগ্রগতি যত বেশি লাভ করছে, নিত্য নতুন কামনা-বাসনা, নতুন নতুন সমস্যাসহ অনেক জটিলতা ও অনেক নৈরাশ্য বঞ্চনার হাহাকার নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এ উন্নতি ধ্বংস ও বরবাদীর এমন সব হাতিয়ার

১৩১. মো: ইসমাঈল মিয়া, "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.): শিক্ষা বিস্তার", *শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২১৫-২১৮

উদ্ভাবনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার দরুন মানবতার অস্তিত্বই কঠিন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এটা যে কত বড় বিয়োগান্ত ব্যাপার, তা বলে শেষ করা যায় না। পরন্ত একদিকে মানুষ মানবীয় সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি বিধানের চেষ্টায় নিয়োজিত, অপরদিকে মানুষ অত্যন্ত তীব্র গতিতে ভিত্তিহীন ধারণা বিশ্বাসে ও কুসংস্কারের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। ফলে মানুষ এক স্থায়ী অশান্তি, দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আমরা যত তীব্রতা ও আন্তরিকতার সাথে বিশ্ব-প্রকৃতিকে জয় করতে শুরু করেছি, তা আমাদের একথা প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছে যে, আমরা কেবল কোমল দেহ ও কামনা-বাসনার অধিকারী নই, 'আত্মা' বলতেও একটি জিনিস আমাদের রয়েছে। দেহের জীবন এবং ক্রমবৃদ্ধির জন্যে যেমন খাদ্য অপরিহার্য, মনের পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা বিধানের জন্য যেমন প্রয়োজন শিক্ষার, তেমনি আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য দরকার ঈমানের। আর ঈমান হচ্ছে কতগুলো মৌল সত্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যয়, যে প্রত্যয় শত প্রতিকূল ঝঞ্ঝা, বাত্যার আঘাতে বিন্দুমাত্র দুর্বল হবে না। এই ঈমান বিনষ্ট হওয়া কঠিনতম দৈহিক রোগ অপেক্ষা অধিক মারাত্মক ও বিপজ্জনক। প্রাচীন মানুষের ইতিহাস অধ্যয়নে বিশেষজ্ঞগণ একথা মেনে নিতে আমাদের বাধ্য করেন যে, বহুসংখ্যক প্রাচীন জাতি ও গোত্র কেবল এ জন্যই ধ্বংস ও পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে তারা তাদের নিজস্ব জীবন পদ্ধতির প্রতি ঈমান ও প্রত্যয় হারিয়ে ফেলেছিল। ইতিহাসের এ এমন এক শিক্ষা যা কোন সময়ই এবং কারোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এরূপ ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হওয়া প্রত্যেক জাতির জন্য সুখবর নয়। ব্যক্তি ও জাতীয় সত্ত্বার স্থিতি যদি আমাদের কাম্য হয়, তাহলে মানবীয় মূল্যবোধের উপর নিজেদের প্রত্যয়কে পুনরুজ্জীবিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে শিক্ষা শুধু আমাদের দেহ ও বৈষয়িক জীবন রক্ষা ও উন্নতি বিধানের পন্থা প্রদর্শন করে এবং উপায়-উপকরণ সংগ্রহের প্রযুক্তি শিখায় কেবল মানসিক উৎকর্ষই যার একমাত্র অবদান-সে শিক্ষা করোর জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। তাই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমাদের একান্ত নিজস্ব

মানবীয় মূল্যবোধ অনুসারে বানাতে হবে। কেননা কেবল ঈমানই মানুষের আত্মাকে সুস্থ, সবল, স্বচ্ছ ও সফল করতে সক্ষম।[১৩২]

বর্তমানে মানবজাতি এক নবতর সামগ্রিক ব্যবস্থার রূপায়নে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ সামগ্রিক ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কি রূপ পরিগ্রহ করবে? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, মানব জাতীর ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে যে সব মূল্যবোধের চেতনা জাগ্রত রয়েছে, তার-ই উপর তাদের বর্তমান সামগ্রিক ব্যবস্থার রূপ-ঐশ্বর্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। মানব জীবনের সামাজিক সংহতি, সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা এবং ব্যক্তির পরম সাফল্য ও সার্থকতাই হচ্ছে মানব সভ্যতার লক্ষ্য। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে সকল প্রকার দুর্নীতি, শোষণ ও চরিত্রহীনতা মুক্ত এক আদর্শ সমাজ গড়া, যেখানে মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বেষ, হানা-হানি, মারা-মারি, লুটতরাজ ইত্যাদি অমানবিক ও অসামাজিক আচার-আচরণ থাকবে না; যেখানে মানুষ তার মানবিক মর্যাদা ও অধিকার পেয়ে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত এমন এক পাঠ্য ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ রচনা করতে হবে- যা শুধু ভাল ভাল জ্ঞান তথ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের মন-মগজ ভরে দেবে না; বরং সেই সংগে মানব প্রজন্মকে প্রদান করবে বিশ্বলোক, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সুস্থ, সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা-বিশ্বাস ও সুস্পষ্ট স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ, সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, কঠোর শ্রমশীলতা ও সুসংগঠিত বিশ্বস্ততার গুণাবলী। আর তা এমন সব উচ্চতর মানবীয় মূল্যবোধের নির্ভুল চেতনা জাগিয়ে দেবে যা শুধু ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাই চরিতার্থ করবে না, ব্যাপকভাবে মানব জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষারও বাস্তব রূপায়নের নিয়ামক হবে। একমাত্র আল্লাহ্ ও

১৩২. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, "ইসলামের শিক্ষা দর্শন", *শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম*, ঢাকা: ইসলাামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ১৯-২০; মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১২৯-১৪৬; ড. জামাল আল বাদাবী, ইসলামী শিক্ষা সিরিজ, প্রাগুক্ত

তাঁর সর্বশেষ রাসূল (সা.)- এর প্রতি মানুষের যে ঈমান বা প্রত্যয় রয়েছে, তাই হচ্ছে ব্যক্তি ও জাতির উন্নতি বিধানের মৌল কেন্দ্র বিন্দু। এ কথা আজ নতুন করে উপলব্ধি করলেও সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা দরকার। এ কেন্দ্রবিন্দুকে উপেক্ষা করে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি রচিত, তা আল্লাহ্, রাসূল তথা ইসলামের আলোকেই বিশ্বাসীদের পক্ষে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং তার দ্বারা আদর্শ ও সুনাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে না।[১৩৩]

ব্যক্তির মন-মানসিকতা ও মেধার উৎকর্ষ বিধানের উদ্দেশ্যে শুধু অনুশীলন ও চর্চার নামই শিক্ষা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির নিজ সত্তার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার চারপাশে বসবাসকারী বিপুল জনতা ও তার পরিবেশ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানার্জনও তার একটা দায়িত্ব। ব্যক্তি কোন জনসমষ্টি বা জাতির অংশ হয়েই বাঁচতে পারে। সমাজ ও সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনাতীত। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে প্রত্যয় ও আদর্শবাদের দিক দিয়ে তার বংশ, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তা শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার অযোগ্য। তা নিছক বন্যতা, বর্বরতা ও পশুত্ব মাত্র। প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সমষ্টির ভিত্তিমূল চূর্ণ করে যে শিক্ষা, তাকে শিক্ষা না বলে 'ডিনামাইট' বলাই যথার্থ। ব্যক্তিকে সমাজ সমষ্টির একজন উত্তম সদস্যরূপে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই উত্তম আদর্শের তথা ঈমান বা বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতিবিম্ব করে গড়ে তুলতে হবে।[১৩৪]

৩.১১.১৩ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সমন্বয় সাধন

১৩৩. দেখুন মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১
১৩৪. মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শিল্পোন্নত সমাজ ও জাতির প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে রচিত। সে শিক্ষায় বৈষয়িক জীবন সত্ত্বার স্থিতি, সুখ-সম্ভোগ ও চাকচিক্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর তার মূলে দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম ও অপরের উপর প্রাধান্য (Survival of the fittest) লাভের ভাবধারার মধ্যে নিহিত। কিন্তু এতদঞ্চলের চিন্তাবিদগণ তা কখনও পছন্দ করেননি। ইউরোপ থেকে আমদানী করা জিনিসের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণ জেগে উঠলেও, তার চাকচিক্য চোখকে ঝলসিয়ে দিলেও এবং প্রথম দিক থেকে মানবমনে একটা উৎকট মাদকতার সৃষ্টি করে থাকলেও এতদ্দেশীয় চিন্তাশীলদের ও সমাজ দরদীদের ভুল ভাঙতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি। ইংরেজদের তৈরি শিক্ষা ব্যবস্থার মারাত্মক বিষক্রিয়া সম্পর্কে সজাগ হতে মুসলমানদের খুব বেশি সময় লাগেনি। কবি রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সমর্থক হয়েও স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন যে, এ শিক্ষা ব্যবস্থা এতদ্দেশীয় পরিবেশের সাথে সম্পর্কহীন[১৩৫]। তাই পাশ্চাত্য নিয়ম নীতির প্রতি যাদের দাস উপযোগি মনোভাব তারা আকণ্ঠ বিষপানে ব্যস্ত মনে করতে হবে। শিক্ষা যাদের জন্য, শিক্ষাকে তাদেরই ঈমান, বিশ্বাস, মন-মানসিকতা, মূলমান-মূল্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও রুচি, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অতএব শিক্ষা ব্যবস্থায় নিজেদের দ্বীন ও ঈমান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সংগে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য ও মূলনীতিসমূহের সমন্বিত ভাবধারার ভিত্তিতে রচিত হতে হবে।

৩.১১.১৪ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমৃদ্ধি

ইসলামী শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমৃদ্ধি সাধন। যে ব্যক্তি তার সমাজ সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন, সে ব্যক্তি সমাজ জীবনে মূলত কোন ভূমিকাই রাখতে পারে না। ব্যক্তি

---

১৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বহু লেখায় ও আলোচনায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন এবং ভারত বর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করার জোরালো দাবী করেছেন।

কেবল তখনই প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী হতে পারে, যখন সে সমাজ-সমষ্টির উদ্দেশ্যাবলীকে নিজের মধ্যে রূপায়িত করে তোলে এবং নিজের সত্তা দিয়ে তার বাস্তব রূপায়ণ ও প্রকাশ ঘটায়। এজন্যে ব্যক্তির মন-মানসিকতাকে সামষ্টিক ও সামগ্রিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে উদ্ভাসিত করে তুলতে হবে। যে সব মতাদর্শ ও দৃষ্টিকোণ ব্যক্তি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা শিক্ষার্থীর মনে ও চরিত্রে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে- এর মূল্যায়ন করে জানা যেতে পারে শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা তার ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য লাভ করেছে। বৈষয়িক জীবনে কে কতটা সফলতা লাভ করেছে, কিংবা কে কতটা উচ্চতর চাকরি লাভ করতে ও কত বেশি অর্থোপার্জনে সক্ষম হয়েছে, তা কোন ব্যবস্থারই সফলতা প্রমাণের মানদণ্ড হতে পারে না। যেমন এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পশু জগতেই সম্ভব, মানব জগতে নয়। এভাবে মওলানা আব্দুর রহীম ইসলামী শিক্ষা দর্শনে শিক্ষার দু'টি অবিচ্ছিন্ন দিকের কথা তুলে ধরেছেন। যথা- (১) একদিকে তা শুধু ব্যক্তির সংশোধন ও সংগঠন এবং (২) অন্যদিকে তা-ই সামাজিক সংশোধন, সামাজিক পুনর্গঠন ও সার্বিক কল্যাণ বিধানে।[১৩৬]

তাই, মওলানা আব্দুর রহীম তার জোড়ালো ও ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে অতএব ইসলামী শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো আধুনিক কালের উপযোগী যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ও পুরাপুরি ইসলামী আদর্শবাদী নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্র এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পূর্ণভাবে গড়ে তোলা। অন্য ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, ইসলামের শিক্ষাদর্শনের দৃষ্টিতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রেম ও ভালোবাসা এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রবল ভাবধারা জাগ্রত করে তোলা। জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের উপর তার প্রভাব বর্তমান থাকা অপরিহার্য। ব্যক্তিগতভাবে তারা হবে উন্নত গুণসম্পন্ন মানুষ, আদর্শবাদী

১৩৬. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ২১

মানুষ, জন দরদী ও সার্বিক কল্যাণকামী মানুষ এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক।[১৩৭]

৩.১১.১৫ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন বিধানের জ্ঞান অর্জন করা

ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন তথা জীবন বিধান। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং তার সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনক্ষেত্র-এ দু'য়েরই যুগপৎ সংশোধন ও পুনর্গঠনের দাবিদার হচ্ছে এই দ্বীন। এই দ্বীনে ইসলাম মানুষের সামনে এক সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে। উদ্দেশ্যহীন জীবন ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য ও পশুতুল্য। এ কারণে জীবন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিপূরক নয় যে শিক্ষা ইসলাম তার বিরোধী শুধু নয় বরং তা বরদাশত করতেও প্রস্তুত নয়। কুরআন মাজীদে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে এ ভাষায়,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"(আমি) জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টিই করেছি আমার দাসত্ব ও আনুগত্য করার জন্য।"[১৩৮] অন্যকথায়, আল্লাহর দাসত্ব বা আনুগত্য করাই হল ব্যক্তি-মানুষ ও সামাজিক মানুষের চরম লক্ষ্য। অন্যত্র বলা হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر

"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্যে। অতএব, তোমরা ন্যায়ের আদেশ দিবে ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে।[১৩৯]" অর্থাৎ মানবতার কল্যাণ সাধন এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধই হল ব্যক্তি-মানুষ ও সমষ্টিগত মানুষের জীবন-লক্ষ্য।

---

১৩৭. প্রাগুক্ত
১৩৮. আল কুরআন, ৫১-৫৬
১৩৯. আল কুরআন, ০৩:১১০

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে ইসলামী শিক্ষাদর্শনের এক উজ্জ্বল দিক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আর তা হল, মানুষ যেন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় দিক দিয়েই গোটা মানবতার কল্যাণের নিমিত্ত ও বাহন হয়ে গড়ে উঠতে পারে। আর এটাই হল ইসলামী শিক্ষাদর্শনের মূল কথা। প্রকৃতপক্ষে যে শিক্ষা বা বিদ্যার কোন প্রতিফলন হয় না ব্যক্তির চরিত্রে, কর্মে এবং যা মানবতার কল্যাণ সাধনের নিবেদিত হয় না, তা ইসলামের দৃষ্টিতে 'শিক্ষা' নামেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা নবী করিম (সা.) এ ধরনের শিক্ষা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চেয়েছেন।

সুতরাং শিক্ষায় ইসলামী দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল উন্নত জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রতিভাত করে তোলা। ইসলাম এমন ব্যক্তিদের সন্ধান করে যারা ব্যক্তিগতভাবে এ বিরাট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানায় এবং জীবনভর কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তারাই মানবজাতির আদর্শ, অনুকরণীয় ও অনুস্মরনীয় মানুষে পরিগণিত হয়। শিক্ষার মাধ্যমে এমন মানুষ তৈরি করাই হচ্ছে শিক্ষায় ইসলামী দর্শনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী সংস্কৃতি ও এর দর্শন

৪.১ সংস্কৃতির সংজ্ঞা

আসলে সংস্কৃতি শব্দটি দ্বারা বুঝানো হয় মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান, ধারণা, দৃষ্টিভংগি, মন-মানসিকতা এবং জীবনের লক্ষ্যে ও চেতনা । এই জিনিসগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠে যে জীবনবোধ, তারই বহি:প্রকাশ ঘটে সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতি কোনো সংকীর্ণ জিনিস নয়। সাহিত্য, কিংবা বিশেষ ধরনের কোনো শিল্পকলার মধ্যে তা মোটেও আবদ্ধ নয়। সংস্কৃতি অত্যন্ত প্রশস্ত। তা গোটা মানব জীবন পরিব্যপ্তি। সমাজের ষোল কলায় প্রতিভাত। এ প্রসংগে সংস্কৃতি বলতে বিশেষজ্ঞরা কি বুঝেছেন আর কি বুঝাতে চেয়েছেন, সেটাই আগে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। প্রথমেই অভিধান খুজে দেখা যাক।

কোলকাতার 'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত অশোক রায়ের অভিধানে সংস্কৃতির সমার্থক শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: কালচার, কৃষ্টি, তমদ্দুন, মার্জনা, পরিশীলন, পরিমার্জন, অনুশীলন, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, রুচিশীলতা, রুচি, সুরুচি ইত্যাদি। সাহিত্য সংসদ তাদের *সংসদ বাঙ্গলা অভিধানে* সংস্কৃতির অর্থ নিম্নরূপ লিখেছেন ঃ সংস্কার, উন্নয়ন, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি, রীতিনীতির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি ইত্যাদি। 'সংস্কৃতি' শব্দটি সংস্কর শব্দ থেকে উদগত হয়েছে। *সংসদ বাঙ্গলা অভিধানে* সংস্কার শব্দের অর্থ লেখা হয়েছেঃ শুদ্ধি, শোধন, পরিষ্কার, বা নির্মল করা, উৎকর্ষ সাধন, সংশোধন, ধারণা বিশ্বাস সংস্কার ইত্যাদি।

সংস্কৃতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Culture। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, কর্তৃক প্রকাশিত *English-Bengali Dictionary*-এ এর অর্থ লেখা হয়েছে ঃ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, মানব সমাজের মানসিক বিকাশ ইত্যাদি। শব্দটির ব্যাখ্যামূলক আরও অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে একটি জাতির মানসিক বিকাশর অবস্থা, কোনো জাতির বিশেষ ধরনের মানসিক বিকাশ কেনো জাতির বৈশিষ্ট্য সূচক শিল্প সাহিত্য বিশ্বাস সমাজনীতি।

আরবি ভাষায় সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে দুটি শব্দ প্রকাশ করা হয়। একটি হলো (**ثقافة**) ‘সাকাফা’ আর অপরটি হলো (تهذيب) ‘তাহযীব’। প্রাচ্যবিদ্য Milton Cowan- এর আরবি ইংরেজি অভিধানে *মুজামুল লুগাতুল আরাবিয়্যাতুল মুয়াসিরা* (معجم لغة العربية المعاصرة) *[A Dictionary of Modern Written Arabic]* (**ثقافة**) ‘সাফাকা’ ও (تهذيب)‘তাহযীব’ শব্দ দুটির অর্থ লেখা হয়েছে নিম্নরূপ:

(**ثقافة**) সাফাকা ঃ Culture, Refinement, Education, Civilization ইত্যাদি।

(تهذيب) তাহযীব ঃ Expurgation, Emendation, Correction, Reflection, Revition, Training, Instruction, Education, Upbringing, Culture, Refinement ইত্যাদি।

আভিধানিক আলোচনা থেকে সংস্কৃতি শব্দটির ব্যাপক ও বিস্তারিত রুপ আমাদের সামনে পরিষ্কার হলো। এবার দেখা যাক বিশেষজ্ঞরা সংস্কৃতির কী সংজ্ঞা দিয়েছেন ।

বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী T.S. Eliot বলেছেন’ “কালচার হলো বিশেষ স্থানে বসবাসকারী বিশেষ লোকদের জীবন ধারা ও জীবন পদ্ধতি।”[১৪০]

১৪০. T.S. Eliot : Notes Towards the Definition of Culture, P. 13

এলিয়ট সংস্কৃতির দুই'টি বিশেষ বৈশিষ্ঠ্যের উল্লেখ করেছেন' একটি হলো ভাবগত ঐক্য আর অপরটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য। Eliot আরেকটি বিবেচনাযোগ্য কথা বলেছেন। তাহলো "মানুষ শিল্পকলা, সামাজিক ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠনাদিকে কালচার মনে করে। অথচ এগুলো কালচার নয় বরং এগুলো হলো সে সকল জিনিস যেগুলো থেকে কালচার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।"[১৪১]

নৃবিজ্ঞানী Philip Bagby বলেছেন ঃ "সংস্কৃতি বলতে যেমন চিন্তা ও অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি এতে পরিব্যপ্ত রয়েছে কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি ও চরিত্রের সবগুলো দিক।"[১৪২]

Methuw Arnold তার *Culture and Anarchy* গ্রন্থে সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে "সংস্কৃতি হলো মানুষকে পূর্ণ মানুষ বানানোর নির্মল প্রচেষ্টা। সংস্কৃতি হলো পূর্ণতা লাভ করার উপায়।"

নৃবিজ্ঞানী বোয়া সংস্কৃতির তিনটি দিক বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো "১. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ২. অনুভূতিশীল মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজে সমাজে পারষ্পারিক সর্ম্পক এবং ৩. মানসিক হাবভাব, ধর্ম, নীতি ও সৌন্দর্যজ্ঞান।[১৪৩]

নৃবিজ্ঞানী Tylor তার Primitive Cilture গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"Culture is that Complex whole which includes knowledge, belief, art, moral law, custom and other capabilities and habits acquired by men as a member of the society."

৪.২ সংস্কৃতির উপাদান

১৪১. T.S. Eliot : Notes Towards the Definition of Culture, P. 120
১৪২. Philip bagby : *Culture and History*, P. 80
১৪৩. Boas : *General Anthropology*, PP. 4-5

উপরের আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞা থেকে সংস্কৃতির নিম্লোক্ত উপাদান পরিলক্ষিত হয়:

১. জগত ও জীবন সর্ম্পকে ধারণা,

২. জীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য,

৩. আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি,

৪. বিশেষ ধরণের নৈতিক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা,

৫. সমাজ ব্যবস্থার রুপরেখা ইত্যাদি।

ইসলামী চিন্তাবীদণের সুস্পষ্ট অভিমত[১৪৪] হচ্ছে যে, ইসলাম ছাড়া বিশ্বের কোনো মতবাদই উপরোক্ত উপাদানগুলো সম্পর্কে যথার্থ ও প্রকৃত নির্দেশনা প্রদান করতে পারেনি। বরং এগুলো সম্পর্কে বস্তবাদী দৃষ্টিভংগি আধুনিক মানব সমাজকে মানসিক অশান্তি আর নৈতিক অধ:পতনের অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছে। তাই এ থেকে পরিত্রাণের জন্য দরকার ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ। এবার আমরা ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় জানার চেষ্টা করব।

৪.৩ ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় ও স্বরুপ

আল্লাহ প্রদত্ত ও মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শিত ইসলামী শারীয়াতের আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের জীবনের সকল কর্ম-কান্ড ইসলামী সংস্কৃতির আওতাভূক্ত, যা মানবতার আদর্শ মুহাম্মদ (সা.) এর পদাংক অনুসরণে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।[১৪৫] ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম *ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বরুপ* এ ইসলামী পন্ডিতগণের উদৃতি দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বেশ কিছু সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এখানে সেখানে হতে বেশ কিছু সংজ্ঞা প্রদান করা হল।

---

১৪৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, Ôwkÿv-mwnZ¨ I ms¯‹…wZÕ, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী-২০০০, ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, ÔBmjvgx ms¯‹…wZi cÖK…wZ I ¯^i‚cÕ, ঢাকা: ইউনিভার্সাল ইসলামিক থট, ২০১৪: সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী রহ: Bmjvg ag, mgvR I ms¯‹…wZ, প্রাগুক্ত; আব্দুস শহীদ নাসিম, wkÿv mvwnZ¨ ms¯‹…wZ, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী) ১৯৯৭
১৪৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, ঢাকা: ইউনির্ভসাল ইসলামিক থ্যট, ২০১৪, পৃ. ৩৫-৬৭

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক হাসান আইয়ূব বলেন,

“কুরআন ও সুন্নাহর বুনিয়াদে পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকান্ড ও ক্রিয়াকলাপ ও আচরণই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।”[১৪৬]

আব্দুল মান্নান তালিবের মতে, “ইসলামী জীবন চর্চাই ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলমানরা যেভাবে তাদের জীবন গড়ে তোলে ইসলামী সংস্কৃতি ঠিক তেমনি রুপ লাভ করে। মুসলমানরা যখন পুরোপুরি ইসলাম তথা ইসলামী বিধান মেনে চলে তখন তারা পূর্ণ ইসলামী জীবন যাপন করে।”[১৪৭]

এ জেড.এম শামসুল আলম ইসলামী সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, “মানুষের জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের পর যে সমস্ত আচার, আচরণ, কাজ, কর্ম, রুচি, চেতনা প্রভৃতি মানব জীবনকে সুন্দর করে এবং জীবনে আনে অনাবিল সুখ-শান্তি সে সমস্ত আচার-আচরণকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয় যদি তা ইসলামী মূল্যেবোধ ভিত্তিক হয়। ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষ্য হলো জীবনকে সুন্দর করা, সুখ-শান্তি ও কল্যাণময় করা। ইসলামী সংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রতীক হলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আর তাঁর সুন্নাহই হলো মৌলিক মুসলিম সংস্কৃতি।”[১৪৮]

ইসলামী গবেষক ফায়জীর মতে, “ইসলাম পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, আর এ জীবন ব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই হল ইসলামী সংস্কৃতি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে তিনটি জিনিস বুঝায়, ১. উন্নততর চিন্তার মান যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন এক যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

১৪৬. Bmjvgx ‘kb I ms¯‹wZ, পৃ. ১৯; সূত্রঃ ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
১৪৭. আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্চ ও ইসলাম*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ খ্রী.) পৃ. ৯৫
১৪৮. এ জেড.এম শাসসুল আলম, *মুসলিম সংস্কৃতি*, (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২ খ্রী), পৃ. ১১

২. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য।

৩. মুসলমানদের জীবনধারা, ধর্মীয় কাজ-কর্ম, ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম প্রথার বিশেষ সংযোজন।"[১৪৯]

মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন "ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের মানসিক অবস্থা যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে উঠে। যেমন, আল্লাহর একত্ববাদ, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানব বংশের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।"[১৫০]

ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন এর মতে, "ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি। পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহই হলো এর মূল ভিত্তি। কুরআন সুন্নাহর ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক কোন সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতাবিরোধী সব কিছুই অপসংস্কৃতি।"[১৫১]

এস জেড সিদ্দীকী বলেন "ইসলামী সংস্কৃতির দুটি অর্থ, একটি হলো তার চিরন্তন দিক। আর অপরটি হলো সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজ সংস্থা।"[১৫২]

উপরের কথাগুলো একত্রে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় যে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণরুপে দ্বীনভিত্তিক আর এই দ্বীনি ভাবধারাই এর প্রাণশক্তি। এ সংস্কৃতির মাধ্যমে একজন মানুষ ধর্মভীরু, নীতিবান ও

১৪৯. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ২৭০
১৫০. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ২৭০
১৫১. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামী সংস্কৃতি*, জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক (ঢাকা: জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০৪ খ্রী:), পৃ. ২৪৭
১৫২. আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী সংস্কৃতি রুপায়ণ*, অপ্রকাশিত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

অনুপম চরিত্র মাধর্যে সুশোভিত হতে পারে। সৎ ও নিষ্ঠাবান মানবসম্পদ সৃজনে এর বিকল্প কোন মাধ্যম নেই।[১৫৩] প্রকৃত পক্ষে ইসলামী সংস্কৃতি কোন জাতীয়, বংশীয় বা গোষ্ঠীয় নয় বরং যথার্থ অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এভাবে ইসলামী সংস্কৃতি এক বিশ্বজনীন উদার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে যার মধ্যে বর্ণ,গোত্র, ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই সমান অধিকার নিয়ে প্রবেশ করতে পাবে। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতি কেবল মুসলমানদের জন্যে নয় বরং সমগ্র মানব জাতির জন্যে।

৪.৪ ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

জীবন যাপনের সবকিছুই হলো সংস্কৃতি। আর জীবন যেহেতু গতিশীল তাই সংস্কৃতিও গতিশীল। জীবনের শুরু যেখানে থেকে সংস্কৃতির সূচনাও সেখানেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম জীবন চর্চা যেহেতু মহান আল্লাহর হিদায়েত ও আনুগত্য দিয়েই, তাই এ প্রথম জীবন চর্চাই ছিল ইসলামী সংস্কৃতির সূতিকাগার। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই একথা বলা যায় যে, আদম (আ.) এর মাধ্যমেই ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়েছিল। যুগে যুগে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকাশিত হয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যুগে এসে তা পূর্ণতায় পৌছায়। মোটকথা রাসূল (সা.) ই একমাত্র উন্নত সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন।[১৫৪]

কেননা মহানবী (সা.) নিজে বলেছেন,

ّنَ اللَّهَ بَعَثَنِي بِتَمَامِ مكارِمِ الأَخْلاقِ، وكَمَل مَحَاسِنِ الأَفْعَل

অর্থাৎ উন্নত সংস্কৃতি জীবন ধারাকে পূর্ণতা দান করার জন্যে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।[১৫৫] মানুষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস হচ্ছে তার সংস্কৃতির ইতিহাস। কারণ প্রথম থেকেই মানুষ সভ্য এবং একটি সুন্দর রুচিশীল সাংস্কৃতিক জীবনের

---

১৫৩. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ২৩৩
১৫৪. অর্থাৎ উন্নত সংস্কৃতি জীবনধারাকে পূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: তাবারানী, *আল- মু জামুল আওসাত, ১৫শ খন্ড* (কায়রো: মাওকা'উ জামি'আল-হাদিস,তা.বি.) পৃ. ১৬৫
১৫৫. ড. আব্দুল মুহাম্মদ রেজাউল করিম, *ইসলামী সংস্কৃতি প্রকৃতি ও স্বরুপ*, ঢাক: ইউনির্ভাসাল ইসলামিক থ্যট, ২০১৪, পৃ. ৩৭

অধিকারী ছিল। একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। আল্লাহ তায়ালা প্রথম মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন এবং সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"এবং আল্লাহ আদম (আ.) কে সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছেন।"[১৫৬] এর অর্থ হচ্ছে তিনি সকল বস্তুর তাৎপর্য ও ব্যবহারবিধি এবং অনুসঙ্গ আল্লাহর তায়ালার কাছ থেকে শিখেছেন। মূলত পরিপূর্ন জ্ঞান বলতে যা বুঝায় তা তিনি এভাবেই অর্জন করেছিলেন। তিনি কোন মুহুর্তেই পার্থিব কারো নির্দেশ পাননি; বরং মহান আল্লাহর নির্দেশে চালিত হয়ে সত্যের প্রবর্তনায় পার্থিব জীবনযাপন করেছিলেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জ্ঞান দান করে নিজ সত্ত্বার মধ্যে এর পরিচালনা, উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষমতা রেখে দিয়েছে। মূলত তিনি যুগে যুগে, দেশে, দেশে তা প্রয়োগ করেছেন। ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এর ভিন্ন ভিন্ন রুপ পরিগ্রহ লক্ষ করা যায়। তাই অনুসন্ধান করলে সবার মূলে একটি অভিন্ন মৌলিক সাংস্কৃতিক কাঠামো পরিদৃষ্ট হয়।[১৫৭] মানুষের সংস্কৃতিতে রয়েছে আবার আরেকটি উল্টো ধারা। যা শয়তানের প্ররোচনা, বিদ্রোহ ও অবিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি, সংস্কৃতির বিকার ও অপসংস্কৃতি এসবই এ উৎস থেকে এসেছে। ইসলামী সংস্কৃতির পাশাপাশি শয়তানের অপসংস্কৃতির চর্চাও আবহমানকালের। আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করার সাথে সাথে শয়তানও আসে। দ্বন্দ্ব শুরু হয় সত্য ও মিথ্যার, হক ও বাতিলের, ন্যায় ও অন্যায়ের। এখানে একদিকে হিদায়েত অন্য দিকে গোমরাহী। প্রতিযোগীতা চলে সমান তালে। সংস্কৃতির সূচনাতে কোন বুদ্ধি ভ্রষ্টতা ছিল না, কোন জড়তা ছিল না, ছিল প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান। মানুষ

---

১৫৬. আল কুরআন, ০২:৩১
১৫৭. আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ৮৮

কেনদিন অসভ্য অমানুষ বা অপমানুষ ছিল না। একজন মানুষ থেকেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[১৫৮]

একথা স্বীকার্য যে স্থান ও কালের সাথে মানব বুদ্ধি সংযুক্ত হয়ে সংস্কৃতি বিচিত্র ও নিত্য নতুন রুপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে জ্ঞানের রয়েছে বিশাল ভূমিকা; জ্ঞানই মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। জ্ঞান থেকে মানুষের যাত্রা শুরু। জ্ঞানই শয়তানকে চিরশত্রুর সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শয়তানের আছে বুদ্ধির অহংকার মানুষের আছে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সম্পদ। জ্ঞানের অভাবেই শয়তান পথভ্রষ্ট। বুদ্ধির আহঙ্কার আর ও ঔদ্ধত্যের কারণেই শয়তান চিরকালের জন্য অভিশপ্ত। কাজেই শয়তানের কোন সৃষ্টি নেই, আছে শুধু ধ্বংস। মানুষের সৃজনশীল কাজ নষ্টের ক্ষেত্রে শয়তানের ভূমিকা সক্রিয়। আর আদম (আ.) বিদ্রোহের শামিল হয়েও নতুন পৃথিবীর সম্রাট। কারণ তাঁর মধ্যে লজ্জাবোধ ও অনুশোচনা ছিল। তিনি সবসময় লজ্জিত ছিলেন এই কারণে যে তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে জান্নাতে থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। মহান আল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রেরিত পুরুষ হিসেবে আদম (আ.) এর প্রধান দায়িত্ব ছিল, এ দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালার খিলাফত কায়েম করা এবং পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করে তোলা। এভাবে

১৫৮. আল কুরআন, ৪: ১

আদম (আ.)-এর মধ্যেমে সর্ব প্রথম দ্বীন ইসলাম তথা ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি রচিত হয়। যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।[১৫৯]

আদম (আ.) এর পরে যে নবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য তিনি হলেন, হযরত নূহ (আ.)। তিনি আল্লাহ তায়ালার দ্বীন তথা ইসলামী সংস্কৃতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। মানুষের অবিশ্বাস, অবিবেচনা এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঘৃনা ও বিদ্বেষ পৃথিবীকে অপরিচ্ছন্ন করেছিল। তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দ্বীনকে পরিশুদ্ধ ও যুগোপযোগী করার। আল্লাহ তায়ালা নূহ (আ.) কে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের অপরিচ্ছন্ন লোকদেরকে পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃতিবান করার জন্য। কুরআনের ভাষায়,

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى

নূহ (আ.) তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা যদি ন্যায় পথে চলো এবং বিশুদ্ধতা অর্জন তথা সংস্কৃতিবান হওয়ার চেষ্টা কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।[১৬০] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। নূহ (আ.) এর সময় ইসলামের যে রুপটি প্রস্ফুটিত হয়েছিল সেটি ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণরুপ নয়। আদম (আ.) থেকে অনেকটা অগ্রসর কিন্তু পূর্ণরুপে প্রতিষ্ঠিত নয়। মানুষ তখনো পার্থিব ঐশ্বর্যকে একমাত্র প্রাপ্তি মনে করতো এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন অনুশোচনা বোধ ছিল না। সুতরাং তিনি তাদের ধ্বংস কামনা করলেন।[১৬১]

---

১৫৯. আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে আবতীর্ণ হওয়াটি যথার্থরুপে শাস্তিস্বরুপ ছিল না। যদিও শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ প্রাথমিক বিবেচনায় শাস্তিই মনে হবে; কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে আগমনের ফলে সমগ্র বিশ্বে মহান আল্লাহর খিলাফতের পূর্ণতা সাধন ঘটল। (দ্রষ্টব্য: সৈয়দ আলী আহসান, "ইসলামের আরম্ভ ও ক্রমধারা", *অগ্রপথিক*, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রী: পৃ. ১০-১১)

১৬০. আল কুরআন ৭১: ৩-৪

১৬১. হযরত নূহ (আ.) তার জাতিকে ধ্বংস করার জন্য এভাবে দু'আ করেন,

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا *إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

হযরত নূহ (আ.) এর পরে উল্লেখযোগ্য নবী হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী এবং সত্য সাধক। সুস্পষ্টভাবে দ্বীনের কার্যক্রমের গণনা আমরা ইবরাহীম (আ.) থেকেই করে থাকি। ইবরাহীম (আ.) এর পিতা আজর ছিলেন মুর্তিপূজক এবং তার ব্যবসা ছিল মূর্তি নির্মাণ। আজর নিয়মিত মূর্তি নির্মাণ করতেন এবং দক্ষ মূর্তি নিমাতা হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি হিসেবে শৈশব থেকেই ইবরাহীম (আ.) মূর্তিপূজার প্রতি বিরুপ ছিলেন। তিনি কোনদিন মূর্তিপূজা করেননি। ইবরাহীম (আ.) বহুবিধ জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুরআন মাজীদে বিশদভাবে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[১৬২] ইবরাহীম (আ.) এর পরে যে নবীর নাম ইতিহাসের ক্রমাধারায় উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হলেন হযরত মুসা (আ.)। মুসা (আ.) কে ইহুদিরা তাদের আইন প্রণেতা হিসেবে মান্য করে। যথার্থই তিনি পার্থিব জীবন ব্যবস্থপনা এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অনুশাসন প্রবর্তন করেছিলেন যেগুলো এখনো প্রাচীনপন্থী ইহুদিরা মেনে চলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ধীরে ধীরে ইসলামী আইন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল তখন অনেক ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) মুসা (আ.) এর আইনকে অবলম্বন করেছিলেন। বানু কুরায়যা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তখন তার শাস্তি দেয়া হয়েছিল ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ নির্দেশাবলীর আলোকে যেগুলো হযরত মুসা (আ.) এর অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। মুসা (আ.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কোন দেবমুর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত নিহত প্রানী হারাম, চৌর্যবৃত্তির ম্যাধমে গৃহিত প্রানীও হারাম। চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে যে প্রাণী তৃণভোজী এবং যাদের পায়ে ক্ষুর আছে এবং যে ক্ষুর দ্বিধাবিভক্ত সে সকল প্রাণী হালাল। কিন্তু আল্লাহর

"নূহ আরও বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের।" (আল কুরআন, ৭১: ২৬-২৭)

১৬২. এ ঘটনাটি সূরা আল- আনয়ামের ৮৬-৮৯ নং আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

নামে জবাই না করলে তা হরাম হবে। রক্ত হারাম, শুকর হারাম। উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে আমরা এ অনুশাসন ও সংস্কৃতির সব ক'টি গ্রহণ করেছি। তবে রাসূল (সা.) এর উম্মতের মধ্যে নতুন কিছু অনুশাসন ও সংস্কৃতি এসেছে এবং খাদ্য বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু বিচার বিবেচনাও এসেছে।[১৬৩]

তবে ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণতা আসে রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে। ইসলাম যেমন সকল দ্বীনের সর্বশেষ সংস্করণ, রাসূল (সা.) ছিলেন ঠিক তেমনি সর্বশেষ ঐশী বাণী বাহক। তাই দেখা যায়, ইসলামই একমাত্র দ্বীন যেখানে সকল দ্বীনের সুন্দরতম গুণাবলীর পূর্ণতা বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। আর মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্র বৈশিষ্ট্যে সকল নবী রাসূল ও মহাপুরুষদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, তাঁর মধ্যে আদম (আ.) এর মহত্ত্ব, নূহ (আ.) এর প্রচার, সালিহ (আ.) এর বিনীত প্রার্থনা, ইবরাহীম (আ.) এর নিষ্ঠাপূর্ণ একত্ববাদ, ইসমাইল (আ.) এর আত্নত্যাগ, মুসা (আ.) এর পৌরুষ্য, হারুন (আ.) এর কোমলতা, ইউসুফ (আ.) এর সৌন্দর্য, ইয়াকুব (আ.) এর ধৈর্য্য, আইয়ূব (আ.) সহানশীলতা, দাউদ (আ.) এর সাহসিকতা, সুলায়মান (আ.) এর বিচার জ্ঞান, ইয়াহইয়া (আ.) এর সরলতা, ইউনুস (আ.) এর অনুশোচনা, ঈসা (আ.) এর অমায়িকতা ইত্যাদি সকল সুমহান গুণের পূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল। মহানবী (সা.) এর প্রচারিত দ্বীনে যেমন সকল দ্বীনের সারবস্তু হয়ে পরিমার্জিত রূপে বিকাশ লাভ করেছে তেমনি তাঁর ব্যক্তি জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সকল প্রেরিত পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে।[১৬৪] সুতরাং তাঁর প্রচারিত আদর্শই মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ রুপে অনুস্মরণীয়, অনুকরণীয় আদর্শ।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

১৬৩. সৈয়দ আলী আহসান, "ইসলামের আরম্ভ ও ক্রমধারা", *অগ্রপথিক*, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ১৩-১৪

১৬৪. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, "ইসলামী সংস্কৃতি", *জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক*, (ঢাকা: জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০৪) পৃ. ২৫১

"রাসূল (সা.) তোমাদের নিকটে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।"[১৬৫]

ইসলামী সংস্কৃতির এ পৃথক ধারাটি মদীনা থেকে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানরা ইসলামের মিশন নিয়ে যেখানেই গিয়েছে সেখানেই ইসলামী সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়েছে। মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে ইসলামের আলোকে পারিবারিক জীবনধারা গঠন করেছে এবং সর্বপরি বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এভাবে সময়ের হাত ধরে মুসলমানদের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে।[১৬৬]

৪.৫ ইসলামী সংস্কৃতির মূলভিত্তি

ইসলামী সংস্কৃতির মূলভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সা.) এর পবিত্র সুন্নাহ। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ

"হে ঈমানদাগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্য কর। তোমরা তাঁর থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না।"[১৬৭] সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের বাইরে যাওয়া যাবে না। যদি কোন প্রতিষ্ঠিত বা প্রবাহমান বিংবা প্রচলিত বা চলমান সাংস্কৃতিক আচার-আচারণ, ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি যদি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত দিক-

১৬৫. আল কুরআন, ৫৯: ৭
১৬৬. আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ১০০
১৬৭. আল কুরআন, ৮:২০

নির্দেশনার বিপরীতে না যায় তাহলে তা গ্রহণ করতে দোষের কিছু নেই। এ দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায়, ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে উদার ও সকল সময়কে পরিব্যপ্তকারী।

৪.৬ ইসলামী সংস্কৃতির স্বরুপ ও প্রকৃতি

ইসলামের মূল ভিত্তি ও বিভিন্ন দিকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ইসলামী সংস্কৃতি একটি পূর্ণ কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কাঠামোর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

৪.৬.১ আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের পরিপূরক

সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মত। এতে আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে নিছক একজন উপাস্যের মতো নয়, বরং পার্থিব মত অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন এই বিশাল রাজ্যের বাদশাহ। রাসূল (সা.) তাঁর প্রতিনিধি আর আল কুরআন তাঁর আইন গ্রন্থ। যে ব্যক্তি তাঁর বাদশাহীকে স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধির আনুগত্য এবং তাঁর আইন গ্রন্থের অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি এ রাজ্যে অত্যন্ত সম্মানিত প্রজা।[১৬৮] কেননা মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

---

১৬৮. *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা*, পৃ. ২৩৩; সূত্র: ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

“ বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল।”[১৬৯]

মুসলমান হওয়া মানেই হচ্ছে সেই বাদশাহ (আল্লাহ তায়ালা), তাঁর প্রতিনিধি ও আইন গ্রন্থের মাধ্যমে যে আইনবিধি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার কার্যকরণ ও যৌক্তিকতা বোধগম্য হোক বা না হোক বিনা বাক্য ব্যয়ে তা স্বীকার করে নিতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং তার আইন বিধানগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে স্থান দিতে অস্বীকার করে এবং তার আদেশাবলী মানা বা না মানার অধিকারকে নিজের জন্য সুরক্ষিত রাখে, তার জন্যে এ রাজ্যের কোথাও এতটুকু স্থান নেই।[১৭০]

৪.৬.২ আখিরাতমুখী

এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের চুড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা। আর ইসলামের দৃষ্টিতে এ সাফল্য অর্জন বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভূল আচরণের ওপর নির্ভরশীল। উপরন্তু চুড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন কাজগুলো উপকারী, আর কোন কাজগুলো অপকারী তা জানা মানুষের সাধ্য নয়; বরং আখিরাতে ফয়সালাকারী আল্লাহ তায়ালাই তা উত্তমরুপে অবহিত। এ কারণেই এ সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়াদিতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করার এবং নিজের কর্ম স্বাধীনতাকে খোদায়ী শারিয়াত দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য মানুষের কাছে দাবি জানায়। অনুরুপভাবে এ সংস্কৃতি হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার এক মহোত্তম সমন্বয়। একে প্রচলিত

১৬৯. আল কুরআন, ৩: ২৬
১৭০. *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা*, পৃ.২৩৩; সূত্র: ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

সংকীর্ণ অর্থে ধর্ম নামে অখ্যায়িত করা চলে না। এটি একটি ব্যাপকতর জীবন ব্যবস্থা বা মানুষের চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচারণ, পারিবারিক কাজ-কর্ম, সামাজিক ক্রিয়া-কান্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপর পরিব্যপ্ত। আর এ সমস্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি ও বিধান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারই সামষ্টিক নাম হচেছ দ্বীন বা ইসলাম বা ইসলামী সংস্কৃতি।[১৭১]

৪.৬.৩ মানবীয় সংস্কৃতি

এ সংস্কৃতি কোন জাতীয়, দেশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয় বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই আহ্বান জানায় এবং যে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাকেই সে নিজের সীমানার মধ্যে গ্রহণ করে। এমনিভাবে এ সংস্কৃতি বিশ্বব্যপী এবং উদার জাতীয়তা গঠন করে যার মধ্যে বর্ণ, গোত্র, ভাষা, নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হওয়ার মতো অনন্য যোগ্যতা। সমগ্র আদম সন্তানকে একই জাতীয় সূত্রে সম্পৃক্ত করার এবং সবাইকে একই সংস্কৃতির অনুসারী করে গড়ে তোলার যোগ্যতারও সে অধিকারী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যিনি একটিমাত্র আত্মা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এবং এই দু’জন থেকে বহু পুরুষ ও নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ঐ আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপর

১৭১. প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩৪

থেকে নিজেদের হক দাবী করে থাক। নিশ্চিত জেনে রাখ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন।"[১৭২]

এ সাধারণ মর্মার্থগুলো আসলে অনেক বড়ো, গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। যদি মানুষেরা তাদের কান ও অন্তরকে সেদিকে নিবদ্ধ করতো তাহলে তাদের এ প্রচেষ্টা তাদের জীবনে বিরাট একটা পরিবর্তন সাধন করতে পারতো, তাদেরকে নানাবিধ জাহেলিয়াত থেকে দূরে রেখে ইসলামী সভ্যতার দিকে স্থানান্তরিত করতে পারতো। এই বাস্তব সত্যটি আরও ইংগিত প্রদান করে যে, এ মানবকূলের উৎপত্তি একটিমাত্র ইচ্ছা থেকেই হয়েছে, তাই মানুষরা সবাই একই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ একই মূল থেকে এদের উৎপত্তি এবং একই বংশের সাথে এরা সম্পৃক্ত। এভাবে উপরোক্ত আয়াতের অর্থ যদি অনুভব করা হতো তাহলে সত্যিই মানব জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে যেত যার ফলে সমগ্র মানব জীবনে এক স্বর্গীয় সুখ নেমে আসত।

৪.৬.৪ বিশ্বজনীন সংস্কৃতি

সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সাথে ইসলামী সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা এবং শক্তিশালী বন্ধন। ইসলামী সংস্কৃতি তার অনুসারীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে। এর কারণ এই যে, আইন প্রণয়ন ও সীমা নির্ধারণ করার পূর্বেই সে ঐ আইনের অনুসরণ ও সীমা সংরক্ষন করার ব্যবস্থা নেয়। অন্য কথায় আদেশ দেয়ার পূর্বেই আদেশটি কার্যকর হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। এ জন্য সর্বপ্রথম সে মানুষের কাছ থেকে আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। তারপর তাকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে যে বিধান তাকে দেয়া হয়েছে তা মহান আল্লাহরই বিধান এবং

১৭২. আল কুরআন, ৪: ০১

তার আনুগত্য ঠিক আল্লাহরই আনুগত্য। পরন্তু তার মনের ভেতর সে এক অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দেয় যে সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় তাকে বিধান পালনে উদ্ধুদ্ধ করে, তার বিরুদ্ধাচারণের জন্য তিরস্কার করে এবং পরকালীন শাস্তির ভয় দেখায়। এভাবে যখন প্রতিটি ব্যক্তির মন ও বিবেকের ভেতর এ কার্যকর শক্তিকে বদ্ধমূল করে নিজের অনুসারীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আদেশ নিষেধ পালন ও সদ গুণরাজিতে ভূষিত হওয়ার মতো করে গড়ে তোলে । ইসলামী সংস্কৃতি যে বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করেছে অন্য কোন সংস্কৃতি তা লাভ করতে পারেনি।[১৭৩]

৪.৬.৫ সুশীল সমাজ গঠন

পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংস্কৃতি এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে এবং এক সৎ ও পবিত্র জন সমাজ গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এর অন্তর্ভূক্ত লোকেরা উত্তম চরিত্র ও সদগুণরাজিতে বিভূষিত না হওয়া পর্যন্ত এরুপ সামজ গঠন সম্ভবপর নয়। এ কারণেই এ সভ্যদের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে করে তারা শুধু অকেজো ও প্রক্ষিপ্ত চিন্তাধারার প্রতিমূর্তি হয়ে না থাকে। তাদের মধ্যে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ মানসিকতা পরিস্ফুট করা প্রয়োজন, যাতে করে অতি স্বাভাবিকভাবে সৎ কর্মরাজির অনুশীলন হওয়ার মতো সুদৃঢ় চরিত্র তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। এই ঈমানের বলেই ইসলামী সংস্কৃতি লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মানুশীলন, সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদারদৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, বিনয়-নম্রতা, উচ্চাভিলাষ, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্য্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, আত্মতৃপ্তি, নেতৃত্বের আনুগত্য, আইনানুবর্তিতার মত উৎকৃষ্ট গুণরাজির সৃষ্টি করে। সেই সাথে তাদের সংঘবদ্ধতার

১৭৩. ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

ফলে স্বাভাবিক পরিণামে যাতে একটি উৎকৃষ্ট জনসমাজ গড়ে ওঠে-তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে যোগ্য করে তোলে ইসলামী সংস্কৃতি।[১৭৪]

৪.৬.৬ সৎ গুণাবলীর সৃষ্টি

ইসলামী সংস্কৃতিতে একদিকে যেমন মানুষের মধ্যে সচ্চরিত্র ও সৎ গুণরাজি সৃষ্টি করার এবং তা প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের উপযোগী সকল প্রকার শক্তি বর্তমান রয়েছে। অন্যদিকে পার্থিব উন্নতি ও প্রগতির জন্য মানুষকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করা এবং তাকে পার্থিব উপকরণ উত্তমরুপে ব্যবহার করার ও আল্লাহর দেয়া বিধানকে বাস্তব জীবনে সুসমভাবে প্রয়োগ করার জন্য যোগ্য করে তোলার শক্তি এর ভেতরে নিহিত রয়েছে। পরন্তু এটি পার্থিব জীবনে প্রকৃত উন্নতি লাভের জন্যে প্রায়োজনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তি সুসংহত করার এবং তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচন্ড শক্তি বর্তমান রয়েছে। সেই সাথে এই কর্মশক্তিকে সীমা অতিক্রম করতে না দেয়ার এবং সত্যিকার কল্যাণের পথ থেকে বিচ্যুত হতে না দেয়ার শক্তি এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এভাবে যেসব গুণাবলী অন্যান্য ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে পাওয়া যায়, ইসলামী প্রত্যয়বাদে তা সবই একত্রে ও উৎকৃষ্টরূপে বর্তমান রয়েছে। আর যেসব বিকৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ে লক্ষ্য করা যায় সেসব থেকে এ প্রত্যয়বাদ তথা এ সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।[১৭৫]

৪.৭ ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৬০

পূর্বে বলা হয়েছে যে ইসলামী সংস্কৃতি এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি পরিচালিত হয় বিশেষ এক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আর এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রুপ দিতে এবং একটি সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার জন্য ইসলাম মানব হৃদয়কে কেন্দ্রীয় গুরুত্বের আসনে বসিয়েছে। যেমন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন;

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

“আর মানুষের নফস ও হৃদয়ের কসম এবং সেই সত্তার কসম, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। তারপর তাকে খারাপ কাজ ও ভালো কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তার হৃদয় ও নফসকে পরিচ্ছন্ন করেছে সেই সফলকাম হয়েছে। আর ব্যর্থ হয়েছে সে ব্যক্তি যে তাকে করেছে কলুষিত।”[১৭৬]

সুতরাং স্পষ্ট হল যে হৃদয় ও মন মানসিকতার পরিচ্ছন্নতাই ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করার একামত্র উপায় হল হৃদয়ে ঈমানকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। হৃদয়ে ঈমানের পরিবর্তে শিরক প্রতিষ্ঠিত হলেই হৃদয় হয়ে পড়ে কলুষিত। ঈমানের মূল বিষয় হচ্ছে আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জীবন সম্পর্কে মানুষকে একটি বিশেষ ধারণা দেয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ইসলামী সংস্কৃতির যে লক্ষ্য ও সীমারেখা নির্মাণ করে দেয় তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে উল্লেখ করছি

১. এ সংস্কৃতিতে আল্লাহ তায়ালা কেবল একজন উপাস্যই নন; বরং তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন শাসক এবং রাসূল (সা.) তার প্রতিনিধি, কুরআন তার সংবিধান। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার প্রতিনিধিত্ব তথা রাসূলের (সা.) আনুগত্য করবে এবং তার পাঠানো সংবিধান অনুসারে জীবন গড়ে সে ব্যক্তি এ বিশ্বরাজ্যে ন্যায় সংগত প্রজা।

---

১৭৬. আল কুরআন, ৯১: ৭-১০

২. এ সংস্কৃতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হলো মানুষকে চুড়ান্ত সাফল্য লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর এর চুড়ান্ত সাফল্য অর্জিত হয় দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে কিন্তু কোন কাজে আল্লাহর তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন আর কোন কাজে অসন্তুষ্ট হবেন তা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নিজের কর্ম স্বাধীনতা পরিহার করে আল্লাহর পাঠানো শরীয়াত অনুযায়ী জীবন যাপন করাই এ সংস্কৃতির লক্ষ্য। এভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের চিন্তা-ভাবনা আচার আচারণ তথা সমগ্র কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রন করে যে সুষ্ঠু জীবনধারা গড়ে তোলে তাই ইসলামী সংস্কৃতি।

৩. এ সংস্কৃতির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জাতীয়, দেশীয় বা কোন ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে এ সংস্কৃতি সীমাবদ্ধ নয়। এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে রাসূল (সা.) কে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করে এবং কুরআনকে পথ চলার বিধান হিসেবে মেনে নিয়ে যে কোন ব্যক্তি এ সংস্কৃতির আওতাভূক্ত হতে পারে। এ অর্থে এটি একটি বিশ্ব সংস্কৃতি ও মানবীয় সংস্কৃতি। সারা বিশ্বের মানুষ এখানে এসে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

৪. এ সংস্কৃতির চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হলো শৃংখলাবোধ ও শক্তিশালী বন্ধন। এ শৃংখলাবোধ ইসলামী সংস্কৃতির অনুসারীদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। সেখানে এমন একজন অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করা হয়ছে যে বাইরের কোন তাগিদ ছাড়াই সবসময় তাকে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

৫. এ সংস্কৃতি একটি উন্নত ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা এবং একটি সৎকর্মশীল মানবগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে ওঠে। এর আওতাভূক্ত মানবগোষ্ঠী একদিকে যেমন সততা, বিশ্বস্বতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতীকে পরিণত হয় তেমনি অন্যদিকে অত্নত্যাগ, আত্নসংযম, উদারতা ইত্যাদি মানবীয় সৎগুণাবলীর মাধ্যমে মানব সমাজে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের ধারা প্রবাহিত করে। এ

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি একদিকে যেমন মানুষকে সৎগুণাবলীতে ভূষিত করে আবার অন্যদিকে পার্থিব উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে তাকে সর্বক্ষণ উদ্ধুদ্ধ করে। আল্লাহর দেয়া সম্পদকে নিয়ামত ও আমানত হিসেবে ঘোষণা করে।

এ আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলাম সর্বপ্রকার পার্থিব ও পরকালীন স্বার্থ পরিত্যাগ করে একটিমাত্র বস্তুকে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করে আর সে বস্তুটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ।

৪.৮ ইসলামী সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সংক্ষেপে ইসলামী সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও এক আল্লাহমুখীতা।

২. আল্লাহ প্রেম, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের প্রেরণা।

৩. আখিরাত বা পরকালের চিন্তা।

৪. আত্মশুদ্ধিতে আত্মার প্রশান্তি।

৫. নৈতিক মূল্যবোধ।

৬. চিন্তা, চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতা।

৭. অনাবিলতা ও পরিচ্ছন্নতাবোধ।

৮. সৌন্দর্যবোধ।

৯. দায়িত্বানুভূতি ও কর্তব্যবোধ।

১০. উদারতা ও মনের বিশালতা

১১. আত্ম সম্মানবোধে স্বাতন্ত্র্যবোধ।

১২. মানবতাবোধ।

১৩. মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান।

১৪. মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ।

১৫. মানবতার ঐক্যবোধ।

১৬. আত্মীয়তাবোধ।

১৭. সমাজিকতাবোধ।

১৮. নির্লোভ ও নিরহংকারবোধ।

১৯. দয়া, মায়া, ক্ষমা, কোমলতা ও ভালোবাসা।

২০. নেতৃত্ববোধ।

২১. বিনয়, আনুগত্য ও শৃংখলাবোধ।

২২. আদর্শবোধ রিসালাতের অনুবর্তণ।

২৩. মিশনারী মনোভাব।

২৪. সুবিচার।

২৫. সহিষ্ণুতা।

২৬. ভারসাম্যতা।

২৭. বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতা।

২৮. রিসালাতের দায়িত্ববোধ।

৪.৯ ইসলামী সংস্কৃতির পরিধি

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ইসলামী সংস্কৃতির পরিধি অনেক ব্যাপক। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু এবং এমনকি মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে ইসলামী সংস্কৃতি অর্ন্তভূক্ত করে। অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যত সকল ঘটমান ও ইঙ্গিতবহ ঘটনাবলীর জন্যে অনুকরণীয়

অনুস্বরণীয় দিক নির্দেশনা রয়েছে এ সংস্কৃতিকে। এ সংস্কৃতি কেবল মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের কথাই বলে না বরং মানুষের সাথে স্রষ্টার এবং অন্যান্য সৃষ্টিকূলের যুক্তিসঙ্গত সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে। মানব জীবনের জন্যে বিভিন্ন আনন্দঘন মুহূর্তের জন্যে খেলাধুলা থেকে আরম্ভ করে চিত্তবিনোদনের জন্যে দিয়েছে সুস্থ পরামর্শ ও নির্দেশনা।

৪.১০ ইসলামী সংস্কৃতিতে চিত্তবিনোদন

ইসলামী আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালিত হয় ভারসাম্যপূর্ণ মানদন্ডে, তাতে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের সুযোগ নেই এবং নেই কোন ধরনের সংকোচন ও মাত্রা হ্রাসকরণের কারণ। ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে যা বৈধ তাকে অবৈধ কিংবা যা অবৈধ তাকে বৈধ করার ক্ষমতা কাউকেই দেওয়া হয় নি। মুসলমানদের জন্যে পালনীয় সবকিছু মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ

"কোরআনে সব কিছুর নির্যাস বর্ণনা করেছি।"[১৭৭] তিনি আরও বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"হে রাসূল! আমি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে সকল জিনিসের বর্ণনা করা হয়েছে।"[১৭৮]

কাজেই মুসলিম জীবনে করনীয় পালনীয় মৌলিক জিনিসের বিবরণ পবিত্র কুরআনেই আছে। অন্যদিকে হাদীসের ভাষ্য থেকে জানা যায়,

الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

১৭৭. আল কুরআন, ৬:৩৮
১৭৮. আল কুরআন, ১৬:৮৯

“হালাল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট এবং হারাম বিষয়ও সুস্পষ্ট। আর এ দু’য়ের মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে অথচ অধিকাংশ মানুষই সে বিষয়ে অবগত নয়।”[১৭৯] সুতরাং আরো স্পষ্ট হলো যে ইসলামের হালাল ও হারাম সুস্পষ্ট ও পরিস্কার। আর যা সুষ্পষ্ট নয় বা সন্দেহতীত তা থেকে বেঁচে থাকাই ভালো বলে ইসলামী পন্ডিতগণ অভিমত দিয়েছেন। খেলা-ধূলা, গান-বাজনা, শিল্পকর্মসহ অন্যান্য চিত্ত বিনোদনমূলক কার্মকান্ড হালাল হারামের মাঝামাঝি অবস্থান করে বিধায় এগুলো নিয়ে ইসলামী পন্ডিতগণের মাঝে কমপক্ষে দু’ধরনের অভিমত (যায়েজ ও না যায়েজের) পাওয়া যায়। যারা না যায়েজের অভিমত দিয়েছেন তারা অতি সতর্কতার কারণে এ রকমের অভিমতের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। কেননা অনেক ক্ষেত্রে এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষ আস্তে আস্তে দ্বীন ইসলামের বিধি-বিধানের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে এবং আল্লাহর স্মরন থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। আবার যারা যায়েজ বলেছেন তারা ঢালাওভাবে সকল ধরনের চিত্ত বিনোদনকে বিবেচনায় আননেনি বরং শারীরিক মানসিক সুস্থতার মানদন্ডের ভিত্তিতে খাপ খায় এমন ধরনের চিত্ত বিনোদনমূলক কর্মকান্ডকে বৈধ বলেছেন। উল্লেখ্য, ইসলামের দর্শন হচ্ছে মানুষ ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি মুহূর্তে উজ্জীবিত থাকুক। এটি আল্লাহ তায়ালার অপছন্দ যে, নিরবিচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততা মানুষের জীবনে সব রস নি:শেষ করুক। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্থ চিত্ত বিনোদন শুধু বৈধই নয় বরং অনেক সময় অপরিহার্যও হয়ে উঠে। কাজের মাঝে সুস্থ চিত্ত বিনোদনের সুযোগ না থাকলে স্বাভাবিকভাবেই জীবন হয়ে উঠে একটি দুর্বিসহ বোঝা। তখন জীবনের সব মাধুর্য, হাস্য-রস, আনন্দ- স্ফূর্তি তেলহীন প্রদীপের মতই নি:শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া কর্মের গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকলে কর্ম শক্তির অবক্ষয় হতে দেরি হয় না। তাই বাস্তাব জীবনে দুর্বিহ বোঝা সঠিক ভাবে বহন করে চলার জন্য মনকে সর্বদা সতেজ, সক্রিয় ও উদ্দমশীল

১৭৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ঈসমাইল বুখারী আল জুফী (রহ:), *আস সহীহ আল বুখারী*, প্রথম খন্ড, পৃ. ২১, হাদীস নং, ৫২, রিয়াদ:মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

রাখা দরকার। আর এ জন্য আনন্দ স্ফূর্তি ও চিত্ত বিনোদনের নানা উপায় ও মাধ্যম অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা ইসলাম স্বীকার করে। বৈধ আনন্দ স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থার দরুণ মানব মনে উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।[১৮০]

মানব জীবন নানাবিধ দু:খ বেদনা ও আনন্দের সমষ্টি মাত্র। ঘটনা পরম্পরায় ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ দু:খ ও আনন্দ পেয়ে থাকে। এটি জীবনের বাস্তবতা। এ কারণে দু:খ ও দুশ্চিন্তায় ভরাক্রান্ত হয়ে বেশিক্ষণ থাকতে নেই। কেননা এতে মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে অনেক ক্ষতি হতে পারে। পক্ষান্তরে হাসি-আনন্দের মাধ্যমে মানুষ হালকা করতে পারে তার বেদনা কাতর মনকে। বস্তুত: হ্যর্ষোৎফুল্ল মনের পক্ষে অধিক কর্মক্ষম হয়ে উঠাই স্বাভাবিক। আর এ জন্যেই মানব জীবনে রয়েছে চিত্ত বিনোদনের যথেষ্ট গুরুত্ব। অতএব চিত্ত বিনোদন সংস্কৃতিরই এক অপরিহার্য রুপ যা অস্বিকার করার উপায় নেই।[১৮১] ইসলাম যেহেতু মানুষের সার্বিক কল্যানের ধর্ম, তাই ইসলামে মানুষের বৈধ চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং ইসলাম ধর্মে নির্দোষ হাস্যরস, আনন্দ ফুর্তি ও কৌতুককে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রেও ভারসাম্যতাকে উপেক্ষা করা যাবে না। মানুষ কেবল আনন্দ ফুর্তিতে মশগুল হয়ে থাকুক এবং ভালোমন্দ নির্বিশেষে সর্বপ্রকারে চিত্ত বিনোদনে জীবনের মহামূল্যবান সময় অতিবাহিত করুক- ইসলামে ঢালাওভাবে এর অনুমোদন নেই। কেননা, এর ফলে মানুষ আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যাবে। আর আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে দূরে যাওয়া আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের কাজ হতে পারে না। ইসলাম যেহেতু মানুষের স্বভাব ধর্ম,[১৮২]সেহেতু মানুষের স্বাভাবিক, শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ নেই। কেবল ক্ষেত্র বিশেষে তা

---

১৮০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৮৫-২৮৬

১৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

১৮২. কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ "প্রতিটি নবজাতকই স্বভাব প্রকৃতি উপর জন্ম লাভ করে থাকে"। (আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী আল জুফী (রহ), *আস সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২, হাদীস নং, ১৩৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণ করেছে মাত্র। তবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পথকে বাধামুক্ত, অবারিত ও নিষ্কণ্টক রেখেছে। প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তুই তার অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশ লাভের জন্য তার নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। মানব প্রকৃতিও এর ব্যতিক্রম নয়। এ কারণেই বিশ্ব প্রকৃতির আবহ ও অনুসঙ্গের সাথে মানুষের কোন সংঘাত নেই। আর এসব বিষয়ের বিবেচনায় ইসলাম বিনোদনের বিষয়টি কখন হালকা করে দেখেনি। এ কারণেই নব বিবাহিত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

"তোমার উপর তোমার শরীরের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে এবং তোমার উপর তোমার দর্শনার্থীদের অধিকার রয়েছে।"[১৮৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) তার নাতীদ্বয় হাসান ও হোসাইন (রা.) কে আদর করতেন, কোলে নিতেন, তাঁদের সাথে আনন্দ করতেন। একবার মহানবী (সা.) ঘোড়ামত সেজে হোসাইন (রা.) কে পিঠে তুলে মসজিদে নববীর একপাশ হতে আরেকপাশে ঘুরেছেন। নামাযের সময় হাসান ও হোসাইন তাঁর পিঠে উঠে বসে থাকতেন। আর নবীজী (সা.)ও তাঁদেরকে সময় দিতেন; যতক্ষন তাঁরা পিঠ থেকে স্বেচ্ছায় সরে না দাড়াতো ততক্ষন তিনি সেজদাহ থেকে উঠতেন না।

মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে হাসি ঠাট্টা ও রসিকতা করতেন। একদা হযরত আয়েশা (রা.) নবীজী (সা.) এর কাছে বসে হাসি রসিকতা করছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর মা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ মহল্লায় কিছু কিছু কৌতুক কিনান গোত্র থেকে এসেছে। তখন নবীজী (সা.) বললেন, বরং আমাদের মহল্লাটিই হাস্য রসিকতার মূর্ত প্রতীক।[১৮৪] মদীনায় মাঝে মাঝে

১৮৩. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৯৬, হাদীস নং-৫৫
১৮৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৫

বিনোদনের উদ্দেশ্য কবিতা পাঠের আসর বসতো। মহানবী (সা.) নিজেও অনেক শুনেছেন। এমনকি তিনি বানাত সূয়াত কবিতাটির জন্য কবি কাব ইবনে জুহাইরকে তাৎক্ষনিকভাবে তার গায়ের চাদর (বুর্দাহ) উপহার দিয়েছিলেন। মানুষের হৃদয়ে আনন্দ সৃষ্টি করা মধ্যে যে বিরাট সওয়াব রয়েছে তা রাসূল (সা.) আমাদেরকে জানিয়েছেন,

أحب الأعمال الى الله عز وجل سرور تدخله قلب مسلم

“আল্লাহ তায়ালার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হল মুমিনের অন্তরে আনন্দে সঞ্চার করা।”[১৮৫]এ জন্য আনন্দের সংবাদকে রাসূল (সা.) অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন এবং বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) শিশু কিশোরদের খেলাধুলা ও বিনোদনের স্বাভাবিক আগ্রহকে কখনও প্রত্যাখান করেননি বরং তাদের তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

لَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى
الفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
سَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ دَعْهُمَا

“রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার গৃহে আসলেন, তখন দু’জন কিশোরী বু’য়াস যুদ্ধের স্মরণে গান গাইছিলো। তিনি বিছানা শয়ন করলেন এবং নিজের মুখটি ঘুরিয়ে রাখলেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা.) আসলেন এবং আমাকে শাসিয়ে বললেন, নবীজী (সা.) এর দরবারে শয়তানের বাঁশি? হযরত আবু বকর (রা.) এর এরুপ কথা শুনে নবীজী (সা.) তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ওদেরকে গাইতে দাও।[১৮৬]

১৮৫. ইবন হিশাম, *সিরাতুন্নবী (সা.)*, ৩য় খ., ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি, পৃ. ৫০৩
১৮৬. *আস সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১০২, হাদীস নং ৯৪৯

মহানবী (সা.) নিজে তাঁর পরিবারের সদস্যদের মনকে বিনোদনের মাধ্যমে প্রফুল্ল রাখার ব্যবস্থা করতেন। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي

“আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামনে তাঁর ঘরে মেয়েদের সঙ্গে খেলতাম। আমার কতিপয় বান্ধবী ছিল, তারা আমার সাথে খেলতো। নবীজী (সা.) ঘরে আসলেই তারা ভয়ে আত্মগোপন করতো। তখন নবীজী (সা.) আমার সঙ্গে তাদের নিয়ে হাসি তামাসা করতেন। ফলে ওরা ফিরে আসতো এবং আমার সাথে খেলতে সাহস করতো।”[১৮৭]

‡Ljv-ajv I kix`i PPv

বিনোদনের প্রসঙ্গে খেলাধুলার বিষয়টি সর্বপ্রথম আসে। বিভিন্ন জাতীগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলা-ধুলার প্রচলন আছে। এর মধ্যে কিছু খেলাধুলাকে তারা উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছে, আবার কিছু নিজেরা আবিষ্কার করেছে। খেলাধুলা যদি শরীর চর্চা, মনের নিরবিল আনন্দ, সুস্থ বিনোদনমূলক কিংবা সামরিক প্রশিক্ষণের জন্যে হয়ে থাকে তাহলে সে সকল খেলাধুলাকে ইসলাম গুরুত্ব দেয়। আর যদি তা জুয়ার আড্ডা খানায় পরিণত হয়, নোংরামীতে পূর্ণ হয়, কিংবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির করণে হয় তাহলে ইসলাম অবশ্যই সে সব খেলাধুলাকে অনুমোদন করে না। এভাবে সার্বিক বিচারে শরীর ও মনের জন্যে উপকারী খেলাধুলা ইসলাম সমর্থন করে। আবার যা মানুষের উপকারের চেয়ে অপকার বেশী করে ইসলাম তা অনুমোদন করে না।

bv›`wbK wkí ev wkí Kjv

১৮৭. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৩২, হাদীস নং- ৫২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মনের অভ্যন্তরে উদিত চিন্তা ভাবনাকে শব্দ, ভাষা, অংকন, অভিনয়, রংতুলি ইত্যাদির মাধ্যমে সুন্দর ভাবে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শকদের রসবোধকে তৃপ্ত ও হৃদয়কে প্রভাবিত করার মত করে প্রকাশ করাকে শিল্প কলা বলা হয়ে থাকে।[১৮৮] সাধারণত যাত্রা, সিনেমা, নাট্যমঞ্চ, চিত্র প্রদর্শনী, গান-বাদ্যযন্ত্র, ভাস্কর্য,কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদিকে শিল্পকলা মনে করা হয়। কিন্তু শিল্পকলা কেবল এ সবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এক অর্থে মানুষের গোটা জীবন শিল্প কর্মে পরিপূর্ণ। জীবন ও জগত যেমন ব্যাপক, তেমনি শিল্পকলার পরিধিও ব্যাপক ও বিস্তৃত।[১৮৯]

শিল্পকলা মানুষের সৃষ্টি। তাই পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পরপরই শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে। আর পৃথিবীর সূচনা থেকেই ধর্ম যেহেতু মানব জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেহেতু যুগে যুগে মানুষের সেই ধর্ম বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্পকলার উদ্ভব ঘটেছে। এ কারনেই শিল্পের বিকাশও হয়েছে ধর্মকে অবলম্বন করে। আবার ধর্মের প্রসারেও রয়েছে শিল্পকলার অবদান। কাজেই শিল্প ও ধর্মের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব হয়নি। বিশ্বজনীন ধর্ম ইসলামের সাথে শিল্পকলার রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। মহানবী (সা.) এর যুগে কবিতা, বক্তৃতা, চিঠি, ক্যালিওগ্রাফী ইত্যাদি শিল্পকলার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। আল কুরআনে মুসলমানদেরকে বিশেষ ধরনের শিল্পকলা চর্চায় উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যেমন সুন্দরকরে কোরআন তেলাওয়াত করা, কোরআনের আয়াত দিয়ে ক্যালিওগ্রাফী তৈরি করা, মসজিদ নির্মাণে অপূর্ব স্থাপনা শৈলী, আরবী ব্যকরণে অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদি।

---

১৮৮. লিউ টলস্টয়, *শিল্পের স্বরুপ*, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বইঘর, ১৯৮৮, পৃ. ৪৯; এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ১১৩

১৮৯. ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

শিল্পকলার মূল কথা সৌন্দর্য অনুভব করা ও প্রকাশ করা। আর ইসলাম হলো এমন এক দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার নাম যা মানুষের অন্তরের ভিতরে সৌন্দর্যপ্রেম ও তার অনুভূতি গভীরভাবে গেঁথে দেয়। মহান আল্লাহ তায়ালা চান যে মানবজাতি গোটা বিশ্বের বিস্তৃত সৌন্দর্য অবলোকন করুক। তারা দেখুক সেসব অসাধারণ শিল্পকর্ম যা তাদের প্রভু মহান আল্লাহ তায়ালা নিজ হাতে সুন্দরকরে সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছু সুনিপুনভাবে অংকন করেছেন।

অত্যন্ত দু:খ জনক হলেও সত্য যে, শিল্পকলার নামে বর্তমান দুনিয়াতে যা চলছে তার অধিকাংশই মানুষের সুস্থ রুচিশীলতার প্রকাশ ঘটায় না। এতে সাময়িকভাবে কিছুটা আনন্দ পাওয়া গেলেও পরক্ষণেই মানব মননে অস্থিরতা ও শূন্যতার সৃষ্টি করে। যার ফলে সমাজে নেমে আসে এক ধরনের মানসিক দৈন্যতা ও অস্থিতিশীলতা। ইসলামী শিল্পকলা মনের চিরন্তন চাওয়াকেই প্রাধান্য দেয় বিধায় এটা অন্যান্য শিল্পকলা থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও দৃষ্টিকোণ পেশ করে থাকে।

৪.১১ ms¯‹wZ‡Z Bmjvgx ‘kb

4.11.1 Bmjvgx ms¯‹wZ n‡”Q wekRbxb

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম মত নয় বরং একটি কালজয়ী আদর্শ ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য মন্ডিত সংস্কৃতির নাম। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা, সংস্কৃতিতে রয়েছে অনুপম দার্শনিক তত্ত্ব ও ভিত্তি। সর্বপরি ইসলামী দর্শন ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণ শক্তিরুপে কাজ করে এবং বিশ্ববাসীর সামনে এক অনুস্বরণীয় বিষয় হিসাবে তা তুলে ধরে। স্থান, কাল, ব্যক্তি ও সমষ্টির সমন্বয়ক প্রতিটি জাতির সংস্কৃতি তার নিজস্ব পরিবেষ্ঠনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি বিশেষ দেশের সীমারেখার মধ্যে জীবন যাপনকারী লোকদের উত্তরাধিকার হয় সেই দেশের সংস্কৃতি। কিন্তু ইসলাম বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ।

সমগ্র মানব বংশের প্রতিই তার সমান আহ্বান। কোন বিশেষ জাতি, বংশ, গোত্র, সম্প্রদায় বা ব্যক্তির প্রতি তার কোন পক্ষপাত নেই। ইসলামের দৃষ্টিকোণ বিশাল, বিস্তীর্ণ, ব্যাপক ও সার্বিক। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ওপরই ইসলামের লক্ষ্য নিবন্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা ব্যক্তিগত ও বংশীয় বিশেষত্বের উৎকর্ষ বিধানের জন্যে চেষ্টা-সাধনা চালাতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করে। আর এর ফলে যে সাংস্কৃতিক ফসল পাওয়া যায়, তার প্রতি ইসলামী সাংস্কৃতিক দর্শনের কোন অনীহা থাকার কথা নয়।[১৯০]

4.11.2 Rxeb-hvc‡bi mnRxKi‡Yi DcKiY I we‡bv'bgjK KgKvÐ‡K gvbe Rxe‡bi j ÿ¨ bv evbv‡bv

বর্তমান বিশ্বে শিল্পকলা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর সীমাহীন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এগুলোর ওপর পূজা-উপাসনার মতোই সংবেদনশীলতার এক মোহময় আবরণ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরণের বাড়াবাড়ি দেখে যে কোন ঈমানদার ব্যক্তি বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এ বিষয়গুলো সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিপ্লব রূপে গণ্য হতে পারে কিংবা তাদের জন্যে তা জীবনের একটা লক্ষ্য হতে পারে হয়তবা। কিন্তু মুসলমানরা একে জীবন লক্ষ্য রূপে গণ্য করতে পারে না। তবে এসব সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প পর্যায়ের কীর্তিসমূহের প্রতি মুসলমানদের মনে কিছুমাত্র অনীহা অথবা ঘৃণা রয়েছে তাও মনে করার কোন কারণ নেই।[১৯১] মুসলমনরা এগুলোকে খোদার অনুদানসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে না এবং নিছক একটা সহায়ক ও বিনোদনমূলক উপাদানই মনে করে। অথবা এগুলো হচ্ছে পথিকের চলার পথে সহজাত আয়েশ ও বিশ্রাম লাভের উপকরণ মাত্র, নিজেই কোন লক্ষ্য বা মন্‌জিল নয়।

১৯০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ২২৯

১৯১. একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ইসলামের তওহীদী চেতনা ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে কোন সাহিত্য ও শিল্পকলা আপত্তিকর বিবেচিত হলে সেটা ভিন্ন কথা। কেননা তাওহীদবাদী ও নৈতিক সাংস্কৃতিক দর্শনের ক্ষেত্রে কোন আপস করতে পারে না।

বড়জোর এগুলো উদ্দেশ্য লাভে ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে সাহায্যকারী মাত্র। মুসলমানরা এই সাহায্য ও আরাম-আয়েশের পূজারী আদৌ নয়। এ ধরনের কাব্য-সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকলামূলক দুর্লভ সম্পদকে দুটি দিক দিয়ে সাহায্যকারী ও বিনোদনমূলক পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। বিশেষত কাব্য-সাহিত্য ও স্থাপত্যশিল্প উভয় দিকেই গণ্য হতে পারে; অর্থাৎ তা যেমন সাহায্যকারী, তেমনি বিনোদনমূলকও।[১৯২]

৪.১১.৩ বিশ্ব মানবতার সার্বিক ও সামাজিক কল্যাণ করার মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তোষ লাভই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য

সমাজবদ্ধ মানব সমষ্টির মধ্যে মুসলিম জাতির লক্ষ্য, পথ-প্রদর্শক ও আলোক-বর্তিকা এক ও অভিন্ন। মহান আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের পথ-প্রদর্শক। তাদের অগ্রগতি সাধিত হয় আল্লাহ্‌র কালাম কুরআন মজীদের নিষ্কলংক আলোকের দিগন্তপ্লাবী উজ্জ্বলতায়। ফলে কুরআনের উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থার প্রতিফলনে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির উন্মেষ ঘটে কেবল তা-ই হতে পারে ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলমান নামধারী লোকেরা অতীতে কোন এক সময় যে সংস্কৃতি আপন করে নিয়েছিল অথবা ভিন্নতর আদর্শানুসারী জীবন যাত্রার ফলে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, ইসলামী সংস্কৃতি বলতে তা বুঝায়না কখনো। ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব-মানবতার সার্বিক ও সামষ্টিক কল্যাণ।[১৯৩]

মূলত: মানবতার যথার্থ কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যেই ইসলামের ঐকান্তিক চেষ্টা। ইসলাম মানুষের মন-মগজ ও যোগ্যতা-প্রতিভাকে এরই সাহায্যে পরিচ্ছন্ন ও পরিপুষ্ট করে তুলতে সচেষ্ট।

---

১৯২. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

এই বিকাশমান ধারাবাহিকতায় এমন কোন পরিবর্তন বা পর্যায় যদি এসে পড়ে, যা কুরআন মাজীদ বা রাসূলের সুন্নাহ অনুমোদিত নয়, তাহলে বুঝতে হবে, সে পরিবর্তন বা পর্যায় ইসলামের মধ্য থেকে সূচিত হয়নি, তার উৎস রয়েছে বাইরে। তাই তা ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন ধারার প্রতিফলন নয়। সে কারণে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী লোকেরা তা গ্রহণও করতে পারে না এবং তা বরদাশত করে নেয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা তার পরিণতিতে মুসলিম জনতা সার্বিকভাবে ধ্বংস, বিপর্যয় ও সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।[১৯৪]

৪.১১.৪ মূর্তি ও ভাস্কর্যের বিষয়ে ইসলামের আপত্তি অযৌক্তিক নয়

শিল্পকলা নামে পরিচিত একালের মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণসহ কয়েক ধরনের সৃষ্টিকর্ম ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। কেননা মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে যে প্রতিমা-পূজা ও মুশরিকী ভাবধারা নিহিত মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ তারই চরিতার্থতা ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রথমটির সঙ্গে রয়েছে দ্বিতীয়টির পূর্ণ সাদৃশ্য। এ কারণে শিল্পকলার আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানাদিকে নির্মল ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা মানব জাতির উৎকর্ষ ও কল্যাণ সাধনের জন্যে অপরিহার্য। এই দুনিয়ার জীবনকে কেবল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, রূপ-শোভামণ্ডিত ও চোখ-ঝালসানো চাকচিক্যে সমুজ্জল করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হতে পারে না। মানব জীবনকে ধন্য ও সুসমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে ইসলামী সংস্কৃতি অবলম্বিত পথ ও পন্থা এবং অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর।[১৯৫]

সংস্কৃতির কোন কোন উচ্চতর নিদর্শন ও প্রতীক, তা যতই উন্নত মানসম্পন্ন হোক না কেন, পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল সংস্কৃতির দর্পন হতে পারে না। কতিপয় ব্যক্তির এরূপ সৃষ্টিকর্ম অধিকাংশ

---

১৯৪. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

১৯৫. যুবাইর মুহাম্মদ ইহসানুল হক, "চিত্রাংকণ ও ভাষ্কর্য: ইসলামী দৃষ্টিকোণ", *মাসিক পৃথিবী*, সংখ্যা ৮, বর্ষ ২৮, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ৩৯

লোকের মহৎ কীর্তি রূপে গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেননা তাদের প্রধান অংশই পশ্চাদপদ, দীন-হীন ও নিম্নমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। অতএব, কথিত শিল্পকর্মকে অধিকাংশ লোকের মহৎ কীর্তি নয়; বরং হীন মন-মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ রূপে গণ্য করতে হবে।[১৯৬]

পাশ্চাত্যের লোকেরা জীবন্ত মানুষের মূল্যায়ন বাদ দিয়ে মৃত মানুষ বা ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি কতটা আসক্ত হয়েছে তার সুন্দর একটি বর্ণনা মওলানা আব্দুর রহীম তার গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এভাবে: "পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকায় একটা প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট বাগ্-বিতণ্ডা চলেছিল। প্রশ্নটি ছিল এই, একটি কক্ষে যদি একটি নিষ্পাপ শিশু থাকে আর সেখানেই এক মূল্যবান, দুর্লভ ও অনন্য গ্রীক ভাস্কর্য প্রতিমা থাকে; আর হঠাৎ কক্ষটিতে আগুন ধরে যায় এবং সে আগুন গোটা কক্ষটিকে গ্রাস করে ফেলে আর সময়ও এতটা সামান্য থাকে যে, তখন শিশুটিকে রক্ষা করা যেতে পারে, না হয় ভাস্কর্যের নিদর্শনটি, তখন এ দু'টির মধ্যে কোনটিকে বাঁচানোর জন্যে চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়-মানব শিশুটিকে কিংবা ভাস্কর্য শিল্পটিকে? এই প্রশ্নটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর জনগণ যে জাবাব দিয়েছিল তা ছিল মানব শিশুটির পরিবর্তে ভাস্কর্যটিকে রক্ষা করার পক্ষে।"[১৯৭] সুতরাং এ থেকে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে মানব শিশুটির প্রতি তাদের চরম উপেক্ষা প্রদর্শন এবং ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই জনমতকে কি কোনক্রমে বিবেক সম্মত ও যথার্থ বলে মেনে নেয়া যায়? নিঃসন্দেহে তা যায় না নিম্নোক্ত কারণে:

১. যে শিশুটিকে একটা নিষ্প্রাণ-নির্জীব প্রস্তর মূর্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জ্বলে-পুড়ে মরার জন্য ছেড়ে দেয়া হল সে বেঁচে থাকলে হয়তো বা একদিন মানব সমাজের এক বিরাট

১৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩০
১৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩১

কল্যাণ সাধন করতে পারতো। তার দ্বারা প্রস্তর মূর্তির চাইতেও অনেক অনেক বেশি মূল্যবান ও দুর্লভ জিনিস সৃষ্টিও হতে পারত।

২. প্রস্তর মূর্তিটি সভ্যতার খুবই ক্ষুদ্র ও নগণ্য অংশ মাত্র। সেটি জ্বলে-পুড়ে ভষ্ম হয়ে গেলে মানবতার এমন কি ক্ষতি সাধিত হতো?

৩. নৈতিক মুল্যমানের দৃষ্টিতে এ প্রস্তর মূর্তিটি খুবই গুরুত্বহীন একটি বস্তু অথচ সংস্কৃতিতে নৈতিক মূল্যমানের ভূমিকা অত্যন্ত প্রকট ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৪.১১.৫ মানুষের সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহর সৃষ্টিকে মূল্যহীন ভাবা যায় না

উপরের ঘটনায় দেখা গেল যে পাশ্চাত্য বিশ্বে মানুষের তুলনায় প্রস্তর মূর্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর প্রস্তর মূর্তির তুলনায় মানুষ অতীব তুচ্ছ-মূল্যহীন। পাশচাত্য চিন্তাবীদদের এ রকমের মনোভাবের ফলে মূর্তি পূজার একটা নবতর সংস্করণ প্রসার ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ অবস্থা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। ইসলাম মানবতার এক উজ্জল ভবিষ্যতের জন্যে কাজ করে। মানুষের কোন মূল্যবান শিল্পকর্মের জন্যে একটা মহামূল্য মানব সন্তানের জীবন উৎসর্গ করা ইসলামে এ দৃষ্টিতে মেনে নেয়া যায় না। মানুষের দুর্লভ কীর্তির প্রতি এই আসক্তি ও ভক্তি কার্যত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যখন নিজের চিন্তা-বিশ্বাসকে খোদায়ী বিধান হতে স্বতন্ত্র ও নিঃসম্পর্ক করে নেয়, তখন তার ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি সীমাহীন হয়ে যায়। তখন চূড়ান্ত ধ্বংসই হয় তার অনিবার্য পরিণতি। এই দৃষ্টিকোণের ধারকরা বলেন, শিল্প-সৌন্দর্য ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। প্রাচীন মানব সভ্যতা পতনের মুখে। একারণেই ভাস্কর্যের নিদর্শনটিকে রক্ষা করা অপরিহার্য। কেননা অতীতের দুর্লভ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি কিছুতেই

Dhaka University Institutional Repository

উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু এ যুক্তিতে মানুষের সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে মূল্যহীন ভাবা যায় না।[১৯৮]

৪.১১.৬ ইসলামী সংস্কৃতি দ্বীনের সর্বাত্মক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত

ইসলামের কল্যাণমূলক দৃষ্টিকোণ ব্যক্তির অন্তরে একদিকে শুভেচ্ছা ও শুভাকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে অনুতাপ ও তিরস্কারের ভাব জাগ্রত করে। আর এটাই হচ্ছে সাফল্য ও সার্থকতা লাভের প্রধান উপায়। যাকাতের মাধ্যমে এই চেতনা কার্যকর হয় মূলধনের হ্রাস-প্রাপ্তির ফলে। আর তার ফলেই মূলধন পবিত্র ও ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে। ইসলাম জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে সমানভাবে পরিব্যাপ্ত। তাতে ধর্ম চর্চা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ ও পার্থক্যই স্বীকৃত। বৈরাগ্যবাদ বা দুনিয়া ত্যাগের কোন অনুমতি বা অবকাশ ইসলামে নেই। প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে বহুমূখী কর্তব্য ও দায়িত্ব। সফল ও সার্থক কার্যাবলী সংঘটিত হয় সে সব সমর্পিত কর্মক্ষমতার দরুন যা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি দ্বীনের সর্বাত্মক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। তা বাস্তব, অবিশ্রিত ও সারবত্তাপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী ব্যবস্থা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তা অবশ্য অনুসরণীয়। কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহের নির্দিষ্ট সময়টুকুতে তার অনুসরণ নিতান্তই অর্থহীন।[১৯৯]

৪.১১.৭ আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতাকে অস্বীকার করা অসম্ভব

ইউরোপে সংঘটিত হওয়া ফরাসী ও রুশ বিপ্লবে স্রষ্টার কোন স্থান স্বীকৃত নয়। পূর্ববর্তী গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ হল বৈষয়িক জীবন ও রাজনীতিতে সৃষ্টিকর্তার কোন অংশ

---

১৯৮. মুহাম্মদ মতিউর রহমান "ইসলামী সংস্কৃতি", Bmjvgx dvD‡Ûkb cwÎKv, ঢাকা: ইলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৭, পৃ-৮৯

১৯৯. মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২; মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯, যুবাইর মুহাম্মদ ইহসানুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১

ছিল না। কিন্তু এ বিশ্বভূবনে এবং মানব সমাজে প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি নিমিষে এমন অসংখ্য ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে যে বিষয়ে কোন ভবিষ্যৎবাণী কোন মানুষ করতে সক্ষম নয় । এ ধরনের ঘটনাবলীর আকস্মিক আত্মপ্রকাশ মানুষের সব পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনাকে চুরমার করে দেয়। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে সে সবের কি সান্তনামূলক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়? নি:সন্দেহে যায় না। সুতরাং যতবড় যুক্তিবাদীই হোক না কেন কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যতই শীর্ষে মানুষজাতী অবস্থান করুক না কেন মহান আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে পারবে না।

৪.১১.৮ ব্যক্তিবাদের উপর সামষ্টিকবাদের প্রাধান্য

অত্যন্ত দু:খজনক হলেও সত্য যে মধ্যযুগীয় ধর্মচর্চা ছিল বিস্ময়কর ঘটনাবলীর গল্প-কাহিনী, রসম-রেওয়াজ, উপাসনা-আরাধনা ও উপাসনালয়-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানাদি সমন্বিত। জগতের রূঢ় বাস্তবতা, বৈষয়িক তৎপরতা ও ব্যতিব্যস্ততা থেকে পলায়নের পথ হিসেবেই তা অবলম্বিত হতো। সেকালের বিজ্ঞান মনস্ক লোকদের অভিমত ছিল, বাস্তব জীবনকে অবশ্যই ধর্মহীন বা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হতে হবে। আর কৃচ্ছসাধক ও একনিষ্ঠ পূজারীদের তা-ই হচ্ছে রক্তিম স্বপনের পরাকাষ্ঠা। এ দৃষ্টিকোণের মারাত্মক প্রভাব আজ দুনিয়ার সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত। হীন স্বার্থের কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে মানুষ আজ সমাজের সাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। ক্ষমতাবানরা মানুষের মৌলিক ও বৈধ অধিকার হরণ করেছে নিষ্ঠুরভাবে। জনগণের রক্ত পানি করে উপার্জন করা বিত্ত-বৈভবের ওপর চলছে নির্মম লুটপাটের পৈশাচিকতা। সব দুষ্কর্মের পশ্চাতে ব্যক্তি-স্বার্থই ছিল প্রধান নিয়ামক। কিন্তু যারা ভালো মানুষ, সত্যই তারা ব্যক্তি-স্বার্থকে সামষ্টিক স্বার্থের জন্যে উৎসর্গ করে। কেননা তাতেই নিহিত রয়েছে মানবতার বৃহত্তর কল্যাণ ও সাফল্য। ব্যক্তিবাদের ওপর সমষ্টিবাদের প্রাধান্য এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ হচ্ছে চরম

লক্ষের নিকটবর্তী পর্যায়। নৈতিক ভিত্তিসমূহ তখন হয় পাকা-পোক্ত, অবিচল ও অনড়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনী ও নিত্য উদ্ঘাটন তার ভিত্তিমূলের ওপর কোন প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।[২০০]

৪.১১.৯ ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীন ভিত্তিক

মূলত: ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীন-ভিত্তিক। এই দ্বীনী ভাবধারাই ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণ-শক্তি ও আসল নিয়ামক। দ্বীনী ভাবধারাশূণ্য সংস্কৃতি কখনও ইসলামী পদবাচ্য হতে পারে না। এখানে প্রতিটি কাজ, পদক্ষেপ বা অনুষ্ঠানের বৈধতা দ্বীন-ইসলাম থেকে গ্রহণীয়। কেননা তা মহান আল্লাহ্র দেয়া বিধি-বিধান ও নির্দেশনার সমষ্টি। জীবনের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি স্তরে ও প্রতিটি চড়াই-উৎরাইয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনাকে পথিকের যাত্রা সুগম করে ও তাকে অগ্রগমনের প্রেরণা দেয়। বিশ্বনবীর বাস্তব জীবনে ও কর্ম-ধারায় তা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। এতে স্পষ্টত প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি নিছক কতকগুলো আকীদা-বিশ্বাসেরই সমষ্টি নয়। বরং বাস্তব কর্ম সম্পাদনই ইসলামী সংস্কৃতির আসল কথা আর এর ফলে মানবজাতীর চূড়ান্ত সাফল্য ও সার্থকতা লাভ সম্ভবপর হয়ে উঠে।[২০১]

---

২০০. মওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২; মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯; যুবাইর মুহাম্মদ ইহসানুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২০১. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৪.১১.১০ ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে মানব জাতিকে পুত:পবিত্র করার ও যথার্থ কল্যাণ করার সংস্কৃতি

ইসলামী সংস্কৃতি ও মানব জীবনে তার কার্যকারিতা উপলব্ধি করার জন্যে আরও একটা দিক দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কুরআন মজীদে (تزكية) 'তায্‌কিয়া' শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ভাষায় ঐ শব্দটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য আমাদেরকে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রকৃত ধারণা (conception) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তিনি বলেছেনঃ (تزكية) 'তায্‌কিয়া' অর্থ পবিত্র হওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ করা, অন্যায় ও কদর্যতা পরিহার করে চলা, যার ফলে আত্মার শ্রীবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রাচুর্য সাধিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

"সফলতা পেল সে যে আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করল।"[২০২] একারণে যাকাত শব্দের অর্থ কখনও বলা হয় প্রবৃদ্ধি, অধিক্য বা প্রাচুর্য; আর কখনও করা হয় পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও ময়লা-আবর্জনা দূর করা। কিন্তু সত্য কথা হল যাকাত শব্দে এ দু'টি অর্থেরই সমন্বয় ঘটেছে। অন্যায় ও ময়লা দূর করা যেমন এর অর্থ, তেমনি কল্যাণ ও মঙ্গল বৃদ্ধি করাও এর মধ্যে শামিল।[২০৩] এ ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়, কুরআনে যে (تزكية النفس) 'তায্‌কিয়ায়ে নফস' (আত্মশুদ্ধি)-এর কথা বলা হয়েছে, তাতে এক সঙ্গে কয়েকটি কথা নিহিত রয়েছে। যথা:

১. তায্‌কিয়ার আসল অর্থ মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতি বিধান করা, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করা, সতেজ বা ঝালাই করা, ময়লা-আবর্জনা ও পংকিলতামুক্ত করা এবং তাকে পূর্ণ পরিণত করে তোলা। দেহ ও আত্মা, মন ও মগজ, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণের যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্যের দরুন জীবন পূর্ণত্ব লাভ

২০২. আল কুরআন, ৯১:০৯।
২০৩. যাকাত শব্দের বিস্তারিত অর্থ দেখার জন্যে অত্র অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় (ইসলাম: সংক্ষিপ্ত পরিচয়) দেখা যেতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারে, তা অর্জনের সঠিক চেষ্টা-সাধনাই আত্মার তায্‌কিয়া বা পরিশুদ্ধতা। আর ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্যও তা-ই।[২০৪]

২. জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মানে সর্বপ্রকারের অন্যায়, অশ্লীলতা ও পংকিলতা থেকে তাকে মুক্ত ও পবিত্রকরণ (Purification)। কেননা এছাড়া জীবনের সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন অসম্ভব। বাস্তবতার দৃষ্টিতেও এ জিনিসটি জীবনের শোভা-সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব ও মহিমা-মাহাত্ম্য অর্জনের আগেই অর্জিত হওয়া উচিত। পবিত্রকরণ ও সংস্কার সাধন জীবনের 'তায্‌কিয়া' ও পূর্ণত্ব বিধানের প্রাথমিক কাজ। এইসব কারণে অনেক সময় পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকরণ এবং সংস্কার সাধনের অর্থেও ব্যবহৃত হয় এই তায্‌কিয়া শব্দ। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"মানব প্রকৃতি এবং সেই সত্ত্বার শপথ, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন; অতঃপর তাকে পাপাচার ও সতর্কতা (তাকওয়া) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের (আত্মার) পবিত্রতা বিধান করল আর ব্যর্থ হল সে, যে তাকে খর্ব ও গুপ্ত করল।"[২০৫] এ আয়াতে মানুষের গোটা সত্ত্বাকেই সামনে রাখা হয়েছে। এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াতেও মানুষের সমগ্র সত্ত্বার পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার সাধন এবং উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা বিধান অর্থেই এ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

---

২০৪. মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪; যুবাইর মুহাম্মদ ইহসানুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯; মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিশমীতি, *ইসলামী জীবন বিধানে সংস্কৃতির অবস্থান*, ঢাকা: আহসানিয়া বুক হাউজ, ১৯৯৭, পৃ.১০৩

২০৫. আল-কুরআন, ৯১:৭-১০

৩. আত্মার তায্‌কিয়া সম্পর্কে কুরআন যে ধারণা পেশ করেছে, তা হল Self-perfection-এর ধারণা। এর ভিত্তি দু'টি জিনিসের ওপর সংস্থাপিত। একটি হচ্ছে মানুষের রূহ বা আত্মা তথা মন ও মগজের সমস্ত শক্তির একটা সমন্বিত ও সুসংহত রূপ। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার সর্বোত্তম ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর নিদর্শনরূপে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিকর্মে মানুষের নানাবিধ যোগ্যতা ও প্রবণতায় এক উচ্চ মানের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে। এ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্তার আত্মা ও বস্তু, জ্ঞান ও বিবেক, বাহির ও ভিতরের মাঝে আল্লাহ্ কোন বিরোধ বা বৈষম্যকে স্বীকার করেন না। এসবের মাঝে গুরুত্বের দিক দিয়ে শ্রেণি-পার্থক্য রয়েছে বটে; কিন্তু সে শ্রেণিগুলোর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ স্বীকৃত নয়। একটির উৎকর্ষের জন্যে অপরটিকে অবলুপ্ত করা বা অবদমন (Suppression) করা জরুরী নয়; বরং একটি পূর্ণত্ব অপরটির উন্নয়নের জন্যে পরিপূরক।

এজন্যেই কুরআনের শিক্ষা হল এই কামনা করা,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

"হে আমার প্রতিপালক! আমাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গল দাও এই দুনিয়ায় এবং পরকালে জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।"[২০৬]

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, মানুষের সমগ্র সত্তার যুগপৎ উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য এবং কাম্য। এ সত্তার প্রতিটি অংশই মহামূল্য এবং তার সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ, পুনর্গঠন ও উন্নয়নই বাঞ্ছনীয়। দৈহিক উন্নতি এবং নৈতিক ও আত্মিক পূর্ণত্ব-এর প্রতিটিই নিজ নিজ সীমার মাঝে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও চিন্তা, মন ও মগজ, চরিত্র ও স্বভাব, সৌন্দর্যপ্রীতি ও সুরুচি-প্রবণতা এবং দেহ ও মনের সব দাবির ভারসাম্য পূরণ

---

২০৬. আল-কুরআন, ২:২০১

এবং সুসামঞ্জস্য সংস্কার সাধন ও পূর্ণত্ব বিধানকেই বলা হয় 'তায্‌কিয়া' এবং তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি। মনের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে দৈহিক সীমা লংঘন কিংবা দৈহিক চাহিদা পূরণে মনের তাগিদ উপেক্ষা করা ইসলামের সংস্কৃতি চেতনা ও দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু কোন বিশেষ মুহূর্তে এ দুটির মাঝে তারতম্য করা যদি অপরিহার্যই হয়ে পড়ে তাহলে দেহের পরিবর্তে মনের গুরুত্ব, বস্তুর তুলনায় আত্মার এবং প্রস্তর বা ভাস্কর্য অপেক্ষা মানুষের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।[২০৭]

মূলত: কুরআনের যেসব স্থানে (تزكية) 'তায্‌কিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব স্থানে সংস্কৃতি শব্দ বসিয়ে দিলে যেরূপ দাঁড়ায় ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণের বক্তব্য কিন্তু তাই। অন্য কথায়, কুরআনের 'তায্‌কিয়া' শব্দের যে ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হল তা-ই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারা।[২০৮] এভাবে মানুষের দেহ, আত্মা ও মনের পরিশুদ্ধ করণই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির দর্শন আর পুত: পবিত্র মানুষের আচরণগত বা বাহ্যিক প্রতিফলিত রুপ হচ্ছে সংস্কৃতি।

৪.১১.১১ সংস্কৃতিতে ইসলামের মৌলিক ভাবনা

ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বুঝায় উন্নতর মতাদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যমান। আর এর মূল ভাবধারা হচ্ছে সে সব মূলনীতি যার উপর ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামোর দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল। ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা হল একথা স্বীকার করা যে, মহান আল্লাহ্ তায়ালা গোটা বিশ্বের এক ও একক স্রষ্টা; তিনিই একমাত্র সার্বভৌম প্রভু। আরও বিশ্বাস

---

২০৭. সংস্কৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় বর্তমানে 'অপসংস্কৃতি' বলে একটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুবই মুশকিল। তবে সংস্কৃতির নামে যা কিছু মানুষের সুস্থ চিন্তা-ভাবনা, নৈতিকতা, রুচিবোধ, শালীনতা ইত্যাদিকে কলুষিত করে তাকেই অপসংস্কৃতি বলা যেতে পারে।
২০৮. মওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

করা যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং কুরআন মাজীদ হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র কালাম যা মানব জাতীর জন্যে হেদায়েতের সর্বশেষ বিধান।

৪.১১.১১.১ সাম্য ও সমতার সংস্কৃতি

ইসলামী মতাদর্শে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস হল সর্বপ্রথম এবং সার্বিক মৌলিক বিষয়। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই (لا إله إلا الله) এই ঘোষণাটি হচ্ছে তওহীদের সার-নির্যাস। অন্য কথায় আল্লাহ্‌কে প্রকৃত মা'বুদ রূপে মেনে নেয়া এবং তাঁরই নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব (সার্বভৌমত্ব) স্বীকার করার পর মানুষ দুনিয়ায় খোদায়ীর দাবিদার অন্যান্য দেব-দেবী, অবতার, রাজা-বাদশাহ এবং সম্পদ-দেবতার দাসত্বের অভিশাপ থেকে চিরকালের তরে মুক্তি লাভ করতে পারে। তাওহীদের এ আকীদার দৃষ্টিতে ইসলামী সংস্কৃতি বংশীয় পার্থক্য, বর্ণগত বৈষম্য-বিরোধ, আর্থিক অবস্থাভিত্তিক শ্রেণি-পার্থক্য, ভৌগোলিক সীমাভিত্তিক শত্রুতা প্রভৃতিকে আদৌ বরদাশত করতে পারেনা অথচ এসবের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতা। মানুষে মানুষে যৌক্তিক ও সঠিক সাম্যই হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে ইসলামী সংস্কৃতির একমাত্র দর্শন। আল্লাহ্‌কে এক ও লা-শরীক সার্বভৌম বলে স্বীকার করা এবং সকল মানুষকে মূলগতভাবে সমান অধিকার সম্পন্ন মেনে নেয়া, শুধু মৌখিকভাবে মেনে নেয়াই নয়, বাস্তবক্ষেত্রেও সে অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন পরিচালিত করাই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মবাণী। ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে একজন শ্রমজীবীও তেমনি সম্মানিত যেমন সম্মানীয় কোন কারখানার মালিক। নিগ্রো মুষ্ঠিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলীকে ও শ্বেতাঙ্গ চিন্তাবিদ মুহাম্মদ মার্মাডিউক পিক্‌থল অভিন্ন শ্রদ্ধার পাত্র।[২০৯]

৪.১১.১১.২ মৌলিক চাহিদা পূরণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা

ইসলামী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন অবাধে পূরণের অধিকারী। এ অধিকার সত্যিকারভাবে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করাই

২০৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

ইসলামী সংস্কৃতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। কাজেই ইসলামী সমাজে যারা ক্ষমতাবান, ধনী কিংবা উচ্চ পর্যায়ে আসীন তাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়। কেননা এটা আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের উপর অবধারিত দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশের কোন সুযোগ নেই।

৪.১১.১১.৩ দেহ ও আত্মার ভারসাম্য বিধান করা

ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবন অবিভাজ্য, বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী অংশ বা বিভাগে তাকে ভাগ করা যায় না। মানুষের সত্যিকার উন্নতি নির্ভর করে দেহ ও আত্মা তথা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের একক কল্যাণের ওপর। দেহ ও আত্মার বিরোধ মিটিয়ে একাকার করে দেয়াই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য, যদিও দুনিয়ার অনেক সংস্কৃতিরই লক্ষ্য এ দু'য়ের মাঝে বিরোধ ও দ্বৈততাকে বজায় রাখা এবং একটি নস্যাৎ করে অপরটির পরিতৃপ্তি সাধন। বর্তমান বিশ্ব Hedonism বা ভোগবাদী ও আনন্দবাদী চিন্তা-দর্শন কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে আত্মার দাবিকে অস্বীকার করে এবং আত্মার মর্যাদা ও প্রবণতাকে অমর্যাদা করে কেবল দৈহিক সুখ ভোগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। তাদের মূল মন্ত্র Pleasure is the highest good- 'সুখ ভোগ বা আনন্দ লাভই শ্রেষ্ঠতর কল্যাণ।' কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি দেহ ও আত্মার মাঝে পরিপূর্ণভাবে সাম্য রক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্প। এর কোনটিকে অস্বীকার করা কিংবা একটি দিকের ওপর আরেকটির সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং সেদিকেই গোটা জীবনকে পরিচালিত করা ইসলামের সাংস্কৃতিক আদর্শের পরিপন্থি[২১০]। এ ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতিবাদীদের লক্ষ্য করেই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

২১০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

“এমনিভাবেই তোমাদেরকে আমরা মধ্যম নীতির অনুসারী করে বানিয়েছি, যেন তোমরা সমগ্র মানুষের পথ-প্রদর্শক হতে পার এবং রাসূল হতে পারে তোমাদের পথ-প্রদর্শক।”[২১১]

৪.১১.১১.৪ ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতি

ইসলাম যেহেতু ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাই এ ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতির অনুসারীরাই বিশ্বামানবের নেতৃত্বের অধিকারী হতে পারে সংস্কৃতি ও সভ্যতা উভয় দিক দিয়েই। আর একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতিই পারে এক ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতির জন্ম দিতে। সে কারণেই ইসলামী সংস্কৃতিতে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। আবার এতে কেবল দুনিয়ার কার্জ-কর্মকেই জীবনের চরম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করারও সুযোগ নেই। বরং ইসলামী সংস্কৃতির শিক্ষা হল মানুষ দুনিয়ার জীবনকে সঠিক পন্থায় এবং পুরোমাত্রায় পরিচালনা করে আল্লাহ্ তায়ালার সন্তোষ লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে আর এটাই হল আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি মানুষের একমাত্র কাজ। ইসলামী সংস্কৃতি এ উভয় দিকে নিহিত অযৌক্তিক প্রবণতা ও অবৈজ্ঞানিক ভাবধারাকে পরিহার করে এবং এ দু’য়ের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করে এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে চায়। অর্থাৎ দুনিয়ায় থেকেও দুনিয়াবিমুখ হওয়া এবং দুনিয়াবিমুখ হয়েও দুনিয়া ভোগ করা এই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মবাণী। রসূলে করীম (সা.) একথাই বুঝিয়েছেন তাঁর এ উক্তি দিয়ে “দুনিয়ায় বসবাস কর যেন তুমি পথ অতিক্রমকারী এক মুসাফির।”[২১২]

৪.১১.১১.৫ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও সমাজের সংশোধন হতে হবে সমান্তরালভাবে

---

২১১. আল কুরআন, ২: ১৪৩

২১২. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

ইসলামী সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ-সংস্থার পূর্ণত্ব বিধান। প্রধানত দুটি দিক দিয়েই ইসলামী সংস্কৃতির ধারণা (conception) অন্যান্যদের ধারণা থেকে ভিন্ন ও বিশিষ্ট। একটি এই যে, ইসলামের উপরিউক্ত লক্ষ্য ইসলামী শরী'আতের সীমার মাঝে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিচালনাধীনে অর্জিত হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়টি হল এ পর্যায়ে যা কিছু চেষ্টা-সাধনা, আয়োজন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সব হতে হবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারেই মহান আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের চেষ্টা করতে হবে। মওলানা আব্দুর রহীম যথার্থই বলেছেন: "কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে ব্যক্তির সংশোধন, পুনর্গঠন ও পূর্ণতা বিধানের জন্যে সমাজ ও সমষ্টির সংশোধন ও পুনর্গঠন একান্তই জরুরী। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি প্রায় অসম্ভব। অধিকাংশ ব্যক্তি-সত্তার সংস্কার, সংশোধন ও পূর্ণত্ব বিধান গোটা সমাজের সংশোধন ও সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল। শেষের কাজটি না হলে প্রথমটি আদৌ সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সমাজ সংশোধন ও সংস্কার প্রচেষ্টাই ব্যক্তি জীবনে এনে দেয় সংশোধন ও সংস্কারের সুযোগ । তাই এ প্রচেষ্টা হতে হবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক যেমন, সমাজ কেন্দ্রিকও তেমনি।"[২১৩]

4.11.11.6 Bmjvgx ms¯‹…Z I gmwjg ms¯‹…Z: mvgÄm¨ I ˆecixZ¨

এই প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণার অপনোদন করা প্রয়োজন। কিছু লোক মনে করে যে মুসলমান নামধারী ব্যক্তি বা সমাজ যেসব অনুষ্ঠান ও ভাবধারাকে সংস্কৃতি রূপে গ্রহণ করেছে তারই নাম ইসলামী সংস্কৃতি; কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই মুসলিম সংস্কৃতি নামে অভিহিত হতে পারে, যার সন্ধান পাওয়া যায় কুরআন ও সুন্নাতে কিংবা যার সমর্থন মেলে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের কাছ থেকে এবং যার লক্ষ্য বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন। মুসলিম সমাজে এমন কোন ভাবধারা বা সংস্কৃতি যদি দেখা দেয়, কুরআন ও

২১৩. প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৮

সুন্নাহ্ যার অনুমতি দেয় না, তাহলে বুঝতে হবে, তা ইসলামী সংস্কৃতি নয়, তা মুসলমানদের নিজস্ব জিনিসও নয়; বরং তা মুসলিম সমাজের বাইরে থেকে আমদানী করা জিনিস। তা গ্রহণ করে মুসলমানরা নিজেদের ধ্বংসেরই ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া কোন কল্যাণই তাতে নেই, থাকতে পারে না।[২১৪]

৪.১১.১১.৭ ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে কল্যাণদৃষ্টির সংস্কৃতি

Fine Arts বা ললিতকলার যেসব ধরণ বা উপকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ, তা নিষিদ্ধ এই কল্যাণদৃষ্টির কারণেই। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে চায় সুন্দর সুষমামণ্ডিত, সবুজ-সতেজ, আনন্দমুখর ও উৎফুল্ল করে গড়ে তুলতে; কিন্তু এ সবই হতে হবে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে, মানুষের সঠিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে।

মওলানা আব্দুর রহীমের মতে, সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শন মানবতাবাদী নয় এবং তা মানুষের প্রকৃত কল্যাণের জন্যে নিবেদিত নয়। এ কারণে পাশ্চত্য দর্শনে আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি মানব সন্তানের চেয়ে নিষ্প্রাণ প্রস্তরে মূর্তির মূল্য অনেক বেশি। এ ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্তের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টিতে মানুষের চাইতেও অধিক প্রিয়, অধিক মূল্যবান এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটি ভাস্কর্য শিল্প প্রস্তরনির্মিত একটি নিষ্প্রাণ প্রতিমা। এমনিভাবে নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের যত অনুষ্ঠানই আজ সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নামে মানবসমাজে প্রচলিত রয়েছে, তার সবক'টিতেই যে মনুষ্যত্বের অপমান, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ মানবতার ধ্বংসই এসবের একমাত্র পরিণতি। আর ইসলামের দৃষ্টিতে যা কিছু মানবতা বিধ্বংসী তথা মানব চরিত্র বিকৃতকারী, তা হচ্ছে মানুষের

২১৪. মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮১-৮২

পশুবৃত্তির চরিতার্থতা। চিত্তবিনোদন ও আনন্দ বিধানের যত বড় আয়োজনই হোকনা কেন, তা সংস্কৃতি নামে অভিহিত করার মতো ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।[২১৫]

৪.১১.১১.৮ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মূলে ভাবধারাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে কথাটি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে মানুষ নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে। এ সীমা ও জীবন-লক্ষ্য শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন সত্যের ধারক ও বাহক। অতএব এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহ্ তায়ালার গুণাবলীকে-স্থায়ী মূল্যমানের উৎসে নিজের মাঝে প্রতিফলিত করে নিতে পারে। অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল দর্শন হল, এ জীবন কয়েকটি মৌল উপাদানের উদ্দেশ্যহীন সংমিশ্রণের ফলে অস্তিত্ব লাভ করছে। এর কোন লক্ষ্য নেই । এসব মৌল উপাদানের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কিছুই নেই, আছে শুধু অন্তহীন শূণ্যতা।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সংস্কৃতি মানব জাতীর মাঝে এমন শৃঙ্খলা গড়ে তোলে যাতে করে ব্যক্তি-চরিত্র ও সমাজ-সংস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত ভারসাম্যপূর্ণ গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটতে পারে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে জীবন যেহেতু একটা আকস্মিক ঘটনা, এজন্যে তাদের কাছে দুনিয়ায় কোন স্থায়ী মূল্যমান (permanent values) নেই, দুনিয়ার কর্ম জীবনের উপর ভিত্তি করে প্রতিফলন দানের বা প্রতিফল পাওয়ার কোন ব্যবস্থা মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নেই। ইসলামী সংস্কৃতি ব্যক্তির মাঝে এমন যোগ্যতা ও প্রতিভা জাগিয়ে দেয়, যার কারণে প্রকৃতি জয়ের ফলাফল সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে। অপরদিকে পশ্চিমা সংস্কৃতির দর্শনে প্রকৃতি জয়ের

---

২১৫. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, ২৩৯

ফলাফল থেকে সাধারণ মানুষ অধিকাংশ সময়ে বঞ্চিত থাকে। পশ্চিমা সংস্কৃতি-দর্শনে যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির সুবিধা হয় তা অপর ব্যক্তি বা জাতির জীবন ধ্বংস করেই হোক না কেন তা-ই তাদের জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিতে ভালো। পক্ষান্তরে যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির অসুবিধা বা স্বার্থহানি হয়, তা-ই অন্যায়।[২১৬]

ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার একত্ব ও মিল্লাতের অভিন্নতার ভিত্তিতে এক ব্যাপকতর ঐক্য ও সম্মিলিত ভাবধারা গড়ে ওঠে। এর ফলে মানব সমাজ থেকে সব রকমের জোর-জবরদস্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, জুলম-শোষণ ও হিংসা-দ্বেষ দূরীভুত হয়ে যায় এবং পরস্পরের প্রতি আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে। পশ্চিমা সংস্কৃতি যেহেতু ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখবাদী দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে, সেজন্যে এরই ফলে বিশ্বের ব্যক্তি ও জাতিগুলোর মাঝে পাস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, হিংসাদ্বেষ, রক্তারক্তি ও কোন্দল-কোলাহল অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরই কারণে চারদিকে চরম বিপর্যয় ও অশান্তি বিরাজমান থাকে, শাসক ও শাসিত, বিজয়ী ও বিজিতের বিভিন্ন শ্রেণি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।[২১৭]

ইসলামী সংস্কৃতিবান প্রতিটি ব্যক্তি অন্য মানুষের জন্যে বেঁচে থাকে। এ কারণে শ্রেণিভেদ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবন-জীবিকা ও যাবতীয় প্রয়োজন আপনা থেকেই পূরণ হতে থাকে। পশ্চিমা সংস্কৃতি জাতিগুলোকে প্রকৃতি-জয়ের সব তত্ত্ব, তথ্য ও গোপন রহস্য থেকে সম্পূর্ণ গাফিল বানিয়ে রাখে আর অন্যান্য জাতিকে বঞ্চিত রাখে সব প্রাকৃতিক কল্যাণ, সম্পদ ও

২১৬. প্রাগুক্ত
২১৭. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

সম্পত্তি থেকে। এ সংস্কৃতি সব কিছুকে নিজেদের একচেটিয়া ভোগ-দখলে রেখে দেয় এবং বিজয়ী জাতির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দেয়।[২১৮]

৪.১১.১১.৯ জীবনাদর্শ ও জীবন-দর্শনের ভিন্নতার কারণে সংস্কৃতির ভিন্নতা আসে

দুনিয়ার প্রায় সব মানুষেরই একটা জীবন দর্শন রয়েছে। আর জীবন দর্শনে যেহেতু পার্থক্য রয়েছে, সেই কারণে সংস্কৃতি বিষয় ধারণা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতেও মৌলিক পার্থক্য হওয়া অবধারিত। এখানে স্মর্তব্য যে, জীবন-দর্শন উদ্ভুত হয় জীবনাদর্শ থেকে। জীবনাদর্শ যা, জীবন-দর্শনও তাই। আর দুনিয়ার মানুষের জীবনাদর্শ যেহেতু বিভিন্ন, তাই জীবন-দর্শনেও বিভিন্নতা স্বাভাবিক। জীবন-দর্শনের এই বিভিন্নতার কারণে সংস্কৃতিরও বিভিন্ন রূপ ও পরস্পর বৈসাদৃশ্য একান্তই অনিবার্য। বস্তুত প্রতিটি জীবন-ব্যবস্থাই তার নিজস্ব মানে ব্যক্তি ও সমাজ গঠন করে। তাই যে ধরনের মানুষ ও সমাজ গঠন তার লক্ষ্য সেরূপ মানুষ ও সমাজ গড়ে ওঠতে পারে যে সংস্কৃতির সাহায্যে, তা-ই সে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করে তোলে পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ করে এবং তার বিপরীত সংস্কৃতিকে প্রতিহত করে কার্যকর ব্যবস্থাপনার সাহায্যে।[২১৯]

৪.১১.১১.১০ জাতীয়তাবাদের জীবন দর্শন স্বার্থবাদিতার সংস্কৃতি

জাতীয়তাবাদ যাদের জীবনাদর্শ, তাদের সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত, আন্তর্জাতিকতা সেখানে সযত্নে পরিত্যক্ত। আবার জাতীয়তাবাদের ভিত্তিও বিভিন্ন রূপ। ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার সংস্কৃতিতে অন্য ভাষার প্রতি বিদ্বেষ তীব্রভাবে বর্তমান; আঞ্চলিক জাতীয়তায় অপর অঞ্চলের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এক স্বাভাবিক ব্যাপার।

---

২১৮. মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬
২১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪০

বর্ণভিত্তিক জাতীয়তার অবস্থাও অনুরূপ। সর্বোপরি জাতীয়তাবাদ একটা বস্তু-নির্ভর ব্যপার বলে সেখানে বস্তুর প্রাধান্য সর্বত্র। নির্বস্তুক (Abstract) আদর্শমূলক সংস্কৃতির সেখানে কোন স্থান নেই।

৪.১১.১১.১১ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রেও স্বার্থবাদিতার দ্বান্দ্বিক সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষণীয়

কেবল জাতীয়তাবাদেই নয়, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রেও অনুরূপ অবস্থাই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী সংস্কৃতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না; বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্তমান। একটি অপরটির মূলোচ্ছেদে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এভাবে চলছে এক সংস্কৃতির সাথে অপর সংস্কৃতির; এক সভ্যতার সাথে অপর সভ্যতার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। সেখানে সহযোগিতার পরিবর্তে অসহযোগিতা এবং শত্রুতাই বেশী বড় করে দেখা হয়।

৪.১১.১১.১২ ইসলামী সংস্কৃতির দর্শনে রয়েছে সত্যিকারের ভাল-মন্দের যাচাই-বাচাইয়ের ব্যবস্থা

ইসলামী আদর্শবাদীদের আছে সংস্কৃতির একটা ইসলামী ধারণা নির্মাণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে বর্জন ও গ্রহণের নীতি অবলম্বন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতির নামে চলমান যে কোন জিনিসকেই ইসলামী জনতা সংস্কৃতি বলে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

কেননা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ এবং একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই এর ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের মান (standard) সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে এবং পরিকল্পিত মানুষ ও সমাজ গঠনের উপযোগী সংস্কৃতি তাকে অবশ্যই গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে।

৪.১১.১১.১৩ বস্তুবাদী দর্শনের সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিকতার কোন স্থান নেই, আছে চিত্তবিনোদনের নির্ভরতা

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে পশুর উত্তরাধিকারী এক বিশেষ জীবমাত্র মনে করে; বিশ্বব্যবস্থাকে মনে করে খোদাহীন, স্বয়ম্ভু। তাই এই দর্শনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌কে মেনে চলার এবং আল্লাহ্‌র দেয়া কোন বিধান তথা ধর্মমত মেনে নেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা মানুষের নেই। আর মানুষ নিতান্ত পশু বলে তার কোন মূল্যবোধ (Sence of value) ও মূল্যমান থাকারও প্রয়োজন নেই। এই মৌলিক কারণেই সংস্কৃতি নিছক চিত্ত-বিনোদনের উপায় ও মাধ্যম বলে পাশ্চাত্য সমাজে বিবেচিত এবং যে সব অনুষ্ঠানে এই চিত্ত-বিনোদন পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে তা অবশ্য গ্রহণীয়। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে চিত্তের দাবির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সেখানে তো প্রতি মুহূর্ত ‘আরো চাই, আরো দাও’-এর দাবিই উচ্চারিত হতে থাকে। তাই

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেখানে নিত্য-নতুন ধরনের অভিনব ভঙ্গিতে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে জনগণের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করার চেষ্টা হয় অবিশ্রান্তভাবে।[২২০]

৪.১১.১১.১৪ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি হচ্ছে গান-বাজনা ও নৃত্য নির্ভরতা

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাথমিক উপকরণ হল গান-বাজনা ও নৃত্য। আসলে এগুলো প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও হিন্দু সমাজের ধর্মীয় পূজা-অর্চনার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বহুকাল থেকে চলে এসেছে। দেবতার সামনে সুন্দরী যুবতী রমণীর আরতি দান দেব-পূজারই এক বিশেষ অনুষ্ঠান। হাতে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে নৃত্যের তালে তালে মিষ্টি মধুর-কণ্ঠে গান গেয়ে গেয়ে দেবতার পদতলে অর্ঘ্যের ডালি সঁপে দেয়া হিন্দু সমাজের এক বিশেষ ধরনের পূজা অনুষ্ঠান। উত্তরকালে সংস্কৃতি-পূজারীরা এ পূজা অনুষ্ঠানকেই মন্দিরের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে বের করে এনে একে বিশাল হল ঘরে সুসজ্জিত ও সুউচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে দিল- যা ছিল দেবতার সম্মুখে নিজেকে পূর্ণমাত্রায় নিবেদিত করার একটা বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান, উন্মুক্ত মঞ্চে উপভোগ্য রূপে নিজেকে নিবেদন করার প্রধান মাধ্যম। অতঃপর নাচ-গান ও বাজনার এ অনুষ্ঠান মঞ্চের ওপর এসে ক্রমশ বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করতে করতে বর্তমান রূপ ধারন করেছে। একক নৃত্য, যুগলনৃত্য, বল নাচ, ফ্লোর-নাচ ইত্যাদি নানা বৈচিত্রময় নাচ-গানের সঙ্গে এসে মিশেছে নানা ধরনের অভিনয়। এ সব দ্বারা চিত্তবিনোদন হয় বলে এখন এটা পাশ্চাত্য ও বস্তুবাদী জীবন-দর্শন প্রসূত সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এর সাথে শুরু হল নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীর সহ-অভিনয়-প্রেমাভিনয়; কিন্তু তাতেও চিত্তবিনোদনের কাজ সম্পূর্ণতা পেল না। ফলে শুরু হল অর্ধ নগ্ন ও প্রায়-উলঙ্গ নৃত্য-সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান। নারী-পুরুষের প্রকাশ্য চুম্বন, আলিঙ্গন ও যৌন মিলনের অনুষ্ঠানও মঞ্চের ওপরই

২২০. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

দেখানো শুরু হল শত-সহস্র নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীর বিস্মিত চোখের সামনে। কেননা এটা না দেখানো পর্যন্ত চিত্তবিনোদনের অনন্ত ক্ষুধা নিবৃত্ত হতে পারে না।[২২১]

২২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৪.১১.১১.১৫ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি হচ্ছে লজ্জাহীন সংস্কৃতি

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দর্শনে মানুষ পশু শ্রেণীরই একটি জীবমাত্র এবং সে কারণে তাদের নৈতিকতা ও চরিত্রের কোন প্রশ্ন ওঠতে পারেনা বলে মানুষের লজ্জা ও শরমেরও কোন বালাই থাকে না। তাই সংস্কৃতি-মঞ্চে বেশি বেশি নির্লজ্জতা ও নগ্নতা প্রদর্শন শিল্প-সৌন্দর্যেরই পরাকাষ্ঠা হয়ে দাড়িয়েছে। আর যে তা যত বেশি দেখাতে পারে, সে সকলের নিকট তত বেশি সার্থক শিল্পী রূপে বিবেচিত হয়। সংস্কৃতির জগতে সে হয়ে উঠবে একজন বিরাট 'হিরো' ব্যক্তিত্বে। পশ্চিমা সমাজে যে যুবক-যুবতীরা যুগ্ম ও সমবেতভাবে প্রায়-নগ্ন কিংবা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্রস্নান এবং সমুদ্র-সৈকতে সমুদ্র-স্নানের উৎসব পালন করছে, তারা তো চিত্তবিনোদনেরই নানা অনুষ্ঠান উপভোগ করছে। এতে কারো কোন লজ্জা নেই, কেউ আপত্তি করে না; বরং সমগ্র শিক্ষা ও পরিবেশ থেকেই তা নিত্য উৎসাহ পাচ্ছে। কেননা এসব কিছু তাদের কাছে নিতান্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪.১১.১১.১৬ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পশুত্ববাদীতার চেতনাকে সদা জাগ্রত করে

পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শনে রয়েছে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও হাজার বছরের পৌত্তলিক সংস্কৃতি। এ তিনের সমন্বয়ে পাশ্চত্য দর্শন আজকের মানুষকে নিতান্ত পশু বা পশুর বংশধর ছাড়া কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৃষ্টি মনে করে না।[২২২] আর পশুকে অধিক পাশবিকতার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই বর্তমান কালের সংস্কৃতিতে এ পর্যন্ত যতটা উৎকর্ষ তা সাধিত হয়েছে তা সবই পাশবিকতারই উন্নতি সাধন করেছে। এ 'পশু'কে মনুষত্বে রূপান্তরিত করার কোন চিন্তা এখানে করা হয়নি; কিংবা মনুষ্যত্বের দিকে প্রত্যাবর্তনের কোন খেয়ালই জাগেনি এই 'পশুত্ববাদী'র সংস্কৃতি চর্চায়।

২২২. পরবর্তীতে ডারউইনে এসে বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে প্রমান করে জানিয়ে দিল যে মূলত মানুষ পশু থেকে বিবর্তনের ফলে আজকের মানুষে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ পাশ্চত্য দার্শনিকেরা এ মত বিশ্বাস করে থাকে। আর বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলনও ঘটাচ্ছে বলে মনে হয়। (দ্রষ্টব্য: মাওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত)

Dhaka University Institutional Repository

৪.১১.১১.১৭ সংস্কৃতিতে ইসলামের দর্শন হচ্ছে অনন্য স্বতন্ত্র

কিন্তু ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা আগাগোড়াই তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আলাদা পথে অগ্রসরমান এক আদর্শ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ শুধু একটি সৃষ্টিমাত্র নয়, বরং মানুষ হল আল্লাহর এক বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ও দায়িত্বশীল সৃষ্টি। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোন্নত ও সর্বোত্তম প্রজাতি তথা আশরাফুল মখলুকাত। অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র এক বিশেষ দায়িত্ব পালন করাই মানুষের এ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সে দায়িত্ব পালন করতে হবে এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার মধ্যেই। কিন্তু তার সবটাই এখানে শেষ হবে না। তার পূর্ণ পরিণতি ও প্রতিফলন ঘটবে এই জীবনের অবসান ঘটার পর অপর এক জগতে। সেজন্যে এই জগতের জীবনকে মানুষ পরকালীন জীবনে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে একান্তভাবে উৎসর্গ করে দেবে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় মানুষের বসতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের রচিত জীবন বিধান (ইসলাম) নাযিল করেছেন তাঁরই মনোনীত ব্যক্তিদের মারফতে।[২২৩]

অতএব, ইসলামের লক্ষ্য হল মানুষকে মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ রূপে গড়ে তোলা। আর আল্লাহর মনোপুত কাজের মাধ্যমে তাঁর সন্তোষ লাভের অধিকারী হওয়াই হল ইসলামী সংস্কৃতির মূল দর্শন। তাই নিজেকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর উপযুক্ত বান্দাহ রূপে গড়ে তোলাই হল ইসলামের দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা। কুরআন মজীদে এ কথাই বলা হয়েছে,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ* بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا* وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

২২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭-২৭৮

"যে 'তায্‌কিয়া' লাভ করল এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করল, সেই সঙ্গে নামাযও পড়ল, সে-ই সত্যিকার কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করল। কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিচ্ছো, যদিও পরকালই হচ্ছে অধিক উত্তম এবং চিরস্থায়ী।"[২২৪]

৪.১১.১১.১৮ পরিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতাই ইসলামী সংস্কৃতি

পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় 'তায্‌কিয়া' শব্দটি দ্বারা পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধি, চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিচ্ছন্নতা, মন-মানস, আকীদা-বিশ্বাস, দৃষ্টিকোণ ও মূল্যমান তথা মন ও দেহের পরিশুদ্ধতা বুঝায়। মূলত: এগুলো ইসলামী সংস্কৃতি। অতএব যে সব কাজে পরিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি; যাতে তা হয় না, বরং যাতে মন-মানস তথা জীবন ও চরিত্র হয় কলুষিত তা ইসলামী সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গাতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করার, তাঁকে কখনো কোন অবস্থায়ই ভুলে না যাওয়া, তাঁর বন্দেগীর প্রবল তাগিদে রীতিমত নামায পড়ার এগুলোই হল ইসলামী সংস্কৃতির বাছাই করা অনুষ্ঠান। এ সবের মাধ্যমে নর-নারীরা আত্মা, মন-মানস ও জীবনের যে পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা বিধান হয় তা-ই হল ইসলামী সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

৪.১১.১১.১৯ পরকাল নির্ভর আদর্শবাদী জীবন যাপনই ইসলামী সংস্কৃতির জীবনাচরণ

পার্থিব জীবনকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া, বস্তুসর্বস্ব আয়েশ-আরাম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং পরকালীন জীবনের অনিবার্য সত্যকে বেমালুম ভুলে যাওয়া কিংবা তা উপেক্ষা করে চলা ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী ভাবধারা। পক্ষান্তরে পরকালকে সম্মুখে রেখে, পরকালের

২২৪. আল কুরআন, ৮৭: ১৪-১৭

কল্যাণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে আদর্শবাদী জীবন যাপন করা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদনই হল ইসলামী সংস্কৃতির অনুকূল জীবনাচরণ।

৪.১১.১১.২০ ইসলামী সংস্কৃতি ভোগবাদের সংস্কৃতি নয়

প্রকৃত পক্ষে আত্মার প্রকৃত কল্যাণ ও তৃপ্তির পরিবর্তে দেহের ক্ষণস্থায়ী আরাম ও তৃপ্তি লাভ ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য নয়। তা হল পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সংস্কৃতির লক্ষ্য। একে এক কথায় বলা যায় ভোগবাদী সংস্কৃতির লক্ষ্য। তাই বলে ইসলামী সংস্কৃতিতে বৈষয়িক ও দৈহিক পরিতৃপ্তির কোন স্থান নেই এটা মনে করাও ভুল। কেননা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার সর্ব প্রকারের করণীয় কাজ সুসম্পন্ন করা, আল্লাহর দেয়া যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ-ব্যবহার করা এবং তার শোকর আদায় করা ইসলামী সংস্কৃতির ঐকান্তিক দাবি। কিন্তু যে ধরনের দৈহিক ও বস্তুগত ভোগ-বিলাসে ও আচার-আচরণে আল্লাহর বিধান লংঘিত হয়, আল্লাহর অসন্তোষ অর্জিত হয়, তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অন্যথায় বৈষয়িকভাবে পদতলে হারিয়ে যাবে ইসলামী সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

৪.১১.১১.২১ ইসলামী সংস্কৃতি সমগ্র জীবন ব্যাপী বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক

ইসলামী সংস্কৃতি কোন সংকীর্ণ জিনিস নয় এবং নয় কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের জীবন যত ব্যাপক, ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রও ততই বিস্তীর্ণ। জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে প্রতি মুহূর্তে ইসলামী সংস্কৃতির ভাবধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বালবের (Bulb) স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎছটা যেমন করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে সব কিছু, ইসলামী সংস্কৃতির তেমনি প্রতিফলন ঘটে সমগ্র জীবনে। অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির জীবন-দর্শনের অনুসারী লোকদের প্রকিটি কাজের ভিতর দিয়েই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পরিস্ফূট হয়ে থাকে। ফলে

মানুষের প্রতিটি কথাবার্তা, কাজকর্ম চলাফেরা, ওঠা-বসা এবং এ সবের ধরন, পদ্ধতি ও কর্ম-কৌশলের মাধ্যমেই জানতে পারা যায় সে কোন সংস্কৃতির ধারক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খাবার খাওয়া। খায় সবাই। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ধারক 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করে, ডান হাত দিয়ে খায়, খাওয়ার সময় সে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করে ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাবধারায় তার অন্তর ভরপুর হয়ে উঠবে। বাহ্যত সে হাতে ও মুখে খায়; কিন্তু তার মন তাকে বলতে থাকে, এ খাবার একান্তভাবে আল্লাহর অনুগ্রহেই পাওয়া গেছে। তিনি না দিলে খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই সে খাবারের প্রতি কোন অবহেলা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করে না, অহঙ্কারীর মত বসে খায় না এবং খেয়ে মনে কোন অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা জাগায় না; বরং খাওয়া শেষ করে সে আন্তরিকভাবে বলে: (ـمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين) "সমস্ত তারীফ-প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।"[২২৫]

খাওয়া মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য কাজ। না খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। মানুষও খায় আবার পশুও খায়। কিন্তু মানুষের খাওয়া ও পশুর খাওয়া একই ধরনের, একই ভাবধারার ও অভিন্ন পরিণতির নয়। তাই মানুষের মতো খাওয়া এবং খেয়ে মানবোচিত পরিণতি লাভই হল খাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি। পক্ষান্তরে গরুর মতো জাবর কাটা এবং কোনরূপ আত্মিক সম্পর্কহীনভাবে খাদ্য গ্রহণ হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিশেষত্ব।

ইসলামী সংস্কৃতিবান ব্যক্তিও পথ চলে, যেমন চলে দুনিয়ার হাজারো মানুষ। কিন্তু তার পথ চলা নিরুদ্দেশ, দিশেহারা ও লক্ষ্যহীন নয়; পথ চলার সময় তার মনে জাগেনা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার

২২৫. মূলত এটি হচ্ছে ইসলামী রীতিসম্মত খাবার গ্রহণের পরের দোয়া।

অস্বাভাবিক ভাবধারা। পথ চলতে গিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমাকে সে কখনো লংঘন করে না। প্রতিটি পদক্ষেপে -পার্শের দৃশ্য অবলোকনে, লক্ষ্য নির্ধারণে এবং সহযাত্রীদের সাথে আচার-আচরণে কোথাও সে মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে হারায় না। হারাম পথে তার পা বাড়ায় না, অন্যায় কাজে সে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয় না। পথ চলাকালে সে মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যায় না মহান আল্লাহর এ নির্দেশ:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

"দুনিয়ায় অহঙ্কারী হয়ে পথ চলো না। কেননা যত অহঙ্কারই তুমি করো না কেন, না তুমি ভূপৃষ্ঠকে দীর্ণ ও চূর্ণ করতে পারবে, না পারবে পর্বতের ন্যায় উচ্চতায় পৌঁছতে।"[২২৬]

এ কারণে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক যখন পথে বের হয়, তখন তার দ্বারা কারোর কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। সে নিজেকে হাজারো মানুষের সমান কাতারে একাকার করে দেয়, নিজের বড়ত্ব দেখার মতো কোন কথাও সে বলেনা, কোন কাজও করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-বিশ্বাসী লোকের আচার-আচরণ, কথা-কাজ, ভাবধারা ও অনুষ্ঠানাদি হয় এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তার চলার ভঙ্গি দেখে সাধারণ মানুষের মনে ধারণা জাগে, কোন দৈত্য-দানব যেন ছুটেছে সব কিছু দলিত-মথিত করে সকলের জীবনে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তার এ পথ চলায় সাধারণ মানুষের মনে জাগে ভীতি ও আতঙ্ক। আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা ও ব্যক্তিগত বড়াইসূচক জয়ধ্বনি সে পায় প্রচুর কিন্তু তাতে আন্তরিকতার খুশবু থাকে না একবিন্দুও।[২২৭]

২২৬. আল কুরআন, ১৭: ৩৭
২২৭. মওলানা আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সংস্কৃতির ধারকও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করে, শিখে ও চর্চা করে। কিন্তু গর্দভের বোঝা বহনের মতো হয় না তার কাজ। বস্তুর বিশ্লেষণে ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদির সন্ধান পেয়ে সে বিস্মিত হয়ে আল্লাহর অসীম কুদরাতের সামনে নিজেকে পেশ করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে। তাই তার কণ্ঠে স্বতঃই উচ্চারিত হয় আল্লাহর প্রশংসা,

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ

"কত পবিত্র মহান তুমি হে খোদা! কত সুন্দর উত্তম সৃষ্টিকর্তা তুমি! 'হে খোদা! তুমি কোন একটি বস্তুও অর্থহীন, তাৎপর্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন করে সৃষ্টি করোনি!"[২২৮]

কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কিংবা পৌত্তলিক সংস্কৃতিতে এর বিপরীত ভাবধারার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। একটা গরুর চোখের পাতায়ও প্রতিফলিত হয় এ পৃথিবীর মনোরম দৃশ্যাবলী, একজন মানুষের চোখেও তাই। কিন্তু মানুষের চোখের প্রতিফলন ও গরুর চোখের প্রতিফলন কোন দিক দিয়েই এক হতে পারে না। এখানে যে পার্থক্য ধরা পড়ে বস্তু-বিজ্ঞান বিশ্লেষণে, ঠিক সেই পার্থক্যই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য তথা পৌত্তলিক সংস্কৃতির মাঝে। জীবিকা নির্বাহের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ও শ্রম-মেহনত সবাইকে করতে হয়। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ধারক এ সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ ও বাধ্য বাধকতা মেনে চলে নিজের মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে-ঈমানের তাগিদে। এ সবের মাধ্যমে সে যা কিছু অর্জন করে, তাকে মহান আল্লাহর দান মনে করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয়-মন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তা দিয়ে সে একদিকে যেমন নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণ করে, সেই সঙ্গে তাতে সমাজের অন্যান্য অভাবগ্রস্ত মানুষেরও প্রাপ্য রয়েছে বলে সে মনে করে। ফলে তার

২২৮. আল কুরআন, ৩: ১৯১

অর্থব্যয়ে এক অনুপম ভারসাম্য স্থাপিত হয়। সে না নিজেকে বঞ্চিত রাখে, না অন্যকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, বরং সে নিজ থেকেই পৌঁছে দেয় যার হক তার কাছে।

সেজন্যে সে কারোর ওপর স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের বাহাদুরী দেখায় না এবং তার বিনিময়ে কাউকে নিজের গোলাম বানাতে চেষ্টা করে না। তার মনোভাব হয় এই যে, তার একার শ্রম-শক্তিই তা অর্জন করেনি; বরং তাতে আল্লাহর অনুগ্রহও শামিল রয়েছে। সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে এ শ্রম-শক্তিও তো তার নিজস্ব কিছু নয়, তাও তো আল্লাহরই প্রদত্ত; তাহলে তার মাধ্যমে লব্ধ সম্পদ তার একার ভোগাধিকারের বস্তু হবে না বরং তাতে স্বীকৃত হবে মহান আল্লাহর এমন সব বান্দাহদের অধিকার যারা তার সমান কিংবা প্রয়োজন অনুরূপ সম্পদ উপার্জন করতে পারেনি। তাই সে নিজের একারই ভোগ-বিলাশ, আয়েশ-আরাম ও সুখ-সজ্জায় তার যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিতে পারে না; বরং নিজের মধ্যম মানের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা সে তুলে দেয় সমাজের হাজারো বঞ্চিত মানুষের হাতে তাদের ন্যায্য অধিকার হিসেবে।[২২৯]

কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারকদের মাঝে সৃষ্টি হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারা ও অবস্থা। সেখানে মানুষ অর্থোপার্জনের ন্যায়-অন্যায় ও হক-না-হকের তারতম্য করে না, বাছ-বিচার করেনা ব্যয় করার বেলায়ও। অর্জিত সম্পদকে-একান্তভাবে নিজের মনে করে। এতে অন্য কারোর একবিন্দু অধিকার স্বীকার করে না। শোষণ, বঞ্চনা ও ব্যয়-বাহুল্যই সে সংস্কৃতির অনিবার্য প্রতিফল। এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় সমাজের সর্বদিকে। হিংসা ও বিদ্বেষের প্রচণ্ড আগুন জ্বলে ওঠে বঞ্চিত লোকদের মন-মগজে। তখন তাদের বিরুদ্ধে ধূর্ত শোষকরা আর একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

২২৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

হয়। 'সর্বহারাদের রাজত্বের' দোহাই দিয়ে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করা হয়, যেখানে এ বঞ্চিত ও সর্বহারাদের চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত, নির্যাতিত ও শোষিত হয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। তখন তারা না পারে তার বিরুদ্ধে টু শব্দ করতে, না পারে বিদ্রোহ করে সে সমাজ ব্যবস্থাকে খতম করতে। ফলে শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের অবসান ঘটেনা, তার রূপটা বদলে যায় মাত্র। পরিবর্তিত অবস্থায় তার তীব্রতা হয় আরো নির্মম, আরো মারাত্মক এবং মনুষ্যত্বের পক্ষে চরম অবমাননাকর।[২৩০]

যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক বিবাহ সম্পর্ককে একমাত্র মাধ্যম বা উপায়রূপে গ্রহণ করে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। এর বাইরে কোথাও বিচরণকে সে সম্পূর্ণ হারাম ও পরিত্যজ্য মনে করে। তাই হাজারো সম্মুখবর্তী সুযোগ পেয়েও সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কোনক্রমেই সে এ হারাম কাজে নিজেকে কলঙ্কিত ও পথভ্রষ্ট হতে দেয় না। তার মন তার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা স্বামীতেই পরিতৃপ্ত। ভিন্ন মেয়ে বা পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকানোকে সে ঘৃণা করে। সব মেয়ের ইজ্জত-আব্রুই তার নিকট পবিত্র ও আমানত। স্বামী ছাড়া সব পুরুষই তার নিকট হারাম ও পরিত্যজ্য। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারকদের নিকট বিবাহের বিশেষ কোন দাম, গুরুত্ব বা মর্যাদা নেই। যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নিজের স্ত্রী বা স্বামী কিংবা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হওয়ার কোন শর্ত নেই। পরস্ত্রী, পরপুরুষ, রক্ষিতা, বন্ধুর স্ত্রী, স্বামীর বন্ধু অথবা স্ত্রীর বান্ধবী ও পুরুষ বন্ধু এসবকে নিজ স্ত্রী বা স্বামীর মত বিবেচনা করতে কোন দ্বিধা বা লজ্জা-শরমের অবকাশ নেই। এজন্যেই পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অবিবাহিত যুবকদের মেয়ে-বন্ধু ও অবিবাহিতা মেয়েদের পুরুষ-বন্ধু একটা

---

২৩০. এভাবে পাশ্চত্য সমাজে পুজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের উত্থান ঘটেছে কিন্তু কোন মতবাদই তাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা উপহার দিতে পারেনি। বরং সকল মতাবাদই মানবতাকে ফাকি দিয়ে কেবল কিছু সংখ্যক মানুষের ক্রীরানকে পরিণত হয়েছে। আর এভাবে অসহায় ও নি:স্ব মানুষরা বঞ্চনা থেকে বঞ্চনার পথেই ধাবিত হচ্ছে। (মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২)

সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা যেন ক্রমশ অংকের হিসাবকেও হার মানতে বাধ্য করেছে[২৩১]। সুতরাং পাশ্চত্য সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের যৌন ক্ষুধা উন্মত্ততার সৃষ্টি করে এবং তা যেকোন স্থানে গিয়ে আঘাত হানার অধিকার রাখে; উভয়পক্ষের রাজী হওয়াটাই কেবল সেখানে একমাত্র শর্ত। এ ক্ষুধা এতো ব্যাপক ও প্রবল যে, সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাই যেন তার নির্বাধ পরিতৃপ্তি লাভের আয়োজনে নিয়োজিত। তাই যুবক-যুবতী বা নারী-পুরুষের একক ও যুগল সঙ্গীত-নৃত্য সে সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ।[২৩২]

পক্ষন্তরে ইসলামী সংস্কৃতি সার্বিকভাবে এক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ভাবধারার উদ্বোধক। কেননা পরিচ্ছন্ন ও চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য। তাই যেসব কাজ, অনুষ্ঠান ও ভাবধারা এরূপ মানুষ গড়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে তা ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা। ইসলাম মানুষকে সংস্কৃতির প্রবহমান নদী থেকে স্বচ্ছ পানির সন্ধান করে তুলে নিতে বলে, অন্ধের ন্যায় ময়লা, আবর্জনা ও কাদাযুক্ত বা বিষাক্ত পানি খেতে বলেনা। পূর্বেই বলা হয়েছে, সর্বদা আল্লাহর স্মরণ এবং সেজন্যে রীতিমত নামায পড়া, কেবল পরকালের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে সব কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং নিছক বৈষয়িক আনন্দ বা তৃপ্তি-সুখ লাভের জন্যে কোন কাজ না করাই হল ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা। একারণে ইসলামী সমাজে মসজিদ হল প্রধান সংস্কৃতি-কেন্দ্র, রঙ্গালয় বা নৈশক্লাব নয়। ইসলামী সংস্কৃতির ধারকরা দিন-রাত পাঁচবার এখানে একত্রিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে দাঁড়ায়, কুরআন পাঠ করে এবং রূকূ ও সিজদায় সম্পূর্ণরূপে অবনমিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতিরই এক বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে। বছরের একমাস রোযা পালন ও দুটি ঈদের নামায ও উৎসব পালন মুসলিম সমাজের সর্বজনীন সাংস্কৃতিক

২৩১. পাশ্চাত্যে কোন কোন ‘উন্নত’ ও ‘সুসভ্য’ দেশে প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে তিনটিই অবৈধভাবে জন্মলাভ করছে। আর এটাও ঘটছে জন্মনিরোধের জন্যে সর্বপ্রকার নিরাপদ (?) ব্যবস্থা গ্রহণের পর। (মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২)
২৩২. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠান। বস্তুত আল্লাহর সামনে সমষ্টিগতভাবে অবনমিত হওয়াই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির সামাজিক রূপ। বিয়ে-শাদীর উৎসব, সন্তানের নামকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন, খাদ্য-পানীয় বাছাই, পরীক্ষিত বন্ধু ও আত্মীয় গ্রহণ, রুজি-রোজগারের জন্যে পেশা গ্রহণ, দিন-রাত্রির জীবন অতিবাহন- এ সব ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটা আবশ্যক। কেননা তার ব্যাপক প্রভাব থেকে এর একটিও মুক্ত থাকতে পারে না। এসব ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ভাস্বর হয় ওঠে। আর এ সব কিছুর মধ্য দিয়েই এ বিশাল মানব-সমুদ্রের মাঝে এক বিশিষ্ট মানব সমাজ গড়ে ওঠে। তাই ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সূর্যের মতই দেদীপ্যমান এবং তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে কি ইসলামী সংস্কৃতি কেবল নিরস ও শুষ্ক উপকরণ দিয়ে গড়া? অথচ সংস্কৃতিতে রসের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। রসই যদি না থাকে তাহলে আর সংস্কৃতি কি? সংস্কৃতি হলেও তা দিয়ে আমাদের কি লাভ? সংস্কৃতি ‘রস-ঘন’ হওয়াই বাঞ্ছনীয় এ কথা ঠিক; কিন্তু রসের তো বিশেষ কোন রূপ নেই। রস আপেক্ষিক। এক ব্যক্তি যেখানে রসের সন্ধান পাবে, অন্যের কাছেও তা-ই যে রসের আকর হবে- এমন কথা জোর করে বলা যায় কি? এক জনের কাছে যা রস, অন্যের নিকট তা বিষও তো হতে পারে। আসল জিনিস হল মনের তৃপ্তি। যেখানে যার তৃপ্তি, তা-ই তাকে অফুরন্ত রসের যোগান দেয়। এক ব্যক্তি যে সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তাতেই সে তৃপ্তি পায়, স্বাদ পায়, আনন্দ পায় ও অমৃত-রসের সন্ধান পায়। ইসলামী সংস্কৃতিতে এ তৃপ্তি, এ স্বাদ, এ আনন্দ ও এ রস সৃষ্টি করে মহান আল্লাহর স্বরণ বা যিকর। তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণই মানুষের মনকে পরিতৃপ্ত ও প্রশান্তিময় করে তোলে।"[২৩৩] মনের তৃপ্তিই যদি কাম্য হয় তাহলে ইসলামী সংস্কৃতিতে রয়েছে তার অপূর্ব সমাবেশ। এজন্যে মুসলমানরা অভাব অনটনে থাকলেও মনের সুখ বা তৃপ্তি থেকে তারা দূরে থাকে না। কেননা তাদের মনে থাকে আল্লাহ তায়ালার স্বরণ। এ স্বরণই তাদেরকে বাচিয়ে রাখে আনন্দভরা তৃপ্ত জীবনে। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতির মূল দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে প্রতিটি সাংস্কৃতিক কর্ম-কান্ডের মধ্যে আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্বের ছাপ ফেলে রাখা। আর এ কাজ তখনই হতে পারে যখন মানব মন আল্লাহ তায়ালার স্বরণে ভরপুর থাকে। তাই এমন কোন কর্ম-কান্ড ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে গণ্য হয় না যা মানব মনকে মহান আল্লাহর স্বরণ থেকে দূরে রাখে। ইসলাম মূলগতভাবে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে নি; বরং নির্দোষ হাস্যরস, আনন্দ-স্ফূর্তি ও কৌতুককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রেও ভারসাম্যকে উপেক্ষা করতে ইসলাম রাজী হয়নি। মানুষ কেবল আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল হয়ে থাকবে এবং ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সর্ব প্রকারের চিত্তবিনোদনে জীবনের মহামূল্য সময় অতিবাহিত করবে, ইসলাম তা মোটেই পছন্দ করেনি। কেননা এর ফলে মানুষ আল্লাহর যিকর থেকে গাফিল হয়ে যেতে পারে। আর আল্লাহর যিকর থেকে গাফিল হয়ে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে নৈতিক ও মানবিক উভয় দিকের চরম বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায়, চিত্তবিনোদনের ব্যাপারটা বহুলাংশেই আপেক্ষিক। কার চিত্ত কিসে বিনোদন করবে আর কিসে হবে দুঃখ-ভারাক্রান্ত সে ব্যাপারে কোন স্থায়ী মানদণ্ড নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আসল লক্ষ্য হল চিত্তের বিনোদন। এখানে আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব আছে; কিন্তু তা মুখ্য নয়, গৌণ। চিত্তবিনোদনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য; কিন্তু তার জন্যে ইদানিং যে সব অনুষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে সাধারণভাবে তা নিশ্চয়ই অপরিহার্য নয়। কেননা চিত্তের বিনোদনের জন্যে এ সকল অনুষ্ঠান

২৩৩. আল কুরআন, ১৩:২৮

একমাত্র উপায় নয়। এ ধরনের অনুষ্ঠান ছাড়াও চিত্তবিনোদন সম্ভব। ইসলাম এ দৃষ্টিতেই চিত্তবিনোদনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠান হিসেবে কেবল তা-ই সমর্থন করেছে যা নির্দোষ-যার পরিণাম ভাল ছাড়া মন্দ নয়, যাতে মানুষের নৈতিকতার পতন ঘটার পরিবর্তে উন্নতি সাধিত হয়, যার দ্বারা মনুষ্যত্বের সুমহান মর্যাদা রক্ষা পায়, যার ফলে মানুষ তার উন্নত মর্যাদা থেকে পশুর স্তরে নেমে যায় না। এ ধরনের যা কিছু অনুষ্ঠান ও উপকরণ হতে পারে, তা-ই ইসলামে সমর্থিত এবং মানুষের পক্ষেও তা-ই গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে যা কিছু এর বিপরীত তাকে বর্জন করাই ইসলামের দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয় এবং মানুষের পক্ষেও তা বর্জনকরা কর্তব্য।[২৩৪]

বস্তুত মনের স্বস্তি-প্রশান্তি-স্থিতি ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। আল্লাহ্, রাসূল ও পরকালের প্রতি অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং তদভিত্তিক ও তদনুকূল অনুষ্ঠানাদিই এবং এর চর্চা ও অনুশীলনেই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা। কেননা ইসলামী অনুষ্ঠানাদি মানুষকে মূর্খতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয়। তাদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে খোদাভীতি, পরকালের জবাবদিহি এবং জীবনের প্রতিপদে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসরণের সুদৃঢ় ভাবধারা।

এক কথায় বলা যায়, সংস্কৃতিতে ইসলামী দর্শনের অন্যতম প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নৈতিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা। বিশ্বনবীর এ পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতিকে নৈতিক বিধান, কর্মনীতি ও আদর্শবাদিতা শিক্ষা দেওয়া এবং এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ তৈরি করা। আদর্শ মানবজাতি বানানো ছাড়া আদর্শ সংস্কৃতি চর্চা করা যায় না।

---

২৩৪. ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, ২০২; এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকল্প*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯ম পৃ, ৮৬; মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-২৮৭

অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে আদর্শ সংস্কৃতির গঠন ও চর্চা ছাড়া আদর্শ মানবজাতিও বানানো যায় না। যেভাবেই বলি না কেন আদর্শ মানবজাতি ও আদর্শ সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক এবং একটি ছাড়া আরেকটির কল্পনা করা সম্ভব নয়। আদর্শ সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে নৈতিকতার উপর। কাজেই ইসলাম নৈতিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। তাই সংস্কৃতিতে যত বড় কাজই হোক না কেন কোন ভাবেই নৈতিকতার মানদন্ডকে লংঘন করা যায় না বরং নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতেই সংস্কৃতির সীমা-রেখা নির্ধারণ করতে হয়। এজন্যে ইসলামী সংস্কৃতিকে বলা হয় নৈতিকতার সংস্কৃতি।

পঞ্চম অধ্যায়

জাহেলী যুগে আরবের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

৫.১ আরব দেশ ও জাতী

আরব দেশ একটি ত্রিভূজাকৃতি উপদ্বীপ। এদেশের তিন দিক জল এবং এক দিক স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ জন্য আরব দেশকে আরবী ভাষায় “জাজিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ” বলে অভিহিত করা হয়। এর উত্তরে সিরিয়ার মরুভূমি, দক্ষিনে ভারত মহাসাগর, পূর্বে পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোগস্থলে হওয়ার কারণে স্বরণাতীত কাল থেকে আরব দেশের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বহু প্রাচীন কাল থেকেই আরবরা স্বীয় স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে টিকে আছে। অনুর্বর ভূমি ও বৈরী আবহাওয়া নিয়ে আরববাসী এক সংগ্রামমূখর জীবন যাপনে বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও জাতির নিকটে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আরব ভূখন্ডের বৈচিত্র্যের কারণে প্রাচীন আরবের জনসমষ্টির মাত্র এক পঞ্চমাংশ ছিল স্থায়ী বাসিন্দা (বা শহরবাসী)।[২৩৫] তারা কৃষিকাজ ও ব্যবসা বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করত। অপরদিকে চতুর্থ পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী ছিল যাযাবর বা বেদুঈন।[২৩৬] তাই প্রাচীন আরবদেশকে বেদুঈনদের দেশ বলে অভিহিত করলে অযৌক্তিক হয় না। বেদুঈনরা পরিবারবর্গ নিয়ে উট, ভেড়া ও ঘোড়ার খাদ্যের সন্ধানে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। তারা ছিল স্বাধীনচেতা, বেপরোয়া ও দুধর্ষ। স্থায়ীভাবে বসবাসের কোন প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করত না। তাদের গৃহ

২৩৫. হাসান আলী চৌধুরী, Bmj‡gi BwZnvm, ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৮৬. পৃ. ৩৩
২৩৬. প্রাগুক্ত

ছিল তাবু, আহার্য ছিল উটের মাংস, পানীয় ছিল উট ও ছাগলের দুধ আর জীবিকা ছিল লুটতরাজ।

আরব জাতির প্রাচীন অধিবাসীদের সম্পর্কে তেমন কোন সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আরবদেশে বিভিন্ন জাতির লোক বসতি স্থাপন করেছিল। যা হোক, মোটামুটি একথা সকলেই স্বীকার করে থাকে যে মূল আরবগণ ছিলেন হযরত নূহ (আ.) এর পুত্র শামের বংশধর। আর মক্কায় বসবাসরত মহানবী (সা.) এর বংশের লোকেরা ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) এর বংশধর। ইসমাঈল (আ.) এর ৫৮ তম অধ:স্তন পুরুষ আল-ফিহরের অন্য নাম ছিল কুরাইশ।[২৩৭] সে নাম হতেই কুরাইশ বংশের উৎপত্তি ঘটে। আর এ কুরাইশ বংশেই মহানবী (সা.) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল তথা ১২ই রবিউল আওয়ালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

৫.২ আইয়্যামে জাহেলিয়া

‘আইয়্যাম’ শব্দের অর্থ সময় বা যুগ আর ‘জাহেলিয়া’ শব্দের অর্থ অজ্ঞতা। সুতরাং আইয়্যামে জাহেলিয়া বলতে ‘অজ্ঞতার যুগ’ কে বুঝানো হয়। সেই যুগে আরবে কোন প্রকার কৃষ্টি ছিল না এ কথা বলা যায় না। বর্তমান ধরনের মত কোন প্রকার সুষ্ঠ শিক্ষা পদ্ধতি আরবে প্রচলিত না থাকলেও বাগ্মীতা ও কাব্য চর্চার জন্য আরববাসী বিখ্যাত ছিল। কিন্তু নীতি বোধ ও মানবতাবোধের অভাবে তাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অবস্থা অধ:পতনের শেষ পর্যায়ে নেমে এসেছিল। কলহ-বিবাদ, খুন-যখম ও অন্যায়-অবিচারের অন্ধকারে সমগ্র আরববাসী নিমিজ্জিত হয়ে পড়েছিল। সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাত্রা এবং সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের পদ্ধতি সম্বন্ধে তারা

২৩৭. প্রাগুক্ত

সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পবিত্র কুরআনে জাহেলি শব্দ দ্বারা মূলত ওহী ভিত্তিক জ্ঞানের অনুপস্থিতিকে বুঝানো হয়েছে। সে হিসেবে এ যুগের ব্যাপ্তি ধরা হয় হযরত ঈসা (আ.) এর তিরোধানের পর হতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুয়্যত পাওয়া পর্যন্ত[২৩৮] প্রায় ৫০০ বছরের সময় কালকে। কেননা এ সময়ের মধ্যে আরবদেশে কোন নবীর আর্বিভাব ঘটেনি। আবার এ সময়ের মধ্যে পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষাও অবিকৃত অবস্থায় ছিলনা বিধায় সারা বিশ্বে মানবজাতি ঐশীজ্ঞানের আলো থেকে দূরে ছিল। R.A Nicholson ও P.K Hitti মহানবী (সা.) এর নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বের এক শত বছর (৫১০-৬১০ খ্রি) কে আইয়্যামে জাহেলিয়া বলে অভিহিত করেছেন।[২৩৯] কেননা তাদের মতে ঐ সময়ের মধ্যেই আরবদেশে মানবীয় গুণের সবচেয়ে বেশি অধ:পতন ঘটেছিল।

৫.৩ শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা

আরববাসীদের মধ্যে সকলেই নিরক্ষর ও মূর্খ ছিল না। তাদের মধ্যে হাতে গুণা কয়েকজন লেখাপড়া জানতো। আজকের মত সে সময়ে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠা সম্ভব হয়নি তবে অল্প কিছু লোক নিজেদের উদ্যোগে লেখা ও পড়ার কাজটি চামড়া, পাথর, গাছের ছাল কিংবা পোড়া মাটির পলকে করত বিধায় তা ছিল কষ্ট সাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে রাজকীয় ও যাজকীয় ফরমানেই লেখার মত কষ্ট সাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষের কাজটি চলত। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধারণাটি বদ্ধমূল ছিল যে স্মৃতিশক্তিতে দুর্বল লোকেরাই কেবল লিখে রাখার মাধ্যমে কোন কিছু সংরক্ষনের জন্যে উদ্যোগী হতে পারে। ফলে লোকমূখের অবমূল্যয়নের ভয়ে অনেকে লেখার বিদ্যা জানা থাকা সত্ত্বেও কোন কিছু লিখে রেখে সংরক্ষণের তেমন উদ্যোগী হতে দেখা যায় নি। বরং স্মৃতি শক্তিতে ধারণ করার মাধ্যমেই কোন কবিতা বা ঘটনাকে সংরক্ষণ

২৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২৩৯. প্রাগুক্ত

করাই ছিল তাদের মধ্যে গৌরবের ও সুনামের কাজ। আবার যারা পড়তে পারতেন তাদের মধ্যে সবাই কিন্তু লিখতে পারতেন না।

যা হোক, তাদের অধিকাংশ লোক মূর্খ ও নিরক্ষর হলেও তাদের মধ্যে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, বাগ্মিতা এবং কবিতা চর্চায় মনন শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন[২৪০]। তাদের কবিতার বিষয়বস্তু ছিল নারী, প্রেম, বংশ গৌরব, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলী। কবিরা তাদের অশ্লীল কবিতার মাধ্যমে সমাজে সর্বপ্রকারের অনর্থক কর্ম-কান্ড ঘটাত। সমাজে কবিদেরকে অতিমানব হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হলেও তাদের কবিতায় মৌলিক চিন্তাধারার অভাব পরিলক্ষিত হত। প্রাক ইসলামী যুগের কবি ও পন্ডিতদের মধ্যে ইমরুল কায়েস, তারাকা, আমর ইবনে উম্মে কুলছুম, লোবিদ, যুহায়ের, হারিস, আনতারবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল মুয়াল্লাকাত, দিওয়ান, আল হামসা কিংবা কিতাব আল আগানী নামক গ্রন্থের মাধ্যমে জাহেলিয়া যুগের গীতিকাব্য সমূহ সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাদের কবিতায় বিষয়বস্তু যতই জঘন্য হউক না কেন তাদের কবিতার মাধ্যমেই কেবল জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজের যাবতীয় কিছু জানা যায়। আরবেরা যে নির্ভীক বীর অতিথি বৎসল ও পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিশ্বাসী ছিল এবং মৃত্যুভয়ে কাপুরুষের মত ভীত ছিল না সেগুলো সম্বন্ধে তাদের কবিতা হতেই অবগত হওয়া যায়। সেজন্যে ঐসব কবিতাকে 'দিয়ানুল আরব' বা জনসাধারনের জীবন যাপনের দলিল বলা হয়। এ যুগে আরবদেশ বহু কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। যাদের কাব্য ও সাহিত্য অদ্যবধি বিশ্ব সাহিত্যে অমূল্য রতন হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। আর তাদের আরবী ভাষাও জাহেলী যুগে খুব সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে ইউরোপের যে কোন উন্নত ভাষার সাথে সে যুগের আরবী ভাষাকে

২৪০. R.A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs*, India: Adam Publishers & Distributors, 1994, pp 5-25; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* London: The Mocmillan Press Ltd., Tenth Editor, Printed in China, 1993, pp 4-16

তুলনা করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক পি.কে হিট্টির মতে, "মধ্যযুগে বহু শতাব্দী কাল পর্যন্ত তা (আরবী ভাষা) সভ্যজগতের শিক্ষা সংস্কৃতি ও উন্নতির একমাত্র মাধ্যম ছিল।"[২৪১]

৫.৪ সাংস্কৃতিক অবস্থা

আরববাসী বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ভাল-মন্দ উভয় দিকই বিদ্যমান ছিল। নিম্নে তাদের সংস্কৃতির মৌলিক কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো:

ওকাজ মেলা: শহরবাসী আরবের সংস্কৃতি জীবনে ওকাজ মেলার একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। বছর এখানে সাহিত্য প্রতিযোগীতাও অনুষ্ঠিত হত। পুরষ্কারপ্রাপ্ত কবিতা কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হত। এরুপ সাতটি ঝুলন্ত কবিতা (সাব-ই-মুয়াল্লাকাত) উমাইয়া আমলে সংকলিত হয়। কবিতাগুলো সমগ্র আরবী সাহিত্যের অসাধারণ সৃষ্টি। এদের রচয়িতাগণকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দেয়া হত। এভাবে আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে ওকাজ মেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

৫.৪.১ গোত্রপ্রীতি

যাযাবর আরব সমাজের মূল ভিত্তি ছিল গোত্রপ্রীতি। আসাবিয়া ছিল তাদের গোত্রর মূলমন্ত্র। গোত্রের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলেও ভিন্ন গোত্রের লোকদের সাথে প্রবল শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। এর ফলে গোত্রে গোত্রে প্রায়শ দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ সংঘঠিত হত। ঐতিহাসিক গীবনের মতে মহানবী (সা.) এর আর্বিভাবের প্রাক্কালে ১৭০০ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।[২৪২] এ সকল যুদ্ধের ফলে বহুলোক মারা যায় এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের বিনাশ ঘটে।

২৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
২৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৫.৪.২ কতিপয় সুকুমার গুনাবলী

লুটতরাজ, যুদ্ধ, বিগ্রহ, জিঘাংসা, হত্যা, চরিত্রহীনতা, মদ্যপান, কন্যাসন্তান হত্যা, নারী অপহরণ ইত্যাদি জঘন্য অপরাধে লিপ্ত থাকলেও তাদের মধ্যে মহত্বের সুকুমার গুণাবলী বর্তমান ছিল। জন্মগতভাবে প্রত্যেক আরববাসী ছিল পূর্ণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তারা প্রত্যেকে অভিজাত বলে বিশ্বাস ও দাবী করত। প্রত্যেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে কম বেশি ধারণা করত। সকলেই দাবী করত আরবজাতী বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রক্তের বিশুদ্ধতা, বাগ্মিতা, কবিতা, অশ্ব, তরবারি, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি ছিল তাদের গর্বের বিষয়বস্তু। তারা কুলুজি চর্চাকে বৈজ্ঞানিক চর্চার মর্যাদা দান করত। আতিথেয়তা, স্বাধীনতা, সাহস, মনোবল, সহিষ্ণুতা, পৌরুষত্ব, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা, দানশীলতা ইত্যাদি ছিল তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তৎকালীন আরবের অল্প কিছু গোত্রে নারীর স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। বিশেষভাবে বেদুঈন মহিলারাই সমাজে পুরুষদের সমান অধিকার লাভ করতো।

প্রাচীন আরবের আধিবাসীদের আরও একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য ছিল যে তারা ছিলেন স্বভাব কবি এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল শ্রুতিধর কেবল সাব-ই- মুয়াল্লাকাত ব্যতিত তাদের রচিত অন্যান্য কাব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। জমিল, লবিদ এবং ইমরুল কায়েস প্রমূখ রচিত মুয়াল্লাকাত আজও বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।[২৪৩]

৫.৪.৩ মরু আবহাওয়া ও পরিবেশের প্রভাব

বৈচিত্রময় আরবের ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশ আরববাসীদেরকে বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যর অধিকারী করে গড়ে তুলেছিল। অদ্ভুত ও বিচিত্র ভৌগলিক পরিবেশ আরব উপদ্বীপের

---

২৪৩. P.K. Hitti, *History of the Arabs,* Op. Cit, PP. 44-49; R.A. Nicholson, Op. Cit, PP. 17-21

জনগনের দেহ মন চরিত্র ও সকল কর্ম কান্ডের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে আরবদের ব্যবহারে এর বহুবিধ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন তাদের ব্যবহার ও আচারণে কোমলতার চেয়ে রুক্ষ স্বভাবই পরিলক্ষিত হয়।

৫.৪.৪ শহরবাসী আরবের জীবনে সভ্যতার ছায়া

আরব ভূখন্ডের স্বল্প সংখ্যক এলাকাতে যে অতি নগন্য সংখ্যক কৃষিজীবী স্থীয়ীভাবে বসবাস করত তাদের মধ্যে জীবন স্পন্দন ও কর্ম চাঞ্চল্য ছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে দেশ-দেশান্তরে গমন করত। বহির্জগতে যোগাযোগের ফলে তাদের জীবন ছিল পরিবর্তনশীল। এভাবে তারা নিজস্ব সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। যেমন, দক্ষিন আরবের ইয়ামিনে ও ওমানে প্রাচীন আরবী সভ্যতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইয়েমেন থেকে আফ্রিকায় এবং ওমান থেকে ভারত মহা সাগরে অবস্থিত দেশ সমূহ যেমন শ্রীলংকা, ইন্দোনিশিয়া ও মালয়েশিয়া তারা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতো।

৫.৪.৫ যাযাবর আরবদের সংগ্রামী জীবন

কিন্তু অধিকাংশ আরব ভু-খন্ড মরুময়। এখানকার মরুভূমি প্রকৃতির রুদ্রলীলাস্থল। প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে লড়াই করে জীবন ধারণ করতে হয় বলে মরুদুলাল আরবগণ কর্মঠ, কষ্টসহিঞ্চু, ধৈর্যশীল, রুক্ষ, দুর্ধষ, দু:সাহসিক জাতীতে পরিণত হয়েছিল। ভৌগলিক প্রভাব ও পরিবেশের কারণে আরবের রৌদ্রদগ্ধ বালু-কণা, নিষ্করুণ ও উন্মাদ লু হাওয়া রুদ্র পর্বতমালা সে দেশের অধিবাসীদেরকে পরিশ্রমী ও সংগ্রামশীল জাতিরুপে গড়ে তুলেছিল। নিজেদের আহার ও পানীয় এবং পশুচারণ ও পশুপালনের প্রয়োজনে মরুবাসী বেদুঈনগণ যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মূল আরবগণ এখনও নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে এ যাযাবর বৃত্তির কথা তুলে ধরে

এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড হিসাবে বিচার করে থাকে।

৫.৪.৬ দলপতির অধীনে সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন

নিরাপত্তার প্রয়োজনে তারা স্ব স্ব গোত্রের দলপতির নেতৃত্বে দলবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করত। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই তারা আক্রমনাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক উভয় প্রকার যুদ্ধে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এরুপে গৃহীত সৈনিকবৃত্তি তাদের জীবনে শৃঙ্খলা, সংঘবদ্ধতা, একতা, শক্তি ও সাহস সঞ্চার করতে এক বলিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবেই মরুবাসী আরব বেদুঈনদের জড়-জীবনে আরাম আয়েশ ছিল না; ছিল শুধু মুক্ত জীবনের অফুরন্ত আনন্দ ও নিরংকুশ স্বাধীনতার অপূর্ব আকাঙ্খা। মাথার উপর সুবিশাল সুনীল আকাশ ও পদতলে সীমাহীন মরুভূমির স্বাধীন আবহাওয়ায় তারা স্বাধীনতাকেই আরব জীবনের প্রধান সম্পদ বলে মনে করত। ফলে তারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের মত ঝুকি গ্রহণ করতে তারা পিছপা হত না।

ভৌগলিক পরিবেশের কারণে খাদ্য ও পানীয়ের দুস্প্রাপ্যতা, দু:সহ তাপ, পথের অভাব ইত্যাদি বৈদেশিক আক্রমনের হাত থেকে আরবদেশকে রক্ষা করেছে। আরববাসী কোন শক্তির কাছে মাথা নত করতে রাজি ছিল না।[২৪৪] তারা প্রতিবেশী অন্যান্য জাতির ন্যায় মহাবীর আলেকজান্ডারের আনুগত্য স্বীকার করেনি কিংবা তার নিকটে কোন দুতও পাঠায়নি। দেশের আবহাওয়া ও প্রকৃতির প্রভাবে আরবের নাগরিক দেশের স্বাধীনতা অটুট রাখতে সচেতন ছিল। এভাবে প্রতীয়মান হয়

২৪৪. P.K. Hitti, *History of the Arabs*, Op. cit, PP. 21-26

যে, আরবের প্রাকৃতিক অবস্থান ও বৈচিত্র দেশবাসীর স্বভাব গঠনে এবং ইতিহাস রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উপরে উল্লেখিত ভৌগলিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে ও প্রতিপালিত হয়ে মরুবাসী আরব সন্তানরা অন্য জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে তা আরও উন্নত ও সুমার্জিত করার অদ্ভূত ক্ষমতাও লাভ করেছিল। এ ক্ষমতা বলে তারা মিশরীয়, অ্যাসেরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীকো-রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে তা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ইসলামের অনুপ্রেরণায় আরববাসীর লুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল।

যা হোক, এতক্ষন পর্যন্ত তাদের কতিপয় ভালো গুণের দিকটি আলোচনা করা হল। এবার জাহেলী যুগের আরবীয় সংস্কৃতির খারাপ কয়েকটি দিক নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

৫.৪.৭ যুদ্ধ বিগ্রহ

প্রত্যেক গোত্রই অপর গোত্রের প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ করত। তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ক্ষতি সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করত। অতি খুঁটিনাটি বিষয়কে উপলক্ষ বানিয়ে মহাযুদ্ধের সূত্রপাত করত। মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাত ছিল তাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। শিশুকাল হতেই নিহত আত্মীয়-স্বজনের প্রতিশোধ গ্রহণের অদম্য স্পৃহা অন্তরে পোষণ করত।[২৪৫] যৌবনে পদার্পন করা মাত্রই হত্যার প্রতিশোধের উদ্দেশ্য ঢাল-তলোয়ার হাতে নিয়ে রণাঙ্গনে ঝাপিয়ে পড়ত। এরুপ অনুষ্ঠিত কোন কোন যুদ্ধ শতাব্দী কাল পর্যন্ত বংশানুক্রমে অব্যহত থাকত।[২৪৬]

---

২৪৫. প্রাগুক্ত

২৪৬. শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জুল হোসাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, nhiZ gnv¤§` g¯Ídv (mv.): mgKvjxb cwi‡ek I Rxeb, ঢাকাঃ ইসলমিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ৫১-৫২

৫.৪.৮ লুটতরাজ

সে কালে আরবদের অধিকাংশ গোত্রই লুট-তারাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের কাছে লুট-তারাজ দূষনীয় কাজে বলে পরিগণিত হত না। প্রত্যেক গোত্রই অপর গোত্রের ধন-সম্পদ গৃহপালিত পশু এমন কি স্ত্রী কন্যা পর্যন্ত লুন্ঠন করে নিয়ে যেত এবং দাসীরুপে বিক্রি করে অর্থ-উর্পাজন করত। ডাকাতিতে সিদ্ধহস্ত হওয়া কৃতিত্বের ও বীরত্বের পরিচায়ক ছিল। খ্যাতনামা ডাকাতগণ জনসভায় স্বীয় লুটতরাজের কাহিনী বর্ণনা করে গৌরব বোধ করত। নিরীহ পথিকদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করার বীরত্বের কথা উল্লেখ করে কবিতা আবৃত্তি করত।

৫.৪.৯ চুরি

আর্থিক অনটনের দরুন চুরির প্রসারও কম ছিল না। ইতর-সম্ভ্রান্ত নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই চোরের আধিক্য ছিল। যে সব বীরের সমাজে প্রতিপত্তি ছিল না তারাই চুরির পেশা অবলম্বন করত। অতি সংকটাপন্ন স্থান হতে চুরি করতে পারলে লোক সমাজে স্বীয় চৌর্য- কৌশল বর্ণনা করে আত্মগৌরব করত। তৎকালীন প্রসিদ্ধ চোর তায়াব্বাতা, শাররা প্রমূখ স্বীয় চুরির কৃতিত্ব প্রকাশ করে আত্মম্ভরিতাপূর্ণ একটি কবিতা রচনা করেছিল যা আরবী সাহিত্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[২৪৭] চৌর্য-বিদ্যায় প্রায় লোকই সুপন্ডিত ছিল। এ জন্যেই ইসলাম গ্রহণ করতে আসলে নবীজী (সা.) স্ত্রী- পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নিকট হতেই চুরি না করার অঙ্গীকার নিতেন।[২৪৮]

৫.৪.১০ নিষ্ঠুরতা

২৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
২৪৮. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪

সর্বদা মারামারি, কাটাকাটি, চুরি, ডাকাতিতে লিপ্ত থাকার দরুন তাদের অন্তরে মায়া-মমতার লেশমাত্র ছিল না। তারা ছিল মানবাকৃতির দানব বা হিংস্র প্রাণী।[২৪৯] জীবিত প্রাণী (উট ও দুম্বা) এর মাংস কেটে নিয়ে কাবাব তৈরি করত। এটাই তাদের অত্যন্ত স্পৃহনীয় খাদ্য ছিল। একদিকে বাকশক্তিহীন নিরীহ প্রাণী রক্তে রঞ্জিত হয়ে যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকত। অপরদিকে তারা আমোদ প্রমোদ করে কাবাব ভক্ষণ করত। কোন জীবিত প্রাণীকে বৃক্ষমূলে আবদ্ধ করে লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করত, তীর নিক্ষেপের অনুশীলন করত। যুদ্ধে বন্দিনী গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেট ফেড়ে সন্তান বের করে বধ করত। যুদ্ধে নিহত শত্রুর নাক-কান ইত্যাদি অবয়ব সমূহ কেটে হার বানিয়ে মেয়েরা কণ্ঠে ধারণ করত এবং বক্ষ বিদীর্ন করে দিত ও কলিজা বের করে চিবিয়ে চিবিয়ে টুকরা টুকরা করে অন্তরের ঝাল মিটাত।[২৫০] শত্রুকে হত্যা করে তার মাথার খুলি ভরে মদ পান করতো। শত্রুকে শাস্তি দিত এভাবে যে বৃক্ষের বিভিন্নমূখী মজবুত দুটি শাখা সজোরে বাকা করে প্রত্যেক শাখার সাথে তার একখানা পা বেধে ছেড়ে দিত আর অমনি সে দ্বিখন্ডিত হয়ে শাখাগ্রে ঝুলে থাকত। তা দেখে তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ত।[২৫১] আর অপরাধী বা শত্রু মহিলাকে শাস্তি দিত এভাবে যে ঘোড়ার লেজের সাথে তার একখানা পা বেধে প্রস্তরময় স্থানে ঘোড়াটিকে দৌড়াতে থাকত। এভাবে তাদের নিষ্ঠুরতার কোন শেষ ছিল না। প্রাণী ও মানুষের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেই তারা আনন্দ পেত।

৫.৪.১১ ব্যভিচার

২৪৯. প্রাগুক্ত
২৫০. প্রাগুক্ত
২৫১. প্রাগুক্ত

ব্যভিচার-অনাচার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, প্রকাশ্যভাবে যিনা করা যদিও অবৈধ ছিল কিন্তু গুপ্তভাবে যিনা করাকে তারা অন্যায় মনে করত না।[২৫২] যিনা ব্যভিচার কিংবা ধর্ষণের পর প্রকাশ্য সভায় স্বীয় বদমাশী এবং গুন্ডামীর কাহিনী বর্ণনা করাকে গৌরব মনে করত। আরবী সাহিত্যর শ্রেষ্ঠ কবি ও কিন্দা রাজ্যের যুবরাজ ইমরাউল কায়েস ফুফাতো বোন উনায়যার সাথে এবং অন্যান্য আরও মাহিলাদের সাথে যে সমস্ত অপকর্ম করেছিল তা স্বীয় রচিত *কাসীদায়ে লামিয়া* নামক কবিতায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে।

৫.৪.১২ নির্লজ্জতা

তদানীন্তন আরবে লজ্জা বলতে কোন বিষয় ছিল না। সে কালের অসভ্য আরবগণও পবিত্র কাবা ঘরের হজ্জ পালন করাকে মহাপূণ্য বলে মনে করত। হজ্জের মৌসুমে হাজার হাজার লোক সমাবেত হতো, সেখানে কুরাইশ বংশীয় লোক ব্যতীত আর সকলকেই সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় পবিত্র কাবা ঘরকে প্রদক্ষিণ করতে হত। এভাবে পবিত্র কাবা ঘরের মত পবিত্র জায়গাতে কুরাইশরা অন্যান্য লোকদেরকে উলঙ্গ তাওয়াফ করতে বাধ্য করত। এতেই বুঝা যায় কতটুকু লজ্জাহীন হলে তারা একাজ করতে পারে।

৫.৪.১৩ নারী উৎপীড়ন

নারীদের দুর্দশার সীমা ছিল না। তারা দায় ভাগের স্বত্বাধিকারী হত না। তারা বলত, যে রণাঙ্গনে অসি ধারণ করতে পারে সেই দায় ভাগের অধিকারী। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বিজয়ীগণ বিজিত

২৫২. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর, AvZ-Zvevix RvwgDj eqvb dx Zvdmxwi j KiAvb, কায়রোঃ মাকতাবা দারুল আরুবা, ১৯৭২, খ. ৫, পৃ. ১৩

পক্ষের নারীদের উপর খোলাখুলি যুদ্ধের ময়দানেই পাশবিক অত্যাচার করে স্বীয় ভোগ লালসা চরিতার্থ করত।

তালাক দেয়ার পরও তালাকদাতার বিনানুমতিতে অন্য স্বামী গ্রহণ করার তার কোন অধিকার ছিল না। বিয়ের সংখ্যা ছিল অনিয়ন্ত্রিত। যার যত ইচ্ছা তত বিয়ে করতে পারত। কোন নারী বিধবা হলে মলিন বা জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে একটি সংকীর্ণ অন্ধকার কক্ষে পূর্ণ এক বৎসর আবদ্ধ হয়ে থাকতে হতো। এ সময়ে তৈল বা সুগন্ধি জাতীয় কোন দ্রব্য ব্যবহার করা ছিলা সম্পূর্ণ নিষেধ।

মহর স্বরুপ যে অর্থ প্রদান করা হত তাতে স্বীয় কোন অধিকার থাকতো না। এ অর্থের অধিকারী হত তার পিতা।[২৫৩] মোট কথা মেয়েরুপে জন্মগ্রহণ করাই ছিল মহাপাপ। তদানীন্তন নারী ছিল সৃষ্টজগতের নিকৃষ্টতম প্রাণী। পৃথিবীতে যত অবিচার অত্যাচার ও উৎপীড়ন ছিল সবই তাকে সহ্য করতে হতো।[২৫৪]

ফলে মেয়ে সন্তানের প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা সৃষ্টি হয়। মেয়েকে কুলের কলংক ও অপমানের উৎস বলে মনে করতো। মেয়ে সন্তান জন্মেছে বলে সংবাদ পেলে পিতা অত্যন্ত দু:খিত হত। এ অপমানজনক সংবাদে তার মস্তক অবনত হয়ে যেত। সে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতো না। এর পর পরিণতি এই হল যে, মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে জীবিত মেয়েকে মাটিতে পুতে ফেলা হত।[২৫৫]

---

২৫৩. সায়্যিদ সোলায়মান নদবী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৬
২৫৪. প্রাগুক্ত
২৫৫. প্রাগুক্ত

৫.৪.১৪ ইতরতা

ভাল মন্দ বিচার না করে সর্বপ্রকার অখাদ্যই তারা ভক্ষন করত। কীট-পতঙ্গ এবং সর্বপ্রকার সরীসৃপ প্রাণী তাদের সাধারণ খাদ্য ছিল। জমাট রক্ত হালুয়ার ন্যায় টুকরা টুকরা করে উঠিয়ে খেত। পশুর চামড়া পুড়িয়ে খেত। গাধা, শুকর এবং মৃত প্রাণীর মাংস খেত। ষাঁড় পাঠা মোরগ ইত্যাদি প্রাণীকে স্বীয় কাল্পনিক দেবতার নামে ছেড়ে দিত এবং এগুলোকে খাওয়া হারাম মনে করত।[২৫৬] এভাবে ইতরতার সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত করেছিল।

৫.৪.১৫ মদ্যপান

আরবে মদের প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। ঘরে ঘরে মদের আড্ডা ছিল। মদ্যপান না করা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে শারাবখানায় আড্ডা দিত । মদ-মত্তাবস্থায় নির্লজ্জতা এবং পাশবিকতার বহু অধ্যায় রচিত হত। মদ্যপান ছিল অতি গৌরবের বিষয়। কবিগণ স্বীয় কবিতায় রঙ বেরঙয়ের মদ্যপানের কথা উল্লেখ করে আত্মগৌরব করত।[২৫৭] মদ ছিল তাদের আভিজাত্যের প্রতীক। মদ্যপান ছাড়া তাদের জীবন ছিল অচল। ছোট-বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানে মদ পরিবেশন করা হত।

৫.৪.১৬ জুয়া

মদ্যপানের ন্যায় আরবের ঘরে ঘরে জুয়ার খেলার অড্ডা হত। ধন-সম্পদ বলতে উটই ছিল আরবের প্রধান সম্বল। এজন্যে উট দ্বারাই তারা জুয়া খেলত। জুয়ালব্ধ মাংস গরীব-দু:খী এবং বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়াকে গৌরবের বিষয় বলে তারা মনে করত। সুতরাং যারা জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ না করত তারা সমাজে ঘৃণিত ও তিরষ্কৃত হত। এমনকি তাদেরকে তুচ্ছ-কৃপণ

২৫৬. সায়্যিদ সোলায়মান নদবী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৮
২৫৭. প্রাগুক্ত

বলে আখ্যা দেয়া হত। এমন লোকদের সাথে বিয়ে শাদীর সম্বদ্ধ করা অপমানজনক বলে মনে করা হত।[২৫৮]

জুয়া খেলায় তারা এরুপ মত্ত ছিল যে, জুয়ায় পরাজিত হয়ে সমস্ত ধন সম্পত্তি নষ্ট করার পর স্বীয় স্ত্রী কন্যার উপর বাজি রেখে জুয়া খেলত এবং পরাজিত হলে স্ত্রী কন্যাকে প্রতিপক্ষের নিকট সমর্পন করতে বাধ্য হত।

সুতরাং মদ ও জুয়ার আড্ডায় এসব বিষয় নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া, কলহ এবং যুদ্ধ বিগ্রহহের সুত্রপাত হত। আবস ও যুবয়ানের ইতিহাস বিখ্যাত চল্লিশ বছরব্যাপী স্থায়ী ধ্বংসত্নক যুদ্ধও ঘোড়াদৌড়ের জুয়াখেলা হতেই সূত্রপাত হয়েছিল বলে জানা যায়।

৫.৪.১৭ সুদখুরী

আরবদেশে সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সমস্ত সম্পদশালী লোকেরাই সুদের কারবার করত। সুদের সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে, নিদিষ্ট হারে সুদ নির্ণয় স্বাপেক্ষে টাকা ফেরৎ দেয়ার মেয়াদ নির্ধারিত করে দেয়া হত। উক্ত মেয়াদের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে না পারলে মেয়াদ বেড়ে যেত এবং সুদের হারও বৃদ্ধি পেত। ক্রমান্বয়ে সুদের অবস্থা মারাত্নক রুপ ধারণ করতে লাগল। সর্বশেষে এমন অবস্থায় পরিণত হল যে, চক্রবৃদ্ধি সুদ অপেক্ষাও বহুগুণে মারাত্নক ছিল। মেয়াদের মধ্যে টাকা আদায় করতে অসমর্থ হলে মেয়াদ বাড়িয়ে আসল টাকা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ বলে ধরে নেয়া হত। এভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে মহাজন খাতক

২৫৮. ফখরুল রাযী, AvZ-Zvdmxiæj Kexi, করাচীঃ মাকতাবা ইসহাকিয়া, খ. ২, পৃ.৩৩১

সর্বসম্পত্তির অধিকারী হত।[২৫৯] ফলে সুদের যাতাকষ্টে সারাদেশের গরীব কাঙ্গালি কৃষকগণ পুজিপতিদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

৫.৪.১৮ গনৎকার

মহল্লায় মহল্লায় এক বা একাধিক গনৎকার ছিল। তারা ভবিষ্যৎ বাণী দিতে পারতো বলে সাধারণ লোকদেরকে বুঝাতো। মূলত তারা এর মাধ্যমে প্রতারণা করত। গনৎকার করার নামে প্রতারণা করে সর্বসাধারণের নিকট হতে উপঢৌকন ও অর্থ করি পেত। এরা নানা রকমের ভান করে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার জ্বালে জড়িয়ে রেখেছিল। সমস্ত দেশের উপর এদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এদের প্রভাবেই সমস্ত আরব শত শত অবাস্তব কাল্পনিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিল।[২৬০]

৫.৪.১৯ ধর্ম বিশ্বাস

অতি প্রাচীনকাল হতেই আরবগণ আল্লাহ তায়লার প্রতি যে বিশ্বাস রাখত- তার প্রমান প্রাচীন শিলালিপিতে পাওয়া যায়। হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মাধ্যমে আরবগণ একত্ববাদের শিক্ষা পেয়েছিল। কালক্রমে পয়গম্বরের শিক্ষা ভুলে তারা প্রকৃত প্রভু আল্লাহ তায়ালা ছাড়াও আরও অনেক উপাস্যের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। তারা মনে করত আল্লাহ তায়ালা আসমান জমিন সৃষ্টি করে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং যাবতীয় পার্থিব কাজ-কর্মের ভার এ সমস্ত ছোট ছোট উপাস্যের হাতে ন্যস্ত করেছেন। তারা আরও বিশ্বাস করতো যে মানুষের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ এরাই পূর্ণ করতে পারে।। ফলে তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার চেয়ে এদের কাছে প্রার্থনা করত

---

২৫৯. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২৬০. সায়্যিদ সোলায়মান নদবী, প্রাগুক্ত পৃ. ২৬৭

এবং এদের নামেই কুরবানী দিত। তারা আরও মনে করত যে এই ছোট উপাস্য সমূহের পূজা করলে এবং তাদের নামে কুরবানী করলে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি হবেন এবং এরাই আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। পবিত্র কুরআনে তাদের এরুপ বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে,

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

“যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরুপে গ্রহণ করেছে এবং বলে যে আমরা এদের ইবাদত করি এ জন্যে যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে রাখে।”[২৬১]

৫.৪.২০ পৌত্তলিকতা

আল্লাহ তায়ালা বাদ দিয়ে অন্যান্য যে সমস্ত উপাস্যের প্রতি তারা বিশ্বাসী ছিল তাদের মূর্তি তৈরি করে তারা পূজা করত। উপাসনালয়গুলোকে মূর্তিদ্বারা পরিপূর্ণ করে রাখত।[২৬২] উল্লেখ্য, আমর খুযাঈ নামক কাবা ঘরের এক মুতওয়াল্লী বলকায় বেড়াতে গিয়ে সেখানকার লোকদেরকে মূর্তিপূজা করতে দেখে তার মনে মূর্তিপূজার আগ্রহ জন্মে। তাই সেখান হতে একটি মূর্তি এনে পবিত্র কা’বা গৃহে স্থাপন করে তার উপসনা শুরু করে দেয়। তাকে এরুপ করা দেখে সকলেই কাবা ঘরের অঙ্গনে মূর্তিপূজা শুরু করে দিল। তারপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে সারা দেশে বহু মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং এদের পূজার শুরু করা হয় মূর্তিদের মধ্যে সকলেই ছিল শ্রেষ্ঠ দেবতা বা দেবী তবে মানাত, লাত ও উযযা[২৬৩] কে সর্বশ্রেষ্ঠ ধরা হত। পবিত্র কাবা ঘরে ও এর আশেপাশে তিনশত ষাটটি মুর্তি ছিল। পৌত্তলিকতার প্রভাবে ক্রমান্বয়ে দেশে নানা প্রকার

২৬১. আল-কুরআন, ৩৯:০৩
২৬২. ইমাম বুখারী, আস সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড,পৃ. ৬২৮
২৬৩. মুল্লা’ মহিউদ্দীন, mxiv‡Z g¯Ídv, দিল্লীঃ মাকতাবা উসমানিয়া, ১৯৫৭, পৃ.১২১

মারাত্মক কু-প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। মানুষের হাতে গড়া দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্যে হাজার হাজার প্রাণীর বলি হয় এমনকি মূর্তিদের চরণ তলে মানুষ পর্যন্ত বলি হতো।

উপরের বর্ণনা হতে সুস্পষ্ট হল যে জাহেলী যুগে আরবের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভাল গুণাগুনের চেয়ে মন্দগুণই বেশী ছিল। তাদের ভাল গুণগুলো মন্দগুণের মধ্যে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে হাতে গুণা কয়েকজন ব্যক্তি শিক্ষার আলো পেলেও বাকীরা সে আলোর ধারে কাছেও আসতে পারেনি। আবার শিক্ষিত লোকেরা শিক্ষার আলো দ্বারা অবশিষ্ট লোকদেরকে আলোকিত করতে পারে নি। যার ফলে আরব সামাজে লেখা-পড়ার দিক থেকে তেমন কোন অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি যদিও বিশ্ব সাহিত্যের মানদন্ডে সে সময়ের আরবী কবিতার সুনাম সুখ্যাতিকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। অন্যদিকে সংস্কৃতির জগতে অপসংস্কৃতি বা কুসংস্কৃতিই তারা সংস্কৃতির নামে চর্চা করতো। তারা সংস্কৃতিবান হয়েও ছিল কুসংস্কারে মোহসক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

lô Aa¨vq

nhiZ gnv¤§‘ (mv.) Gi RxeÏkvq Bmjvgx wkÿv I ms¯wZi GKwU mswÿß

chv‡jvPbv

6.1 bexRx (mv.) Gi RxeÏkvq Bmjvgx wkÿv

আমরা জানি রাসূলে কারীমের (সা.) জীবনকালেই গোটা আরব উপদ্বীপে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল। বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের পর আরবের বেশিরভাগ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে আল কুরআন ও ইসলামী শরীআতের শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান এ আত্মনিয়োগ করে। ফলে প্রতিটি গোত্রে ও প্রতিটি জনপদে পড়া ও পড়ানোর ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। আর মহানবী (সা.) শিক্ষাদানের জন্যে বহু সাহাবীকে বিভিন্ন জায়গাতে শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এ সকল সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ কেবল মানুষকে দ্বীনের শিক্ষাই প্রদান করতো না বরং তাদেরকে ভালভাবে জীবনযাপন ও বাঁচতে হয় তার শিক্ষাও দিতেন। উল্লেখ্য মহানবী (সা.) নিজেই ছিলেন সর্বোত্তম শিক্ষক এবং তার শিক্ষার সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তারা সকলেই ভাল ছাত্র ও শিক্ষকে পরিণত হয়ে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর জন্যে বিভিন্ন জায়গাতে গিয়েছিলেন।

6.1.1 wnhi‡Zi c‡e g°vq Bmjgx wkÿv I wkÿv e¨e¯v

মক্কা মুকাররামায় ইসলামের জন্য বিরুপ পবিবেশ বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও কোন না কোন ভাবে কুরআন শিক্ষা অব্যাহত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) মাক্কী জীবনের পূর্ণ সময়কালে মক্কায় কোন নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষালয় গড়ে ওঠেনি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হজ্জ মওসুমে এবং সময় ও সুযোগ মত

মানুষকে কুরআন শোনাতেন। এ সময়ে মসজিদে আবু বকর, দারে আরকাম (আরকামের গৃহ), ফাতিমা বিনত খাত্তাবের বাড়ি, শি'আবে আবী তালিব প্রভৃতি স্থানকে অনেকাংশে শিক্ষালয় বলে অভিহিত করা যায়।[২৬৪] মক্কার সেই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ (সা.) মাক্কী জীবনের এ সময়কালে বেশ কিছু ক্বারী ও মু'আল্লিম (কুরআন পাঠক ও শিক্ষক) তৈরি হয়েছিলেন যারা অন্যদেরকে কুরআন শেখান এবং দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদান করেন। খাববাব ইবন আরাত (রা.) কুরআন শিক্ষা দিতেন ফাতিমা বিনত খাত্তাবের (রা.) গৃহে। রাসূলুল্লাহর (সা.) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রা.) মাদীনার কুবা পল্লীতে মুস'আব ইবন উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতুম (আমর ইবন কায়েস আল আ'মা) নাকী আল খাদিমাতে এবং রাফি ইবন মালিক যারকী (রা.) মাসজিদে যুরাইক এ শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতেন। এদের সকলেই ছিলেন উল্লেখিত মক্কার শিক্ষালয়গুলোর কৃতী ছাত্র। আর মদীনার প্রথম পর্বের এই শিক্ষালয়ের ছাত্ররাই তখন মাদীনায় প্রতিষ্ঠিত একাধিক মাসজিদের ইমামতির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানুষকে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের খিদমাত ও আঞ্জাম দিতেন।

6.1.2 wnhi‡Zi c‡i g'xbvq Bmjvgx wkÿv I wkÿv e¨e¯v

রাসূলুল্লাহর (সা.) মদীনায় হিজরাতের পরে মাদীনায় মসজিদে নববী কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় হিসেবে গড়ে ওঠে। সেখানে স্বয়ং সায়্যিদুল মু'আল্লিমীন রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষকে শিক্ষা দিতেন। তাছাড়া আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উবাই ইবন কা'ব, উবাদা ইবন আস সামিত (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামও এই শিক্ষালয়ের মুকরী ও মু'আল্লিম (কুরআনের পাঠক ও শিক্ষক) ছিলেন।[২৬৫] এই মাসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষালয়ের যারা শিক্ষার্থী ছিলেন তাঁরা নিজেদের ঘরে নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতেন।

---

২৬৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষাদান পদ্ধতি*, ঢাকা: ইসলামিক সেন্টার, ২০১১, পৃ. ১৬৮

২৬৫. প্রাগুক্ত

এভাবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে গোটা মদীনা শহরটি জ্ঞান চর্চার শহরে পরিণত হয়। এর প্রতিটি অলি গলিতে কুরআনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্র ও প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) দক্ষ কুরআন পাঠক তথা কারীদেরকে মু'আলিম হিসেবে বিভিন্ন গোত্রে পাঠাতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষালয় থেকে শিক্ষা লাভ করে বিভিন্ন গোত্রের নেতা ও প্রধানগণ নিজ নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে গোত্রীয় লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন। এ সময়ে মক্কা ও মদীনার পরে ইয়ামেনের বিভিন্ন অঞ্চল ও জনপদে পঠন-পাঠন তৎপরতা সবচেয়ে বেশি শুরু হয়।

6.1.3 gnvbex (mv.) †cÖiZ KgKZv I KgPvixi gva¨‡g Bmjvgx wkÿvi e¨e¯v

বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিজ নিজ প্রভাব বলয়ের মধ্যে মানুষকে কুরআন, সুন্নাহ, ফারায়েজ, দ্বীন ও শরীয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের পর মক্কায় মু'আয ইবন জাবাল, তায়িফে ইছমান ইবন আবিল আস আছ-ছাকাফী, উমানে আবু যায়দ আল-আনসারী, নাজরানে খালিদ ইবন আল-ওয়ালিদ, ইয়ামেনে আলী ও আবু উবায়দা ইবন আল-জাররাহ এবং জানাদে মু'আয ইবন জাবাল (রা.) এই দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২৬৬]

এ সকল ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.) যে সকল ব্যক্তিকে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগ করেন, তাঁরা সেখানে গিয়ে শিক্ষকতার ও ইমামতের দায়িত্ব পালন করেন। মুসলমানদেরকে দ্বীন বিষয়ক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ সকল পদে তাদেরকেই নিয়োগ দেওয়া হতো যারা কুরআন, সুন্নাহ এবং দ্বীন ও শরীয়তের জ্ঞানে জ্ঞানী হতেন। তাঁরা সকলে এসব বিষয়ের জ্ঞানই

২৬৬. প্রাগুক্ত

লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষামূলক সফরের ধারাবাহিকতাও চালু ছিল। দুর-দুরান্ত থেকে সাক্ষাতের জন্য বিভ্নিন প্রতিনিধিদল ও ব্যক্তিবর্গ রাসূল (সা.) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসতো। একদা আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বললো, আমরা বহু দূর থেকে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এসেছি। পথে কাফির গোত্র মুদার এর আবাসস্থল। এ কারণে আমরা কেবল পবিত্র হারাম মাসে আপনার নিকট আসতে পারি। ‘উকবা ইবন হারিছ (রা.) মাত্র একটি মাসায়ালা জানার জন্য মাদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) খিদমতে হাজির হন।[২৬৭]

6.1.4 RvqMx‡ii e¨e¯vcbv

প্রথম দিকে শিক্ষার্থীদের থাকা ও খাওয়ার জন্য কোন সমস্যার সম্মখীন হতে হত না। রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার দারুল আরকাম এ অবস্থানকারী সাহাবীগণের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন সচ্ছল সাহাবীগণের গৃহে যাকে জায়গীর নামেও অভিহিত করা হয়। মাদীনার কুবা-তে সা’দ ইবন খায়ছামার শূন্য বাড়ি “বায়তুল আযযাব” ছিল ছাত্রাবাস। “আসহাবে সুফফাহ” মাসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন এবং সরাসরি মহানবী (সা.) এর কাছে থেকে জ্ঞান চর্চা করতেন। আর দূর-দুরান্ত থেকে আগত শিক্ষার্থী তথা প্রতিনিধিদল এবং বিভিন্ন ব্যক্তি-বর্গ আসলে তাঁরা সাধারনত রামলা বিনত হারিছ এর গৃহে অবস্থান করতেন। আসহাবে সুফফার আহারের ব্যবস্থা করতেন মাদীনার আনসারগণ এবং রাসূল (সা.) নিজে। আর বহিরাগতের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আতিথেয়তা ও বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থাও ছিল।[২৬৮] মাঝে মাঝে মহানবী (সা.) নিজে তাদের দেখা শোনা করতেন এবং কখনও স্বচ্ছল সাহাবীদেরকে দাায়িত্ব নিতে বলতেন।

---

২৬৭. ইমাম বুখারী, আস সহীহ আল বুখারী, বাবু তাহরীদ আন- নাবিয়্যা ওয়াফদা আব্দুল কায়ম, হাদীস নং-৫; বাবুর রিহালা ফিল মাসায়ালা, হাদীস নং-৮৬
২৬৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, ১৭০

6.1.5 Avj KiAv‡bi wkÿv I wkLv‡bvi e¨e¯'vcbv

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা হতো সাধারণত মৌখিকভাবে। লিখিত মাসহাফের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। এমনিতেই তৎকালীন আরবে লেখা-লেখির তেমন প্রচলন দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও ওহী লেখা হতো এবং শিক্ষার্থীদের হাতে কিছু কিছু সূরা লিখিতরুপেও পাওয়া যেত। মক্কাতে ফাতিমা বিনত খাত্তাবের গৃহে একটি সহীফা থাকার কথা জানা যায়। মদীনায় উবাদা ইবনে সামিত মৌখিকভাবে কুরআন শিক্ষাদানের পাশাপাশি লেখাও শেখাতেন। এছাড়া বদর যুদ্ধের বন্দীদের দ্বারা লেখা শেখানো হয়। ফলে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে লেখার প্রচলন হয় এবং মাসহাফ লেখা হয়। কোন কোন সাহাবী মাসজিদে নববীতে হাদীছও লিখতেন বলে জানা যায়। তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে কুরআনের শিক্ষা মৌখিক ভাবেই হতো। সম্মানিত বিশেষ বিশেষ সাহাবী সম্পূর্ণ কুরআনের হাফিয ও ক্বারী ছিলেন। পক্ষান্তরে বেশিরভাগ সাধারণ সাহাবা প্রয়োজন পুরণের মত কিছু সূরা মুখস্থ করে নিতেন।

6.1.6 gmwR'mgn wQj Bmjvgx wkÿv †K›'

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনকালে মসজিদসমূহে শিক্ষার আসর ও বৈঠক বসতো। অনেক সাহাবী নিজ নিজ গৃহে বৈঠক বসিয়ে মানুষকে এর দ্বীনের তা'লীম দিতেন। পরবর্তীতে এই সুন্নাত অনুসারে আলিমগণ মাসজিদসমূহকে জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানদানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী দু'তিন শো বছর পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। সে সময়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের অথবা শিক্ষার্থীদের জন্যে পৃথক কোন স্থপনা নির্মাণের এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[২৬৯] মসজিদের আশে পাশের লোকজনই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এর বিনিময়ে তারা শিক্ষক

২৬৯. প্রাগুক্ত

ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করতেন না; কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও দ্বীন ইসলামের খেদমতেই তারা এ সকল কাজ কর্ম স্বেচ্ছামূলক ভাবে করতেন।

6.2 gnvbex (mv.) Gi RxeÏkvq Bmjvgx ms¯‹wZ

এবার জানা যাক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলামী সংস্কৃতি কেমন ছিল- সে বিষয়ে

6.2.1 wekv‡mi cYMVb

সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেওয়ার সময় এ কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে মানুষ যা করে তাই তার সংস্কৃতি। তবে যর্থাথ অর্থে মানুষের রুচিশীল ও ভদ্র আচার-আচরণ, ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্ম, সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও শালীন চিত্ত-বিনোদনের ক্রিয়া-কর্ম ইত্যাদি সবই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সংজ্ঞার আলোকে এটা সহজেই বলা যায় মহানবী (সা.) জীবদ্দশায় যা যা করেছেন সবই তার সংস্কৃতি ব্যক্তি মানুষ হিসেবে। তবে নবুয়্যাত পাওয়ার পর মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী তিনি যে সকল কাজ-কর্ম করেছেন, করতে বলেছেন অথবা সাহবীরা করেছেন তিনি সমর্থন করেছেন কিংবা চুপ থেকেছেন বা প্রতিবাদ করেননি তার সবই ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উদহারণ। অপরদিকে যা তিনি করেননি, করতে বলেননি কেউ করলে প্রতিবাদ করেছেন ইত্যাদি অবশ্যই ইসলামী সংস্কৃতির উদহারণ হতে পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান নিজে এনেছেন এবং অন্যদেরকে আনতে বলেছেন। কাজেই ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে এগুলো হচ্ছে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলোর উপর সুগভীর বিশ্বাস ছাড়া ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়া যায় না। অথচ ইসলাম পূর্ব আরবের লোকেরা নানা ধরনের কুসংস্কারসহ বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিল। মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। সেখানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওহী ভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিশ্বাসের পূণর্গঠন করে বহু প্রভুর পরিবর্তে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী বানালেন। তাদের কলিজার মধ্যে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কাছে দুনিয়ার জীবনের জবাবদিহীতার ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা কবর, হাশর, বেহেশত ও দোযখের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী বানালেন। শুধু তাকেই নবী ও রাসূল হিসেবে নয় বরং তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে বিশ্বাস করার জন্যে প্রস্তুত করলেন। তাদের সকলের উপর অবতীর্ণ সকল কিতাবের উপর বিশ্বাস করতে বললেন। ফিরিশতা ও জ্বিনসহ আরও অনেক অদেখা জিনিসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বললেন। এভাবে তিনি এমন সব জিনিসের প্রতি বিশ্বাসী বানালেন যেখানে দেখার বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণরুপে অনুপস্থিত।[২৭০]

6.2.2 wekv‡mi ‘vexbhvqx Kg MVb

এরপর বিশ্বাসের দাবী অনুযায়ী কর্ম করার জন্যে তিনি বিশ্বাসীদেরকে প্রস্তুত করলেন। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, পুরো রমজান মাসে সিয়াম পালন করা, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীকে নিজেদের অর্জিত সম্পদ থেকে অন্যদের লুকায়িত অধিকার তথা[২৭১] প্রতি বছর বাধ্যতামূলক যাকাত প্রদান করা এবং সামর্থবানের জন্যে কমপক্ষে জীবনে একবার হজ্জ করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হল। ইবাদত তথা প্রার্থনার মত কতিপয় বিধান জাহেলী আরবে বিদ্যমান থাকলেও মুসলমানদের সালাত, রোজা, যাকাত ও হজ্জের বিধানগুলো অন্যান্য ধর্মের বিধান থেকে সাতন্ত্র্য ও অন্যান্য।

---

২৭০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ঈমান সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসগুলো দেখা যেতে পারে। উল্লেখ্য প্রথম অধ্যায়ে এ ব্যাপারে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে।

২৭১. এগুলো হচ্ছে ঈমানের পরেই ইসলামের মৌলিক ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর নির্দেশে তিনি নিজে এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে সে রকমভাবেই করতে বলেছেন। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও অনুশীলন সম্পর্কে অত্র পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

6.2.3 gvb‡li ‡Mvjvgxi †eovRvj n‡Z †ei K‡i Avjøvni Lwjdvi Avm‡b emv‡bv

ইসলামে দীক্ষিত করার মাধ্যমে মহানবী (সা.) মূলত মানুষের গোলামীর বেড়াজাল হতে মুক্ত করে মহান আল্লাহ তায়ালার সত্যিকারের খলিফা বা প্রতিনিধি বানানোর মাধ্যমে মানবজাতির যথার্থ মর্যাদার ব্যবস্থা করেছিলেন। মানবজাতি এ পৃথিবীতে কারো গোলামী করতে আসেনি, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বিধি বিধান মান্য করে পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্বই প্রতিষ্ঠা করতে এসেছে[২৭২]-এরকম উপলব্ধি তিনি মানবমনে জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে আমরা দেখতে পাই তার ডাকে সারা দিয়ে আরববাসী গোত্র-প্রথা, কৌলিন্য ও গোত্র শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

6.2.4 wkïi bvgKiY I AvKxKv

আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মুসিলমদের জীবনে চলে এসেছিল এক আমূল পরিবর্তন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। শিশু জন্মের সাত দিনের মাথায় স্রষ্টার শুকারিয়া স্বরুপ আক্বীকার অনুশীলন মুসলমানরা করে আসছে। অকীক্বার দিবসে নাম রাখার প্রচলন এবং ইসলামী নাম রাখা বা নবী রাসূলগণ কিংবা পূর্ববর্তী যামানার আল্লাহ তায়ালার প্রেমিক ব্যক্তিদের নামানুসারে শিশুর নাম রাখার অনুশীলন দেখা যায়। শিশুর জন্মের পরপরই তার ডান কানে আযান আর বাম কানে ইক্বামত দেওয়ার অনুশীলন হয়ে আসছে মুহাম্মদ (সা.) এর জীবদ্দশা থেকে। শিশুর প্রতি যথার্থ দায়িত্ব পালন করা, তাকে সুন্দর আচরণ শিক্ষা দেওয়া, তার সাথে কোনভাবেই প্রতারণা না করা, সর্বোপরি

---

২৭২. মানবজাতি আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি; সে কথা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ কর হয়েছে, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً– "আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করব।" (আল কুরআন, ২: ৩০)

তাকে মানব সমাজে বসবাসের মত উপযুক্ত হিসেবে তৈরি করার দায়িত্ব মুসলমানেরা নবী মুহাম্মদ (সা.) এর সময় হতেই পালনের চেষ্টা করে আসছে।[২৭৩]

6.2.5 wK‡kvi I heK‡‘i‡K wkÿv †‘Iqv

কিশোর ও যুবকদেরকে ইসলামী বিধি বিধানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং তা পালনের জন্যে বিশেষ নজরদারী করার অনুশীলন মুসলিম সমাজে চলে আসছে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময় কাল হতেই। কিশোর ও যুবকদেরকে ইসলামী সমাজে যথার্থরূপে মূল্যায়ণ করা হয়। কেননা তাদের চরিত্র ও কর্ম-প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করে ভবিষ্যতের সমাজ ব্যবস্থা।

6.2.6 wcZv gvZvi cwZ hZkxj nIqv

আবার পিতা মাতা বৃদ্ধ হলে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা অক্ষম হয়ে থাকলে তাদের প্রতি অতি যত্নশীল হওয়ার অনুশীলনটি সন্তানদের উপর নবীজী (সা.) বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।[২৭৪] মহানবী (সা.) এর শিক্ষা হতে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয় যে বৃদ্ধ পিতা-মাতা সন্তানের জন্যে বোঝা নয় বরং আশীর্বাদ স্বরূপ।

---

২৭৩. এগুলো হচ্ছে ইসলামী আদবী জিন্দেগীর অংশ। কোরআন ও হাদীসের বহু জায়গাতে পিতা-মাতাকে সন্তানদের বিষয়ে যথাথ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২৭৪. এ বিষয়ে কুরআনী নির্দেশনা জানার জন্য, মহান আল্লাহ বলেন,

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا *وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“তাঁদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাঁদেরকে ‘উহ’ শব্দটিও বলো না এবং তাঁদেরকে ধমক দিও না এবং তাঁদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা বলো। তাঁদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা!, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।” (আল কুরআন, ১৭: ২৩-২৪)

6.2.7 gZ e¨w³i AvZ¥vi ckvwšÍ Kvgbv Kiv

মৃত্যু ব্যক্তির লাশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, তার রুহের মাগফিরাত কামনা করা, জানাযা নামায পড়া[২৭৫] ইত্যাদির মত কল্যাণ কামনাকারী কাজ-কর্ম মহানবী (সা.) এর জীবনকাল থেকে শুরু হয়ে মুসলিম সমাজে অদ্যবদি চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অব্যহত থাকবে। এভাবে যদি হিসাব করা যায় দেখা যাবে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজ-কর্মে মুসলমানরা ইসলামী দিক নির্দেশনা মত করার যথেষ্ট উপকরণ পাচ্ছে। মনের বিশ্বাসের বহি:প্রকাশ ঘটে যে সকল কাজে-কর্মের মাধ্যমে, মূলত তাই মানুষের সংস্কৃতি। মহানবী (সা.) আল্লাহর বিধান অনুসারে যে সংস্কৃতির গোড়া পত্তন করেছেন তাই মুসলিম সমাজে অনুসৃত হয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি হিসাবে।

6.2.8 mvjv‡gi cPjb

আরবের লোকেরা পরস্পর দেখা সাক্ষাতের সময় বলত শুভ সকাল কিংবা শুভ দুপুর অথবা শুভ বিকাল বা শুভ রাত্রি। অর্থাৎ সময়ের সাথে সম্পর্কিত হয়ে তারা একজন আরেক জনের মঙ্গল কামনা করত; সেখানে আল্লাহ বা স্রষ্টার নাম নেওয়াটা মোটেই লক্ষ্যণীয় ছিল না। কিন্তু ইসলামের তাওহীদবাদী ও সর্বমঙ্গল দৃষ্টি ভঙ্গির দর্শনের ফলে সেখানে অনুশীলন হতে লাগল আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু অর্থাৎ আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ, করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক সম্ভাষণের মাধ্যমে। এভাবে পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাত ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময়ে সালামের প্রচলন শুরু হল।

---

২৭৫. জানাযা নামাযা হচ্ছে ফরজে কিফায়াহ। মুসলিম কোন ব্যক্তি- নর কিংবা নারীর মৃত্যু হলে তার গোসল, জানাযা ও দাফন-কাফনের যাবতীয় ব্যবস্থা করা মুসলিমদের জন্যে আবশ্যক। অবশ্য যদি কেউ বা কয়েকজন এগুলো করে থাকে- তাহলে বাকী সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়।

6.2.9 kvjxb †cvkv‡K Kvev Zvlqvd Kiv

কাবাগৃহে যেখানে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতো সেখানে মুহাম্মদ (সা.) এর সুযোগ্য নেতৃত্বে শালীন পোশাক পড়ে আসতে বাধ্য করা হল। যেখানে বহু মূর্তির অবস্থান ছিল সেখানে মক্কা বিজয়ের দিনে মহানবী (সা.) এর আদেশে মূর্তিগুলোকে সরিয়ে কা'বা ঘরকে শিরকিয়াত ও অশ্লীলতার হাত থেকে মুক্ত করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার জন্যেই নির্ধারিত করা হল এবং তারপর হতে সেখানে সুস্থ শালীন ও ভদ্র সংস্কৃতির অনুশীলন হওয়া শুরু হল।

6.2.10 wnhv‡ei Abkxjb

ইসলামের হিযাব বা পর্দার বিধানের ফলে[২৭৬] মুসলিম নারী পুরুষের পোশাক পরিচ্ছদ ও কথা বার্তায় এক আমূল পরিবর্তন চলে আসে। আগে যেখানে তারা আরবী প্রথানুযায়ী পোশাক পরতো সেখানে মুসলিম নারীদেরকে স্বাভাবিক ও সাধারণ পোশাকের সাথে আরও কিছু অতিরিক্ত পোশাক পরিধান করতে বলা হল যাতে তাদের সৌন্দর্য কোনভাবেই গায়রে মুহরিম পুরুষের দৃষ্টিতে না আসে। শুধু পোশাক পরিধানের বিষয় নয় বরং চোখের দৃষ্টি, কানের শোনা ও কথা-বার্তার মধ্যেও যেন শালীনতা ও ভদ্রতার কমতি না আসে সে বিষয়ে মহানবী (সা.) বার বার মুসলমানদেরকে সাবধান করতেন। পর্দার বিধান শুধু মেয়েদের জন্যে সীমিত ছিল না বরং পুরুষকেও তা পালন করতে হত। শরীরের একটি নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত পুরুষকেও ঢেকে রাখা, বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করা, মনে খারাপ কামনা বাসনার জায়গা না দেওয়া এবং অশ্লীল কথা বার্তা মুখে না আনার জন্যে বলা হয়েছে। এভাবে মুসলিম সমাজকে যাবতীয় কলুষতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মহানবী (সা.) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে। ফলে মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজটি ছিল

---

২৭৬. পবিত্র কুরআনের সূরা নূর-এর আয়াত ৩০, সূরা আহযাব-এর আয়াত ৫৯ এবং বহু হাদীসের মাধ্যমে পর্দার বিধান মুসলিম নর-নারী সবার জন্যে আবশ্যক করা হয়েছে।

সত্যিকারের আদর্শের সমাজ যেখানে ঠিক ব্যভিচার, জুলুম-নির্যাতন, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদির কোন অস্তিত্ব ছিল না।

6.2.11 iæwPkxj e¨e¯vcbv I ˆea Dcv‡q wPËwe‡bv`b

চিত্তবিনোদনের জন্য বৈধ হাসি, হাস্যকর কৌতুক, গল্প বলা বা শোনা, কবিতা চর্চা, শরীর চর্চা, বৈধ খেলাধুলা, ঘোড় দৌড় প্রতিযোগীতা, সীমিত আকারে রুচিশীল গান, দফ বাজানো ইত্যাদির প্রচলন মহানবী (সা.) এর সময়কালে ছিল। তবে অশ্লীল গান, নাচ, কাউকে অপবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা কুৎসা রাটনার উদ্দেশ্যে কোন ধরনের কবিতা রচনা বা আবৃত্তির সুযোগ ছিল না। নাটক, নাট্যভিনয়, সিনেমা ইত্যাদির প্রচলন তৎকালীন আরব সমাজে বিদ্যমান ছিল না বলে জানা যায়। তাই এগুলোর রুচিশীল ব্যবহারও ইসলামের দৃষ্টিতে যা বৈধ মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজে পরিলক্ষিত হতে খুব একটা দেখা যায়নি।

6.2.12 fv¯‹h, gwZ I Qwe AsK‡bi †ÿ‡Î Bmjvgx weav‡bi †hŠw³K AbrmwnZ KiY

আজকের যুগের মত ভাস্কর্য শিল্পের এত বেশি উন্নয়ন না ঘটলেও জাহেলি আরবে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মূর্তি বানানো ও বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করত অনেকে।[২৭৭] সাধারণ মানুষও দেব-দেবীর মূর্তিকে নিজের কাছে রাখা, বাড়ীতে রাখা, কার্মস্থলে রাখা এমনকি পবিত্র কাবা ঘরে রাখাকে পূণ্যের বা বরকতের কাজ মনে করত।[২৭৮] ফলে তদানীন্তন আরব সমাজ মূর্তি সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আরব সামাজ থেকে মূর্তির সংস্কৃতি অবসান হয়ে তাওহীদবাদী সংস্কৃতির

২৭৭. এ কাজটি খুবই সম্মানিত একটি পেশার কাজ। নিজেদের বানানো মূর্তির উপর তাদের বিশ্বাস ছিল অসাধারন। সর্বদা তারা মূর্তি বানাতো নিজের হাতে এবং বানানো মূর্তির উপসনা করতো।
২৭৮. পূণ্যের কারণে তারা মূর্তি রাখতে গিয়ে কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করেছিল।

উত্থান ঘটে। তবে হ্যাঁ, প্রাণীর ছবি অংকন না করে কিংবা প্রাণ আছে এমন বস্তুর ভাস্কর্য নির্মাণ না করে যদি গাছপালা, তরুলতা কিংবা নির্জীব বা প্রাণহীন বস্তুর চিত্র অংকন করা বা ভাস্কর্য নির্মাণ করলে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হত না।

6.2.13 mxwgZ cwim‡i Mvb evRbv

নাবালেগ মেয়ে কিংবা মেয়ে শিশুর কন্ঠে গান ও তাদের রুচিশীল নৃত্য কোনক্রমেই হারাম ছিল না। রাসূল (সা.) মদীনায় আগমনের দিনে মদীনাবাসী নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ-সকলেই হেলে দুলে, নেচে-গেয়ে তালাআল বদরু আলাইনা'র গানটি গাইতে ছিলেন। বিভিন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে পর্দার অন্তরালে মহিলারা মহিলাদের মাঝে রুচিশীল গান গাইত এবং রুচিশীল নৃত্যের মত বিভিন্ন কর্ম-কান্ডের মাধ্যমে নিজেদের হাসি আনন্দ প্রকাশ করতো।[২৭৯] এতে নিজেরা যেমন আনন্দ পেত অন্যদেরকেও তেমনি আনন্দ দিতে পারতো।

6.2.14 Dj i aŸwbi cwie‡Z Avjøvn eoZ I cksmv mPK k‡ãi e¨envi

জাহেলী যুগে আরববাসী বিশেষত মহিলারা কোন শুভ সংবাদ বা ধর্মীয় বিধান পালনের সময় উলুর ধ্বনি দিত। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর ঐ লোকেরাই এখন আল্লাহর প্রশংসাসূচক কোন শব্দ বা বাক্য দ্বারা এখন মনো ভাব প্রকাশ করতে শুরু করল।[২৮০] জাহেলী আরবে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারে ভরপুর ছিল। বিশ্বনবীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে মুসলমানদের মন থেকে জাহেলী যুগের সকল ধরনের

---

২৭৯. যেটা ছিল অত্যন্ত শালীন ও ভদ্রতার পরিচয়ের মাধ্যমে এবং কেবল মহিলাদের মধ্যে সীমিত।
২৮০. হাচি দিলে বলতে হয়, আল- হামদুলিল্লাহ, ভাল সংবাদ শুনে বলতে হয়, আল- হামদুলিল্লাহ, খারাপ কিছু শুনলে বলতে হয়, ইন্না-লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন ইত্যাদি।

কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছিল। এখন এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও গভীর আস্থা বোধই সকল বিশ্বাস, প্রত্যয় ও কর্মচেষ্টার মূলনীতিতে পরিণত হয়।

6.2.15 kixi I g‡bi cwiï×Zv I cwi”QbZv

মহানবী (সা.) বহুমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মনের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা আনেন। আগে যেখানে তারা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিলেন এখন তারা শিরকিয়াত ও কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস পরিত্যাগ করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহমুখী হওয়ার মাধ্যমে তারা মনের পবিত্রতা অর্জন করে। অপরদিকে ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি সালাত আদায়ের জন্যে মনের পবিত্রতার পাশাপাশি শারীরীক পবিত্রতাও (যেমন ওযু-গোসল) সম্পর্কে তারা পূর্ণ অবহিত ছিলেন। প্রতিদিন পাঁচ বার শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো ধৌত করার মাধ্যমে তারা শরীরের কোন ধরনের ময়লা জমতে দিত না। এর ফলে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে বিধায় সহজে অসুখ-বিসুখ আক্রমন করতে পারে না। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানব মনের দূষিত ও কলুষিত জিনিসগুলো দূরীভূত হয়ে নির্মল আনন্দ সুখ অনভূত হয়। অপরদিকে যাকাত আদায়কারীর অবশিষ্ট সম্পদে কোন ধরনের খারাপ কিছু থাকলে তা আল্লাহ তায়ালা নিজ গুণে মাফ করে দিয়ে থাকেন।

6.2.16 n¾ Z_v evwlK m‡¤§j‡bi e¨e¯vcbv

হজ্জ সম্পাদনের জন্যে শারীরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অপরিহার্য। হজ্জ সম্পাদনের জন্যে মানুষকে নির্দিষ্ট সময়ে যেতে হয় পবিত্র কা'বা ঘরে এবং আরাফাতের ময়দানে যেখানে বিশ্বের আনাচে-কানাচে থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম সমবেত হয়ে বিশ্ব সম্মেলনের ব্যবস্থা করে । কাজেই হজ্জ হচ্ছে বিশ্ব মুসলিমের একটি মহৎ পবিত্র সাংস্কৃতিক কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

6.2.17 LvIqvi ms¯‥Z

রাসূল্লাহ (সা.) প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজে খাবার খাওয়ার সংস্কৃতি হচ্ছে খাবারটি হালাল কি না প্রথমে যাচাই করে দেখা। হালাল খাবার হলে মহান আল্লাহর নামে অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুরু করা। খাবারের ডান দিক হতে ডান হাতে দস্তরখানায় আস্তে আস্তে খাওয়া যাতে তা হজম হতে সহায়ক হয়। মাঝে মাঝে একটু একটু করে পানি পান করা, খাবার খেতে তাড়াহুড়া না করা, খাওয়া চলাকালীন সময়ে মাঝে মাঝে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ার্থে বলা রাব্বানা লাকাল হামদ (হে আমাদের প্রভু! প্রশংসা তোমারই), এবং আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে খাওয়া শেষ করা। খাবার শুরু করার আগে ভালো ভাবে দু'হাত ধুয়ে নেয়া। অনুরূপভাবে খাওয়া শেষে সুন্দর ভাবে দু'হাত ধৌত করে নেওয়া। খাওয়ার কাজটি চামচের সাহয্যে নয় বরং হাতের সাহায্যেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে সাহাবায়ে কেরামগণ সম্পন্ন করতেন। পানি কখনও এক ঢোকে নয় বরং তিন ঢোকে আস্তে আস্তে করে পান করতেন। নবীজী (সা.) এর শিক্ষানুযায়ী সাহাবীরা পেটের তিন ভাগের একভাগ খাবার দিয়ে পূর্ণ করতেন আরেক ভাগ পানি ও আরেক ভাগে খালি রাখতেন। এমনিতেই সাহাবাগণ খাবার খেয়ে পেট ভর্তি করতেন না।

6.2.18 cwiav‡bi ms¯‥Z

কোন কিছু পরিধান করার সময় ডান দিক হতে শুরু করে বাম দিকে এসে শেষ হওয়ার নিয়ম। যে কাপড়টি পরিধান করতে হয় তা অবশ্যই রুচিশীল, মার্জিত ও ভদ্রতার পরিচায়ক হতে হত। এমনকিছু পরিধান না করা যাতে মানুষের মনের মধ্যে অহংকারবোধ ফুটে ওঠে।

জামা, পাজামা, লুঙ্গি, গেনজি, শার্ট ইত্যাদি যা কিছু পরবে তা যেন খুব বেশি আট-শাট না হয়ে বরং একটুখানি ঢিলে ঢালা হওয়ই কাম্য। পোশাক পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের শরীরের অবয়ব যেন বাহির থেকে দেখা না যায়। পুরুষ হলে টাকনু গীরার উপর পর্যন্ত যেন ঢাকা থাকে সে দিকে খেয়াল রাখার কথা বলা হয়েছে। মহানবী (সা.) বার বার পোশাকের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য যত্নশীল ও মনোযোগী হতে বলেছেন। নবীজী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কাউকে হলুদ ও লাল রঙ্গের কাপড় চোপড় পড়তে দেখলে তিনি নিষেধ করতেন।[২৮১] কাপড়ের কোথাও প্রাণীর ছবি অংকিত দেখলে নবীজী (সা.) আপত্তি করতেন।[২৮২] একদিন হযরত আয়েশা (রা.) এর গৃহের দরজার পর্দায় অংকিত প্রাণীর ছবি দেখে তিনি আপত্তি জানালে দ্রুত হযরত আয়েশা (রা.) তা পরিবর্তন করে ফেলেন। মহানবী (সা.) সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। তিনি নিজে আতর ব্যবহার করেছেন। পোশাক পরিচ্ছদ যা কিছু তাঁর ছিল সেগুলোকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন। ছেড়া হলেও সেগুলোকে তিনি নিজ হাতে সেলাই করে নিতেন। মহানবী (সা.) রঙয়ের ব্যবহারও জানতেন ও বুঝতেন। তার কাছে সাদা ও সবুজ রঙয়ের জিনিসই বেশি পছন্দের ছিল। তবে তিনি গিরগিরা হলুদ ও লাল রংয়ের কাপড় চোপড় ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন না এবং কাউকে পরতে দেখলে তার আপত্তির কথা প্রকাশ করতেন। অধিকাংশ সময়ে তাঁর গায়ের পোশাক ও পরনের ইজারা সাদা রঙয়ের ছিল আর মাথার পাগড়িটি ছিল সবুজ রংয়ের ।

6.2.19 ‡mŠ›`h PPv©i ms¯‹…wZ

২৮১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী আল জুফী (রা.) আস-সাহীহ আল বুখারী, কিতাবুল লিবাছ (পোষাক পরিচ্ছেদ অধ্যায়)।

২৮২. প্রাণীর ছবি অংকন করা বা ভাস্কর্য নির্মাণ করা পৌত্তলিক সংস্কৃতির অংশ। এসব কাজের সাথে পৌত্তলিকতার সম্পর্ক আছে বিধায় ইসলামের তাওহীদবাদী সংস্কৃতিতে প্রাণীর চিত্র অংকন করা বৈধ কাজের মধ্যে পড়ে না।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা.) দাড়ি লম্বা রাখতেন তবে এত লম্বা ছিল না যে তা নাভীর নিচে পড়ে। গোফকে তিনি একেবারে মুন্ডিয়ে না ফেলে বরং ছোট ছোট করে রাখতেন। মহানবী (সা.) তিন স্টাইলের চুল রাখতেন যথা- সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডন করা, সামনে পিছনের চুলগুলো সমান্তরাল ভাবে খাটো করে রাখা ও ঘাড়বাবরী রাখা। তিনি যথাসময়ে হাত পায়ের নখ এবং বগলের ও লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কারের কথা বলেছেন। মহানবী (সা.) এর মাথা ও দাড়ির চুলগুলি খুব একটা পাকেনি বা সাদা হয়নি। তবে তিনি সাদা দাঁড়িতে মেহেদীর রঙ লাগানোটা পছন্দ করতেন। মেয়েদের হাতে মেহেদীর রঙ থাকুক নবীজী (সা.) তা চাইতেন। সাহাবায়ে কেরামগণের যুদ্ধের হাতিয়ার বা ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল বহু ধরনের ও নানা রঙের। পানি রাখার মশক ও তলোয়ার রাখার খাপও ছিল ছোট বড় নানা ধরনের ও নানা রঙয়ের।[২৮৩]

6.2.20 Lvev‡ii cwZ hZkxj

খাবার তৈরি করা খাওয়া, তা বিতরণ ও বণ্টনের সকল পর্যায় মহানবী (সা.) ও তাঁর সম্মানিত সাহাবাগণ ছিলেন অতিশয় যত্নশীলা খাবারের পাত্র ও পানির ঢেকে রাখার বিষয়ে নবীজী (সা.) নিজে ছিলেন যত্নশীল এবং তা দেখে তাঁর সঙ্গী সাথীগণও সতর্ক ছিলেন। দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার খেতেন সে সময়ের মুসলিম সমাজের সকলে। দস্তরখানায় খাবার পড়ে গেলে সেখান থেকে তা উঠিয়ে নিয়ে ফুঁ দিয়ে পরিস্কার করে খাবার খাওয়ারও উদহারণ দেখা যায় মহানবী (সা.) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সমাজে।[২৮৪]

---

২৮৩. প্রতিটি সীরাত গ্রন্থে এ সাধারণ কর্ম-কান্ডের উল্লেখ আছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মাওলানা আব্দুল মুসতাফা আজামী, *সীরাতে মুস্তফা*, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৫৮-৭৯; মাওলানা মোঃ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত*, ঢাকা: ঝিনুক পুস্তিকা, ১৯৭৫, পৃ. ১০৩-১১৫; গোলাম মুস্তফা, *বিশ্ব নবী*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮-৯৩; তাছাড়া সকল হাদীস গ্রন্থের কিতাবুল লিবাস অধ্যায়ে সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২৮৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ইমাম হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরী (র.), সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশ-রিবা (পান করা অধ্যায়); আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী আল-জুফী (র.), আসসাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আতয়ামাতু (খাবার

6.2.21 Ngv‡bvi ms¯‹wZ I cvZ¨wnK iæwUb

ঘুমানোর পূর্বে নবীজী (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ কপি বাতি ভালো করে নিভিয়ে নিতেন। জাহেলী যুগের সাধারণ মানুষের মত করে তারা ঘুমাতেন না। মাগরিবের নামায শেষে রাত্রির খাবার (ডিনার) শেষ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এশার নামায পড়তেন। এশার নামায শেষে তেমন বেশি কথা বার্তা না বলে ডানকাতে ঘুমিয়ে যেতেন । শেষ রাত্রিতে তাদের অধিকাংশই জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল ইবাদত বন্দেগী করতেন। এরপরে ফযরের নামায জামাতে আদায় করে যার যার কর্মস্থল দিকে বেরিয়ে যেতেন নিজেদের রুটি-রুজির সন্ধানে। মাঝখানে খাওয়ার কাজটি শেষ করে একটানা যোহর পর্যন্ত কর্মে ব্যস্ত থেকে বাড়ীতে ফিরে এসে যোহারের নামায জামাতে আদায় শেষে অল্প সময়ে জন্যে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করে আসর পর্যন্ত কর্মে থাকার শক্তি যোগাতেন। আসর নামায শেষে মাগরিবের নামায পর্যন্ত বাড়ীতে সময় দিতেন গৃহস্থলির কাজ কর্ম সম্পন্ন করার জন্যে। এটাই ছিল তাঁদের প্রত্যাহিক জীবনের অধিকাংশ সময়ের রুটিন। সে সময়ে তাঁরা কেবল দু'বেলা খাবার খেতেন। সকালে আর বিকালে কিংবা সন্ধা বেলায়। আমাদের মত করে তিন বেলা খাবার খাওয়ার কথা তারা চিন্তাও করতেন না, আবার পেট ভরে খাবার খাওয়ার সুযোগও তাঁদের ছিল না।

6.2.22 AwZw_ civqYZv I ci¯úi‡ii mv‡_ ï‡f”Qv wewbgq

অতিথি অপ্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের কোন তুলনা হয়না। নিজে না খেয়ে অতিথি খাওয়াতেন ও সেবা যত্ন করতেন। অতিথি পূর্ব শত্রুর কেউ হলেও আশ্রায়কালীন সময়ে তার উপর প্রতিশোধ নেওয়া হতনা এবং কাউকেও প্রতিশোধ নিতে দিতেন না। পরস্পর পরস্পরের সাথে দেখা হলে সালম দিতেন। মুসাফা

অধ্যায়); নির্বাচিত বোখারী শরীফ, (অনু. ও সম্পাদনায় মাওলানা জাকির হোসেন আজাদী), ঢাকা: সত্যকথা প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ১৮৪, হাদীস নং-১০৬৮

করতেন। অনেক দিন পর দেখা হলে মুয়ানাকা তথা ঘাড়ের সাথে ঘাড় মিলানো বা কোলাকুলি করতেন। এ সকল অবস্থায় পরস্পর পরস্পরের জন্যে আল্লাহর কাছে শুভ কামনা করতেন।[২৮৫]

২৮৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মিশকাত শরীফের কিতাবুল আদব অধ্যায়।

6.2.23 Pjv-‡divi ms¯'wZ I cwi"QbZvi welq

চলাফেরার সময়ে তারা রাস্তার ডান পাশ হয়ে চলাচল করতেন। রাস্তায় চলাচলের সময় কষ্টদায়ক কোন জিনিস দেখলে তা নিজ হাতে নিরাপদ দূরত্বে রাখতেন। রাস্তার ধারে পানির উৎস স্থলে, লোকালয়ে কিংবা ধর্মীয় পবিত্র স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করতেন না। সে সময়ে যদিও প্রত্যেকের বাড়ীতে নিজস্ব পায়খানা গড়ে উঠেনি। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে জংগলে, ঝোপ-ঝাড়ে কিংবা কোন কিছুর আড়ালে যেতেন। তদুপরি যত্র-তত্র মলমূত্র ত্যাগ করার কোন উদহারণ সে সময়ে পাওয়া যায়নি। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তথা পেশাব-পায়খানা থেকে তারা ঢিলা ও পানির ব্যবহার করে পবিত্রতা অর্জন করতেন।[২৮৬]

6.2.24 gvbl‡K gj¨vqb I m¤§vb 'vb Kiv

রাসূল (সা.) প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় সবাই সাবাইকে মর্যাদা দিত। ছোটরা বড়দেরকে আবার বড়রা ছোটদেরকে, ধনীরা গরীবদেরকে আবার গরীবরা ধনীদেরকে, স্বামী-স্ত্রীকে আবার স্ত্রী-স্বামীকে, সন্তান পিতা-মাতাকে আবার পিতা-মাতা সন্তানদেরকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সম্মান করতো। এভাবে মহানবী (সা.) এর আদর্শিক শিক্ষায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে সাহাবায়ে কেরামগণ শুধু মানব মর্যাদা ও মানবাধিকারের বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন না বরং প্রাণীর মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়েও তাঁরা সজাগ ও সচেতন ছিলেন।[২৮৭]

২৮৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: মিশকাত শরীফের কিতাবুল আদব অধ্যায়।
২৮৭. প্রাগুক্ত

6.2.25 gvbweK ¸Yvejxi cwkÿY

মহানবী (সা.) এর দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সে সময়ের মুসলমানদেরকে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর আদর্শ কর্মী হিসেবে তৈরি করেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভিতরে ছিল অপরের কল্যাণ কামনা করা ও আত্মত্যাগের বাসনা। তাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন আদল ও ইনসাফের তথা ন্যায় ও সুবিচারের প্রতীক, দয়া ও ভালবাসার উজ্জল দৃষ্টান্ত এবং ক্ষমা ও উদারতার জ্বাজল্যমান উদহারণ। তারা একজন আরেকজনের জন্যে ছিলেন জীবন নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরীর মত। ক্রয়-বিক্রয় ও আয়-ব্যয়ের হিসেবে তাঁরা ছিলেন মিতব্যায়ী। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন শান্তি-শৃঙ্খলার কর্মী। শালীনতার ও মার্জিত আচার-আচারণের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন অতুলনীয়। উপকারের উপকার স্বীকার করা তথা কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী, আত্নীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী, সততা ও সত্যবাদিতা ছিল তাঁদের প্রত্যেকের জীবনের ভূষণ, নিজেরা ছিলেন খুবই বিনয়ী, নম্র, ভদ্র ও সরল মনের মানুষ, দানশীলতা ও বদান্যতায় সকলকে মুগ্ধকারী, আমানতকারী, অঙ্গীকার রক্ষাকারী, সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগকারী, বীরত্ব ও সাহসিকতার উদাহরণ, অন্যের প্রতি ভালো ধারণা পোষণকারী, লজ্জাশীল ধৈর্য-ধারণকারী, ও সহমর্মিতা প্রদর্শকারী এসকল মানবীয় গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাদের তুলনা হয় না।[২৮৮]

6.2.26 gvbweK Amr ¸Yvejx †_‡K g³KiY

অপরদিকে মানব গুণের অসৎ বা বদ দিক গুলো যেমন পরনিন্দা, উপহাস, অপবাদ, অহংকার, আত্মম্ভারিতা, মিথ্যাচার, কৃপণতা, অপব্যয়, অপচয়, ক্রোধ, রাগ, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মগৌরব, আত্ম অহংকার, অশালীন চিন্তা-ভাবনা, কথা-বার্তা, ধোকা-প্রতারণা প্রভূতি থেকে রাসূল (সা.) এর প্রশিক্ষন

২৮৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, *ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বরূপ*, ঢাকা: ইউনির্ভাসাল ইসলামিক স্টাট, ২০১৪ পৃ. ১৩৩-১৫৯

প্রাপ্ত সাহাবাগণ ছিলেন মুক্ত।[২৮৯] যার ফলে মহানবী (সা.) এর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল উত্তম গুণাবলীর সঙ্গী-সাথীদেরকে নিয়ে বিশ্বের বুকে এক অতুলনীয় আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

---

২৮৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৭১

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবন: সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেমন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে আদর্শ ঠিক তেমনি তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণও ছিলেন সমস্ত মুমিন-মুসলিমের জন্যে আদর্শ স্বরুপ। সমস্ত মুসলমানদের জন্যে হুজুরে আকরাম (সা.) হলেন অধ্যাত্নিক পিতা স্বরুপ, অনুরুপভাবে তাঁর পুত: পবিত্র সহধর্মীণীগণও মুমিনদের মা বা উম্মুহাতুল মোমিনীন হিসাবে পরিগণিত।[২৯০] কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন: النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ "নবী মুহাম্মদ (সা.) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা"।[২৯১] অতএব স্বীয় মাতার ন্যায় তাঁদের প্রত্যেককে সম্মান করা কর্তব্য (ওয়াজিব)।[২৯২] তাঁদের সম্পর্কে কোন ধরনের অশ্রদ্ধামূলক কথা-বার্তা বলা যাবে না। তাঁদের প্রতিটি কাজ কর্মের মধ্যেই রয়েছে উম্মাতে মুহাম্মদী (সা.) এর জন্য অনেক দিক-নির্দেশনা। তাঁরা প্রত্যেককে মহানবী (সা.) এর সাথে অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতেন। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোন ধরনের কমতি ছিল না। একবার সহজাত দুর্বলতার কারণে তাদের পক্ষ হতে কিছুটা ত্রুটি হয়ে পড়লে সাথে সাথেই তাঁরা সংশোধিত হয়ে যেতেন। যেমন তাদের কয়েকজন নবীজী (সা.) এর কাছে মাসিক ভাতা বৃদ্ধির অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এটা নবীজী (সা.) এর কাছে পছন্দনীয় কাজ ছিল না। মহানবী (সা.) সর্বদা গরীবী হালাতে দিনাতিপাত করতেন এবং এই গরীবী হালাতে দিনাতিপাত করাকে তিনি পছন্দও করতেন। কাজেই তাঁর জীবন সংঙ্গীনীদেরকে এমন হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু

২৯০. উম্মুল মোমেনীন (বহু বচনে উম্মুহাতুল মোমেনীন) পরিভাষাটি সর্ব প্রথম হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) এর বিবাহের ওলীমাতে ব্যবহার করা হয়। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৭৬-৭৭

২৯১. আল কুরআন, ৩৩:০৬

২৯২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৭৬-৭৭

মানুষের সহজাত দুর্বলতার ফলে তাঁদের কয়েকজনের মাসিক ভাতা বৃদ্ধির অনুরোধ মহানবী (সা.) কিছুতেই মানতে পারলেন না। উল্টো তিনি তাঁদেরকে মহানবী (সা.) এর দরিদ্রতাপূর্ণ অবস্থানে যারা থাকতে অপছন্দ করে তাঁদেরকে মহানবী (সা.) এর সংসার ত্যাগ করে পার্থিব ভোগ বিলাসে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ□سَرَاحًا

جَمِيلًا كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

"হে নবী! আপনার পত্নিগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসীতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যেকার সৎ কর্মপরায়নদের জন্য আল্লাহ তায়ালা মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"[২৯৩] কিন্তু উম্মুহাতুল মোমিনীনদের সকলেই আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (সা.) কেই দুনিয়ার ভোগ বিলাসের চেয়ে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ঘটনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে তাঁরা সকলেই কতটা আল্লাহ ও রাসূল (সা.) কে ভালবাসতেন এবং দুনিয়ার জীবনের চেয়ে আখিরাতের জীবনকে প্রাধান্য দিতেন। সাধারনত সতিনদের মধ্যে যেসব ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে বলা যায় তার কিছুই তাঁদের মধ্যে সংঘটিত হয়নি। টুকটাক কিছু ঘটলেও সাথে সাথেই তাঁরা তা মিটিয়ে ফেলতেন এবং সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে নিতেন। এভাবে তাঁরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে সতিনের সম্পর্ক নিয়ে নয় বরং সহোদর বোনের মতই জীবন যাপন করেছেন। মূলত তাঁরা সকলে মহানবী (সা.) কে ঘরের কাজে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন এবং নবীজী (সা.) এর পারিবারিক জীবনের আদর্শের কথা মানুষের নিকটে তুলে ধরেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে উম্মাহাতুল মোমেনীন' বা ঈমানদারদের মা বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষাণা দিয়েছেন।

২৯৩. আল কুরআন, ৩৩:২৮-২৯

নি:সন্দেহে তাঁরা হলেন সকল মুসলিম নারীর জন্যে অনুস্বরণীয়-অনুকরনীয় জীবনাদর্শ। মহানবী (সা.) এর বাস্তব জীবন সম্পর্কে জানা একজন মুসলমানদের জন্যে যেমন অপরিহার্য কাজ ঠিক তেমনিভাবে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং স্বীয় জীবনে তা যথার্থরুপে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। মহানবী (সা.) এর জীবনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। একটি হচ্ছে তাঁর বাহ্যিক জীবন যেটা আমরা সাধারণ পুরুষ সাহাবীদের সাথে তাঁর আচার-আচারণ থেকে জানতে পারি। কিন্তু তাঁর আভ্যন্তরীন জীবন তথা পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবন-চরিত জানা ছাড়া আসলে মহানবী (সা.) এর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা যায় না। মহানবী (সা.) এর পঁচিশ বছর বয়স থেকে শুরু করে তিষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় আটত্রিশ বছরের পারিবারিক জীবনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার কারণ, তাঁদের সাথে মহানবী (সা.) এর আচার-আচারণ, নবীজী (সা.) এর পবিত্র মুখনি:সৃত বানী সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারে তাঁদের মূল্যবান অবদান এবং বিশেষকরে মহানবী (সা.) এর সাথে পবিত্র সহচর্য লাভ ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য খুবই প্রয়োজন। সে প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করেই অত্র অধ্যায়ে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবন-চরিতের একটি সমীক্ষা তুলে ধরা হবে। এর আগে আমরা এক নজরে দেখে নেই ক্রমধারা অনুযায়ী তাঁদের সংখ্যা, নাম, মহানবী (সা.) এর সাথে বিবাহকালীন বয়স ইত্যাদি।

ক্রমিক নং	নাম	নবীজী (সা.) এর বিবাহকালীন বয়স	বিয়েকালীন নবীজী (সা.) এর বয়স	বিয়ে নং	বর্ণিত হাদীস সংখ্যা	রাসূলের দাম্পত্য জীবন	ইন্তিকাল
০১.	হযরত খাদিজা (রা.)	৪০ বছর বয়সে	২৫ বছর বয়সে	৩য় বিবাহ	--	২৫ বছর	নবুওতীর দশম হিজরী
০২.	হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রা.)	৫৫ বছর বয়সে	৫০ বছর বয়সে	২য় বিবাহ	০৫টি	১৩ বছর	২২ হিজরীতে

							ত
০৩.	হযরত আয়েশা (রা.)	৬/৭/৮/৯/ বছর বসয়ে	৫১ বছর বয়সে	১ম বিবাহ	২২১০টি	১২ বছর	৫৮ হিজরীতে
০৪.	হযরত হাফসা (রা.)	১৯ বছর বয়সে	৫৪ বছর বয়সে	২য় বিবাহ	৬০টি	৯ বছর	৪৫ হিজরীতে
০৫.	হযরত যয়নাব বিনতে খুযাইমা (রা.)	৪১ বছর বয়সে	৫৫ বছর বয়সে	৩য় বিবাহ	--	৩ মাস	৪র্থ হিজরীতে
০৬.	হযরত উম্মু সালামা (রা.)	৩১ বছর বয়সে	৫৬ বছর বয়সে	২য় বিবাহ	৩৭৮টি	৮ বছর	৬৩ হিজরীতে
০৭.	হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)	৩৮ বছর বয়সে	৫৭ বছর বয়সে	২য় বিবাহ	১১টি	৭ বছর	২০ হিজরীতে
০৮.	হযরত জুহাইরিয়া (রা.)	২১ বছর বয়সে	৫৭ বছর বয়সে	২য় বিবাহ	৭টি	৭ বছর	৫০ হিজরীতে
০৯.	হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)	৩৭ বছর বয়সে	৫৭ বছর বয়সে	২য় বিবাহ	৬৫টি	৭ বছর	৪৪ হিজরীতে
১০.	হযরত সুফিয়্যা (রা.)	২০ বছর বয়সে	৫৮ বছর বয়সে	৩য় বিবাহ	১০টি	৬ বছর	৫০ হিজরীতে
১১.	হযরত মায়মুনা (রা.)	২৮ বছর বয়সে	৫৮ বছর বয়সে	৩য় বিবাহ	৭৬ টি	৫ বছর	৬১ হিজরীতে
১২.	হযরত রায়হানা (রা.)	২৫ বছর বয়সে	৫৮ বছর বয়সে	২য় বিবাহ	--	৫ বছর	নবীজী (সা.) এর ইন্তিকালের পূর্বে

১৩.	হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.)	২৫ বছর বয়সে	৫৮ বছর বয়সে	--	--	৫ বছর	১৩ হিজরীতে

*

*(সূত্র: মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম (সংকলিত), *রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন*, ঢাকা: পিস পাবলিকেশন্স, ২০১৫, পৃ. ৯ এর অনুকরনে কিছুটা সংশোধন ও পরিমার্জন করে উপরের চার্টটি তৈরি করা হয়েছে।)

উপরোক্ত চার্টের ক্রমধারা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবন-চরিত আলোচনা করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১ হযরত খাদিজা (রা.)

পরিচয়: নাম, উপাধি ও উপনাম

তাঁর মূল নাম খাদীজা। তিনি নবী করীম (সা.) এর প্রথম স্ত্রী। প্রথম মুসলমান এবং উম্মুল মু'মিনীনদের প্রধান তাঁর প্রথম স্বামী আবুল হালার ঔরসে হিন্দ নামক তাঁর এক পুত্র ছিল, তাঁর নাম অনুসারে খাদীজা (রা.) এর নাম হয় ডাক নাম উম্মু হিনদা। তাঁর উপাধি ছিল তাহিরা বা পুত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। উল্লেখ্য, বয়স ও বুদ্ধি হওয়ার পর পুত পবিত্র চরিত্রের জন্য এ উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[২৯৪]

জন্ম

হযরত খাদীজা (রা.) ৫৫৫ বা ৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ হস্তী বছরের ১৫ বছর পূর্বে মক্কায় সম্মানিত গোত্র আসাদ ইবনে আবদিল উযযায় জন্ম গ্রহণ করেন।[২৯৫] এই হিসেবে তিনি বয়সে রাসূল (সা.) এর চেয়ে ১৫ বছরের বড় ছিলেন।

বংশ পরিচয়

হযরত খাদিজা (রা.)-এর পিতার নাম খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওযযা ইবনে কুসাই আর মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে যায়িদাহ। আর নানা ছিলেন আসাম ইবনে হারাম ইবনে ওয়াহাব ইবনে হাজার ইবনে আবদ ইবনে মাহীছ ইবনে আমের। তার নানীর নাম ছিলেন হালাহ

২৯৪. আল-ইমাম আজ-জাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরুত: আল-মুওয়াসসাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০, খন্ড ২, পৃ. ১০৯; ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৬, খ. ৫, পৃ. ৯

২৯৫. ইবন সা'দ, *আত-কাবাকাত আল-কুবরা*, বৈরুত: দারু সাদির, খ. ১, পৃ. ১৩২; আল্লামা শিব্‌লী নু'মানী (রা.), *সীরাতুন্‌নবী*, (অনু. এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্‌শী), ঢাকা: দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮, খ. ২, পৃ. ৮২৭-৮২৮; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ৯, পৃ. ৪৮৩-৪৮৯

বিনতে আবদে মানাফ। উল্লেখ্য, কয়েক পুরুষ ওপরে গিয়ে খাদীজা (রা.) এর পিত্রকূল ও মাতৃকূল এক ছিল। অর্থাৎ তাঁর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ একই ব্যাক্তি ছিলেন। এ ব্যক্তির নাম ছিল কুসাই। পৈত্রিক বংশের দিক দিয়ে খাদীজা (রা.) রাসূল (সা.) এর ফুফু হতেন। নবুওয়্যাতের সূচনায় খাদীজা (রা.) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল এর নিকট রাসূল (সা.) সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন "আপনার ভ্রাতুস্পুত্রের কথা শুনুন" তা-এ সম্পর্কের ভিত্তিতে।[২৯৬] তাহলে বুঝা গেল যে খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.) ছিলেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ কুরাইশ বংশের পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মেয়ে।

গোত্র পরিচয়

তাঁর গোত্র আসাদ ইবনে আব্দুল উযযা কুরাইশদের সেই নয়টি বিশিষ্ট গোত্রের অন্যতম ছিল,যাদের মধ্যে দশটি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গৌরবজনক দায়িত্বে ছিল। পরামর্শ এ গোত্রের দায়িত্বে রয়েছে বিধায় 'দারুন নাদওয়া' এর ব্যবস্থাপনা ছিল তাদের অধীনস্থ। কুরাইশদের যখন কোন জাতীয় অথবা রাষ্ট্রীয় সমস্যা দেখা দিত এবং তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কোন কাজ করতে মনস্থ করত তখন সুপরামর্শের জন্য সবাই দারুন নাদওয়াতে মিলিত হত। এ পদে সর্বশেষ অধিষ্টিত ব্যক্তি ছিলেন যায়েদ ইবনে যাম'আ ইবনে আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আসাদ। কুরাইশরা তাদের সমস্যাবলী তার নিকট পেশ করত। তিনি যদি তাদের সাথে একমত হতেন তাহলে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হতো নতুবা তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিত। কুরাইশগণ পুনরায় চেষ্টা করে তাকে তাদের মতাবলম্বী করে নিত। এ হতে কুরাইশদের মধ্যে তার প্রভাব কেমন তা উপলব্ধি করা যায়।

বাল্য জীবন

২৯৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূল জীবন কথা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৬, ৫ম খন্ড, পৃ: ৯

খাদীজা (রা.) এর বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে রাসূল (সা.) এর সাথে বিয়ে হওয়ার পূর্বে তাঁর আরও দু'বার বিয়ে হয়েছিল বলে জানা যায়। এরও পূর্বে খাদীজা (রা.) এর পিতা খুওয়াইলিদ তাঁকে বিয়ে দেয়ার জন্য সে সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি তাওরাত ও ইনজীলের বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নাওফিলের সাথে সম্বন্ধ ঠিক করেন। ওয়ারাকা খাদীজা (রা.) এর চাচত ভাই ছিলেন। কিন্তু যে কোন করণে সে বিয়ে হয়নি।[২৯৭]

প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহ

হযরত খাদীজা (রা.) এর প্রথম বিবাহ হয় আবু হালা হিনদ ইবনে যূরারা ইবনে নাব্বাশ ইবনে 'আদিয়্যি আত-তামীমীর সাথে। তার নাম সর্ম্পকে মতভেদ আছে। কেউ কেউ নামনাশ ইবনে যূরার আবার কেউ কেউ নাব্বাশ ইবনে মুরারা বলে বর্ণনা করেছেন। ইবনে সাদ হিনদ ইবনে নব্বাশ ইবনে যূরারা বলে উল্লেখ করেছেন। আবু হালার দাদা নাব্বাশ তার গোত্রের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি মক্কায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং বনূ'আবদি' ইবনে কুসায়্যির সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাই খাদীজা (রা.) এর সাথে আবু হালার সাথে কুরাইশদের সর্ম্পক সমপর্যায়ের ছিল। তারাও মুদার গোত্রভূত ছিল। এ জন্য তাদের সাথে আত্নীয়তা করা কোনরুপ অবমাননাকর ছিল না। এ স্বামীর ঔরসে খাদীজা (রা.) এর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে দুই জন পুত্র সন্তান যথাক্রমে হিনদ ও আল হারিছ এবং যয়নব নামক এক কন্যা সন্তান ছিল।[২৯৮] খাদীজার প্রথম পুত্র ও প্রথম সন্তান হল হিনদ যিনি রাসূল (সা.) এর নিকট লালিত

২৯৭. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, মিশর: দারুল মা'য়ারিফ, খন্ড-১, পৃ. ৪০৭; ইবন হাজার আস কিলানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, বৈরুত: দার-আল ফিকর, ১৯৭৮, খন্ড-৪, পৃ. ২৮২
২৯৮. মুয়াল্লিমা মোশেদা বেগম (সম্পাদিত), *রাসূলুল্লাহ (সা:) এর স্ত্রীগন যেমন ছিলেন*, ঢাকা: পিস পাবলিকেশন্স,২০১৫, পৃ.১৪

পালিত হন। এজন্য তাকে রাবীবু রাসূল্লিলাহ বা রাসূল (সা.) এর পালক পুত্র বলা হতো। এ হিনদ ইসলাম গ্রহণ করে উহুদ বা বদর যুদ্ধে শরীক হন এবং পরে বসরায় ইন্তোকাল করেন। রাসূল (সা.) এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর খাদীজা (রা.) এর পুত্র দু'জনই ইসলাম কবুল করেন এবং সম্মানিত সাহাবা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু তাঁদের পিতা আবূ হালা ইবনে যাররাহ সে জাহেলী যুগেই ইন্তিকাল করেন। তার ইন্তিকালের কারণ সর্ম্পকে বিস্তারিত জানা যায় নি। হযরত খাদীজা (রা.) এর স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয় 'আতীক ইবনে আবিদ (ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ইবনে মাখযুম)-এর সাথে। খাদীজা (রা.)-এর গর্ভে তার এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যিনি উম্মু মুহাম্মদ উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[২৯৯] অধিকাংশ সূত্রের মতে, দ্বিতীয় স্বামী আতিকের মৃত্যু হলে তিনি বিশেষভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তবে ঐতিহাসিক বালাজুরী বলেছেন, দ্বিতীয় স্বামী আতীকের সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

পিতার ইন্তিকাল

হযরত খাদীজা (রা.) এর বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছরের সময় তার পিতা খুওয়াইলিদ ইন্তিকাল করেন। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে বলেন যে, তিনি ফুজ্জার যুদ্ধে ইন্তিকাল করেন।

হযরত খাদীজা (রা.) এর ব্যবসায়িক অবস্থা

ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বাকীর করেছেন যে, আররেব জাহেলী যুগে মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)। জানা যায় তাঁর বাণিজ্য বহর নিয়ে যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা

---

২৯৯. ইবন হাযাম, *জামহারাতুল আনসাবিল আরাব*, মক্কা: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬২, পৃ. ১৪২; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ৯, পৃ. ৪৮৩-৪৮৭

করত তখন দেখা যেতো একা খাদীজা (রা.) এর পন্যসামগ্রী কুরাইশদের সমগ্র পন্যসামগ্রীর সমান।

পিতার মৃত্যুর পর খাদীজা (রা.) এর পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ তাঁর পিতার ব্যবসা আরবের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। এজন্য তিনি একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজতে লাগলেন যাতে তাঁর ব্যবসা দেশের বাইরেও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়।

বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হিসাবে মুহাম্মদ (সা.)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) তখন ২৫ বছরের যুবক। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের সাথে কয়েকবার বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়ায় গিয়ে প্রভূত সাফল্য লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি নানাবিধ সামাজিক কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার কারণে সর্বোপরি **'আল-আমিন'** উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় সমগ্র আরবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারিতা, ন্যায়পরায়নতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মাধুর্যতার কথা খাদীজা (রা.) এর কানে পৌছতে দেরী হয়নি।

বিশ্বস্ত লোকের খোঁজে খাদীজা (রা.)

এদিকে খাদীজা (রা.) তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য বিশ্বস্ত লোক খোঁজছেন—জানতে পেরে রাসূল (সা.) এর চাচা আবূ তালিব তাঁকে ডেকে বললেন,'ভাতিজা! আমি একজন দরিদ্র মানুষ, সময়টাও খুব সংকটজনক। মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে আমরা নিপতিত। আমাদের কোনো ব্যবসা বা অন্য উপায় উপকরন নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজা (রা.) তাঁর পন্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোজ করছেন। তুমি যদি তাঁর কাছে

যেতে, হয়তো তোমাকেই তিনি নির্বাচন করতেন। তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা তাঁর ভালো করেই জানা আছে। চাচা আবু তালিবের প্রস্তাবের জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, 'সম্ভবত তিনি নিজেই লোক পাঠাবেন।' দেখা গেলো খাদীজা (রা.) সত্যি সত্যিই লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, 'মুহাম্মদ (সা.) যদি তাঁর ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যেতে চায় তাহলে তাঁকে অন্যদের তুলনায় দ্বিগুন মুনাফা দেবেন।[৩০০] 'রাসূল (সা.) তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন এবং একদিন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

পাদ্রীর ভবিষ্যৎ বাণী

নবী করীম রাসূল (সা.) সিরিয়ার পথে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য বাণিজ্য কাফেলা নামিয়ে বসলেন। সাথে ছিলেন খাদীজা (রা.) এর বিশ্বস্ত দাস মাইসারা। এ সময়ে গীর্জার পাদ্রী এগিয়ে এসে মাইসারাকে ডেকে জিজ্ঞাস করলেন,"গাছের নীচে বিশ্রামরত লোকটি কে?' মাইসারা বললেন, ইনি মক্কার হারামবাসী কুরাইশ বংশের লোক। এ কথা শোনার পর পাদ্রী বললেন, ইনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।"[৩০১] ইবনে হাজার আল আসকিলানীর বর্ণনায় ঐ পাদ্রীর নাম 'বুহাইরা। অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন ঐ পাদ্রীর নাম ছিল 'নাসতুরা'।

মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাথমিক সফলতা

রাসূল (সা.) সিরিয়ার বাজারে গিয়ে যথাসম্ভব উচ্চমূল্যে পন্য সামগ্রী বিক্রি করে প্রয়োজনীয় মালামাল ও জিনিসপত্র কম মূল্যে ক্রয় করলেন। তারপর তাঁর সঙ্গী মাইসারাকে নিয়ে মক্কার

৩০০. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, বৈরুত: দারু সাদির, খন্ড-১, পৃ. ১২৯; ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, বৈরুত, খন্ড-১, পৃ. ১৮৮

৩০১. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, বৈরুত, খন্ড-১, পৃ. ১২৯; ইবন হাজার আল আসকিলানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, বৈরুত: দার-আল ফিকর, ১৯৭৮, খন্ড-৪, পৃ. ২৮১

উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। পথ চলতে চলতে মাইসারা আর্শ্চয হয়ে লক্ষ্য করলেন, নবী করীম (সা.) তাঁর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছেন, আর দু'জন ফেরেশতা দুপুরের প্রচন্ড রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে আছেন। এভাবে তাঁরা মক্কায় ফিরলেন। ঘরে ফিরেই মাইসারা তার মালিক খাদীজা (রা.) কে পাদ্রীর মন্তব্য ও পথের সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে খুলে বললেন। মক্কায় ফিরে সিরিয়া থেকে আনা পন্য সামগ্রী বিক্রি করে রাসূল (সা.) দেখলেন এ থেকে প্রায় দ্বিগুন মুনাফা অর্জিত হয়েছে। তিনি সমস্ত হিসাব নিকাশ খাদীজা (রা.) কে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

হযরত খাদীজা (রা.) এর বিয়ের প্রস্তাব

সুন্দরী, বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষন সর্বোপরি অসম্ভব ভদ্র মহিলা ছিলেন খাদীজা (রা.)। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন বিধবা। যে কারণে মক্কার অনেক সম্ভ্রান্ত কুরাইশ যুবক তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন। তাদের অনেকে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলেন। সে সব প্রস্তাব খাদীজা (রা.) বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর অনুগত ও প্রিয় দাস মাইসারার নিকট রাসূল (সা.) এর সাথে তার ব্যবসায়িক আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততার বিস্তারিত বিবরণ জানার পর ইয়ালার স্ত্রী ও খাদীজা (রা.) এর বান্ধবী 'নাফিসা বিনতে মারিয়া'র মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। নাফিসা রাসূল (সা.) এর নিকট এভাবে প্রস্তাব পেশ করেন: "আপনাকে যদি ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও জীবিকার নিশ্চয়তার দিকে আহ্বান জানানো হয়, আপনি কি গ্রহণ করবেন?"[৩০২] এখানে সকলের জন্য একটি তথ্য দিয়ে রাখা ভালো যে, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আরবের সে জাহেলী যুগেও মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামতের স্বাধীনতা ছিল। তারা নিজেদের বিয়ে শাদী

৩০২. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, বৈরুত: দারু সাদির, খন্ড-১, পৃ. ১৩২; ইবন হাজার, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, বৈরুত: দার-আল ফিকর, ১৯৭৮, খন্ড-৪, পৃ. ২৮২; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ৯, পৃ. ৪৮৫-৪৮৮

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে নিজেরা সরাসরি কথা বলতে পারতেন। প্রাপ্ত বয়স্কা ও অপ্রাপ্তবয়স্কা সবাই সমভাবে এ অধিকার ভোগ করতো।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে হযরত খাদিজা (রা.) এর শুভ বিবাহ

রাসূল (সা.) খাদীজা (রা.) পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর সিদ্ধান্তহীনতায় ছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁর চাচা আবু তালিব এর পরামর্শে খাদীজা (রা.) কে বিয়ে করার সম্মতি প্রদান করেন। রাসূল (সা.) এর সম্মতি দেয়ার পর খাদীজা (রা.) এর চাচা আমর বিন আসাদের পরামর্শে পাচঁশ স্বর্ণমুদ্রা দেনমোহর ধার্য করে বিবাহের দিন-তারিখ ঠিক করা হয়। বিয়ের দিন রাসূল (সা.) এর পক্ষ থেকে খাদীজা (রা.) এর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন আবু তালিব ও হামজা (রা.) সহ তাঁর বংশের আরো কিছু সম্মানিত লোকজন। খাদীজার (রা.) এর পক্ষ থেকেও বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উভয়পক্ষের বিশিষ্ট মেহমানদের উপস্থিতিতে আবু তালিব ভাতিজার বিয়ের খুতবা পাঠ করান এবং বিয়ে পড়ান।[৩০৩] এ সময়ে নবী করীম (সা.) এর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর, আর খাদীজা (রা.) বয়স ছিল ৪০ বছর।

৩০৩. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, মিশর: দারুল মা'য়ারিফ, খন্ড-১, পৃ. ৯৭-৯৮

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়াত লাভ এবং হযরত খাদিজা (রা.) এর পাশে থাকা

বিয়ের ১৫ বছর পর অর্থ্যাৎ রাসূল (সা.) এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। হেরা গুহায় প্রথম অহী নাযিলের বিষয়টি সর্বপ্রথম তিনি খাদীজা (রা.) কে জানান। খাদীজা (রা.) তো তাঁর বিয়ের পূর্ব থেকেই রাসূল (সা.) এর নবী হওয়া সর্ম্পকে জ্ঞাত ছিলেন। সে কারণে তিনি বিষয়টি সহজে সামলে নিতে পেরেছিলেন। এ সর্ম্পকে বুখারী শরীফের ওহীর সূচনা অধ্যায়ের হাদীসগুলো দেখা যেতে পারে।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি ‘হেরা’র গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সাথে নিয়ে যাওয়া- এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন।

এভাবে ‘হেরা’ গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন,‘পড়ুন’। তিনি বললেন: আমি তো পড়তে পারি না। রাসূল (সা.) বললেন, তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন, এতে আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: ‘পড়ুন’। আমি উত্তর দিলাম ‘আমি তো পড়তে পারি না’। রাসূল (সা.) বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন,“পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাধাঁ রক্তপিন্ড থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত”। এভাবে তিনি সূরা আলাকের ৫ আয়াত ওহী নাযিলের প্রথম দিনেই হযরত জিব্রাঈল (আ.) এর সাথে পড়েছিলেন।

তারপর এ আয়াতগুলো নিয়ে রাসূল (সা.) বাড়ীতে ফিরে এলেন। তখন তাঁর অন্তর কাঁপছিল। তিনি খাদীজা (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, ‘আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও’, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা.)-এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশঙ্কা বোধ করছি। খাদীজা (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, কখন না। আল্লাহ আপনাকে কখনও অপমান করবেন না। আপনি তো আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, অসহায়-দূর্বলের দায়িত্ব বহন করেন ও নি:স্বকে সহযোগীতা করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্থদের সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রা.) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফিল ইবনে ‘আবদুল আসাদ ইবনে ‘আবদুল ‘উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহেলী যুগে ‘খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ভাষায় ইনজীল থেকে আরবীতে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রা.) তাকে বললেন, ‘হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।’ ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞাস করলেন, ভাতিজা! তুমি কি দেখ? রাসূল (সা.) যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাকে বললেন, ইনি সে দূত যাকে আল্লাহ ওয়ালা হযরত মূসা (আ:) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দিবে। রাসূল (সা.) বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অতীতে

যিনিই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।'[৩০৪] এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন।

হযরত খাদীজা (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ

ওহী সূচনার ঘটনার দ্বারা বুঝা যায় খাদীজা (রা.) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে হযরত খাদীজা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ওপর এক বিরাট ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাঁর বংশধর এবং শুভানুধ্যায়ী ও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে খাদীজা (রা.) পুরোপুরি রাসূল (সা.) কে অনুসরন করা শুরু করেন। সালাত ফরয হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি রাসূল (সা.) এর সাথে ঘরে বসে সালাত আদায় করতেন। এ অবস্থা অনেকদিন বালক আলী (রা.) দেখে ফেলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'মুহাম্মদ এ কী?' রাসূল (সা.) এ সময়ে নতুন দ্বীনের দাওয়াত আলী (রা.) এর কাছে পেশ করেন এবং বিষয়টি গোপন রাখার জন্য বলেন। এ সময়ে ইসলামের অবস্থা ছিল আফীক আল কিন্দীর ভাষায়, 'আমি জাহেলী যুগে মক্কায় এসেছিলাম স্ত্রীর জন্য আতর এবং কাপড়-চোপড় ক্রয় করতে, সেখানে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নিকট অবস্থান করি। ভোরবেলা কা'বা শারীফের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। আব্বাসও আমার সাথে ছিলেন। এ সময় একজন যুবক আগমন করেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাড়ায়। কিছুক্ষণ পর একজন নারী ও একজন শিশু এসে তার পিছনে দাঁড়ায়। এরা দুজন যুবকটির পেছনে সালাত আদায় করে চলে যায়। তখন আমি আব্বাস কে বললাম, আব্বাস! আমি লক্ষ্য করছি, এক বিরাট বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে। আব্বাস বললেন, 'তুমি কি জান' এ

৩০৪ ইমাম বুখারী, *আস সহীহ আল বুখারী*- বুবু বুদুয়ুল ওহী; আল-ইমাম আয-যাহাবী, *তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীরওয়াল আ'লাম,* কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হি., খন্ড-১, পৃ. ৬৭-৬৮

যুবক এবং মহিলাটি কে?' আমি জবাব দিলাম, না। তিনি বললেন,'যুবকটি হচ্ছে আমার ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। যে নারীকে তুমি সালাত আদায় করতে দেখেছ, তিনি হচ্ছেন আমার ভাতিজা মুহাম্মদ (সা.) এর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)। আমার ভাতিজার ধারণা, তার ধর্ম হচ্ছে একনিষ্ঠ ধর্ম এবং সে যা করছে আল্লাহ তায়ালার হুকুমেই করছে। যতদূর আমার জানা আছে, সারা দুনিয়ায় এই তিনজন ছাড়া আর কেউ তাঁদের দ্বীনের অনুসারী নেই। এ কথা শুনে আমার মনে আকাংঙ্খা জাগে, চতুর্থ ব্যক্তি যদি আমি হতাম।'[৩০৫] খাদীজা (রা.) তৎকালীন সময়ে আরবের একজন প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন। ফলে তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পিতৃকূলের লোকদের ওপরও পড়ে। জানা যায়, তাঁর পিতৃকূল বনু আসাদ ইবনে আবদুল উযযার জীবিত পনের জন বিখ্যাত ব্যক্তির দশজনই ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুল করেন। এর মধ্যে খাদীজা (রা.) এর ভাতিজা হিযামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবা হাকীম জাহেলী যুগে মক্কার 'দারুন নাদওয়া' পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। অপর ভাতিজা আওয়ামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী যুবাইর (রা.) এর মা ছিলেন রাসূল (সা.) এর আপন ফুফু। খাদীজা (রা.) এক বোন হালা ছিলেন রাসূল (সা.) এর মেয়ে যয়নাব (রা.) এর স্বামী আবুল আস ইবনে রাবী'র মা। এ হালাও ইসলাম কবুল করেছিলেন। মোট কথা খাদীজা (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর বংশের ছোট-বড় অনেকে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ। করেন আবার অনেকে ইসলাম সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতে থাকেন।

হযরত খাদিজা (রা.) এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অফুরন্ত ভালোবাসা

৩০৫. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীরওয়াল আ'লাম*, কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হি., খ. ৮, পৃ. ১১; সাঈদ আনসারী, *সিয়ারুস সাহবিয়াত*, আজমগড়: মাতবা'আ মা'আরিফ, হি., পৃ. ৭

হযরত খাদীজা (রা.) সে সময়ে অত্যন্ত সম্মানিত মহিলা ছিলেন যিনি নবীজী (সা.) নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রথম শুনেছিলেন। তিনি নির্দ্ধিধায় সর্বপ্রথম রাসূল (সা.) এর নবুওয়্যাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং ইসলাম কবুল করেছিলেন। সাথে সাথে তাঁর সমস্ত সম্পদ রাসূল (সা.) কে সোপর্দ করেছিলেন তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী খরচ করার জন্য। রাসূল (সা.) এর সাথে ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি রাসূল (সা.) এর বিপদে আপদে সুখে-দু:খে সর্বোত্তম বন্ধুর ভূমিকা পালন করেছিলেন। একজন সান্তনা প্রদানকারী হিসেবে সময়ে অসময়ে সকল প্রকার সাহায্য সহোযোগীতা করেছেন জীবন মরণ বাজি রেখে।

অপর দিকে রাসূল (সা.) নিজেও খাদীজা (রা.) কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। যে কারণে নিজের থেকে ১৫ বছর বড় হওয়া সত্ত্বেও খাদীজা (রা.) জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। রাসূল (সা.) খাদীজা (রা.) কে কেমন ভালোবাসতেন তা আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। তিনি বলেন ‘খাদীজা (রা.)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা ছিল রাসূল (সা.) এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি ততটা ছিল না। একদিন রাসূল (সা.) আমার সামনে তাঁর কথা উল্লেখ করলে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে বলি, সে তো ছিল বৃদ্ধা স্ত্রী, এখন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্ত্রী দান করেছেন; তবুও আপনি তাঁর কথা কেন স্বরণ করছেন? আমার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল (সা.) ক্রুদ্ধ হন। রাগে তাঁর পশম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমি পাইনি। যখন সকলে ছিল কাফির তখন সে ঈমান এনেছিল। যখন সকলে আমাকে অবিশ্বাস করেছিল তখন সে আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। যখন সকলে আমকে ত্যাগ করেছিল, তখন অর্থ সম্পদ দিয়ে সে আমাকে সহায়তা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা

তাঁর গর্ভেই আমাকে সন্তান দান করেছেন। আয়েশা (রা.) বলেন, "এরপর আমি অন্তরে অন্তরে বলি ভবিষ্যতে আমি কখনো খারাপ অর্থে তাঁর নাম মুখে নেবো না।"[৩০৬]

এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে খাদীজা (রা.) ছিলেন অতুলনীয়। সে কারণে রাসূল (সা.) বলেছিলেন, "সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন সন্তানের মাতা এবং গৃহকর্মী।" আবু হুরাইরা (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, "দুনিয়ার সমস্ত নারীর ওপর চারজন নারীর মর্যাদা রয়েছে তা হচ্ছে-মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, খাদীজা বিনতে খুওয়াইদি এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ।"[৩০৭] ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) মাটির ওপর চারটি রেখা একে বলেন,'জান এটি কি'? সাহাবীরা বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) ই ভালো জানেন। রাসূল (সা.) বললেন,'শ্রেষ্ঠ চার নারী জান্নাতী নারী-

১. খাদীজা (রা.), ২. ফাতিমা (রা.), ৩. মারইয়াম (রা.), ৪. আছিয়া (রা.) ।[৩০৮]

সমগ্র মক্কাবাসী যখন রাসূল (সা.) এর দুশমনে পরিণত হয় অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে, তখন একদিন নবীজি (সা.) কে খুঁজতে খাদীজা (রা.) বাইরে বের হন। পথে মানুষরুপে জিবরাঈল (আ:) তাঁর কছে আসেন এবং রাসূল (সা.) এর খোজ খরব নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু খাদীজা (রা.) ভয় পেয়ে যান এ ভেবে যে, সম্ভবত তিনি শত্রু, রাসূল (সা.) কে হত্যা করার জন্য খোজ খবর নিচ্ছেন। সে কারণে তিনি ভয় পেয়ে যান এবং দ্রুত গৃহে ফিরে আসেন। বিষয়টি রাসূল (সা.) কে খুলে বললে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি ছিলেন জিবরাঈল (আ:)। তিনি আমাকে বলে গেছেন,

৩০৬. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরুত: আল-মুওয়ামমাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ১১৭; ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ* ৬/১১৭-১১৮, মিশর: আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, তা.বি. খ. ৬, পৃ. ১১৭-১১৮
৩০৭. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরুত: আল-মুওয়ামমাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০, খন্ড ২, পৃ. ১১৭
৩০৮. মহিউদ্দিন ইবন শারফ আন-নাওবী, *তাহযীবুল আসমাওয়াল লুগাত*, মিশর: আত-তিবায়া-আল-মুগীরিয়্যা, খন্ড-২, পৃ. ৩৪১

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে তাঁর সালাম পৌছাতে এবং জান্নাতে এমন গৃহের সুসংবাদ শোনাতে যে গৃহ তৈরি হয়েছে মনি-মানিক্য দিয়ে, হৈ চৈ আর কষ্ট-ক্লেশ কিছুই থাকবে না সেখানে।[৩০৯]

রাসূল (সা.) তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরও তাকে ভূলতে পারেনি। যে জন্য তাঁর মৃত্যুর পর যতবারই বাড়িতে পশু জবেহ হতো, ততবারেই তিনি তালাশ করে করে খাদীজা (রা.) এর বান্ধবীদের ঘরে ঘরে হাদিয়া স্বরুপ গোশত পাঠিয়ে দিতেন।[৩১০]

প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা (রা.) যখন প্রিয় দাস যায়িদ বিন হারিস (রা.) কে স্বামীর হাতে তুলে দিলেন তখন রাসূল (সা.) স্ত্রীকে খুশি করার জন্য যায়িদ (রা.) কে স্বাধীন করে দিলেন। খাদীজা (রা.) এর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে আয়েশা (রা.) যখন রাসূল (সা.) কে ভালোবাসাচ্ছলে রাগাতে চেষ্টা করতেন তখন তিনি বলতেন,"আল্লাহ আমার অন্তরে তাঁর (খাদীজার) জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"

হযরত খাদীজা (রা.)-এর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ও নাম

হযরত খাদীজা (রা.) এর গর্ভে রাসূল (সা.) এর ৬ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৪জন মেয়ে সন্তান আর ২ জন ছেলে সন্তান ছিলেন।[৩১১] পর্যায়ক্রমে তারা হলেন-

১. কাসিম (রা.)। যে কারণে রাসূল (সা.) এর ডাক নাম ছিল আবুল কাসিম। কাসিম (রা.) অল্প বয়সে মক্কায় ইন্তিকাল করেন।

---

৩০৯. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরুত: আল-মুওয়ামমাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০, খন্ড ২, পৃ. ১০৯-১১০

৩১০. ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়া*, হায়দ্রাবাদ: দায়িরাতুল মা'যারিফ, ১৩৫৭ হি., খ. ২, পৃ. ৩; ইবন হাজার আল আসকিলানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, বৈরুত: দার-আল ফিকর, ১৯৭৮, খন্ড-৪, পৃ. ২৮৩

৩১১. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরুত: আল-মুওয়ামমাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০, খন্ড ১, পৃ. ৪২; ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, বৈরুত, খন্ড-১, পৃ. ১২৯; ইবন হাজার আল আসকিলানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, বৈরুত: দার-আল ফিকর, ১৯৭৮, খন্ড-১, পৃ. ২১০; ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ৯, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯

২. যয়নব (রা.)। যার বিবাহ হয়েছিল খাদীজার ভাগিনেয় আবুল আস (রা.) এর সাথে।

৩. রুকাইয়া (রা.)।

৪. উম্মু কুলসুম (রা.)। রুকাইয়া ও উম্মু কুলসুমের বিবাহ হয়েছিল আবু লাহাবের দুই পুত্রের সাথে। পরবর্তীকালে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দেয়া হয়। পরে রুকাইয়াকে ওসমান (রা.) এর সাথে বিবাহ দেয়া হয়। হিজরী দ্বিতীয় সনে রুকাইয়া (রা.) এর মৃত্যু হলে রাসূল (সা.) উম্মে কুলসুম (রা.) কে হযরত ওসমান (রা.) এর সাথে বিবাহ দেন। এর জন্য তাকে 'যুন নূরাইন' বা দুই জ্যোতির অধিকারী বলা হয়।

৫. খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রা.)। তাঁর সাথে হযরত আলী (রা.) এর বিবাহ হয়।

৬. আবদুল্লাহ (রা.)। যিনি নবুওয়্যত প্রাপ্তির এক বছর পর জন্মলাভ করেন। আবদুল্লাহ অল্প বয়সেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর জন্মের কারণে খাদীজা (রা.) প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসিম (রা.) এর শোক ভূলে যান। কিন্তু তিনিও শিশুকালেই ইন্তিকাল করেন। তার উপাধি ছিল তায়্যিব ও তাহির। কারণ তিনি নবুওয়্যাতের যুগে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩১২]

৩১২. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, বৈরুত, খ. ১, পৃ. ১২৯; ইবন হাজার আল আসকিলানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, বৈরুত: দার-আল ফিকর, ১৯৭৮, খন্ড-১, পৃ. ১৯০

রাসূল (সা.) এর প্রতি নির্মম নির্যাতন

শিয়াবে আবু তালিবের নির্বাসনের সময় সারাক্ষন নবীজী (সা.) এর পাশে ছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)। হাবাশায় হিজরতের পর রাসূল (সা.) এর প্রতি কাফিরগণের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। নবুওয়্যতের সপ্তম বছরের মহররম মাস হতে শিয়াবে আবি তালিব নামক স্থানে মহানবী (সা.) কে অবরুদ্ধ থাকতে হয়। কুরাইশগণ যখন দেখল যে সাহাবায়ে কেরাম হাবাশায় পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং সকল গোত্রে ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে গেছে, তখন তারা পরামর্শ করে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব সম্পর্কে এ অঙ্গীকারনামা প্রদান করে যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরুপ: "বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা.) কে হত্যার জন্য তাদের নিকট সোপর্দ না করবে ততক্ষন পর্যন্ত তাদের সাথে কেউ আত্নীয়তার সম্পর্কে স্থাপন করবে না, ক্রয়-বিক্রয় করবে না, তাদের সাথে মেলামেশা করবে না ও কথা-বার্তা বলবে না এবং তাদের নিকট কোন খাদ্যসামগ্রী পৌছতে দিবে না।" আবদুদ দার গোত্রের মনসুর ইবনে ইকরাম এ অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করেন। এর বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্যে একে কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। উপায়ান্তর না দেখে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব আবু কুসাইস পর্বতের শিব-ই-আবু তালিব নামক গিরিপথে আশ্রয় নেয়। তা ছিল হাশিম গোত্রের মীরাছি সূত্রে প্রাপ্ত গিরিপথ।

চাচা আবু তালিব এ সময়ে রাসূল (সা.)-এর সাথে ছিলেন। আবু তালিব তার পরিবারবর্গ নিয়ে পৃথক হয়ে কুরাইশদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। রাসূল (সা.) এর সাথে খাদীজা (রা.) গিরিপথে ছিলেন।[৩১৩] দীর্ঘ তিন বছর তারা গিরিপথে অবস্থান করেন। প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে সেখানে খাদ্য সামগ্রী পৌছাতে হতো। খাদীজা (রা.) এর তিন ভ্রাতুষ্পুত্র কুরাইশদের সরদার হাকিম ইবনে

৩১৩. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, বৈরুত, খ. ১, পৃ. ১২৯; ইবন হাজার আল আসকিলানী, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, বৈরুত: দার-আল ফিকর, ১৯৭৮, খ. ১, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

হিজাম, আবুল বুক্কারী ও জাম'আ ইবনুল আসওয়াত অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য পৌছানোর এ মহান কাজে অংশগ্রহণ করেন। তাদের উটগুলো ভিতরে প্রবেশ করত খাদ্যসামগ্রী নিয়ে।

এভাবে একাধিকক্রমে প্রায় তিন বছর পর দুশমনদের মধ্যেই দয়ার সঞ্চার হল এবং তাদের পক্ষ হতে এ লিখিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। এ নিপীড়নমূলক অঙ্গীকার ভঙ্গের উদ্যোক্তা ছিলেন কুরাইশের পাচঁজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তারা হলেন হিশাম ইবনে আমার আমিরী, যুহাইর ইবনে আবী উমাইয়া মাখযুমী, মুত'ইম ইবনে আদিয়া, আবুল বুখতারী ইবন হিশাম ও যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ। শেষোক্ত দু'জন খাদীজা (রা.) এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। প্রথমোক্ত ব্যাক্তি ছিলেন বনু হাশিমের নিকট আত্নীয়। যুহাইর ছিলেন আবু জেহেলের চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা.) এর ভাই। তা ছিল নবুওয়্যাতের দশম বছরের ঘটনা।

হযরত খাদিজা (রা.) এর ইন্তিকাল

হিজরতের পূর্বে নবুওয়্যাতের দশম বছরে রমযান মাসের ১০ তারিখে মক্কায় খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিল ৬৫ বছর। তখনো জানাযা সালাতের বিধান চালু হয়নি। এই জন্য তাঁকে জানাযা ছাড়াই 'হাজুন' নামক স্থানে কবরস্থানে দাফন করা হয়।[৩১৪] 'হাজুন' মক্কার একটি পাহাড়ের নাম। বর্তমানে এটি জান্নাতুল মাওলা বা জান্নাতুল মু'আললা নামে পরিচিত। নবী করীম (সা.) নিজেই খাদীজা (রা.) এর লাশ কবরে নামান।

৩১৪. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরুত: আল-মুওয়াममাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ১১৭; আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরুত: আল-মুওয়ামমাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০, খ. ১, পৃ. ১৪০

খাদীজা (রা.) এর মৃত্যুর পর ফাতিমা (রা.) রাসূল (সা.) এর নিকট তাঁর মায়ের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন, তোমার মা খাদীজা (রা.), সারা এবং মারইয়াম (রা.) মধ্যখানে অবস্থান করছেন।

অন্যদিকে রাসূল (সা.) এর পৃষ্ঠপোষক চাচা আবু তালিব খাদীজা (রা.) এর ইন্তিকালের বছরে ইন্তিকাল করেন।[৩১৫] অবশ্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আবু তালিবের মৃত্যুর তিন দিন পর খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করেন। যা হোক, সময়টা ছিল রাসূল (সা.) এর একান্ত প্রিয়জন হারানোর দু:খজনক সময়। এজন্য মুসলিম উম্মাহর নিকট এ বছরটি 'আ'মুল হুযুন'বা শোকের বছর নামে অভিহিত হয়েছে।[৩১৬]

৩১৫. প্রাগুক্ত
৩১৬. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, বৈরুত, খ. ১, পৃ. ৪১৬;

Dhaka University Institutional Repository

৭.২ হযরত সাওদা (রা.)

পরিচয়: নাম ও বংশ

তাঁর মূল নাম ছিল সাওদা বিনতে যাময়া। ডাক নাম ছিল উম্মূল আসওয়াদ। পিতার নাম যাময়া আর মাতার নাম শামসু বিনতে কায়েস। পিতা ছিলেন কুরাইশ বংশের আর মাতা ছিলেন মদীনার বিখ্যাত নাজ্জার গোত্রের মেয়ে। হযরত সাওদা (রা.) সেই ভাগ্যবতী মহিলা যাঁকে নবী করিম (সা.) হযরত খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর পরে বিয়ে করেন। শুধু তাঁকে নিয়েই প্রায় তিন বছর বা তাঁর চেয়ে একটু বেশি সময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁরপর হযরত আয়েশা (রা.) কে ঘরে তুলে আনেন।[৩১৭]

ইসলাম গ্রহণ ও হিযরত

জাহেলী যুগে হযরত সাওদার প্রথম বিবাহ হয় সাকরান ইবনে আমেরের সাথে।[৩১৮] সাকরান ছিলেন হযরত সাওদা (রা.) এর চাচাতো ভাই। ইসলামের সূচনা লগ্নেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আত্নীয়-স্বজনের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম কবুল করেন। শুধু তাই নয়, তাদের নিকটাত্নীয়দের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁরা রাসূল (সা.) এর পরামর্শ অনুযায়ী আবিসিনিয়া হিযরত করেন। এ আবিসিনিয়াতেই তাদের একমাত্র সন্তান আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আবদুর রহমান হালুলার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

নবীজী (সা.) এর সাথে বিবাহের স্বপ্ন

৩১৭. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, বৈরুত: আল-মুওয়ামমাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ১১৭; ইমাম আহমাদ, মুসনাদ ২/২৬৫
৩১৮. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, বৈরুত, খ. ২, পৃ. ৬৪৪; ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, বৈরুত: দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, খ. ৫, পৃ. ৪১২

সাকরান (রা.)-এর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে হযরত সাওদা (রা.) স্বপ্নে দেখেন 'নবী (সা.) আগমন করে তাঁর কাঁধে কদম (পা) মুবারক স্থাপন করেছেন।' তিনি স্বামী সাকরান (রা.) কে স্বপ্ন খুলে বললে তিনি বলেন 'তুমি সত্যই এ স্বপ্ন দেখে থাকলে মহান আল্লাহর শপথ আমি মারা যাবো এবং নবীজী (সা.) তোমাকে বিয়ে করবে।[৩১৯] সাওদা (রা.) পুনরায় স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন, আকাশের চাঁদ ছুটে এসে তাঁর মাথায় পড়েছে। এ স্বপ্ন সম্পর্কেও সাকরান (রা.) কে জানালে তিনি বলেন 'আমি খুব সহসা মৃত্যু বরণ করব এবং আমার পরে তুমি বিয়ে করবে।' সাকরান (রা.) সে দিনই অসুস্থ হন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ইন্তিকাল করেন।[৩২০]

স্বামী সাকরানের মৃত্যুর পর শিশু পুত্র আবদুর রহমানকে নিয়ে সাওদা (রা.) অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করতে থাকেন। মুসলমান হওয়ার করণে আত্নীয়-স্বজনরাও তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। এ সময়ে একান্ত অনন্যোপায় হয়ে তিনি শিশুপুত্রসহ রাসূল (সা.) এর এক দুর সম্পর্কীয় খালা খাওলার বাড়িতে আশ্রয় নেন। খাওলার অবস্থাও অস্বচ্ছল ছিল। তবুও ধৈর্য, সংযম ও পবিত্রতার মুর্ত প্রতীক সাওদা অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়েই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

ইয়াতিম সন্তানদের লালন-পালন নিয়ে চিন্তিত রাসূল (সা.)

চাচা আবু তালিব ও খাদীজা (রা.) এর মৃত্যুতে রাসূল (সা.) খুবই মনকষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছিলেন। মা হারা মাসুম বাচ্চা উম্মু কুলসুম ও ফাতিমাকে নিয়েই বেশি চিন্তার মধ্যে ছিলেন

৩১৯. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল কুবরা*, বৈরুত, তা.বি. খ. ৮, পৃ. ৫৭
৩২০. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, মিশর: দারুল মায়ারিফ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৪০৭

তিনি। এমনকি ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম রাসূল (সা.) কে নিজ হাতেই সম্পাদন করতে হচ্ছিল। যা একজন পুরুষ মানুষের জন্য ছিল সত্যিই কষ্টসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে সংসারে এ অব্যবস্থাপূর্ণ শোচনীয় পরিস্থিতিতে সন্তানদের লালন পালনের জন্য রাসূল (সা.) এর একজন জীবন সাথীর জরুরী প্রয়োজন ছিল। মূলত খাদীজা (রা.) বিহীন নবীর সংসারে জীবন অনেকটা মাঝিহীন নৌকার মত বেশামাল অবস্থায় পৌছেছিল।[৩২১]

হযরত সাওদা (রা.) এর বিবাহের আয়োজন

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সংসারের এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে একদিন তাঁর খালা উসমান বিন মাযউন এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম নবী গৃহে এসে দেখেন যে- রাসূল (সা.) নিজ হাতে থালা বাসন পরিষ্কার করছেন। তখন তিনি রাসূল (সা.) কে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেগুলো পরিষ্কার করেন এবং বিনীতভাবে রাসূল (সা.) কে বলেন, 'হে মুহাম্মদ! খাদীজার ইন্তিকালে তোমাকে অত্যন্ত বিষন্ন দেখছি।' বললেন ঠিক! ব্যাপার তো তাই।' তখন খাওলা বললেন 'হে মুহাম্মদ! বর্তমানে তোমার সংসারে একজন পরিচর্যাকারিনীর প্রয়োজন।

সুতরাং তুমি যদি অনুমতি প্রদান কর তাহলে সাওদা বিনতে যাম'আর সাথে তোমার বিয়ে দিতে পারি। সাওদা খুবই নিরীহ, অসহায় ও খুবই ভালো মহিলা। তাঁর স্বভাব চরিত্র ও সাহিষ্ণুতার যে পরিচয় আমি পেয়েছি, এতে তাঁর মতো একজন নারী তোমার গৃহে আসলে তোমার কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হবে। সাওদা তোমার সংসারকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। রাসূল (সা.) এ প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং ঐদিনই খাওলা সাওদা (রা.) কে সুসংবাদ দিলেন। সাওদা (রা.)

৩২১. আহমাদ শালাবী, AvZ-ZvixL Avj Bmjvg, খ. ১, পৃ. ৩২৭; ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

তা কবুল করলে খাওলা সাওদার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলেন। সাওদার মা খ্রিষ্টান ছিলেন তবুও তিনি বললেন, ‘কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষের সাথে আমার মেয়ে বিয়ে দিতে আমি রাজি আছি।’

নবীজী (সা.) এর সাথে সাওদা (রা.) এর বিয়ে

হযরত সাওদা (রা.) ও তাঁর পিতা বিয়েতে রাজি হওয়ায় রাসূল (সা.) নিজে সাওদার পিতার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। চারশত দিরহাম মোহরানা ধার্য করে হযরত সাওদার পিতা নিজে খুতবা প্রদান করে বিয়ে পড়ান। কিন্তু সাওদার ভাই আবদুল্লাহ এ বিয়ের খবর জানার পর প্রচন্ড অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পরে যখন তিনি ইসলাম কবুল করেন তখন তিনি তার ভূল বুঝতে পেরে সব সময় আফসোস করতেন।[৩২২] বিয়ের পরপরই সাওদা রাসূল (সা.) এর সংসারে চলে আসেন এবং বাচ্চাদের লালন-পালনসহ গৃহের সব দায়িত্ব নিজ হতে তুলে নেন। ফলে রাসূল (সা.) যে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তা থেকে পরিত্রান লাভ করেন এবং ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

হযরত সাওদা (রা.) এর অবয়ব ও আকৃতি

হযরত সাওদা (রা.) ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী। তার দৈহিক গঠন ছিল চমৎকার। তবে তিনি একটু মোটা ধরনের ছিলেন। যে কারণে দ্রুত চলাফেরা করতে কষ্ট হতো। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতি ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না মহিলা।

---

৩২২. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ’লাম*, কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হি., খ. ১, পৃ. ১৬৬; আল্লামা শিবলী নুমানী, *সীরাতুন নবী*, (অনু. এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনশী), ঢাকা: দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮, খ. ২, পৃ. ৮২৮-৮৩৩

পর্দার আয়াত অবতীর্ণের প্রসঙ্গ হওয়া

হযরত সাওদা (রা.) বিদায় হজ্জের সময় মুজদালিফা থেকে রওয়ানা হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রওয়ানা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী রাসূল (সা.) তা অনুমোদন করেননি। শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা.) এর সাথেই তাঁকে রওয়ানা হতে হয়। একদিন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ভোররাতে খোলা মাঠের দিকে (তখনো পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি) সাওদা (রা.) গমন করেন। ফেরার পথে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে চিনে ফেলেন। ওমর (রা.) তাঁকে তখন বলেন, আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। বিষয়টি সাওদা (রা.) ও ওমর (রা.) কেউই পছন্দ করেননি। যে কারণে বিষয়টি নিয়ে তাঁরা রাসূল (সা.) এর সাথে আলাদা আলাদা আলোচনা করেন। এরপর পরই পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ

ُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কয়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরুপে পবিত্র করতে।”[৩২৩]

রাসূলের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে হযরত সাওদা (রা.) এর একনিষ্ঠতা

রাসূল (সা.) বিদায় হজ্জের পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীরদেরকে বলেন, অতঃপর আর ঘরের বাইরে যাবে না। আবু হুরাইরা (রা.) থেকে জানা যায় নবী রাসূল (সা.) এর ওফাতের পরও অন্যান্য স্ত্রীরা হজ্জ করেন। কিন্তু সাওদা বিনতে যাম‘আ ও যয়নব বিনতে জাহাশ এ নিদের্শটি এমন কাঠোরভাবে

৩২৩. আল কুরআন, ৩৩:৩৩

মেনে চলেন যে আর ঘরের বাইরে যাননি। তিনি বলতেন আমি হজ্জ করেছি ও ওমরাহ করেছি। এখন মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মত ঘরের মধ্যে বসে কাটাবো।

রাসূল (সা.) কে খাদীজার মতো আশ্রয় দান এবং তাঁর সোব যত্নে নিজেকে উৎসর্গ করা

হযরত সাওদা (রা.) যখন রাসূল (সা.) এর ঘরনী হয়ে আসেন তখন তাঁর ওপর শত্রুদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের অত্যাচার নির্যাতন নেমে আসে। হযরত সাওদা স্বামীর এ দু:খ কষ্ট ও মর্মযাতনার বিষয় উপলব্ধি করে সর্বদা তাঁর কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করতেন। হযরত খাদীজার মতই তিনি তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে স্বামীর সংকটকালের মোকাবিলা করেছেন। নিঃসন্দেহে সাওদা (রা.) এসব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী ছিলেন।

সৎ সন্তানকে আপন মায়ের মতো স্নেহদান এবং মমতায় ও ভালোবাসায় মায়ের স্মৃতিকে ভুলিয়ে রাখা

হযরত সাওদা (রা.) নবী নন্দিনী উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা (রা.) কে এমনভাবে লালন পালন করেন যে, তাঁরা কোন দিনই তাঁদের মায়ের অভাব অনুভব করেননি। তিনি কুলসুম ও ফাতেমা (রা.) কে খুবই আদর করতেন।[৩২৪]

জীবন চরিত ও দর্শন

স্বল্প ভাষিনী মধুর আচরনকারিণী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন পবিত্র নারী ছিলেন হযরত সাওদা (রা.)। অতিথিপরায়নতা ও দানশীলতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর কোমল ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হত। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন খুবই সহজ ও সরল। অহংকারবোধ বলতে কোন কিছুই তার জীবন আচরণে প্রকাশ পায় নি।

হযরত সাওদার দানশীলতা

একবার হযরত ওমর (রা.) উপহারস্বরুপ এক থলে দিরহাম সাওদা (রা.) এর নিকট পাঠালেন। সাওদা (রা.) থলে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর ভিতর কি আছে'? বলা হল, 'দিরহাম'। এ কথা শুনে সাওদা (রা.) বললেন, 'খেজুরের থলে কি দিরহাম শোভা পায়'। এ বলে তিনি সমস্ত দিরহাম গরীব মিসকীনের মধ্যে বিলি করে দিলেন।[৩২৫]

হযরত সাওদা (রা.) এর সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গি

---

৩২৪. ইউনিভার্সিটি অব পাঞ্জাব, দারিয়া-ই-মায়ারিফ ইসলামিয়া, খ. ১১, পৃ. ৪৪২
৩২৫. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা,* বৈরুত: দারু সাদির, তা.বি., খ. ৮, পৃ. ৫৬

হযরত সাওদা (রা.) ছিলেন রসিক মহিলা। মাঝে মাঝে তিনি এমন এমন রসিকতাপূর্ণ কথা বলতেন যে রাসূল (সা.)ও হেসে ফেলতেন। একবার তিনি রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কাল রাতে আমি আপনার সাথে সালাত পড়ছিলাম। আপনি রুকুতে এত দেরী করছিলেন যে আমার সন্দেহ হয়েছিল যে নাক ফেটে রক্ত ঝরবে। এ কারণে আমি আমার নাক অনেকক্ষণ টিপে ধরেছিলাম। রাসূল (সা.) এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন।

ত্যাগ স্বীকারকারী হিসাবে হযরত সাওদা (রা.)

সাওদা (রা.) যে উদারতা প্রদর্শন করেছেন তা সত্যিই বিরল। তিনি সপত্নী হযরত আয়েশার (রা.) এর জন্য ছাড় দিতে গিয়ে রাসূল (সা.) এর খেদমতে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমার জন্য যে রাত আপনার সান্নিধ্যে থাকা বরাদ্দ আছে, সে রাতটুকু আমি আয়েশাকে দান করলাম। সে কুমারী, আল্লাহ আপনার সান্নিধ্যে ও সাহচর্য দ্বারা তাঁকে অধিক উপকৃত করুন এটাই আমার কামনা। রাসূল (সা.) অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন,'সাওদা' প্রকৃতই তুমি অনন্যা। প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ হিজরী সনে আয়েশা (রা.) স্বামী গৃহে আসলে সাওদা (রা.) তাঁকে অত্যন্ত আপন করে নেন। গার্হস্থ্য জীবনে অধিকাংশ বিষয়ে হযরত সাওদা (রা.) ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.) এর বান্ধবী।[৩২৬]

হযরত আয়েশা (রা.) এর অত্যন্ত পছন্দের মানুষ ছিলেন হযরত সাওদা (রা.)

তিনি আয়েশা (রা.) কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রাসূল (সা.) এর ঘরে আসার পর সাওদা (রা.) নিজেই হযরত আয়েশা (রা.) জন্য সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতেন। এ জন্যই হযরত

৩২৬. শায়খ সৈয়দ সুলায়মান নদভী, *সীরাতে আয়িশা (রা.)*, দিল্লী: মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যা, ১৯৯৬, পৃ-৬৮-৬৯; ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী আল জুফী (রা.), *বুখারী শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪, খ. ৩, পৃ. ৩০৮

আয়েশা (রা.) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি কেবল একজন মহিলার কথাই জানি, যার অন্তরে হিংসার ছোয়া মোটেই পড়েনি। তিনি হলেন হযরত সাওদা (রা.)। কতইনা ভালো হতো যদি তাঁর দেহে আমার প্রাণ হত।[৩২৭] কতখানি উদার ও মহৎ হৃদয়ের মানুষ হলে এটা সম্ভব? সম্ভবত সাওদা (রা.) বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

রাসূল (সা.) এর ঔরসে হযরত সাওদা (রা.) এর গর্ভে কোন সন্তান জন্ম লাভ করেনি। প্রথম স্বামী সাকরানের ঔরসে আবদুর রহমান নামে একজন পুত্র সন্তান ছিলেন। যার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

ইন্তিকাল

রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর প্রায় এগার বছর জীবত ছিলেন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আপন ভূমিকা পালন করেন। ৭৫ বছর বয়সে হযরত সাওদা (রা.) ইন্তিকাল করেন। মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার মৃত্যু সন নিয়ে মতবেদ আছে। ওয়াকিদীর মতে আমির মু'য়াবিয়ার শাসনমলে ৫৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। আর ইবনে হাজারের মতে, ৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইমাম বুখারী (রা.) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতের সময় ২২ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩২৭. ইমাম আবুল হুসাইন, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র.), *মুসলিম শরীফ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪, হিবা অধ্যায়; ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহযীব*, হায়দ্রাবাদ: দারিয়াতুল মা'য়ারিফ, ১৩২৫ হি., খ. ১২, পৃ. ৪৫৫

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.)

পরিচয়: নাম ও বংশ

তার মূল নাম আয়েশা। আয়েশা শব্দের অর্থ সৎচরিত্রা। ডাক নাম উম্মে আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দিকা ও হুমায়রা। তিনি খুব ফর্সা ছিলেন। এ জন্য তাঁকে হুমায়রা বলা হতো।[৩২৮] পরবর্তীকালে নবী (সা.) এর স্ত্রী হওয়ার কারনে উম্মুল মু'মিনীন বা মুমিনদের মা খেতাব প্রাপ্তা হন।

পিতার নাম আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। যিনি রাসূল (সা.) এর সার্বক্ষনিক সহচর ও বন্ধু ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম খলিফা ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল যয়নব এবং ডাক নাম ছিল উম্মে রুম্মান। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ তালিকা হল, আয়েশা বিনতে আবু বকর ইবনে কুহাফা ইবনে ওসমান ইবনে আমের ইবনে ওমর ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তায়িম। মাতার দিক থেকে আয়েশা বিনতে উম্মে রুম্মান বিনতে আমের। পিতৃকূলে দিক থেকে আয়েশা (রা.) তাইম গোত্রের এবং মাতৃকূলের দিক থেকে কেনানা গোত্রের ছিলেন।

উপনাম

হযরত আয়েশা (রা.) নিঃসন্তান ছিলেন। কোন একদিন তিনি নবীজী (সা.) কে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁদের পূর্বোক্ত স্বামীর সন্তানদের নামানুসারে গুণবাচক নাম গ্রহণ করে থাকেন। আমি কি ডাক নাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কারো নামের সাথে নিজের নামকে সংযুক্ত করব? 'রাসূল (সা.) মৃদু হাসলেন এবং বললেন,' আয়েশা! তুমি তোমার বোনের ছেলে

---

৩২৮. ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Avðjvg Avb-bevjv, বৈরুতঃ আল-মুয়ামমাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ১৪০; আল্লামা শিবলী নুমানী, wmivZb bex, (অনু. এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুনসী), ঢাকাঃ দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮, খ. ২, পৃ. ৮৩৩; ইসলামী wek‡Kvl, খ. ১, পৃ. ৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ নামের সাথে সংযুক্ত করে ডাক নাম (কুনিয়াত) গ্রহন করতে পারো।’ এরপর থেকে তিনি উম্মে আবদুল্লাহ নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৩২৯]

অবশ্য তাঁর পিতা আবু বকর (রা.)-এর আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ, আর ডাক ছিল আবু বকর। এ জন্য আয়েশা (রা.) কে উম্মে আবদুল্লাহ অর্থাৎ আবদুল্লাহর মা বলার কারণ বলে ইবনুল আসীর বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে রাসূল (সা.) তাকে ‘সত্যবাদীর কন্যা সত্যবাদীনী’ বলে ডাকতেন।

জন্ম

হযরত আয়েশা (রা.) এর জন্ম ও বিয়ের সন তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যাহোক, মতগুলো নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্ত আসা যায় যে, নবুওয়্যাতের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সনে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং নবুওয়্যাতের দশম সনের শাওয়াল মাসে বিয়ে হয়েছিল। এসময় তার বয়স ছিল ছয় কিংবা সাত বছর। হিজরী দ্বিতীয় সনে শাওয়ার মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আয়েশা (রা.) এর বাসর অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে আয়েশা (রা.) বয়স হয়েছিল নয়/দশ/এগার বছর।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে হযরত আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব

নবীজী (সা.) এর খালা খাওলা বিনতে হাকিম ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও আরবের জাহেলী যুগের কুসংস্কার দূর করার জন্য আয়েশা (রা.) কে বিয়ে করার ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বললে, তৎক্ষণাৎ রাসূল (সা.) এ বিষয়ে হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। তিনি মহান আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর তিনি এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, ‘এক ফেরেশতা

৩২৯. ইবন সা’দ, AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, বৈরুতঃ দারু সাদির, খ. ৮, পৃ. ৬৪; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩৪-৮৩৫

কারুকার্য খচিত একটি রুমাল জড়িয়ে অতি মনোরম এক বস্তু তাকে উপহার দিচ্ছেন। রাসূল (সা.) তা হাতে নিয়ে ফেরেশতাকে জিজ্ঞাস করলেন, 'এটি কি জিনিস'? উত্তরে ফেরেশতা তা খুলে দেখার জন্য বললেন। রাসূল (সা.) খুলে দেখলেন তার মধ্যে হযরত আয়েশার ছবি অঙ্কিত রয়েছে।[৩৩০] এর পর রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে খাওলা আয়েশা (রা.) এর পিতা-মাতার নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এ বিয়েতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন, 'এ বিয়ে কিভাবে বৈধ হবে? আয়েশা তো রাসূল (সা.) এর ভাইঝি।' একথা শুনে রাসূল (সা.) বলেন, তিনি 'তো কেবল মাত্র আমার দ্বীনি ভাই।' খাওলা আবু বকর (রা.)-কে বোঝান যে, রাসূল (সা.) তো আপনার রক্ত সম্পর্কের ভাই নন। রক্ত সম্পর্কের না থাকলে একই খান্দানে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। আয়েশা (রা.) এর মা এ বিষয়ে বললেন, 'আয়শার সাথে রাসূল (সা.) এর বিয়ে খুবই আনন্দের কথা। আমার বিশ্বাস এ বিয়ের ফলে আরবের অনেক জঘন্য কু-প্রথা দূর হবে।'

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে আবু বকর (রা.) তাঁর পিতা আবু কুহাফাকে বিষয়টি বললেন। তিনি তার মতামতে বললেন, ' রাসূল (সা.) এর সাথে আমার নাতনির বিয়ে হলে তা বড়ই গৌরবের কথা হবে। তবে আমি আমার নাতনির বিয়ে যুবায়ের ইবনে মাতয়াম এর ছেলের সাথে দেয়ার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি। একথা আমি কারো নিকট এতদিন প্রকাশ করিনি। আমি যুবায়েরের মতামত নিয়ে তোমাকে আমার অভিমত জানাবো। যুবায়ের ও তার পরিবার তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে কারণে তারা নওমুসলিম আবু বকরের কন্যার সাথে তাদের সন্তানের

৩৩০. তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮/৬০

বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে রাসূল (সা.) এর সাথে আয়েশার (রা.)-এর বিয়ের বাধা দূরীভূত হয়।[৩৩১]

বিবাহ সম্পন্ন

উভয় পক্ষের সম্মতিতে ৫০০ দিরহাম মহরানা ধার্য করা হলে আবু বকর (রা.) নিজে রাসূল (সা.) এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন। রাসূল (সা.) আবু বকরের বাড়িতে আসার সাথে সাথে উপস্থিত মেহমান বৃন্দ 'মারহাবান মারহাবান, আহলান ওয়া সাহলান 'অর্থাৎ শুভেচ্ছা স্বাগতম বলে তাঁকে খোশ আমদেদ (স্বাগতম) জানান। বিয়ের মজলিশে সকলকে উদ্দেশ্য করে আবু বকর সিদ্দিক (রা.) একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন- "আপনারা জানেন রাসূল (সা.) আমাদের পয়গম্বর। তিনি আমাদেরকে আঁধার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছেন, এ আলোকের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার এবং চিরদিনের জন্য আমাদের এ অকৃত্রিম বন্ধুত্ব বজায় রাখার পথ অনেক দিন ধরে খুজছি। তাই আজ আপনাদের খেদমতে আমার ছোট মেয়েটিকে এনেছি। এ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে কতশত কুসংস্কার আমরা গড়ে তুলেছি। বিনা অজুহাতে আমারা শিশু কন্যাকে মাটিতে পুতে ফেলি, হাত পা বেধেঁ দেব-দেবীর পায়ে বলি দেই; যাদেরকে বাচিঁয়ে রাখি তাদেরকে কোন মূল্য দেই না, দোস্তের মেয়েকে আমাদের কেউই বিয়ে করতে পারে না। আপনারা যদি আমার এ আয়েশা (রা.) কে রাসূল (সা.) এর হাতে সোপর্দ করে দেন তবে চিরতরে আরব দেশ থেকে এ সকল কুসংস্কার মুছে যাবে। এতে আপনারা আমার বন্ধুত্বকে বজায় রাখতে পারবেন এবং প্রিয়কন্যা রাসূল (সা.) এর সাথে থেকে ভবিষ্যতে তাঁর আদর্শ ও বাণী জগতে প্রচার

৩৩১. রাসূল (সা:)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা) এর বিবাহের বর্ণনা বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায়। যেমন *মসনাদে আহমাদ*-৬/৪১,১২৮.১৬১; ইমাম বুখারী *আস সহীহ আল বুখারী* বিভিন্ন অধ্যায়ে উক্ত বিবাহের বর্ণনা করেন। *সহীহ মুসলিম* (হাদীস নং ২৪২৮) ফাদায়লুস সাহাবা;

করতে পারবে। উপস্থিত সুধীবৃন্দ এ বক্তৃতা শোনার পর সমবেত কণ্ঠে আবার বলে উঠলেন, ‘মারহাবান মারহাবান’, (স্বাগতম)। এভাবে আয়েশার বিয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই কল্যাণ নেমে আসুক।”[৩৩২]

তৎপর আবু বকর (রা.) নিজে খুতবা পাঠ করে রাসূল (সা.) ও আয়েশা (রা.) এর বিয়ে পড়িয়ে দেন।

আয়েশা (রা.) এর জন্ম ও বিয়ে ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা মত থাকলেও একটি বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকই একমত, তা হলো তিনি শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন, শাওয়াল মাসেই তার বিয়ে হয় এবং শাওয়াল মাসেই তিনি স্বামীগৃহে পদার্পণ করেন।

সংসার জীবনে হযরত আয়েশা (রা.)

হযরত আয়েশা (রা.) পিতৃগৃহ থেকে স্ত্রী হয়ে আসেন ৯ বছর বয়সে।[৩৩৩] যে বাড়ীতে উঠেন সেটি ছিল মদীনায় মসজিদে নববীর পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত ছোট একটি কাচাঁ ঘর। ঘরটি প্রশস্ততা ছিল ছয় হাতের চেয়ে একটু বেশি। দেয়াল ছিল কাচাঁ মাটির। ছাদ ছিল খেজুর গাছের পাতা ও ডালের । তার উপর কম্বল দেওয়া ছিল যেন বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এতটুকু উচু ছিল যে, একজন মানুষ দাড়ানোর মত। হাতে ছাদের নাগাল পাওয়া যেত। এক পাল্লার একটি দরজা ছিল। পর্দার জন্য দরজায় একটি কম্বল ঝুলানো থাকতো। ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল, একটি খাট, একটি চাটাই, একটি বিছানা, একটি বালিশ, খোরমা-খেজুর রাখার দুইটি মটকা, পানির একটি পাত্র এবং পান করার একটি পেয়ালা। এর বেশি কিছু নয়। বিভিন্ন হাদীসে এইসব জিনিস পত্রের

৩৩২. মাওলানা নূরুর রহমান, D¤§j gÖwgbxb nhiZ Av‡qkv wmÏxKv (iv.), ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭, পৃ. ২৩-২৪; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩৪-৮৩৫

৩৩৩. ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, বৈরুতঃ দারু সাদির, খ. ৮, পৃ. ৫৮-৫৯

নাম এসেছে। ঘরে রাত্রির বেলায় বাতি জ্বালানোর সমর্থ ছিল না। ঘরে সর্বসাকুল্যে দু'জন মানুষ ছিলেন, রাসূল (সা.) ও আয়েশা (রা.)। কিছুদিন পর বুরায়রা (রা.) নামে একজন দাসী যুক্ত হয়েছিলেন। ঘর গৃহ-স্থলীর গোছগাছ ও পরিপাটির বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়তো না। খাবার তৈরি ও রান্নাবান্নার সুযোগ খুবই কম আসতো।[৩৩৪]

দাম্পত্য জীবনে হযরত আয়েশা (রা.)

মহানবী (সা.) এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.) এর নয় বছরের দাম্পত্য জীবনে ছিল গভীর ভালোবাসা। তাঁদের মধ্যে ছিল পারস্পারিক সহমর্মিতা, সীমাহীন আবেগ ও নিষ্ঠাপূর্ণ দায়িত্ব। কঠিন দারিদ্র, অনাহার তথা সকল প্রতিকুল পরিবেশেও তাঁদের এ মধুর সম্পর্কে একদিনের জন্যও ফাটল দেখা দেয়নি। কোন রকম তিক্ততা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়নি। নবীজী (সা.) আয়েশা (রা.) কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। এ কথা গোট সাহাবী সমাজের জানা ছিল। এ কারণে রাসূল (সা.) যেদিন আয়েশা (রা.) এর গৃহে অবস্থান করতেন সেদিন তাঁরা বেশি বেশি হাদিয়া তোহফা পাঠাতেন।[৩৩৫]

স্বামীর অফুরন্ত সেবায় হযরত আয়েশা (রা.)

হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে জানা যায় যে, ঘরে খাদেম থাকা সত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রা.) নিজ হাতে সব কাজ করতেন। নিজ হাতে আটা পিষতেন, খাবার তৈরি করতেন, বিছানা পাততেন, ওযুর পানি এনে রাখতেন, স্বামীর মাথায় চিরুনী করে দিতেন, দেহে আতর লাগিয়ে দিতেন,

---

৩৩৪ বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ রশীদ হাইলামায, Rxeb I Kg: Av‡qkv iwh, (অনু. মুহাম্মদ আদম আলী ও সম্পাদনায় মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর), ঢাকাঃ মাকতাবাতুল ফুরকান, ২০১৫, পৃ. ৪০.৪৮; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩৪-৮৩৫

৩৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-১০০

কাপড় ধুতেন, রাতে শোয়ার পূর্বে মিসওয়াক ও পানি মাথায় কাছে এনে রাখতেন এবং মিসওয়াক ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন।[৩৩৬]

স্বামীর আনুগত্য ও অনুকরণে হযরত আয়েশা (রা.)

হযরত আয়েশা (রা.) নবীজী (সা.) এর কোন অপছন্দের কাজ করতেন না। একবার তিনি যত্নসহকারে দরজায় ছবিওয়ালা পর্দা টানালেন। মহানবী (সা.) তা দেখে অপছন্দ করলে তা তিনি সাথে সাথে খুলে ফেললেন। স্বামীর মৃত্যুর পরও হযরত আয়েশা (রা.) পূর্বের মতই আনুগত্য ও অনুস্বরণ করেছেন।

সতীন ও তাদেদর সন্তানদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক

হযরত আয়েশা (রা.) এর আট জন সতীন ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের সাথে হযরত আয়েশা (রা.) এর সু-সম্পর্ক ছিলো। রাসূল (সা.) এর মুখে হযরত খাদিজা (রা.) এর প্রশাংসা শুনে শুনে তিনি তাঁর প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধশীল হয়ে ওঠেন এবং তাঁর সন্তানদের প্রতিও যত্নশীল হন। হযরত সাওদা (রা.) কে ভিতর থেকে সম্মান করেতন, যেমন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর সর্ম্পকে বলেন, তার দেহে যদি আমার প্রাণ হত। হযরত সাফিয়্যা (রা.) এর চমৎকার খাবার তৈরির প্রশাংসা করতেন। হযরত ফাতিমা (রা.) এর প্রশংসায় হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ফাতিমা (রা.)-র চেয়ে একামাত্র তাঁর পিতা ছাড়া আর কোন ভালো মানুষ কখনও দেখি নি।[৩৩৭]

জ্ঞান চর্চায় হযরত আয়েশা (রা.)

---

৩৩৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৪

৩৩৭. ইমাম আবু দাউদ, Av¡j-RwgDm mbvb, বিয়দঃ মাকতাবাহ আর রুশদ, ২০০৫, কিতাবুল আদব, (হাদীস নং-৫২১৭); বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ রশীদ হাইলামায, জীবন ও কর্মঃ আয়েশা (রাযি.), (অনু. মুহাম্মদ আদম আলী, সম্পাদনায় মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর), ঢাকাঃ মাকতাবাতুল ফুরকান, ২০১৫, পৃ. ১৮৯-১৯২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাধর একজন বালিকা। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। যে কোনো বিষয়ে তিনি দু'একবার শুনলেই মুখস্ত করে ফেলতে পারতেন। আয়েশা (রা.) তাঁর পিতার সাথে থেকে তিন থেকে চার হাজার কবিতা ও কাসিদা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই পিতা আবু বকর (রা.) এর ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষের পূত-পবিত্র সহচর্য থেকে আদব-কায়দা, আচর-ব্যবহার, চাল-চলন, দান-খয়রাত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অতিথি-অপ্যায়ন এবং সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে তাঁকেই আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতা মাতার নিকট থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন রাসূল (সা.) এর সহচার্যে এসে তা শতধারায় বিকশিত হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে পরবর্তী জীবনে তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এর জীবনের সাথে জড়িত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং এর প্রাসঙ্গিক শিক্ষা

আয়েশা (রা.) এর জীবনে চারটি ঘটনা অত্যন্ত আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। এ ঘটনা চারটি হল:

১. ইফক, ২. ঈলা, ৩. তাহরীম, ৪. তাখাইয়ির

ইফকের বা মিথ্যা অভিযোগের ঘটনা

৫ম বা ৬ষ্ট হিজরীতে অনুষ্ঠিত বনু মুসতালিক গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান থেকে ফিরার পথে রাত্রি বেলায় হযরত আয়েশা (রা.) এর হার হারিয়ে যায়। হার খুঁজতে গিয়ে দেরী হয়ে যায় বিধায় তাঁর পক্ষে সওয়ারী দলের সাথে যাত্রা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি এবং কাফেলাও বুঝতে পারি নি যে তাঁরা হযরত আয়েশা (রা.) কে পিছনে ফেলে আসছেন। যাহোক, বনু সালাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান এর সওয়ারীতে উঠে যাত্রা শুরু করেন এবং পরদিন দুপুরের সময় কাফেলাকে ধরে

Dhaka University Institutional Repository

ফেলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কতিপয় মুনাফিক হযরত আয়েশা (রা.) এর বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করে এবং সাধারণ সরলমনা মুসলমানগণের মনের মধ্যেও সন্দেহের ঢেউ খেলতে থাকে।

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত নির্দোষ কিন্তু তিনি তাঁর নির্দোষিতার কথা কাউকে বুঝাতে পারেননি। অবশেষে তিনি সিন্ধান্ত নিলেন যে তিনি ধৈর্যধারণ করবেন যতক্ষন পর্যন্ত না স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দোষিতার বিষয়ে কোন কিছু নবীজী (সা.) কে না জানান। যাহোক, অবশেষে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দোষিতার ব্যাপারে মহানবী (সা.) কে জানালেন এর ফলে সবার মনে মধ্যে দানা বেধে ওঠা সন্দেহ সংশয় দূর হয় এবং হযরত আয়েশা (রা.) এর চারিত্রিক নিষ্কুলতা প্রমানিত হয়।[৩৩৮] যাহোক, এ ঘটনাটি ইফকের বা অপবাদ আরোপের ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে

ইফ্ক এর ঘটনাকে পুজি করে পাশ্চত্যের ইসলাম বিদ্বেষী একটা মহল আয়েশা (রা.) এর বিষয়ে সমালোচনার অপপ্রয়াস চালানোর চেষ্টা করছে। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত আয়েশা (রা.) এর চারিত্রিক সনদ এলে তাদের মিশন প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। আল্লাহ তায়ালার কোন কাজই অন্তসার শূন্য নয়, বরং সবকিছুর পশ্চাতেই একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। ইফ্ক এর ঘটনা অবতারনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের নারী জাতিকে সকল বিপদে দৃঢ়তা অবলম্বন ও ধৈর্য-ধারনের শিক্ষা দেয়া।

৩৩৮. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন *আস-সহীহ আল বুখারীর*, কিতাবুল সাহাদাত (হাদীস নং ১৯৮); কিতাবুল জিহাদ (হাদীস নং ৩৩৩,৩৩৫), কিতাবুল তাফসীর (হাদীস নং ৩৪৩,৩৬৭); *সহীহ মুসলিম* (হাদীস নং ২৭৭০) কিতাবুত তাওবাহ; ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, বৈরুত: খ. ২, পৃ. ২৯৭, ৩০৭; *তিরমিযী* (হাদীস নং ৩১৭৯); ইবন কাসির, *আল-বিদায়াওয়ান নিহায়া*, বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ, খ. ৩, পৃ. ১৬০; *তাফসীরে ইবনে কাসীর*; ইবন কাসীর, *আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয্যা, খ. ২, পৃ. ৫১-৫৪; আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫৩-১৫৯

তায়াম্মুমের ঘটনা

ইফকের ঘটনার মাত্র তিন মাস পর 'জাতুল জ্বায়েশ' যুদ্ধে রাসূল (সা.) গমন করেন। এবারও আয়েশা (রা.) রাসূল (সা.) এর সফর সঙ্গী হন এবং তাঁর হারটি হারিয়ে যায়। বিষয়টি তিনি তৎক্ষনাৎ রাসূল (সা.) কে জানান। ফলে রাসূল (সা.) যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন। হার খুজতে খুজতে ফজরের ওয়াক্ত প্রায় যায় যায় অবস্থা। এদিকে কাফেলার সাথে এক ফোটা পানিও ছিল না। কীভাবে সালত আদায় করা হবে এ ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

আবু বকর (রা.) যথারীতি এ কাফেলার সাথে ছিলেন। তিনি বুঝলেন হযরত আয়েশার জন্য এ অবস্থা। তাই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে রাসূল (সা.) এর তাবুতে গেলেন। রাগত কণ্ঠে বললেন, 'আয়েশা'! এ কি তোমার আচরণ? তোমার হারের জন্য সমগ্র কাফেলার লোকজন এক চরম বিপদের সম্মুখীন। অযু গোসলের জন্য এক বিন্দু পানিও নেই। এখন লোকজন কেমন করে ফজরের সালাত আদায় করবে? বারে বারে তুমি আমাদেরকে একই রকমের সমস্যায় ফেলে চলেছ।

আয়েশা (রা.) টু শব্দটি করলেন না। কারণ রাসূল (সা.) তখন তাঁর কোলে মাথা রেখে চোখ বুজেছিলেন। তিনি মনে মনে শুধু মহান আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। এ সময় রাসূল (সা.) এর নিকট ওহী নাযিল হলো।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Dhaka University Institutional Repository

“আর যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা বিদেশ ভ্রমণে থাক, কিংবা তোমাদের কেউ শৌচাগার হতে ফিরে আসে, কিংবা স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, এমতাবস্থায় পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর। হস্তদ্বয় ও মুখমন্ডল মাসেহ কর, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।”[৩৩৯]

তায়াম্মুমের হুকুম নাযিল হওয়ার কারণে উপস্থিত সবাই খুব খুশি হয়ে আয়েশা (রা.) ও আবু বকর (রা.) এর প্রশংসা করতে লাগল। রাসূল (সা.)ও খুশি মনে সকলকে নিয়ে তায়াম্মুম করে জামা'য়াতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে যাত্রার উদ্দ্যেশ্যে আয়েশা (রা.)কে বহনকারী উঠ দাড়াতেই দেখা গেল তাঁর হার সেখানে পড়ে আছে। হার পাওয়াতে আবু বকর (রা.) নিজ কন্যার কাছে এসে বললেন, মা আয়েশা! আমি জানতাম না, তুমি এতই পূণ্যবর্তী। তোমাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা' আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি যে রহমতের ধারা বর্ষণ করেছেন, তার জন্য হাজারো শোকর। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘায়ূ দান করুন।[৩৪০]

ঈলার ঘটনা

রাসূল (সা.) এর স্ত্রীদের জন্য খাদ্য ও খেজুরের যে পরিমান ছিল, প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নেহায়েত অপ্রতুল। তাঁরা অভাবের মধ্যে দিনাতিপাত করতেন। এদিকে ৯ম হিজরী সনে আহযাব ও বনু কুরায়জার অভিযানের সমসাময়িককালে আরবের দুর-দুরান্তে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধ বিজয়, বার্ষিক আমদানী বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত গণীমতের মাল সঞ্চায় হতে লাগলো। রাসূল (সা.) এর হাতে সম্পদের আধিক্য দেখে (নবী পত্নীগণ) তারা সমস্বরে তাঁদের

৩৩৯. আল-কুরআন, ৪:৪৩
৩৪০. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৭২; আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭১

জন্য নির্ধারিত বরাদ্দের পরিমান বৃদ্ধির আবেদন জানালো। আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ও ওমর (রা.) তাঁদের কন্যাদ্বয় যথাক্রমে আয়েশা ও হাফসা (রা.) কে বুঝিয়ে এ দাবী থেকে বিরত রাখেন।

অপরদিকে অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁদের দাবির ওপর অটল থাকলেন। ঘটনাক্রমে এ সময় মহানবী (সা.) ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং পাজরে গাছের একটি মূলের সাথে ধাক্কা লেগে আঘাতপ্রাপ্ত হন।[৩৪১] স্ত্রীদের এ দাবীতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। আয়েশা (রা.) এর হুজরা সংলগ্ন আল-মাশরাবা' নামক গৃহে অবস্থান নেন এবং এক মাস পর্যন্ত কোন স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ করেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মুনাফিকরা সমাজে রটিয়ে দেয় যে রাসূল (সা.) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এ কথা শুনে সাহাবীরা অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁরা মসজিদে নববীতে অবস্থান করেন। রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগণ অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু কেউই রাসূল (সা.) পর্যন্ত যাওয়ার সাহস করলেন না।

হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীতে এসে ব্যথাতুর অবস্থা দেখে রাসূল (সা.) এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। দু'বার সারা না পেয়ে তৃতীয় বারের মাথায় অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন রাসূল (সা.) একটি চৌকির উপরে শুয়ে আছেন, তাঁর শরীর মুবারকে মোটা কম্বলের দাগ পড়ে গেছে। ওমর (রা.) ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে কায়েকটি মাটির পাত্র ও একটি শুকনো মশক ছাড়া কিছুই নেই। এ দৃশ্য দেখে ওমর (রা.) এর চক্ষু অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়ল। তিনি জিজ্ঞাস করলেন ইয়া রাসূল (সা.)! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন। নবীজী উত্তরে না বললেন। রাসূলের অনুমতি নিয়া এ সংবাদটি হযরত ওমর (রা.) সকলকে জানিয়ে দিলেন। ফলে সকল মুসলমানগণ ও নবী পত্নীগণ চিন্তমুক্ত হন।

---

৩৪১. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৮

আয়েশা (রা.) বলেন, আমি এক এক করে দিন গুণতে ছিলাম। ২৯ দিন পূর্ণ হলে নবী (সা.) ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সর্বপ্রথম আমার গৃহে আগমন করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.)! আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন, আজতো ঊনত্রিশ দিন হয়েছে। নবী (সা.) বললেন, মাস ঊনত্রিশ দিনেরও হয়।[৩৪২]

তাখাইয়্যিরের ঘটনা

ঈলার ঘটনার পর তাখয়্যিরের ঘটনা ঘটে। তাখঈর অর্থ ইখতিয়ার বা স্বীধীনতা দান করা।

পার্থিব ভোগ-বিলাসিতা দ্বারা নিজেকে কুলুষিত করতে একদিকে যেমন রাসূল (সা.) নারাজ ছিলেন। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রীগণ জীবন যাপনের মান বৃদ্ধির জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন: এঘটনা থেকে মুসলিম নারী সমাজ দাম্পত্য জীবনে ধৈর্যধারন ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার শিক্ষা পান।

نْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

"হে নবী! আপনি স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্য পেতে চাও তবে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের গৃহ ভালো মনে কর, তবে তোমাদের মধ্যে যে নেককার তার জন্য আল্লাহ বিরাট পুরষ্কার ঠিক করে রেখেছেন।"[৩৪৩]

৩৪২. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, বাবুল ঈলা।
৩৪৩. আল- কুরআন, ৩৩:২৯

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো: নবী পত্নীদের মধ্যে যার ইচ্ছে দরিদ্র ও অভাব-অনটন মেনে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সাথে সংসার ধর্ম পালন করতে পারে; আর যার ইচ্ছা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারে।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা.) সর্বপ্রথম আয়েশা (রা.) এর কাছে এসে বললেন, আজ তোমাকে একটি কথা বলছি, খুব তাড়াতাড়ি করে উত্তর না দিয়ে তোমার পিতা-মাতার সাথে জেনে স্থিরভাবে উত্তর দিবে। অতঃপর রাসূল (সা.) উপরে উল্লিখিত আয়াতটি তাঁকে পাঠ করে শোনালেন: আয়াতটি শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন এ বিষয়ে আমার বাবা-মা'র নিকট কি জিজ্ঞাসা করবো? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.) এবং পরকালের সাফল্যই প্রত্যাশী করি।

আয়েশা (রা.) এর এ উত্তর শুনে নবী (সা.) অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি বললেন বিষয়টি তোমার নিকট যেভাবে উপস্থাপন করেছি, ঠিক সেভাবে অন্য স্ত্রীদের নিকটেও করবো। আয়েশা (রা.) তাঁর সিদ্ধান্তের কথা কাউকে না জানাতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু রাসূল (সা.) তা রাখেন নি। তিনি বরং তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট আয়েশার এর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন।[৩৪৪] তাঁদের প্রত্যেকেই আয়েশার (রা.) এর মত করে একই উত্তর দেন। আলোচ্য আয়াত নাযিলের সময় রাসূল (সা.) এর চার জন (সাওদা, আয়েশা, হাফসা ও উম্মু সালমা) মতান্তরে ৯ জন (বাকি ৬ জন হচ্ছেন হাবিবা, সাফিয়া, মায়মুনা, জুহাইরিয়া ও যয়নব বিনতে জাহাশ) স্ত্রী ছিলেন।

তাহরীমের ঘটনা (হারাম করা)

৩৪৪. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬৯

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) মধু খুব পছন্দ করতেন। এ জন্য যয়নাব (রা.) তাকে প্রায়ই মধুর শরবত তৈরি করে দিতেন। কিন্তু একদিন আছরের পর রাসূল (সা.) যয়নবের ঘর থেকে মধু খেয়ে বের হয়ে আয়েশা (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করলে আয়েশা ও হাফসা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মুখে "মাগাফীর" নামক এক প্রকার ফলের দূর্গন্ধ আসছে। বিষয়টি আয়েশা (রা.) সহ অন্যান্য নবী পত্নীদের পছন্দনীয় ছিল না। রাসূল (সা.) যখন ব্যাপারটা আঁচ করলেন, তখন তিনি আর মধু খাবেন না বলে কসম করলেন।[৩৪৫]

মহান রাব্বুল আলামীন কিন্তু তাঁর হাবীবের এ কাজটি পছন্দ করলেন না। সাথে সাথে ওহী নাযিল হল,

أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"হে প্রিয় নবী-আল্লাহ আপনার জন্য যা কিছু বৈধ করেছেন, স্বীয় স্ত্রীদের প্ররোচনায় তাঁদের মনতুষ্টির জন্য হালাল বিষয়টিকে আপনি অবৈধ বা হারাম বলে অভিহিত কেন করলেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আল্লাহ আপনার কসম ভঙ্গের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা হবে আইনসঙ্গত। আল্লাহ আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।"[৩৪৬]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা.) আবার মধু পান করা শুরু করলেন। তারপর রাসূল (সা.) কসমের কাফফারা আদায় করেন। আয়েশা ও হাফসা (রা.) সহ অন্যান্য নবী পত্নীগণ এ বিষয়ে রাসূল (সা.) এর নিকট ক্ষমা চাইলেন। এ ঘটনা তাহরীমের ঘটনা হিসেবে পরিচিত।[৩৪৭]

৩৪৫. ইবন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, বৈরুত: মাকতাবাতুল মায়ারিফ, তা.বি. খ. ৩, পৃ. ১৬১
৩৪৬. আল-কুরআন, ৬৬:১-২
৩৪৭. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৩১৩

যেহেতু এ ঘটনা বহুলাংশে হাফসা (রা.) এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই তাঁর সম্পর্কে আলোচনার স্থানে এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আয়েশা (রা.) এর জীবনে সংঘটিত উপরোক্ত প্রতিটি ঘটনাই প্রকারান্তরে তাঁর ইযযত ও সম্মান বৃদ্ধি করেছে যা গোটা মানব জাতিকে বহুবিদ কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন বিশ্ব নারী জাতির জন্য গর্ব, আদর্শ ও আলোকবর্তিকা স্বরুপ।

সজাগ, সর্তক ও সচেতনশীল আয়েশা (রা.)

হযরত আয়েশা (রা.) অন্ধ অনুকরনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সবকিছু যাচাই বাছাই করে তারপর গ্রহণ করতেন। রাসূল (সা.) এর সময়ে মেয়েদের জন্যে মসজিদে গিয়ে পুরুষদের পেছনে সালাত আদায়ের অনুমতি ছিল। কিন্তু রাসূল (সা.) ইন্তিকালের পর তৎকালীন সময়ের মেয়েদের চলাফেরা দেখে আয়েশা (রা.) বেশ রাগের সাথে বলেছিলেন, রাসূল (সা.) যদি জানতেন, নারীদের কি দশা হবে, তা হলে তিনি বনী ইসরাঈলের মতো নারীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন।

কা'বা শরীফের চাবিধারী ওসমান (রা.) একবার এসে আয়েশা (রা.) কে বললেন, কা'বা শরীফের গেলাফ নামানোর পর তা দাফন করা হয়েছে। যেন মানুষের নাপাক হাত তা স্পর্শ করতে না পারে। আয়েশা (রা.) বললেন, 'এটা তো কোন যুক্তিযুক্ত কথা হলো না। গেলাফ খুলে ফেলার পর যার ইচ্ছা তা ব্যবহার করতে পারে। তুমি তা বিক্রি করে গরীব দু:খীদের মধ্যে তার মূল্য বিতরণ করে দিলেন না কেন?'

স্বামী রাসূল (সা.) এর অফুরন্ত ভালোবাসায় সিক্ত আয়েশা (রা.)

হযরত আয়েশা (রা.) সে সৌভাগ্যবান উম্মাহাতুল মু'মিনীন যার কোলে মাথা রেখে রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে অসুস্থাবস্থায় নবী করীম রাসূল (সা.) আয়েশা (রা.) এর গৃহে ছিলেন। এমনকি তাঁর গৃহেই রাসূল (সা.) কে দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) কেও রাসূল (সা.) এর পাশে অর্থাৎ আয়েশার গৃহে দাফন করা হয়।[৩৪৮]

আসলে রাসূল (সা.) অন্যান্যদের তুলনায় আয়েশা (রা.) কে একটু বেশিই ভালোবাসতেন। তিনি নিজেই বলেছেন 'হে আল্লাহ! যা কিছু আমার আয়ত্তাধীন, (অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে সাম্য বজায় রাখা) সে ক্ষেত্রে ইনসাফ থেকে যেন আমি বিরত না থাকি, আর যা আমার আয়ত্তের বাইরে (অর্থাৎ আয়েশার মর্যাদা ও ভালোবাসা) তা ক্ষমা করে দাও।

আমর ইবনুল আস (রা.) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূল (সা.)! দুনিয়ার জীবনে আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? রাসূল (সা.) বললেন, আয়েশা। তিনি বললেন, আমি জানতে চাচ্ছি পুরুষদের মধ্যে কে সবচেয়ে প্রিয়। জবাব দিলেন, আয়েশার পিতা অর্থাৎ আবু বকর (রা.)।[৩৪৯]

হযরত আয়েশা (রা.)ও প্রাণ দিয়ে রাসূল (সা.) কে ভালোবাসতেন। নবীজী (সা.) ইন্তিকালের সময় যে পোশাক পরিহিত ছিলেন পরবর্তীকালে আয়েশা (রা.) তা যত্ন সহকারে হেফাজত করেন। একদিন তিনি জনৈক সাহাবাকে কম্বল ও তহবন্দ (লুঙ্গি জাতীয়) দেখিয়ে বলেন, 'খোদার কসম, এ কাপড় পরিধান করে রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করেছেন।' জীবনের শুরুতেই হযরত আয়েশা (রা.)

---

৩৪৮. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, nhiZ gnv¤§‘ g¯Ídv (mv.) mgKvjxb cwi‡ek I Rxeb, ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, পৃ. ৯৪১-৯৪৩
৩৪৯. তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৮৮৬

বিধবা হন, এর পর তিনি ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। এ ৪৮ বছর জীবনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে রাসূল (সা.) রেখে যাওয়া কাজের তদারকি করছেন।

রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর আবু বকর (রা.) এর খেলাফাতকে স্বীকার করে বাই'আতকালে নবী পত্নীগণ হযরত উসমানের মাধ্যমে মীরাছি দাবি করার উদ্যোগে নিলে আয়েশা (রা.) সকলকে স্মরণ করে দিলেন, "রাসূল (সা.) বলে গেছেন, কেউ আমার ওয়ারিশ হবে না। আমার রেখে যাওয়া জিনিস হবে ছদকা।"[৩৫০]

আয়েশা (রা.) পোষাক পরিধান করার ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। একবার তাঁর ভাইঝি হাফছা বিনতে আবদুর রহমান পাতলা ওড়না পরে তাঁর সমানে আসলে তিনি ওড়নাটি ছুড়ে ফেলে একটা মোটা কাপড়ের ওড়না তাকে দেন। আয়েশা (রা.) কোনো এক বাড়িতে একবার বেড়াতে যান। সেখানে বাড়িতে মালিকের দু'জন মেয়েকে চাদর ছাড়াই সালাত পড়তে দেখে বলেন, 'আগামীতে বিনা চাদরে কখনো সালাত পড়বে না।

পরামর্শক হিসাবে আয়েশা (রা.)

হযরত আবু বকর (রা.) এর আমল থেকে আয়েশা (রা.) বিভিন্ন জটিল বিষয়ে সাহাবাদেরকে পরামর্শ দিতেন। এ সময়ে থেকেই তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর হাদীস বর্ণনা করতে থাকেন এবং ফতোয়া দেয়া শুরু করেন।

---

৩৫০. আস সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং- ৬৩৪৯

হযরত ওমর (রা.) এর শাসন আমলে যখন তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদে থেকে পদচ্যুত করেন, তখন এ সংবাদ পাওয়ার পর আয়েশা (রা.) খলিফাকে পরামর্শ দেন খালিদকে সাধারন সৈনিক হিসেবে রাখার জন্য; তা না হলে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে বলে তিনি আংশকা করেছিলেন। ওমর (রা.) মা আয়েশা (রা.) এর কথা অনুযায়ী কাজ করেন।[৩৫১]

মিসর অভিযানে আমর ইবনুল আস যখন সুবিধা করতে পারছিলেন না তখন আয়েশা (রা.) ওমর (রা.) কে তাড়াতাড়ি জোবায়েরের নেতৃত্বে নতুন সৈন্য বাহিনী মিসরে পাঠানোর পরামর্শ দেন। খলিফা সে অনুযায়ী কাজ করলেন। ফলে অল্পদিনেই মিসর মুসলমানদের পদানত হয়।[৩৫২]

মৃত্যুর আগে হযরত ওমর (রা.) এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.) কে হযরত আয়েশা (রা.) এর নিকট পাঠান তার লাশ রাসূল (সা.) এর পাশে দাফন করার অনুমতির জন্য। আবেদন পেশ করলে আয়েশা (রা.) বলেন, স্থানটি আমার নিজের জন্য রাখলেও হযরত ওমরের জন্য তা আনন্দের সাথে ত্যাগ করছি।

আয়েশা (রা.) এর অনুমতি পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) ওছিয়াত করে যান, ‘আমার মৃহদেহ আস্তানার সামনে রাখবে। অনুমতি পাওয়া গেলে ভেতরে দাফন করবে, অন্যথায় সাধারন মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে।’ সে অনুযায়ী কাজ করা হয়। আয়েশা (রা.) এর অনুমতি পাওয়ার পর হুজরার ভেতর ওমর (রা.) এর লাশ দাফন করা হয়।[৩৫৩]

---

৩৫১. ইবন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭০
৩৫২. প্রাগুক্ত
৩৫৩. আস সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-১৩৯২

হযরত ওসমান (রা.) এর খিলাফতকালে বিভিন্ন বিষয়ে আয়েশা (রা.) এর নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হতো এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হতো। তাঁর সময়ের প্রথম দিকে রাজ্যে হট্টগোল দেখা দিলে মুহাম্মদ বিন আবু বকরসহ বিশিষ্টি ব্যক্তিবর্গ খলিফার পদত্যাগের দাবি নিয়ে আয়েশার কাছে আসেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, না, তা হতে পারে না। রাসূল (সা.) বলেছেন, যদি ওসমানের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব আসে তাহলে সে যেন তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করে।'

হযরত ওসমান (রা.) এর খেলাফাতের শেষ দিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে দু:শাসনের অভিযোগ উঠলে হযরত আয়েশা (রা.) এর পরামর্শ অনুযায়ী তাদেরকে রাজধানীতে তলব করা হয় এবং গভর্নরদের পেশকৃত দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় একটি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে। এ তদন্ত কমিটিও আয়েশা (রা.) এর পরামর্শে গঠিত হয়।

ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই মুনাফিকরা আল্লাহ রাসূল (সা.) ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছিল। হযরত ওসমান (রা.) এর সময়ে এসে তারা খুবই সুকৌশলে কাজ শুরু করে এবং ওসমান (রা.) এর শাহাদতের ফলে তা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। আলী (রা.) এমনি এক দু:খজনক পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের খলীফা হন। খিলাফাত প্রাপ্তির পর পরই তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় হযরত ওসমানের হত্যার বিচার করার জন্য।

কিন্তু ঘটনা এমন ছিল যে হত্যাকরীরা কে বা কারা তা সঠিক করে কেউ জানতো না। ওসমান (রা.) এর স্ত্রী নাইলা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাউকে চিনতে পারেননি। ফলে কাউকে সাজা দেয়া যাচ্ছিল না। চক্রান্তকারীরা এ সুযোগটিই গ্রহণ করল। তাদের প্ররাচনায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবাও ওসমান হত্যার দ্রুত বিচার দাবি করলেন। এদের মধ্যে আয়েশা, তালহা ও যুবাইর (রা.)

এর মতো লোকও ছিলেন। তাঁরা আয়েশার নেতৃত্বে মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন। সেখানে ওসমান হত্যার বিচার দাবিকারীদের সংখ্যা ছিল বেশী। এহেন সংবাদ আলী (রা.) এর কাছে পৌছায় এবং দু'বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যেহেতু উভয়পক্ষ সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ফলে আলাপ আলোচনার পর বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়।

কিন্তু চক্রান্তকারীরা এ ধরনের পরিস্থিতির পক্ষে ছিল না। তাই তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাতের আধারে এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর আক্রমন চালায়, আর প্রচার করতে থাকে যে অপর পক্ষ সন্ধির সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে আক্রমন করেছে। এতে যুদ্ধ বেধে যায় এবং আরো ভয়াবহ রুপ নেয়। উভয়পক্ষে প্রচুর শহীদ হন। শেষ পর্যন্ত আলী (রা.) জয়লাভ করেন এবং আয়েশা (রা.) কে সসম্মানে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। যা হোক, এ যুদ্ধে আয়েশা (রা.) উটে আরোহন করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বলে ইতিহাস এটা জঙ্গে জামাল বা উষ্টের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

হযরত আয়েশা (রা.) এর বদান্যতা ও দানশীলতা

আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে আয়েশা (রা.) এর খেদমতে তিনি এক লক্ষ দিরহাম উপহারস্বরুপ পাঠিয়েছিলেন। আয়েশা (রা.) ঐদিন সন্ধার আগেই পুরো এক লক্ষ দিরহাম গরীব মিসকীনদের মধ্যে দান করে দিলেন। ঐদিন তিনি রোযা রেখে ছিলেন। কিন্তু ইফতার করার জন্যেও কিছু রাখেননি। তাই তাঁর দাসী আরজ করলো, 'ইফতারের জন্য তো কিছু রাখা প্রয়োজন ছিল।' উত্তরে আয়েশা (রা.) বললেন, 'মা! তুমি এ বিষয়ে পূর্বে আমাকে স্বরণ করিয়ে দিতে পারতে'।

হযরত আয়েশা (রা.) এর বিশেষ বৈশিষ্ট সমূহ

হযরত আয়েশা (রা.) অনেক ক্ষেত্রে অনেকের চেয়ে বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। উম্মুহাতুল মু' মিনীনদের মধ্যে তাঁর ফযীলত ও বৈশিষ্ট ছিল ব্যাতিক্রমধর্মী। তিনি নিজেই বলেন, এটি আমার অহংকার নয় বরং প্রকৃত ঘটনা এই যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেকগুলো কারণে দুনিয়ার সকলের চেয়ে আমাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। তাঁরই কথা-

১. আমার বিয়ের পূর্বে আমার ছবি ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ.) রাসূল (সা.) এর সামনে রেখেছিলেন।

২. যখন আমার ছয় কিংবা সাত বছর বয়স তখন রাসূল (সা.) আমায় বিয়ে করেছিলেন।

৩. নয়, দশ বা এগারো বছর বয়সে আমি রাসূল (সা.) এর বাড়িতে আসি।

৪. আমি ছাড়া রাসূল (সা.) এর কোন স্ত্রী কুমারী ছিলেন না।

৫. আমর বিছানায় থাকাকালে নবীজী (সা.) এর কাছে ওহী নাযিল হত।

৬. আমি রাসূল (সা.) এর প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলাম।

৭. আমাকে লক্ষ করে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে।

৮. আমি নিজে দু'বার জিবরাইল (আ) কে দেখেছি।

৯. রাসূল (সা.) আমার কোলে পবিত্র মাথা রেখে ইহকাল ত্যাগ করেন।

১০.আমার নির্দোষিতার প্রমাণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন।

১১. আমি রাসূল (সা.) এর খলিফা আবু বকর (রা.) এর কন্যা এবং সিদ্দিকা। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মাজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন আমি তাদের মধ্যে অন্যতম।[৩৫৪]

৩৫৪. এ ধরনের আরো গৌরব ও মর্যাদার কথা তিনি নিজেও যেমন বলেছেন, তেমনি আরো বহু সাহাবী বর্ণনা করেছেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে যা ছড়িয়ে আছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, খ. ৩, পৃ. ১৪০-১৪১,১৪৬-১৪৭,১৯১; ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৮

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ। কবি হাসসান বিন সাবিদ ইফকের জঘন্য আপবাদকরীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। তবুও কবি হাসসান বিনতে সাবিত যখন আয়েশা (রা.) এর মজলিশে আসতেন তিনি তাঁকে সাদরে বরণ করে নিতেন। অন্যরা হাসসানের কৃতকর্মের জন্য সমালোচনা ও নিন্দা করলে তিনি বলতেন, তাঁকে মন্দ বলো না। সে বিধর্মী ও পৌত্তলিক কবিদের কবিতার উত্তর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষ থেকে প্রদান করতো।

আয়েশা (রা.) ছিলেন প্রচন্ড আত্মিক মনোবলের অধিকারী। যে কারণে তিনি ওহুদ যুদ্ধের সময়ে আহতদের সেবা করতে পেরেছিল। তিনি সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে মশক (কলস জাতীয় চামড়ার তৈরি এক প্রকার পানির পাত্র) কাধেঁ নিয়ে তৃষ্ণার্তদের পানি পান করিয়েছিলেন। তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধের এক পক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমনিতেও তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের প্রবল ইচ্ছা পর্যন্ত প্রকাশ করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এর পান্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান-গরিমা

হযরত আয়েশা (রা.) এর পান্ডিত্যের বিবরণ শুনলে অবাক হতে হয়। তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, উসূল, ইজমা, কিয়াস, সাহিত্য, ইতিহাস, রসায়ন, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি শিক্ষকতা ও বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল কমপক্ষে বার হাজার। এই জন্যই আয়েশা (রা.) সর্ম্পকে রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘শরীয়তের অর্ধেক বিদ্যাই তোমরা ঐ রক্তাভ গৌরবর্ণা মহিয়সী নারীর নিকট থেকে শিখতে পারবে।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, 'হযরত আয়েশা (রা.) এর চেয়ে সুন্নাতে নববীর বড় আলেম, দ্বীনের সূক্ষতত্ত্বে বিশষজ্ঞ, কালামে মজীদের আয়াতের শানে নযুল এবং ফারায়েয সম্পর্কে বেশি জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।'আতা ইবনে আবু রেবাহ তাঁর সম্বন্ধে বলেন, 'হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে উত্তম মানুষ এবং লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুস্থমতের অধিকারীণী। ইমাম যুহরী (রা.) বলেন, 'সকল পুরুষ এবং উম্মু মু'মিনীনদের সকলের ইলম একত্র করা হলেও হযরত আয়েশা (রা.) এর ইলম হবে সবার চেয়ে বেশি।'

হাদীস শাস্ত্রে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সুবিশাল অবদান

হযরত আয়েশা (রা.) মোট ২২১০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরমধ্যে ১৭৪টি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম একমত হয়েছেন। ইমাম বুখারী (রা.) তার কাছ থেকে একক ভাবে ৫৪টি হাদীস ও ইমাম মুসলিম ৬৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবী ও তাবেয়ী মিলে মোট দুই শতাধিক রাবী আয়েশা (রা.)-এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৫৫]

অন্যান্য বিষয়ে আয়েশা (রা.)-এর অবদান ও কৃতিত্ব

হযরত আয়েশা (রা.) ইসলামী সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে এক বিষ্ময়কর নাম। হাদীস ছাড়াও তাফসীর, ফিক্হ, সাহিত্য, কাব্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি শারঈ ও পার্থিব বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। নিম্নে এ সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে হযরত আয়েশা (রা.)-এর অবদান

৩৫৫. ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা,* বৈরুত: দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, তা.বি., খ. ৫, পৃ. ৪২৬

এক্ষেত্রেও আয়েশা (রা.) এর অবদান ছিল অসামান্য। দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র সাহচর্য থেকে তিনি কুরআন অবতরণ ও নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর ঘরেই অধিকাংশ সময়ে রাসূল (সা.) এর নিকট কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। তিনি স্বয়ং রাসূল (সা.) থেকে কুরআন (ভাব ও তাৎপর্যসহ) শিক্ষা লাভ করতেন। আবু ইউনূস নামে তাঁর এক দাসকে দিয়ে তিনি কুরআন লিখিয়েছিলেন। তার বর্ণনায় আল-কুরআনের অনেক আয়াতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য স্পষ্ট হয়েছে।[৩৫৬]

ফিকহী মাসয়ালাতে হযরত আয়েশা (রা.) এর অবদান

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে শরঈ বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাকেই ফিকহ বলে। এই ফিকহ শাস্ত্রে হযরত আয়েশা (রা.) এর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবীজীর ইন্তিকালের পর ইসলামী শরী'আত ও হুকুম-আহকামে পারদর্শী সাহাবীদের উপর এ দায়িত্ব বর্তায়। বিশেষ কোন সমস্যা আসলে তাঁরা প্রথমে কুরআন ও সুন্নায় তাঁর সমাধান তালাশ করতেন। কিন্তু তার স্পষ্ট সামধান না পেলে কুরআন ও হাদীসের অন্য হুকুমের উপর কিয়াস বা অনুমান করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। খুলাফায় রাশিদার যুগে শেষ পর্যায় এসে বিভিন্ন করণে বড় বড় সাহাবীদের অনেকেই মক্কা, তায়িফ, দামিস্ক, বসরা, কূফা প্রভৃতি নগরীতে ছড়িয়ে পরেন। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা.)-এ চার মহান ব্যক্তিত্বে মদীনায় ফিকহ ও ফতওয়ার কাজ আঞ্জাম দেন।[৩৫৭]

---

৩৫৬. রশীদ হাইলামায, Rxeb I Kg: A\‡qkv iwh., (অনু. মুহাম্মদ আদম আলী ও সম্পাদনায় মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর); ঢাকা: মাকতাবাতুল ফুরকান, ২০১৫, পৃ. ২৬২-২৬৫
৩৫৭. রশীদ হাইলামায, Rxeb I Kg: A\‡hkv iwh., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রা (রা.) এর পদ্ধতি ছিল উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের কোন বিধান কিংবা পূর্ববর্তী খলীফাদের কোন আমলে থাকলে তাঁরা তা বলে দিতেন। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করতেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এ ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী খলীফাদের আমলে সমাধানকৃত মাসআলার ওপর অনুমান করে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী সামধান দিতেন। এক্ষেত্রে আয়েশা (রা.) এর মূলনীতি ছিল প্রথমে কুরআন ও পরে সুন্নাতের মাঝে সমাধান অনুসন্ধান করা। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে সমাধান না পেলে স্বীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে হযরত আয়েশা (রা.)-এর অবদান

হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর মাতৃভাষার ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এর পশ্চাতে অলংকার সমৃদ্ধ, মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং রাসূল (সা.) এর হাদীস চর্চা ও অধ্যয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। আয়েশা (রা.) অত্যন্ত সুমিষ্ট, স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

পত্র সাহিত্যে আয়েশা (রা.) এর অবদান

পৃথিবীর যে কোন ভাষাতেই পত্র সাহিত্যের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। আরবী সাহিত্য এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ইসলামের ইতিহাসে এমন অসংখ্য পন্ডিতের নাম পাওয়া যাবে যাদের পত্রাবলী ইসলামী সাহিত্যকে অধিক সমৃদ্ধ করেছে। এর মধ্যে আয়েশা (রা.) এর নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করা যায়। আয়েশা (রা.) ছিলেন তৎকালীন সময়ের শরয়ী বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইসলামী

রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদল বা জ্ঞানপিপাসুগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় আয়েশা (রা.) কেও বিভিন্ন শহর বা অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সাথে পত্র যোগাযোগ করতে হয়েছে। লিখনী বিদ্যার সাথে তাঁর তেমন পরিচয় না থাকলেও অন্যের মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো লিখে নিতেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তার পত্রের ভাব ও ভাষা ছিল একান্তই নিজস্ব। তাঁর পত্রাবলীতেও প্রবীন সাহিত্যিকগণ সাহিত্য মূল্য বিবেচনা করে নিজেদের রচনাবলীতে স্থান দিতে আগ্রহী হয়েছেন। ইবন আবদি রাব্বিহী রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আল ইক্বদুল ফরিদ* এর চতুর্থ খন্ডে আয়েশা (রা.)-এর অনেক পত্র সংকলিত হয়েছে।

আরবী কাব্য সাহিত্যে আয়েশা (রা.)-এর অবদান

হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর প্রখর স্মৃতি শক্তিতে কুরআন ও হাদীস চর্চার পাশাপাশি কাব্য চর্চা ও তা সংরক্ষনের কাজে লাগিয়েছিলেন। ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী যুগে কবিদের অনেক কবিতা আয়েশা (রা.) এর মুখস্থ ছিল। তিনি সে সকল কবিতার অংশ বিশেষ বিভিন্ন সময়ে উদ্ধৃতি আকারে পেশ করতেন। হাদীসের গ্রন্থাবলীতে তাঁর বর্ণিত কিছু কবিতা বা পংক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়েশা (রা.) এর মাঝে কাব্য রস আস্বাদনের প্রবল আগ্রহ ছিল। অনেক কবি তাদের স্বরচিত কবিতা তাঁকে শোনাতেন। হাসসান ইবন সাবিত (রা.) ছিলেন আনসারদের সেরা কবি। ইফকের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার কারণে তাঁর প্রতি আয়েশা (রা.) এর মনোভাব তিক্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আয়েশা (রা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কবিতা শোনাতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) যেমন নিজে কবিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন, তেমনি অন্যদের গঠনমূলক কবিতা চর্চা ও অনুশীলনের প্রতি উদ্ধুদ্ধ করতেন। তিনি বলেন, "কিছু কবিতা ভালো আছে আবার কিছু কবিতা খারাপও আছে। তোমরা খারাপটি ছেড়ে দিয়ে ভালোটি গ্রহণ কর"। আয়েশা (রা.)

আরো বলেন-"তোমরা তোমাদের সন্তানদের কবিতা শেখাও। তা হলে তাদের ভাষা সুমধুর ও লাবন্যময় হবে।"[৩৫৮]

এছাড়া চিকিৎসা, ইতিহাস, কালাম শাস্ত্র বিবাদমান সমস্যা ও প্রভৃতি বিষয়েও আয়েশা (রা.) এর কম বেশি দখল ছিল।

ইন্তিকাল

৫৮ হিজরী ১৭ রমযানে ৬৮ বছর বয়সে হযরত আয়েশা (রা.) ইন্তিকাল করেন। তাঁর ওছিয়ত মোতাবেক রাতের বেলা তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। মদীনায় সে সময়কার গভর্নর আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের ও ওরওয়াহ বিন জুবায়ের দুই সহোদর জানাযার পর তাঁর লাশ কবরে নামান। হযরত আয়েশা (রা.) এর মৃত্যু সংবাদে ঐ রাতের বেলাতে পুরুষ ছাড়াও প্রচুর পরিমানে মহিলার সমাগম ঘটে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ সকলকে এত ব্যাথাতুর করেছিল যে, মাসরুক বলেন 'নিষিদ্ধ না হলে আমি উম্মু মু'মিনীনদের জন্য মাতমের আয়োজন করতাম। আর আবু আইউব আনসারী বলেন, "আমরা আজ মাতৃহারা শিশুর মতো এতিম হলাম"।

৩৫৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: রশীদ হাইলামায, প্রাগুক্ত, ২৮০-২৮৩

৭.৪ হযরত হাফসা (রা.)

পরিচয়: নাম ও বংশ

তাঁর মূল নাম হাফসা। তিনি ইদসলামের দ্বিতীয় হযরত খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর মেয়ে, পরবর্তীতে নবীজী (সা.) এর স্ত্রী। মায়ের নাম যয়নব বিনতে মাযউন। তাঁর বংশ তালিকা হল হাফসা বিনতে ওমর বিনতে খাত্তাব ইবনে নওফেল ইবনে আবদুল ওযযা ইবনে রিবাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুরাত ইবনে রিযাহ ইবনে আদী ইবনে লয়াই ইবনে ফিহির ইবনে মালিক।[৩৫৯]

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ

হযরত হাফসা (রা.) নবুওয়্যাতের পাচঁ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময়ে কুরাইশদের কা'বার পুন:নির্মানের কাজ হচ্ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ছিলেন তাঁর সহোদর। তিনি কবে ও কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা পরিষ্কার করে জানা যায়নি। শুধু এতটুকু জানা যায় যে ওমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব সমগ্র পরিবারের ওপর পড়ে। ফলে তাঁর গোটা বংশের লোক ইসলাম কবুল করে। হাফসা (রা.) এ সময়ে পিতা-মাতা ও স্বামীসহ ইসলাম কবুল করেন।[৩৬০]

প্রথম স্বামী

হযরত হাফসা (রা.) এর প্রথম স্বামী ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী খুনাইস ইবনে হুযাইফা ইবনে কায়েস ইবনে আদী। তিনি বনু সাহম বংশের লোক ছিলেন। মদীনায় হিজরতের সময় স্বামী খুনাইস (রা.) এর সাথে হাফসা (রা.)ও মদীনায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই শাহাদাত বরণ করেন।

---

৩৫৯. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২২; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩৫
৩৬০. প্রাগুক্ত

বিধবা হয়ে পিতার গৃহে প্রত্যাবর্তন

তাঁর স্বামী অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ইন্তিকাল করেন। সময়টা ছিল দ্বিতীয় হিজরীর মাস রমযান। স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা হাফসা (রা.) পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

মেয়ের বিবাহের জন্য পিতা ওমরের পেরেশানী

হযরত হাফসা (রা.) বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসার পর পিতা হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ওমর (রা.) মেয়ের পুনরায় বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করেন। প্রথমে তিনি আবু বকর (রা.) এর সাথে তাঁকে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকেন। আবু বকর (রা.)এর এ নীরবতা ওমর (রা.) ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাই ওসমান (রা.) এর নিকট মেয়েকে বিয়ের দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ সময়ে ওসমান (রা.) বিপত্নীক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নবী নন্দিনী রোকাইয়া (রা.) কিছুদিন আগে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তবুও ওসমান (রা.) এ প্রস্তাব এড়িয়ে গিয়ে জানিয়ে দেন যে আপাতত তিনি বিয়ের চিন্তা ভাবনা করছেন না।[৩৬১]

রাসূল (সা.) নিজেই বিবাহের প্রস্তাব দেন

মহানবী (সা.) সব দিক ভেবে-চিন্তে ওমর (রা.) এর মর্ম বেদনার কথা উপলব্ধি করলেন এবং তাঁকে কন্যা দায়গ্রস্ততা থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেই হাফসা (রা.) কে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হিজরী ৩য় সনে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে করে হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন। অন্যদিকে একজন বিশিষ্ট শহীদ সাহাবীর নি:সন্তান বিধবা স্ত্রীর দু:খময় নি:সঙ্গতার অবসান ঘটে। রাসূল (সা.) যখন হাফসা (র) কে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিলেন তখন একদিন আবু বকর

৩৬১. আল-বালাজুরী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২২

Dhaka University Institutional Repository

(রা.) ওমর (রা.) এর সাথে দেখা করে বললেন, ওমর! যখন তুমি আমার নিকট হাফসার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে, তখন আমার নীরবতা তোমাকে ব্যথিত করেছিল। কিন্তু আমার নীরব থাকার কারণ ছিল এই যে, একদা রাসূল (সা.) হাফসা (রা.) সম্পর্কে নিজেই আলোচনা করেছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, রাসূল (সা.) অবশ্যই হাফসা কে স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করে নেবেন। এ গোপন কথাটি আমি আর কারও নিকট প্রকাশ করিনি। যদি রাসূল (সা.) হাফসাকে বিয়ে না করতেন তাহলে অবশ্যই আমি তাকে বিয়ে করতাম। [৩৬২]

হাফসাকে বিবাহ করার কারণ

ঐতিহাসিকদের মতে রাসূল (সা.) হাফসা (রা.) কে প্রধানত তিনটি কারণে বিয়ে করেছিলেন। তথা:

১. মুহাম্মদ (সা.) যে ইসলামের বিজয় নিশানকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবেন তা তিনি অন্তরদৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) কে পুরস্কার স্বরুপ ও তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য রাসূল (সা.) হাফসা (রা.)কে বিয়ে করেন এবং উভয়ের মধ্যকার আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করেন। শুধুমাত্র রাসূল (সা.) এর সাথে এ আত্মীয়তার বন্ধনের কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ হযরত ওমর (রা.) কে স্বরণ করবে। এটি একটি সৃদুর প্রসারী তাৎপর্য ।

২. হযরত হাফসা (রা.) কে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর রাসূল (সা.) হাফসা (রা.) এর মর্যাদাকে এত সমুন্নত করেছেন যে শুধুমাত্র রাসূল (সা.) এর সাথে বিয়ে হওয়ার

৩৬২. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, মিশর: দারুল মা'য়ারিফ, খন্ড-১, পৃ. ৪২৩,; ইমাম আহমাদ, ইবনে সাদ, ইমাম বুখারী, নাসাঈ,বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসীন হাফসার বিয়ে সংক্রান্ত বর্ণনা করেছেন; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩৫-৮৩৭

কারণে হাফসা (রা.) মুহাম্মদ রাসূল (সা.) এর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং সে নিশ্চয়তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদান করেছেন।

৩. আল্লাহর রাসূল (সা.) হাফসা (রা.) কে বিয়ে করার মাধ্যমে হযরত ওমর (রা.) কে পেরেশানী থেকে মুক্ত করেন এবং সকল প্রকার নিন্দার হাত থেকে বাচাঁন।

রাসূল (সা.) এর সাথে হযরত হাফসার আচরণ ও ব্যবহার

হযরত হাফসা (রা.) একটু কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন। এমনকি তিনি অনেক সময় রাসূল (সা.) এর সাথে তর্ক করতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, একদা হযরত ওমর (রা.) কোন বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। এমন সময়ে ওমরের স্ত্রী এসে বললেন, তুমি কি নিয়ে বেশি চিন্তা করছ? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার বিষয় সম্পর্কে খোঁজ নেবার অধিকার তুমি কোথা পেলে? প্রত্যুত্তরে ওমরের স্ত্রী বললেন, তুমি আমার কথা পছন্দ কর না। কিন্তু তোমার মেয়ে হাফসা সমানে সমানে রাসূল (সা.) এর সাথে তর্ক করে থাকে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি তখনই হাফসার নিকট চলে আসলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম, মা হাফসা ! তুমি নাকি রাসূল (সা.) এর সাথে তর্ক করে থাক? হাফসা বললেন, হ্যা, অনেক সময় তাই হয়। আমি বললাম, সাবধান! কখনও এমন করো না। তোমার মনে করা উচিত নয় যে, তোমার রুপ রাসূল (সা.) কে মুগ্ধ করেছে, বরং রাসূল (সা.) এর প্রতি সর্বদা অনুগত থাকবে।[৩৬৩]

৩৬৩. ইউসুফ আল-কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবা*, দিমাশক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করন ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ৬৮২-৬৮৩; শিবলী নু'মানী, *সিরাতন নবী*, আজমগড়: মাতবা'আ মা'আরিফ, ১২শ সংস্করন, ১৯৭৮, খ. ৪, পৃ. ৪১০

উল্লেখ্য হযরত হাফসা (রা.) এর এ ধরনের আচরণের কারণে মহানবী (সা.) একবার তাঁকে একতালাক দিয়ে বসেন।[৩৬৪] অবশ্য হাফসার রাতভর নফল ইবাদত ও দিনের বেলা রোযা রাখার কথা স্বরণ করিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল (সা.) কে তাঁকে (হাফসাকে) গ্রহণ করে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। রাসূল (সা.) আল্লাহর নির্দেশ মতো কাজ করেন অর্থাৎ হযরত হাফসা (রা.) কে আবার ফিরিয়ে আনেন।[৩৬৫]

হযরত হাফসার (রা.) এর সাথে রাসূলের অফুরন্ত ভালোবাসা

এত কিছুর পরও নবীজী (সা.) তাঁকে অনেক ভালোবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন। অনেক গোপন কথাও তাঁকে বলতেন। একদা নবীজী (সা.) হযরত হাফসা (রা.) এর সাথে একটি গোপন বিষয়ে আলাপ করেন এবং অন্য কারো কাছে না প্রকাশ করার জন্য বলেন। কিন্তু নারীসূলভ মানসিকতার কারণে তিনি তা আয়েশা (রা.) এর কাছে বলে ফেলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাসূল (সা.) হাফসার প্রতি একটু রাগান্বিত হন। এরপর এ বিষয়কে কেন্দ্র করে সূরা তাহরীমে আল্লাহ ঘোষনা করেন,

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

"আর রাসূল (সা.) যখন তাঁর এক স্ত্রীর কাছে একটি গোপন কথা বলেন, আর তিনি তা ফাস করে দেন, আল্লাহ তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করলে তিনি

৩৬৪. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৮
৩৬৫. প্রাগুক্ত

বলেন, কে আপনাকে এটা বলে দিয়েছে? তিনি বললেন, যিনি মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ, তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।”[৩৬৬]

এ ঘটনাটি হলো তাহরীমের ঘটনা। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে যখন আয়েশা (রা.) ও হাফসা (রা.) একমত হয়ে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়-

تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ

“তোমরা উভয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা তোমাদের দিল সঠিক ও নির্ভূল পথ থেকে সরে গিয়েছে। আর তাঁর বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করলে আল্লাহই তো তাঁর প্রভু জিবরাঈল এবং নেককার ঈমানদারগণ তো আছেই, এসবের পর আল্লাহর ফেরেশতারা তাঁর সহায়ক রয়েছেন।”[৩৬৭]

মুনাফিকরা সব সময় যড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য নানা ধরনের ফাক-ফোকর খুজে বের করার চেষ্টা করে। এ আয়াতে ঐসব মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাঁদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে। হাফসা আর আয়েশা (রা.) যদি বিরোধ চায় আর মুনাফিকরা যদি ষড়যন্ত্র করে তা দিয়ে ফায়দা হাসিল করতে চায়,তাহলে আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.) কে সাহয্য করবেন। আর আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন, ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) এবং দুনিয়ার নেককার মু’মিনগণও তাঁর সাথে আছেন।

হযরত সাফিয়্যা (রা.) এর সাথে আয়েশা ও হাফসার সাময়িক দ্বন্দ্ব

৩৬৬. আল-কুরআন, ৬৬:৩
৩৬৭. আল-কুরআন, ৬৬:৪

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, 'একদিন উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া (রা.) কাঁদতে ছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁর কান্নার কারণে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে হাফসা (রা.) বলেছে যে আমি ইয়াহুদির মেয়ে। রাসূল (সা.) তাঁকে সান্তনা দিয়ে বললেন, তুমি নবী বংশের মেয়ে। তোমার বংশে বহু নবী আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তুমি নবীর স্ত্রী। সুতরাং হাফসা তোমার ওপর কোন বিষয়ে গৌরব করতে পারে?[৩৬৮]

আরো বর্ণিত আছে যে, 'একদিন আয়েশা ও হাফসা সাফিয়াকে বললেন, আমরা রাসূল (সা.) এর নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় ও মর্যাদাবান। আমরা তাঁর স্ত্রী এবং একই রক্তধারার অধিকারী। সাফিয়া এ কথায় ক্ষুন্ন হলেন এবং রাসূল (সা.) এর নিকট অভিযোগ পেশ করলেন। উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, তুমি একথা কেন বলনি যে, তোমরা আমার চেয়ে অধিক সম্মানিতা কেমন করে হতে পার? আমার স্বামী স্বয়ং মুহাম্মদুর রাসূল (সা.) আমার পিতা হারুন (আ:) ও আমার চাচা মুসা (আ:)।[৩৬৯]

আসলে হাফসা ও আয়েশা (রা.) এর মধ্যে মধুর সর্ম্পক ছিল। অনেক সময় তাঁরা একত্রে রাসূল (সা.) এর সফর সঙ্গী হতেন।

ইতিহাস খ্যাত হওয়ার কারণ

হযরত হাফসা (রা.) এর নাম যে কারণে ইতিহাসের পাতা ও মুমিনদের মনে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাহলো তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের সংরক্ষক বা হেফাজতকারী। উল্লেখ্য,

৩৬৮. ইউসুফ আল-কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৭৯; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩৭-৮৩৮
৩৬৯. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৫

ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক ক্বারী ও কুরআনের হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফতকালে ১১ হিজরী সালে যিলহজ্জ মাসে ইয়ামামা নামক স্থানে কিছুসংখ্যক ধর্মত্যাগীর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।[৩৭০]

এ যুদ্ধে এত বেশি সংখ্যক কুরআনের হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন যে, এর ফলে হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আবু বকর (রা.) এর কাছে আসলেন আল কুরআন সংকলনের সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। অনেক আলাপ আলোচনা এবং চিন্তা ভাবনার পর যায়েদ ইবনে সাবিতের ওপর কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যায়েদ (রা.) সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তৎকালীন আরবের প্রখ্যাত ক্বারী ও হাফিজদের সহায়তায় কঠোর পরিশ্রমে পবিত্র কুরআনের একটি পান্ডুলিপি তৈরি করেন। এটি ছিল আবু বকর (রা.) এর খেলাফতের সর্বজন স্বীকৃত সরকারী পান্ডুলিপি।[৩৭১]

আবু বকর (রা.)-এর জীবদ্দশায় পান্ডুলিপি তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর পবিত্র কুরআনের পান্ডুলিপিটি ওমর (রা.) এর অধিকারে সংরক্ষিত থাকে। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত হাফসা (রা.) কুরআনের এই পান্ডুলিপিটি অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখেন। খলিফা ওমর (রা.) এর খিলাফতকালে পবিত্র কুরআনের এ মূল পান্ডুলিপি থেকে নকল করে এক লক্ষ পান্ডুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন এলাকাতে পাঠানো হয়। কিন্তু হযরত ওসমান (রা.) এর খেলাফতের সময় হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান নামক এক সাহাবী যুদ্ধ উপলক্ষে আযারবাইজান গমন করে ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের মধ্যে কুরআন পাঠের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করেন।

৩৭০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: হাসান আলী চৌধুরী, Bmjv‡gi BwZnvm, ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, পঞ্চম সংস্করন ২০০১, পৃ. ১০৮-১১২
৩৭১. M.M. Azami, *The History of the Quranic Text from Revelation to Compilation: A comparative Study with the Old and New Testaments,* UK: Islamic Academy, PP. 57-79

পরে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে এ বিষয়ে ওসমান (রা.) কে অবহিত করেন এবং কুরআনে উচ্চারণে এ পার্থক্য দূরীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। ওসমান (রা.) বিষয়টির গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত ওসমান (রা.) জানতেন যে হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে তৈরিকৃত কুরআনের মূল পান্ডুলিপিটি হযরত হাফসা (রা.) এর কাছে সংরক্ষিত আছে। ফলে তিনি হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট এ মর্মে খবর পাঠান যে, তিনি যেন অবিলম্বে তাঁর কাছে সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের পান্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দেন। ফলে হাফসা (রা.) এর পাঠানো পান্ডুলিপিটির ভিত্তিতে কুরআনের নকল তৈরি করে তার পান্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয়।[৩৭২]

হযরত ওসমান কয়েকজন লেখক যেমন-যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.), সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশামকে কুরআনের কপি তৈরির কাজ নিয়োজিত করেন। হযরত ওসমান (রা.) এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, কুরআনের লিখন ও পঠনে যদি মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে যেন কুরায়শী রীতিতেই কুরআন লেখা হয়; কেননা কুরায়শী ভাষায়ই আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ওসমান (রা.) এর নির্দেশে এমনিভাবে কুরায়শী রীতিতেই পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষিত করা হয় যা অবিকল পান্ডুলিপি আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। এমনিভাবে পবিত্র কুরআন সংরক্ষনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই মুসলমানরা যখন পবিত্র কুরআনের লিখন ও পঠনে চরম এক অনিশ্চয়তার মাঝে ছিল তখন হযরত হফসা (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত কুরআনের মূল পান্ডুলিপিটি মুসলমানদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। যদি হযরত হাফসা (র) যত্নসহকারে এ পান্ডুলিপিটি সংরক্ষন না করতেন তবে ওসমান (রা.) এর পক্ষে হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

৩৭২. প্রাগুক্ত

সম্ভব হতো না। হযরত হাফসা (রা.) পবিত্র কুরআনের সর্বজন স্বীকৃত পাণ্ডুলিপিটি এমনিভাবে সংরক্ষন করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমাদের অন্তরে চিরস্বরণীয় হয়ে আছেন।[৩৭৩]

হাফসা (রা.) এর সহজ- সরল জীবন যাপন

হাফসা (রা.) ব্যক্তিগত জীবনে রাগী স্বভাবের হলেও তিনি ছিলেন অসম্ভব ইবাদত বন্দেগী করার একজন মুত্তাকী মহিলা। তিনি রাত্রি জেগে যেমন তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন, তেমনি দিনের বেলা রোযা রাখতেন। যে কারণে তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি খুবই সাধারন জীবন যাপন করতেন। মৃত্যুকালে তিনি সহোদর আবদুল্লাহকে ডেকে বলেন, ‘যৎসামান্য আসবাবপত্র বা বিষয়- সম্পত্তি সবই যেন আল্লাহর রাহে গরীব-মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়’।[৩৭৪]

শিক্ষাব্রতী হিসেবে হযরত হাফসা (রা.)

সে সময়ে আরবে নারীগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন অনেক পিছিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন তখন নারী ও পুরুষের কারো জন্যে ছিল না। হযরত হাফসা (রা.) এর পক্ষেও অন্যান্যদের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ হয়নি, কিন্তু মহান শিক্ষক ও প্রিয় স্বামী রাসূল (সা.) এবং পিতা ওমর (রা.) এর সুষ্ঠু তত্ত্বাধানে ধর্মীয় বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান অর্জনের অপূর্ব সুযোগ পান। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকরী। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। দ্বীনী বিষয়ে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল বিভিন্ন ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

৩৭৩. ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪২৫; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩৭-৮৩৮
৩৭৪. প্রাগুক্ত

একদা রাসূল (সা.) বললেন, আমি আশা করি বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবী জাহান্নামে যাবে না। হযরত হাফসা (রা.) এতে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা তো বলেছেন–

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

"তোমাদের সকলকে জাহান্নামে হাযির করা হবে।"[৩৭৫]

নবী করীম (সা.) বলেন, হ্যাঁ,তা ঠিক, তবে কোথাও তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

"অতঃপর আমি আল্লাহ ভীরু লোকদের নাজাত দেব এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।"[৩৭৬]

হাফসা (রা.) এর মধ্যে শেখা ও জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে রাসূল (সা.) সব সময় তাঁকে বিভিন্ন জিনিস শেখানো এবং জ্ঞানীরুপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.) নামে এক মহিলা সাহাবী লেখাপড়া জানতেন। হাফসা (রা.) তাঁর নিকট থেকেই লেখা শিখেন। এ শিফা (রা.) নামলা নামক এক প্রকার ক্ষতরোগ নিরাময়ে ঝাড় ফুক জানতেন। জাহিলী যুগে তিনি এ ঝাড় ফুক করতেন। একদিন তিনি রাসূল (সা.) এর কাছে এসে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে সে মন্ত্র আপনাকে শোনাবো। রাসূল (সা.) শুনে বললেন, এ ঝাড় ফুক তুমি হাফসাকে শিখিয়ে দাও।[৩৭৭]

৩৭৫. আল-কুরআন, ১৯:৭১
৩৭৬. আল-কুরআন, ১৯:৭২
৩৭৭. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

এসব বর্ণনা হতে হাফসা (রা.) এর জ্ঞান চর্চার আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং এ বিষয়ে নবী (সা.) এর ভূমিকা অবগত হওয়া যায়।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান

পিতা হযরত ওমর (রা.) এর কাছে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। রাসূল (সা.) স্বয়ং ছিলেন তাঁর শিক্ষক। হযরত হাফসা (রা.) রাসূল (সা.) এর নিকট থেকে কুরআন হাদীস, ফিকাহ ও উসূল এবং শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ে আদ্যপান্ত শিক্ষা লাভ করেছেন। যে কারণে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব জ্ঞানে তিনি ছিলেন সুপন্ডিত। কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি পারদর্শী ছিলেন। অনেক প্রখ্যাত সাহাবীই তাঁর ছাত্রের পর্যায়ভূক্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে পুরুষদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হামযা ইবনে আবদুল্লাহ, হারেস ইবনে ওয়াহাব,আবদুর রহমান ইবনে হারেস (রা.) প্রমূখ এবং মহিলাদের মধ্যে সাফিয়া বিনতু আবু ওবায়দা (রা.) এবং উম্মে মুবাশশিরা আনসারিয়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।[৩৭৮] হাফসা (রা.) এর জ্ঞান ও প্রতিভা সারা বিশ্বে এখনো মশহুর হয়ে আছে যা মুসলিম জাহানের কল্যাণ সাধনে অকল্পনীয় সহায়ক হয়েছে।

শিফা (রা.) এর নিকট থেকে হাফসা (রা.) যেখানে রাসূলের নির্দেশে নামলার মন্ত্র শিখেছিলেন সে ক্ষেত্রে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হাদীসের জ্ঞান রাসূল (সা.) থেকে অর্জন করবেন এটাই স্বাভাবিক। নবীপত্নী হিসেবে রাসূল (সা.) কে কাছ থেকে দেখার অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এর ফলে হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় তিনি উজ্জল অবদান রেখেছেন।

---

৩৭৮. আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Avjvg Avb-bevjv, বৈরুতঃ আল-মুত্তয়াসমাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করন ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ২২৮

তাঁর থেকে মোট ৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলো তিনি খোদ রাসূল (সা.) এবং স্বীয় পিতা ওমর (রা.) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে ৪টি হাদীস মুত্তাফাকুন আলাইহি এবং ৬টি হাদীস ইমাম বুখারী (রা.) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পুনরুক্তিসহ সহীহ বুখারীতে ১১টি, সহীহ মুসলিম ১৪টি, জামি আত-তিরমিযিতে ১২টি, সুনান আবু দাউদে ৬টি, সুনান আন নাসাঈতে ৪০টি এবং সুনান ইবন মাজায় ৭টি সংকলিত হয়েছে।[৩৭৯]

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৪৫ সনে ৬৩ বছর মদীনায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর দিনেও হাফসা (রা.) রোযা ছিলেন এবং রোযা অবস্থায়ই শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তৎকালীন মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর জানাযা পড়ান। আবু হুরায়রা (রা.) কবর পর্যন্ত তার লাশ বহন করেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও তাঁর পুত্রগণ লাশ কবরস্থ করেন। জান্নাতুল বাকী নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৮০]

৩৭৯. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৯
৩৮০. ইবন হাজার, ZvnhxeZ Zvnhxe, হায়দ্রাবাদঃ দায়িরাতুল মায়াবিফ, ১৩২৫ হি. খ. ১২, পৃ. ৪৩৯; ইবনুল আসীর, Dm' j Mvev dx gwidwZm mvnvev, বৈরুতঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, খ. ৫, পৃ. ৪২৬

৭.৫ হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা.)

পরিচয়: নাম, জন্ম ও বংশ

তাঁর মূল নাম যয়নব। ডাকনাম উম্মুল মাসাকিন বা গরীব-দু:খীর মা। পিতার নাম খুজাইমা ইবনুল হারেস এবং মাতার নাম মানদাব বিনতে আউফ। তাঁর নসবনামা এ রকম যয়নব বিনতে খুযাইমা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে হেলাল ইবনে আমের ইবনে সা'আ।[৩৮১] তিনি নবুওয়্যাতের ছাব্বিশ বছর আগে বনু বকর ইবনে হাওয়াযেনে হেলালীয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ

জানা যায়, তুফায়েল ইবনুল হারিছের সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। প্রথম স্বামীর সাথে তাঁর বনিবনা হয়নি। এজন্য প্রথম স্বামী তাঁকে তালাক দিলে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে বিবহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে একই সময়ে ইসলাম কবুল করেন। জাহাশ ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবীদের একজন। তিনি বলেন, "আমি ওহুদ ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাব এবং প্রতিপক্ষ আমার ঠোঁট, নাক ও কান কেটে ফেলবে এবং আমি সে অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হবো। তখন আমাকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে হে আব্দুল্লাহ! তোমার ঠোঁট, নাক, কান কাটা কেন? আমি আরজ করব, হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূল (সা.) এর জন্য।"[৩৮২]

---

৩৮১. ইবন আবদিল বার, *আল ইসতীয়াব*, ('আল-ইসাবা' গ্রন্থের পার্শ্বটীকা), খ. ৪, পৃ. ৩১৩; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩৯

৩৮২. আব্দুর রউফ দানাপুরী, Avmvn Avm-mxivn, করাচী, তা.বি., পৃ. ৬১৯

তাঁর দুয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করেন। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায় শত্রুর তরবারীর আঘাতে তাঁর তরবারি দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। তখন রাসূল (সা.) তাঁর হাতে একটি ডাল তুলে দেন। তিনি ডালটিকেই তরবারি হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন এবং এক সময় শাহাদত বরণ করেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেলো মুশরিকরা তাঁর ঠোঁট, নাক ও কান কেটে ফেলেছে। ।[৩৮৩] স্বামীর এমন মৃত্যুতে যয়নাব অনেক ব্যথা পান।[৩৮৪]

যয়নবসহ বিধবা মুসলিম মহিলা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর শাহাদাত বরণ করলে বিধবা যয়নব (রা.) খুবই অসহায় হয়ে পড়েন। মূলত ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হওয়ার ফলে বিধবাদের একটি লম্বা কাফেলা দাড়িয়ে যায় যারা ছিলেন একান্তই অসহায় ও নি:স্ব। কারণ মুসলামান হওয়ার কারণে তাঁদের আত্নীয় স্বজনেরা তাঁদেরকে একটু সহানুভূতি পর্যন্ত দেখাতে রাজি হয় নি। এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) এ সকল অসহায় মুসলমান বিধবা মহিলাদেরকে বিয়ে করার জন্যে সাহাবীদেরকে অুনরোধ করতে থাকেন এবং নিজেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে হযরত যয়নাব (রা.) এর শুভ বিবাহ

হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন ওহুদ যুদ্ধের ফলে যারা বিধবা হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বিধবা হওয়ার পর আত্নীয় স্বজনের দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকেছেন একটু আশ্রয়ে জন্য কিন্তু তারা তাকে পাত্তা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা.) তাঁকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিয়ে করেন। এক বর্ণনায় জানা যায়, অসহায় যয়নব নিজেকে বিনা মোহরে রাসূল (সা.) এর

৩৮৩. ইবন আবদিল বার, আল ইসতীয়ার, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৩
৩৮৪. প্রাগুক্ত

কাছে পেশ করেন। তবে অন্য বর্ণনা মতে রাসূল (সা.) তাঁর বিয়ের মোহরানা ধার্য করেছিলেন চার শত দিরহাম।[৩৮৫] হিজরী তৃতীয় সনে রাসূল (সা.) ও যয়নব (রা.) এর বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ সময়ে যয়নব (রা.) এর বয়স ছিল ৪১ বছর আর রাসূল (সা.) এর বয়স ছিল ৫৫ বছর।

চরিত্র-মাধুর্য

হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন জন্ম গতভাবেই প্রশান্ত হৃদয় ও উদার প্রকৃতির নারী। ছোটবেলায় থেকেই তিনি ভূখা, নাঙা ও গরীব-দু:খীদের বন্ধু ছিলেন। তিনি ধনাঢ্য পিতার সন্তান হওয়ার পর গরীবদের দু:খ কষ্ট সইতে পারতেন না। বহু ঘটনা আছে যে তিনি খেতে বসেছেন- এমন সময়ে ক্ষুধার্ত এসে খাবার চেয়েছেন,ব্যাস! তিনি নিজের খাবারটাই দিয়ে দিতেন। এ জন্য ইসলাম গ্রহণের আগে বাল্যকালেই তিনি উম্মুল মুমিনীন বা মিসকীনদের মা নামে আরবে পরিচিত লাভ করেন।[৩৮৬] তাঁর ব্যাপারেই রাসূল (সা.) এর ভবিষ্যত বানী তোমাদের মধ্যে যার হাত সর্বাপেক্ষা বড় সে তোমাদের সকলের আগে মৃত্যুবরণ করবে সত্যে পরিণত হয়। এখানে বাহ্যিকভাবে বড় হাতের কথা বুঝানো হয়নি বরং রুপক অর্থে দানশীলতার কথা বুঝানো হয়েছে।[৩৮৭]

ইন্তিকাল

হযরত যয়নব (রা.) রাসূল (সা.) এর সাথে বিয়ের মাত্র তিন মাস পরই ইন্তিকাল করেন।[৩৮৮] তিনি রাসূল (সা.) এর উপস্থিতিতেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর জানাযার ইমামতি করেন স্বয়ং রাসূল (সা.)।[৩৮৯] উম্মুহাতুল মু'মিমীনীনদের মধ্যে এ ভাগ্য আর কারো হয়নি। যদিও খাদীজা (রা.)ও

৩৮৫. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ, বৈরুত: তা.বি., খ. ২, পৃ. ৬৪৭
৩৮৬. ইবন আবদিল বার, *আল ইসতীয়ার*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৩; আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৯
৩৮৭. ইবন হাজার, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, বৈরুত: দার আল ফিকর, ১৯৭৮, খ. ৪, পৃ. ৩১৬
৩৮৮. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৮
৩৮৯. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮২

রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে খাদীজা (রা.) যখন ইন্তিকাল করেন তখন জানাযার হুকুম হয়নি। মৃত্যুকালে এ সৌভাগ্যবতী যয়নব (রা.) এর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪১ বছর। এত কম বয়সেও রাসূল (সা.) এর কোন স্ত্রী ইন্তিকাল করেননি। তাঁকে মদীনায় বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।[৩৯০]

৭.৬ হযরত উম্মু সালামা (রা.)

পরিচয়: নাম ও বংশ

মহানবী (সা.) এর ষষ্ঠ স্ত্রী ছিলেন উম্মু সালামা (রা.)। তাঁর মূল নাম ছিল হিন্দ আর ডাক নাম ছিল উম্মু সালামা। এ নামেই তিনি ইতিহাসে পরিচিতি হয়ে আছেন। পিতার আসল নাম সুহাইল, ডাক নাম আবু উমাইয়া। ইনি কুরাইশ বংশের মাখজুম গোত্রের লোক। মায়ের নাম আতিকা। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ পরিচয় হল-হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া সুহাইল ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মাখজুম। আর মায়ের দিক থেকে হল হিন্দ বিনতে আতিকা বিনতে আমের ইবনে রাবীয়াহ ইবনে মালেক কেনানা।[৩৯১] উম্মু সালামা (রা.) এর পিতা মাতা উভয় দিক থেকে তৎকালীন আরবের খুবই মর্যাদা সম্পন্ন বংশের লোক ছিলেন। তাঁর পিতা আবু উমায়ইয়া ছিলেন আরবের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি এতটাই উদার দানশীল এবং হৃদয়খোলা মানুষ ছিলেন যে, যাদুর রাকিব উপাধিতে ভূষিত হন। মাঝে মধ্যে যখন সফরে যাওয়ার প্রয়োজন হতো তখন আবু উমাইয়া পুরো কাফেলার ব্যয় ভার বহন করতেন। এজন্য তাকে উপাধি দেয়া হয় যাদুর রাকিব বা মুসাফিরে পাথেয়।[৩৯২]

---

৩৯০. প্রাগুক্ত

৩৯১. ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৮৭; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪০

৩৯২. ইবনুল আবদিল বার, *আল ইসাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ৬, পৃ, ৬৯-৭০

প্রথম বিবাহ ও সুখী দাম্পত্য জীবন

উম্মু সালামা (রা.) এর প্রথম বিয়ে হয় তাঁরই চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদের সাথে। তিনি রাসূল (সা.) এর দুধভাই ছিলেন।[৩৯৩] মূল নাম আবদুল্লাহ হলেও পরবর্তীতে তিনি আবু সালামা নামে পরিচিতি লাভ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগে এ দাম্পত্য জুটির জীবন ছিল খুবই সুখের ও আনন্দের। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর হতেই তাঁদের উপর নেমে আসে অত্যাচার নির্যাতনের স্টীম রোলার।

ইসলাম গ্রহণ ও হিযরত

ইসলামের একান্ত প্রাথমিক অবস্থায় উম্মু সালামা এবং তাঁর স্বামী পরিবার পরিজনের তীব্র বিরোধীতার মুখে ইসলাম কবুল করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের উপর নেমে আসে নানা অত্যাচার নির্যাতন। শেষ পর্যন্ত মক্কায় টিকতে না পেরে তাঁরা অন্যান্য মুসলমানদের সাথে স্বামী স্ত্রী উভয়েই আবিসিনিয়ায় হিযরত করেন। এখানেই তাঁদের প্রথম সন্তান সালামা জন্মগ্রহণ করেন। এ পুত্র সালামার নামেই স্বামী আবু সালামা এবং স্ত্রী উম্মু সালামা নামে খ্যাতি লাভ করেন। জানা যায় আবিসিনিয়ার আবহাওয়া সালামা পরিবারের স্বাস্থ্যের অনুকূলে ছিলনা। যে কারণে তাঁরা বাধ্য হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। পরবর্তীকালে রাসূল (সা.) এর নির্দেশে আবার মদীনায় হিযরত করেন।

হিযরতের করুন চিত্র

৩৯৩. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০২

উম্মু সালামা (রা.) মদীনায় হিযরতকারী প্রথম মহিলা।[৩৯৪] কিন্তু মদীনায় হিযরতের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই তিক্ত ও দু:খজনক। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর সে ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন: আবু সালামা যখন মদীনায় যাওয়ার সিন্ধান্ত নেন, তখন তাঁর কাছে একটি মাত্র উট ছিল। তিনি আমাকে এবং আমার পুত্র সালামাকে তার পিঠে সওয়ার করেন। তিনি নিজে উটের লাগাম ধরে রওয়ানা দেন। বনু মুগীরা ছিল আমার সমগোত্রিয়। এ গোত্রের লোকেরা আমাদেরকে দেখে ফেলে এবং আবু সালামাকে বাধা দিয়ে বলে যে আমরা আমাদের কন্যাকে এত খারাপ অবস্থায় যেতে দেব না। তারা আবু সালামার হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নেয় এবং আমাকে সাথে নিয়ে চলে যায়। এর মধ্যে আবু সালামার বংশের লোক বনু আবদুল আসাদ এসে পৌছে। তারা পুত্র সালামাকে ছিনিয়ে নেয় এবং বনু মুগীরাকে জানিয়ে দেয় যে তোমারা তোমাদেরকে কন্যা কে স্বামীর সাথে যেতে না দিলে আমরাও আমাদের শিশুকে তোমাদের কন্যার সাথে কিছুতেই যেতে দেবনা। এখন আমি আমার স্বামী এবং পুত্র সন্তান তিন জনই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। শোকে-দু:খে আমার অবস্থা বেগতিক। যেহেতু হিজরতের হুকুম হয়েছিল, তাই আবু সালামা মদীনায় চলে যান। আমি একা রয়ে যাই। প্রতিদিন ভোরে ঘর থেকে বের হতাম এবং একটা পাহড়ে বসে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতাম। প্রায় এক বছর আমাকে এ অবস্থায় কাটাতে হয়। একদিন বনু মুগীরার এক ব্যক্তি যিনি ছিলেন আমার বন্ধু; আমার এই অস্তিরতা দেখে দয়াপরবশ হয়ে তার বংশের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, আপনারা এ অসহায়কে কেন ছেড়ে দিচ্ছেন না? একে তো আপনারা স্বামী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। তার একথাগুলো বেশ কাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মনে দয়া জাগ্রত হয়। তারা আমাকে অনুমতি দিয়ে বলে যে তোমার ইচ্ছা হলে স্বামীর কাছে যেতে পারো। এটা শুনে বনু আসাদের লোকেরাও আমার কাছে সন্তান ফেরত দেয়। এবার উটের পিঠে

---

৩৯৪. ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ, খ. ৩, পৃ. ১৬৯; ইবনুল আসীর, Dm‘j Mvev dx gwi dwZm mvnvev, বৈরুত: দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, খ. ৫, পৃ. ৫৮৮; ইউসুফ আল-কানধালূবী, হায়াতুস সাহাবা, দিমাশক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করন ১৯৮৩, খ. ১, পৃ. ১৫৮, ৩৫৯

Dhaka University Institutional Repository

হাওদা বেধে পুত্র সালামাকে বুকে নিয়ে সাওয়ার হই আমি আর আমার এই শিশু সন্তান। হযরত তালহা আমার উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যান। আল্লাহ স্বাক্ষী, তালহার চেয়ে ভালো লোক আমি পাইনি। মনজিলে এলে আমার অবতরণের দরকার হলে তিনি গাছের আড়ালে চলে যেতেন। আবার রওয়ানা করার সময় হলে তিনি উট নিয়ে আসতেন। আমি ভালো ভাবে বসলে তিনি উটের লাগাম ধরে আগে আগে গমন করতেন। গোটা পথ এভাবে কাটে। মদীনা পৌছে বনু আমের ইবনে আওফ-এর জনপথ কোবা অতিক্রমকালে ওসমান ইবনে আবু তালহা আমাকে জানান যে, তোমার স্বামী এ গ্রামে আছেন। আবু সালামা এখানে অবস্থান করছে।[৩৯৫]

তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন

হিযরতকালীন সময়ে আবু সালামা গোত্রের উপর যে অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে, যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে অন্যদের বেলায় তেমন হয়নি। উম্মু সালামা নিজেই বলেন ইসলামের জন্য আবু সালামা গোত্রকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, তা আহলে বাইতের আর কাউকে সইতে হয়েছে বলে তার জানা নেই।[৩৯৬] উম্মু সালমা এমনই মযার্দা সম্পন্ন পিতার মেয়ে ছিলেন যে, যখন তিনি হিযরতকালে মদীনার কোবা পল্লীতে পৌছান তখন তাঁর পরিচয় জানতে পেরে কেউ তাকে বিশ্বাস করতে চায়নি। কারণ ঐ জাহেলী যুগের কুরাইশ বংশেও আবু উমাইয়ার মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা একা বেড়াতে বের হত না। কিন্ত উম্মু সালামা (রা.) এর ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ইসলামের হুকুম-আহকাম সর্বোপরি মহান আল্লাহর নির্দেশকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এর কিছু দিন পর হজ্জ করার জন্য কিছু লোক যখন মক্কার উদ্দেশ্যে

৩৯৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ইবন কাসির, Avj-we'vqv Iqvb wbnvqv, বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ, খ. ৩, পৃ. ১৬৯; ইবনুল আসীর, Dm'j Mvev dx gwiidwZm mvnvev, বৈরুত: দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, খ. ৫, পৃ. ৫৮৮; ইউসুফ আল-কানধালূবী, nvqvZm mvnvev, দিমাশক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩, খ. ১, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯
৩৯৬. প্রাগুক্ত

রওয়ানা হয় তখন উম্মু সালামা তাঁর পরিবারের কাছে একটা চিঠি পাঠান। এবার সবাই বিশ্বাস করে যে সত্যিই তিনি কুরাইশ বংশের আবু উমাইয়ার সন্তান।

স্বামী আবু সালামা (রা.) এর সাথে স্বাক্ষাত ও ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ

মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে স্বামীর সাথে সাক্ষাত হয়। মদীনায় স্বামীর সাথে একত্রিক হওয়ার পর তাঁর আবার সাংসারিক জীবন শুরু হয়। কিন্তু বেশিদিন একত্রে থাকার সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে ডাক আসে ওহুদ যুদ্ধের। বীর যোদ্ধা আবু সালামা ওহুদ যুদ্ধে বীর বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে তিনি বহু শত্রু সৈন্যকে নিধন করেন। তবে শত্রু নিক্ষিপ্ত একটি তীর তাঁর বাহুতে এসে বিদ্ধ হয়। যখমটা ছিল মারাত্বক। দীর্ঘ একমাস চিকিৎসার পর তিনি কোনো রকম সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে কতন এলাকায় আরেকটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং এ যুদ্ধে তিনি মারাত্বকভাবে আহত হয়ে মদীনায় ফিরে এসে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাত বরণের কথা শুনে নবীজী (সা.) তাঁর বাসায় ফিরে আসেন এবং দোয়া করেন:

"হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও। তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দাও। তোমার প্রিয় ও নিকটতম বান্দাদের মধ্যে তাঁকে অন্তর্ভূক্ত করো। তাঁর পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব গ্রহণ করো এবং তাঁকে ও আমাদের সকলকে ক্ষমা করো। তাঁর কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করে দাও।[৩৯৭]

রাসূল (সা.) থেকে তাঁর স্বামী কর্তৃক বর্ণিত সেই দু'য়া উম্মু সালামা (রা.) এর স্মরণ হলো। তিনি বলেন হে আল্লাহ! বিপদে তোমার কাছেই এর প্রতিদান চাচ্ছি-পর্যন্ত বলে থমকে গেলেন এবং মনে মনে বললেন: আবু সালামার চেয়ে উত্তম জীবন সাথী আর কে হতে পারে। হিজরী ৪র্থ

৩৯৭. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২১৬৯

বর্ষের জামাদিউল উখরার ৯ তারিখে তিনি ইন্তিকাল করেন। উম্মু সালামার গর্ভে আবু সালামার ঔরসজাত দুই'জন পুত্র সন্তান ছিল - সালামা ও উমার এবং দু'জন কন্যা ছিল যয়নব (রা.) ও রুকাইয়া (রা.)।

মহানবী (সা.) এর সান্ত্বনা ও দো'য়া

হযরত আবু সালামার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রাসূল (সা.) তাঁর বাড়িতে ছুটে যান। শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন। উম্মু সালামা যখন খুবই কাতর হয়ে বার বার বলছিলেন অসহায় অবস্থায় কেমন মৃত্যু হয়েছে, হায়! তখন রাসূল (সা.) তাঁকে ধৈর্যধারন করার ও মরহুমের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে বলেন। বিষয়টি সুনানে নাসাঈ নামক গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে রাসূল (সা.) উম্মু সালামা (রা.) কে বললেন, বলো "হে আল্লাহ! আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম উত্তরাধিকারী দাও"।

তারপর নবীজী (সা.) আবু সালামা (রা.) এর মৃতদেহে দেখতে যান এবং অতি গুরুত্বের সাথে তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। এ জানাযার সালাতে তিনি ৯টি তাকবীর বলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ইয়া রাসূল (সা.)! জানাযায় আপনার ভূল হয়নিতো? বললেন, ইনি হাজার তাকবীরের যোগ্য ছিলেন। ইন্তিকালের পর তাঁর চোখ খোলা ছিল। নবীজী (সা.) নিজ হাতে তাঁর চোখ বন্ধ করে দেন এবং তাঁর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেন।[৩৯৮]

পূর্ব স্বামীর প্রতি তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা

৩৯৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আল মুসনাদ, হাদীস নং ২৮৯, ২৯১, ৩০৬; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, হাদীস নং-৯১৯; আবু দাউদ, আল-জানায়িয, হাদীস নং-৩১১৫; তিরমিযী, আল-জানায়িয, হাদীস নং-৯৭৭

উম্মু সালামা (রা.) তাঁর স্বামী আবু সালামা (রা.) কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। আর এ কারণে একদা তাঁর স্বামীকে বলেন, যদি কোনা স্ত্রীর স্বামী জান্নাতবাসী হয় আর স্ত্রী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর পূনবিবাহ না করে তবে আল্লাহ তায়ালা সে স্ত্রীকে তাঁর স্বামীর সাথে জান্নাতে স্থান দান করবেন। এরূপ অবস্থায় যদি স্ত্রীর মৃত্যু হয় তবে স্বামীও তাঁর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতএব, হে আবু সালামা! আসুন আমরা উভয়ে চুক্তি করি যে, আপনার পরে আমি অথবা আমার পরে আপনি আর বিয়ে করবেন না। উত্তরে আবু সালামা (রা.) বলেন, কিন্তু পূণ:বিয়ে সুন্নাত। আচ্ছা তুমি কি আমার উপদেশ মান্য করবে? উম্মু সালামা (রা.) বললেন, কেন করব না? আপনার অনুগত্য ছাড়া আমি আর কোনো কিছুতে খুশি হতে পারব কি? তখন আবু সালামা (রা.) বলেন, আমি মারা গেলে আমার পরে তুমি বিয়ে করে ফেলো। এর পর আবু সালামা দু'য়া করলেন। "হে আল্লাহ! আমার পরে উম্মু সালমাকে আমার থেকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত করো।"[৩৯৯]

আবু সালামা এর দু'য়ার বাস্তবায়ন

উম্মু সালামা (রা.) বলেন আমার স্বামী আবু সালামা (রা.) এর মৃত্যুর পর আমি ভাবতাম যে তাঁর থেকে উত্তম ব্যক্তি কে হতে পারে। এর কিছুদিন পরেই রাসূল (সা.)-এর সাথে আমার শুভ পরিনয় অনুষ্ঠিত হয়।[৪০০] আর এভাবে পূর্ব স্বামী হযরত আবু সালামার (রা.) এর দু'য়া বাস্তবায়িত হয়।

রাসূল (সা.) এর সাথে তাঁর শুভ বিবাহ

হযরত আবু সালামা (রা.) এর ইনতিকালের সময়ে উম্মু সালামা অন্ত:সত্তা ছিলেন। সন্তান (যয়নব) ভুমিষ্ট হওয়ার পর বিধবা উম্মু সালামা (রা.) যখন অত্যন্ত অসহায়া ও দরিদ্র অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলেন তখন আবু বকর (রা.) তাঁর অসহায়াত্বের কথা বিবেচনা করে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু

৩৯৯. ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj Keiv, বৈরুতঃ দারু সাদির, খ. ৮, পৃ. ৮৮, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৯৫; ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Avǒjvg Avb-bevjv, বৈরুতঃ আল-মুয়ামমাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ২০৩
৪০০. ইমাম নাসাঈ, *সহীহ সুনানুল নাসাঈ*, বৈরুত, ১৯৮৮, হাদীস নং ৫১১

এ বিয়েতে তিনি রাজি হননি।[৪০১] এক বর্ণনায় আছে যে হযরত ওমর (রা.) বিয়ের প্রস্তাব দেন। অবশ্য অন্য বর্ণনায় ওমর (রা.) নিজের জন্য এ প্রস্তাব দেননি। বরং তিনি রাসূল (সা.) এর হয়ে এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। আসলে ইসলামের জন্য উম্মু সালামার অপরিসীম ত্যাগ এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে করুন অবস্থা ইত্যাদির কথা চিন্তা করেই রাসূল (সা.) এ প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

উম্মু সালামা (রা.) ছিলেন সুসাহিত্যিক, কাব্যপটু ও অসাধারণ পান্ডিত্বের অধিকারী একজন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মহিলা। রাসূল (সা.) এর স্ত্রীদের মধ্যে সমস্ত দিক দিয়ে আয়েশা (রা.) এর পর তাঁর স্থান ছিল। রুপ-সৌন্দর্য, জ্ঞান-প্রজ্ঞায় বিভূষিত এ মহিলার পক্ষে রাসূল (সা.) এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই তিনি প্রস্তাবকারী ওমর (রা.) কে পরিষ্কার ভাষায় বলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে রাসূল (সা.) এর প্রস্তাবকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং একই সাথে আমি রাসূল (সা.) এর কাছে তিনটি আরজ পেশ করছি:

১. আমি আভিজাত্যের অহংকারী মেয়ে যার ফলে আমার স্বভাবে অত্যধিক আত্নবোধ রয়েছে;

২. আমি একজন বিধবা মহিলা এবং আমার সন্তানাদি আছে;

৩. বিয়ের কাজ সম্পাদান করার মত আমার কোন অভিভাবক নেই, আমি একা এক্ষেত্রে।

হযরত ওমর (রা.) উম্মু সালামা (রা.)এর এ আরজ শোনার পর বললেন, হে উম্মু সালামা! তুমি কেমন নারী! আমার প্রস্তাবে রাজি হওনি। এখন রাসূল (সা.) এর প্রস্তাবে শর্তারোপ করছ। বুদ্ধিমতি উম্মু সালামা তৎক্ষনাত উত্তর দিলেন, হে ওমর (রা.)! আমার ইয়াতিম সন্তান আছে।

৪০১. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, বৈরুত: দারু সাদির, খন্ড-৮, পৃ. ৯০; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪২-৮৪৩

আমি নি:স্ব! আমার বাস্তব অবস্থা রাসূল (সা.) এর দরবারে কেবল তাঁর অবগতির জন্য পেশ করছি। এ কোন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরন বা অহংকারবোধের বহি:প্রকাশ নয়। সব কথা শুনে রাসূল (সা.) উম্মু সালামাকে বললেন, হে উম্মু সালামা! তোমার যে ইয়াতিম সন্তানদের কথা উল্লেখ করেছ তাদের লালন পালনের ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন। আর তোমার কেই নেই-সে সমস্যারও সমাধান হবে। তার উত্তরে উম্মু সালামা ছেলে ওমরকে বললেন যাও রাসূল (সা.) এর সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর।[৪০২] এর কিছুদিন পর রাসূল (সা.) এর সাথে বিয়ে হয়। সময়টা ছিল হিজরী চতুর্থ সালের শাওয়ালের মাস। বিয়ের সময় রাসূল (সা.) উম্মুল সালামাকে দু'টো যাতা, একটি কলসী এবং খুরমার বাকলে ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ দান করেছিলেন। এ সকল জিনিস তিনি অন্যান্য বিবিগণকেও বিয়ের সময় প্রদান করে ছিলেন।[৪০৩]

বিয়ের পর চারজন সন্তান-সন্ততিসহ উম্মু সালামা (র.) নবীজীর গৃহে আসেন এবং সংসার জীবন শুরু করেন। মহানবী (সা.) এর স্ত্রীগণ দু'টি দলে বিভক্ত ছিলেন। এর একটির নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.) এবং অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন হযরত উম্মু সালামা (রা.)।

উম্মু সালামা (রা.) এর বিচক্ষণতা, দুরদর্শী ও উপস্থিত বুদ্ধি

উপস্থিত বুদ্ধির জোরে উম্মু সালামা (রা.) হুদায়াবিয়ার সন্ধির সময়ে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণে রাসূল (সা.) কে সহযোগীতা করেছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরতি হওয়ার পর রাসূল (সা.) সেখানেই সকলকে কুরবানী করার আদেশ করেন। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে কেউই রাসূল (সা.) এর হুকুম মতো কাজ করেনি। বরং চুপচাপ বসেছিলেন। বাহ্যত হুদায়বিয়ার

৪০২. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯০,৯১; আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা*, খ. ২, পৃ. ২০৪,২০৫; ইবনুল জাওজী, *সিফাতুস সাফওয়া*, হায়দ্রাবাদ: দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩৫৭ হি., খ. ২, পৃ. ২১
৪০৩. ইবনুল জাওজী, *সিফাতুস সাফওয়া*, হায়দ্রাবাদ: দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩৫৭ হি., খ. ২, পৃ. ২১

সন্ধিটা ছিল বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। যে কারণে মুসলমানরা খুবই মনঃকষ্টে ভুগছিলেন।

তাঁর মেধা-মনন, শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান

উম্মু সালামা (রা.) সম্পর্কে মাহমুদ বিন লবিদ বলেন, যদিও মহানবী (সা.) এর সকল পত্নীগণ আল্লাহর রাসূল (সা.) এর প্রচুর হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন, তবু তাঁদের মধ্যে আয়েশা (রা.) এবং উম্মু সালামা (রা.) এর কোনো তুলনা ছিল না।[৪০৪] তিনি রাসূল (সা.) এর মতোই সুন্দর সুরে কুরআন তিলায়াত করতেন এবং ছাত্রদেরকে শোনাতেন। তিনি রাসূল (সা.) এর প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন, মনে রাখতেন এবং আমল করার চেষ্টা করতেন।

হাদীস শাস্ত্রে উম্মু সালামা (রা.) এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান

হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় উম্মু সালামা (রা.) এর অবদান অনস্বীকার্য। হাদীস বর্ণনা ও প্রচারে হযরত আয়েশা (রা.) এর পরই তাঁর স্থান। হাদীস শোনার প্রতি উম্মু সালাম (রা.) এর প্রবল আগ্রহ ছিল। একদিন তিনি চুলের বেনী বাধাচ্ছিলেন এমন সময়ে রাসূল (সা.) ভাষণ দেয়ার জন্য মসজিদের মিম্বারে দাঁড়ালেন। তিনি কেবল "ওহে লোক সকল! বলেছেন আর অমনি উম্মু সালামা (রা.) চুল বিন্যস্তকারিনীকে বললেন 'চুল বেধে দাও'। সে বলল এত তাড়াহুড়া কিসের? কেবল তো ওহে লোক সকল! বলেছেন। উম্মু সালামা (রা.) তখন বললেন আমরা কি লোক সকলের অন্তর্ভূক্ত নই? অতঃপর তিনি নিজেই চুল বেধে দ্রুত উঠে যান এবং দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূল (সা.) এর পূর্ণ ভাষণটি শুনেন।[৪০৫]

৪০৪. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৫
৪০৫.ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৯৭

এভাবে হাদীস শিক্ষার প্রতি তাঁর যেমন তীব্র আকাঙ্খা ছিল তেমনিভাবে হাদীস বর্ণনা ও সম্প্রসারণের প্রতিও ছিলেন যথেষ্ট সজাগ ও যত্নবান। তিনি রাসূল (সা.) এর ছাড়াও তাঁর পূর্ব স্বামী আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ এবং নবী কন্যা ফাতেমা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪০৬] তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৭৮টি। তার মধ্যে ১৩টি মুত্তাফাকুন আলাইহি। আর একক ভাবে ইমাম বুখারী (র) থেকে ৩টি এবং ইমাম মুসলিম থেকে ১৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা পুনরুক্তিসহ সহীহ আল-বুখারীতে ৪৮টি, সহীহ মুসলিমে ৩৯টি, আল জামে'আত-তিরমিযীতে ৩৯টি, সুনান আবু দাউদে ৫০টি, সুনান আন নাসাঈতে ৬৮টি এবং সুনান ইবনে মাজায় ৫২টি সংকলিত হয়েছে।[৪০৭] উম্মু সালামা (রা.) এর থেকে বর্ণিত হাদীসে শারাঈ বিধি বিধান, ইবাদত, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, নারী বিষয়ক, পবিত্রতা, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে স্থান লাভ করেছে।

ইন্তেকল

উম্মু সালামা (রা.) ৬৩ হিজরী সনে ৮৪ কিংবা ৮৫ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। নবী পত্নীদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘায়ূ লাভ করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান। জানাযা শেষে তাঁকে মদীনার জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

---

৪০৬. ইবন হাজার, *তাহযীবুত তাহসীব*, হায়দ্রাবাদ: দাযিরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩২৫ হি., খন্ড-১২, পৃ. ৪৮৩; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৩

৪০৭. মুয়াল্লিমা মোরশেদ বেগম (সম্পাদিত), *রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন*, ঢাকা: পিস পাবলিকেশন্স, ২০১৫, পৃ. ১১৯

৭.৭ হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)

পরিচয়: নাম ও বংশ

তাঁর মূল নাম যয়নব। পূর্বে তাঁর নাম ছিল বুররাহ আর ডাক নাম উম্মু হাকাম। বাবার নাম ছিল জাহাশ। তিনি তৎকালীন আরবের সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল উমাইয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব। অর্থাৎ যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.) এর আপন ফুফাতো বোন।[৪০৮] তাঁর বংশ তালিকা ছিল এ রকম, যয়নব বিনতে জাহাশ ইবনে রুবাব ইবনে ইয়া'মার ইবনে সোবরা ইবনে মুবরা ইবনে কাসীর ইবনে গানাম ইবনে দুদরান ইবনে আসাদ খুযাইমা।

ইসলাম গ্রহণ

তিনি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে নবুওয়্যাতের সূচনালগ্নে ইসলাম কবুল করেন। সে সূত্রে তিনি সাবেকুনাল আউয়ালুনদের তথা প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীর পর্যায়ভূক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। পিতা জাহাশ পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। তাই তিনি পিতার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হন।

হিযরত

অবিশ্বাসী মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন রাসূল (সা.) এর নির্দেশে পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে হযরত যয়নব (রা.) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

৪০৮. ইবনুল আসীর, Dm‘j Mvev dx gwidwZm mvnvev, বৈরুত: দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৪

এরপর সেখানে থেকে মদীনায় হিযরত করেন এবং রাসূল (সা.) এর অভিভাবকত্বে অবস্থান করেন।

যায়েদ (রা.) এর সাথে যয়নব (রা.) এর বিয়ে

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পালক পুত্র হযরত যায়েদ (রা.) এর সাথে আপন ফুফাতো বোন অনিন্দ্য সুন্দরী যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) এর বিয়ে হয়। রাসূল (সা.) এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনা। ইসলামে সব মুসলমান সমান, সকলে ভাই-ভাই, আশরাফ-আতরাফের কোন বালাই নাই। ইসলামের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই তিনি একজন সদ্য আজাদ প্রাপ্ত ক্রীতদাসের সাথে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ, কুরাইশ বংশের মেয়ে তাও আবার নিজেরই ফুফাতো বোনকে বিয়ে দেন। কিন্তু নারী সূলভ মানসিকতার কারণে হযরত যয়নাব (রা.) এ বিয়েকে ভালোভাবে মেতে নিতে পারেনি। যে কারণে বিয়ের প্রায় এক বছর একত্রে বসবাস করার পরও তাদের মধ্যে সার্বিক অর্থে কোন ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ফলে যায়েদ (রা.) প্রচন্ড অশান্তির মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। আসলে যয়নাব (রা.) বিয়ের আগে রাসূল (সা.) এর খিদমতে যায়েদ (রা.) সমন্ধে আরজ করছিলেন যে আমি তাঁকে আমার জন্য পছন্দ করি নাই। তিনি শুধু রাসূল (সা.) এর নির্দেশ মেনে নেয়ার জন্য এ বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন।[৪০৯]

তালাকপ্রাপ্তা নিরীহ যয়নাব (রা.)

৪০৯. ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, বৈরুতঃ দারু সাদির, খ. ৮, পৃ. ১০৮; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৫-৮৪৬

হযরত যাযেদ (রা.) যয়নাব (রা.) কে তালাক দিলে জনগণের মধ্যে জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে যে ক্রীতদাসের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে কেই বা বিয়ে করবে। অপরদিকে তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর যয়নাব (রা.) হয়ে যান অসহায় ও ঘৃণার পাত্রী। এ অবস্থা থেকে যয়নাব (রা.) কে রেহাই দিতে স্বয়ং আল্লাহ রাসূল (সা.) এর সাথে তাঁকে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। যয়নাব (রা.) তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দত পুরা করলে রাসূলে করীম (সা.) আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য, জাহেলী প্রথা সেখানে বাধা হয়ে দাড়ায়। কারণ যায়েদ (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.) এর পালকপুত্র। তৎকলীন আরবের লোকজন পালকপুত্রকে আপন পুত্রের মতই মনে করতো। ফলে রাসূল (সা.) অপবাদের আশংকা করছিলেন

যায়েদ-যয়নাব দ্বন্দ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ

যখন দুজনের মধ্যে মোটেই বনিবনা হচ্ছিল না তখন একদিন যায়েদ (রা.) এসে রাসূল (সা.) কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! যয়নাব আমার কথার উপর কথা বলে, তর্ক করে, আমি তাঁকে তালাক দিতে চাই।" এ কথা শুনে রাসূল (সা.) যায়েদ (রা.) কে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে তালাক দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন। কারণ তালাক দেয়া শরীয়তে যায়েজ হলেও অপছন্দনীয়। এমনকি বৈধ কাজ সূমহের মধ্যে এ কাজ নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক ঘৃণীত। যে কারণে রাসূল (সা.) তাঁকে প্রশ্ন করেন,"তুমি কি তাঁর মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পেয়েছো?" যায়েদ উত্তরে বলেন, "না"! "কিন্তু আামি তাঁর সাথে বসবাস করতে পারবো না"। রাসূল (সা.) তাঁকে আদেশের সুরে বললেন," বাড়িতে গিয়ে তোমার স্ত্রীকে দেখাশোনা কর, তাঁর সাথে ভালো আচরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। কারণ আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদাচারন কর আর

আল্লাহকে ভয় কর।” কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক এমন পর্যায় পৌছেছিল যে শেষ পর্যন্ত যায়েদ (রা.) রাসূল (সা.) এর নিষেধ সত্ত্বেও যয়নাব (রা.) কে তালাক দিয়ে দেন।[৪১০]

কু-প্রথার মূলৎপাটনে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল প্রকার কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে নির্ভেজাল একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূল (সা.) কে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। এরশাদ হচ্ছে,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“তোমাদের পুরুষদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা.) কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।”[৪১১] এভাবে আল্লাহর অনুমতি পেয়ে রাসূল (সা.) যয়নাব (রা.) কে বিয়ে করেন। আর এর ফলে আরবে প্রতিষ্ঠিত বহু পুরোনো একটি কু-প্রথার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ওলীমা অনুষ্ঠান

এ বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ার আয়োজন করা হয়। অলীমার অনুষ্ঠানে আনসার ও মুহাজিরদের প্রায় তিনশত জনকে দাওয়াত করে খায়ানো হয়। খাবারের তালিকায় ছিল গোশত-রুটি। প্রতিবারের দশজন করে লোক বসে খাওয়া দাওয়া করেন। কিন্তু শেষ দলের লোকজন খাবার শেষ হওয়ার পরেও বসেছিলেন। তারা নানা গল্পে মেতে ওঠেন। ফলে রাত ক্রমেই গভীর হতে থাকে। এতে মহানবী (সা.) মনে মনে অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন, কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে পারছিলেন না।[৪১২]

পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষ্য হলেন হযরত যয়নাব (রা.)

---

৪১০. প্রাগুক্ত
৪১১. আল-কুরআন, ৩৩:৪০
৪১২. ইউসুফ আল-কানধালুবী, nvqvZm mvnvev, দিমাশক, দারুল কালাম, ২য় সংস্করন ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ২৬০-২৬১; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৭

মহানবী রাসূল (সা.) লজ্জার কারণে মেহমানদের ওঠতে বলতে পারছিলেন না, অথচ মনে মনে ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। ঠিক এই সময়ে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। ইরাশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

"হে ইমানদার লোকেরা! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করবে না। অবশ্য দাওয়াত পেলে যাবে, কিন্তু ডাকার আগে গিয়ে অনর্থক বসে থাকবে না। বরং ডাকার পরে যাবে, খাওয়ার পরে চলে আসবে, বসে গল্প গুজবে রত হবে না। নিশ্চয়ই এটি নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদেরকে সংকোচবোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা নবীর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।"[৪১৩]

উক্ত আয়াত নাাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা.) দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে দেন। এর ফলে লোকদের ভেতরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে রাসূল (সা.) ও যয়নাব (রা.) এর বিয়ের ফলে আরবের দীর্ঘ দিনের প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারনার অবসান ঘটে তা হলো পালক পুত্র কখনো আপন পুত্র হতে পারে না। ফলে তার স্ত্রীকে বিয়ে করাও দূষণীয় নয়। ইসলাম পরিস্কার ভাবে ১৪ জন নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছে। অবশিষ্ট সকলকে বিয়ে করা যায়েজ। এই ১৪ জনের মধ্যে পালক পুত্রের স্ত্রীর কথা নেই। শারীরীক গঠনের দিক দিয়ে হযরত যায়নাব (রা.) ছিলেন ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু অন্যান্য সুন্দরী এবং সেই সাথে শোভন শারিরীক গঠনের অধিকারী।

৪১৩. আল-কুরআন, ৩৩:৫৩

চরিত্র, মাধুর্য ও ধর্মপরায়ণতা

তিনি একাধারে দ্বীনদার, পরহেযগার, উদার, দয়াদ্রচিত্ত, বিনয়ী ও সৎ স্বভাবী ছিলেন। আর সেই সাথে তিনি ছিলেন যথেষ্ট পরিশ্রমী মহিয়সী নারী। তিনি হস্তশিল্পের কাজে খুবই পারদর্শী ছিলেন। নিজ হাতে রোজগার করে সংসার চালাতেন। তাঁর পরহেযগারিতার ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল (সা.) এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। একবার সাহাবীগণের মধ্যে রাসূল (সা.) কিছু মাল বিতরন করছিলেন। কিন্তু স্ত্রী যয়নাবের পরামর্শক্রমে তা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখেন। এতে হযরত ওমর (রা.) রাগ করে যয়নাব (রা.) কে ধমক দিলে রাসূল (সা.) বলেন, ওমর! যয়নাবকে কিছু বলো না। সে খুবই আল্লাহভীরু ও ইবাদতের সময় ক্রন্দনশীল।[৪১৪]

একবার হযরত ওমর (রা.) বাইতুল মাল থেকে যয়নাব (রা.) কে এক বছরের খরচ পাঠিয়ে দেন। হযরত যয়নাব (রা.) এর থেকে সামান্য অংশ একটি চাদরে ডেকে রেখে বাকি সমস্ত কিছু গরীবের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার জন্য পরিচারিকাকে নির্দেশ দেন। এ সময় পরিচারিকা আরজ করেন, আম্মাজান! গরীবদের মাঝে আমিও একজন। তাই এ মাল থেকে আমিও কিছু পেতে পারি। তখন যয়নাব (রা.) বলেন, চাদরে ঢাকা যা আছে সবই তোমার, বাকিগুলো তুমি দান করে দাও।[৪১৫]

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত

হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) ছিলেন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহিলা। মুহাম্মদ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত যয়নাব (রা.) নবীজী (সা.) কে বলেন, ইয়া রাসূল (সা.)! আমি আপনার অন্য স্ত্রীগণের মতো নই। তাঁদের মধ্যে একজনও এমন নেই, যার বিয়ে পিতা-ভাই বা

---

৪১৪. আল বালাজুরী, Avbmve j Avkivd, মিশর: দারুল মায়ারিফ, খ. ১, পৃ. ৪১৫; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৬-৮৪৭
৪১৫. ইবন সাদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, বৈরুত: দারু সাদির, খ. ৮, পৃ. ১০৪

বংশের অন্য কারো অভিভাকত্বে সম্পন্ন হয়নি। একমাত্র আমিই ব্যাতিক্রম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে আসমান থেকে আপনার স্ত্রী করেছেন।[৪১৬]

আয়েশা (রা.) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা যয়নাব বিনতে জাহাশের প্রতি রহম করুন। সত্যি দুনিয়ায় তিনি অনন্য মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নবীর সাথে তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন।[৪১৭]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান

হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন কর্মের পাশাপাশি তিনি অল্প পরিমান হলেও নবী (সা.) থেকে হাদীস শিক্ষা ও তা বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূল (সা.) থেকে ১১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস পুনরুক্তিসহ বুখারীতে ৫টি, মুসলিমে ৩টি, তিরমিযীতে ২টি, আবু দাউদে ২টি, নাসাঈতে ২টি ও ইবনে মাজায় ২টি সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা.) উম্মু হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান, যয়নব বিনতে আবু সালামা, কুলছুম বিনতে মুসতালাক (র) প্রমুখ সাহাবী ও তাবেঈনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইন্তিকাল

হিজরী ২০ সালে ৫৩ বছর বয়সে হযরত যয়নাব (রা.) ইন্তিকাল করেন।[৪১৮] ইন্তিকালের সময় শুধু একটি মাত্র গৃহ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তার স্মৃতি চিহ্ন এ গৃহটি উমাইয়া খলীফা

---

৪১৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ Bgvg gmwjg, মুসলিম শরীফ, প্রাগুক্ত, ফাদায়েলু যায়নাব।
৪১৭. প্রাগুক্ত
৪১৮. ইবন হাজার, Avj-Bmvev dx Zvghxwhm mvnvev, বৈরুতঃ দার আল ফিকর, ১৯৭৮, খ. ৪, পৃ. ৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক ৫০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাঁর আত্মীয় স্বজনের নিকট থেকে ক্রয় করে মসজিদে নববীর অন্তর্ভূক্ত করেন। তিনিই এতই পরহেযগার ছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর কাফনের কাপড় তৈরি করে যান।[৪১৯] এ ব্যাপারে তিনি অসিয়ত করেন যে খলীফা হযরত ওমর আমার জন্য কাপড় পাঠাতে পারে। এমন হলে এক প্রস্থ কাপড় ছদকা করে দেবে। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী রাসূল (সা.) এর খাটে করে তাঁকে দাফন করতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ খাটে আবু বকর (রা.) এর লাশ বহন করা হয়। তবে আবু বকর (রা.) এর পর যাদের লাশ বহন করা হয় তাঁদের মধ্যে যয়নব (রা.) ছিলেন প্রথম মহিলা। ওমর (রা.) তাঁর জানাযা পড়ান। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

৪১৯. ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, বৈরুতঃ দারু সাদির, খ. ৮, পৃ. ১০৯; আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Avѐjvg Avb-bevjv, বৈরুতঃ আল-মুয়াসসাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন ১৯৯০, খ. ২ পৃ. ২১১

৭.৮ হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)

পরিচয়: নাম ও বংশ

তার মূল নাম জুয়াইরিয়া। পিতার নাম হারেস। তিনি বনু মুস্তালিক গোত্রের সর্দার ছিলেন।[৪২০] তাঁর বংশ তালিকা হলো জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস ইবনে আবু দিদার ইবনে হাবীব ইবনে আয়েয বিনে মালেক ইবনে জুয়াইমা ইবনে আসাদ ইবনে আমর ইবনে রাবীয়া ইবনে রাবীয়া ইবনে হারিসা ইবনে আমর মুযিকিয়া।[৪২১] জুয়াইরিয়া (রা.) এর প্রথম বিবাহ হয়েছিল তাঁর নিজের গোত্রের মুসাফা ইবনে সাফওয়ান মুসতালিফের সাথে। মুসাফা সম্পর্কে জুয়াইরিয়ার চাচাতো ভাই ছিলেন।

প্রথম দিকে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) এর পিতা এবং স্বামী দু'জনই ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলো।[৪২২] মক্কার কুরাইশদের প্ররোচনায় অথবা নিজেদের ইচ্ছায় তারা মদীনার ওপর আক্রমন করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। সংবাদটি মহানবী (সা.) এর কানে পৌছালে তিনি এই সত্যতা যাচায়ের জন্য কুরাইদা ইবনে হাবীব আসলামীকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য। হযরত বুরাইদা (রা.) ফিরে এসে সংবাদটি রাসূল (সা.) নিকট জানালেন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং মরাইসী নামক স্থানে অবস্থান নেন। এ মুরাইসী নামক স্থানটি মদীনার থেকে নয় মাইল দুরে। আর সময়টি ছিল হিজরীর ৫ম সনের শাবান মাস।

৪২০. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৯; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৮
৪২১. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৬
৪২২. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১১৬

বনী মুস্তালিক যুদ্ধ ও যুদ্ধ বন্দী হিসাবে হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) এর মদীনাতে আগমন

ওদিকে মুসলিম বাহিনীর আগমন, অবস্থান গ্রহণ ও রণসজ্জারের খবর শুনে মুস্তালিক গোত্র প্রধান জুয়াইরিয়া (রা.) এর পিতা হারেস তাঁর সংঘটিত বাহিনীর থেকে সটকে পড়েন। কিন্তু তাঁর বাহিনীর মনোবাল ছিল অটুট। হারেসের অধীনস্থ বাহিনী কিছুমাত্র পিছু না হটে মুসলিম বাহিনীর সাথে মরণাপণ লড়াইতে অবতীর্ণ হয়। প্রচন্ড যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা যায় মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করেছে। এ যুদ্ধে বনী মুস্তালিক গোত্রের নয় জন নিহত হয় এবং আরো ছয়শত সেনা মুসলিম বাহিনীর হতে বন্দী হয়। আর দুই হাজার উট ও পাঁচ হাজার ছাগল মুসলমানদের দখলে আসে।[৪২৩] এসব যুদ্ধবন্দীদের সাথে বন্দী হওয়া অবস্থায় গোত্র প্রধান হারেসের কন্যা জুয়াইরিয়া ছিলেন। তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম হিসেবে বিলি-বণ্টন করা হল। সে মোতাবেক জুয়াইরিয়া সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েন। কিন্তু তিনি দাসীর জীবন মেনে নিতে পারছিলেন না। সে জন্য তিনি সাবিত (রা.) এর কাছে অর্থের বিনিময় মুক্তির আবেদন জানান। সাবিত (রা.) ১৯ উকিয়াত স্বর্ণের বিনিময়ে এ আবেদন মঞ্জুর করেন।

রাসূল (সা.) জুয়াইরিয়া পক্ষ থেকে মুক্তিপণ আদায় করেন ও তাঁকে বিবাহ করেন

কিন্তু জুয়াইরিয়া (রা.) এর কাছে এত বিপুল পরিমাণ সোনা না থাকার কারণে তিনি এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য স্বয়ং রাসূল (সা.) এর কাছে আবেদন করেন। তিনি রাসূল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি হারেস ইবনে আবু দিদারের কন্যা। আমার পিতা গোত্রের নেতা, অমি যে বিপদে পড়েছি-তা আপনার অজানা নেই। আমি সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েছি। আমার মুক্তিপণ আদায় আপনার সাহায্য কামনা করছি। রাসূল (সা.) বলেন, আমি যদি তোমার জন্য আরো ভালো কিছু ব্যবস্থা করি

৪২৩. আব্দুর রউফ দানাপুরী, *আসাহ আস সিয়ার*, করাচী, পৃ. ১৭২; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৯-৮৫০

তাহলে কেমন হয়? তিনি বলেন হে আল্লাহর রাসূল! সেটা কি, তিনি বলেন, আমি তোমার পক্ষ হয়ে মুক্তিপন আদায় করে দিয়ে তোমাকে বিয়ে করব। জুয়াইরিয়া (রা.) বলেন হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আমি এতে রাজি আছি। তখন রাসূল (সা.) বলেন আমি তাই করেছি। তারপর তাঁকে বিয়ে করে স্বাধীন স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন।[৪২৪]

জুয়াইরিয়া (রা.) এর পিতার ইসলাম গ্রহণ এবং মুসলমান ও ইয়াহুদী গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

ইবনে আসীর (রা.) বলেন, জুয়াইরিয়া (রা.)-এর বাবা যখন জানতে পেরেছেন যে তাঁর কন্যা বন্দী হয়ে আছে, তখন তিনি অনেক সম্পদ ও আসবাবপত্রসহ কয়েকটি উটের ওপর বোঝাই করে কন্যার মুক্তির জন্য মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে পছন্দনীয় দু'টি উট মাফিস নামক স্থানে লুকিয়ে রেখে অবশিষ্ট উট ও আসবাপত্র নিয়ে রাসূল (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন: আপনি আমার কন্যাকে বন্দী করে এনেছেন। এসব মাল ও আসাবাপত্র নিন, বিনিময়ে আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে দু'টো উট তুমি লুকিয়ে রেখে এসেছো তা কোথায়? রাসূল (সা.) এর কথা শুনে হারেস আশ্চার্য হয়ে গেলেন এবং তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে যখন জানতে পারেন যে তার কন্যা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তখন তিনি সীমাহীন খুশি হন এবং কন্যার সাথে সাক্ষাত করে ঘরে ফিরে আসেন।[৪২৫] নিজ গোত্রে এসে গোত্রের লোকদেরকে মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা ছাড়তে বলেন এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

---

৪২৪. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৪-২৯৫; সীরাতু ইবনে হিশাম, খ. ২, পৃ. ২৯৪,২৯৫
৪২৫. ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪২০

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে বিয়ে

মূলত রাসূল (সা.) এ বিয়েটা করেছিলেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে। একটু চোখ-কান খুলে চিন্তা করলে বিয়ের বিষয়টা দেখলেই পরিষ্কার হয় যে বিয়েটা ছিল রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দুরদর্শীতার এক মাইলফলক। তারা কোন প্রকারেই রাসূল (সা.) ও মুসলমানদের মেনে নিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) জুয়াইরিয়া (রা.) কে বিয়ে করার ফলে বনু মুস্তালিকের সকল যুদ্ধ বন্দী বেকসুর মুক্তি লাভ করেন। ফলে হঠাৎ করেই প্রাণের দুশমন বন্ধুতে পরিণত হয়। বনু মুস্তালিক গোত্রের কেউ আর কোনদিন রাসূল (সা.) ও মুসলমানদের বিরোধিতা করেনি। এমনকি তারা ধীরে ধীরে সকলেই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৪২৬]

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) এর ব্যক্তিসত্তা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা মহিলা। যে কারণে তিনি বন্দী জীবন সহ্য করতে পারেন নি। তিনি দেখতে ছিলেন সুন্দরী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তাঁর ব্যাপারে বলতে গিয়ে   হযরত আয়েশা (রা.) বলেন হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। তাঁর অনুপম চেহারায় চিত্তাকর্ষক এবং মধুর আচরণে এমন এক মাধুর্য নিহিত ছিল যাতে করে যে কোন লোক তাঁর সান্নিধ্যে এলে সে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে যেত। তাঁকে দেখলেই দর্শকের মনে একটা স্থায়ী মমতার চিহ্ন ফুটে ওঠতো।[৪২৭]

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে জুমুআর দিনে নবীজী (সা.) জুয়াইরিয়া (রা.) এর কাছে যান। সেদিন তিনি সিয়াম পালনরত ছিলেন। নবীজী (সা.) যেহেতু একটা রোযা রাখাকে মাকরুহ মনে করতেন,

৪২৬. আল ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi‡ Av'jvg Avb-bevjv, বৈরুতঃ আল-মুত্তওয়ামমাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ২৬২
৪২৭. ইবন হিশাম, Avm-mxivn, বৈরুত, খ. ২, পৃ. ২৯৪

তাই জিজ্ঞাস করেন তুমি গতকাল সিয়াম রেখেছিলে? বললেন,না। নবীজী (সা.) পুনরায় বললেন, তুমি কি আগমীকাল রোযা রাখবে? বললেন, না। নবীজী বলেন তাহলে সিয়াম ভেঙ্গে ফেল।[৪২৮] কেননা রোযা রাখলে এক সাথে দু'দিন রাখার নিয়ত করতে হয়। একদিন রোযা রাখলে এতে ইহুদিদের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। আর মুসলমানদের কাজ কর্ম স্বতন্ত্র্য হওয়া উচিত।

হাদীসে তাঁর অবদান

এ পুণ্যবর্তী মহিলা রাসূল (সা.) থেকে সাতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে অব্বাস ইবনে ওমর, জাবের, আবু আইয়ূব, মারাসী, তোফায়েল, মুজাহিদ, কুলছুম উবনে মুসতালিক, কুরাইব এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৪২৯]

ইন্তিকাল

মু'য়াবিয়ার শাসন আমলে ৬৫ বছর বয়সে হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) ইন্তিকাল করেন। সময়টা ছিল হিজরী ৫০ সনের রবিউল আউয়াল মাস। মদীনায় তৎকালীন গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

৪২৮. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১১৯
৪২৯. ইবন হাজার, Avj -Bmvev dx Zvgqxwhm mvnvev, বৈরুতঃ দার আল-ফিকর, ১৯৭৮, খ. ৪, পৃ. ২৬৬

৭.৯ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)

পরিচয়: নাম ও বংশ

তাঁর মূল নাম রামলা।[৪৩০] কারো কারো মতে হিন্দ আর ডাক নাম ছিল উম্মু হাবীবা।[৪৩১] পিতার নাম আবু সুফিয়ান। মাতার নাম সুফিয়া বিনতে আবুল আস। তার মা ওসমান (রা.) এর ফুফু ছিলেন। উম্মু হাবীবা নবুওয়্যাতের ১৭ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ তালিকা হলো রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে উমইয়া ইবনে আবদে শামস পিতামাতা উভয়েই কুরাইশ বংশের লোক ছিলেন। পিতা আবু সুফিয়ান তো ছিলেন ইসলামের প্রধান শত্রু এবং বিখ্যাত কুরাইশ নেতা। মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪৩২]

প্রথম বিবাহ

উম্মু হাবীবা মক্কার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের অন্যতম ছিলেন। যে করণে পিতা আবু সুফিয়ান গর্ব করে বলতেন, আমার কাছে রয়েছে সারা আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী (উম্মু হাবীবা)। আবু সুফিয়ান তাই অনেক খোজ খবর নিয়ে বনু আসাদ গোত্রের সুদর্শন পুরুষ ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে নিজ কন্যার বিয়ে দেন। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ খ্রিষ্টান ধর্মাবল্বী ছিলেন। তিনি উম্মূল মু'মিনীন যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) এর ভাই ছিলেন।[৪৩৩]

---

৪৩০. আল-বালাজুরী, Avbmvej Avkivd, মিশর: দারুল মা'য়ারিফ, খ. ১, পৃ. ৪৩৮; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫০
৪৩১. প্রাগুক্ত
৪৩২. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ দানাপুরী, আসাহুস সীয়ার, ঢাকা: কতুবখানা রাশিদীয়া, ১৯৯০, পৃ. ৬৪২
৪৩৩. ইবন কাসীর, Avj-we'vqv Iqvb wbnvqv, বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ, খ. ৪, পৃ. ১৪৩

ইসলাম গ্রহণ ও হাবাশায় হিযরত

নবুওয়াতের প্রথম যুগেই উম্মু হাবীবাহ ও স্বামী ওবায়দুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কায় কাফেরদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে স্বামী-স্ত্রী দু'জন হাবশায় হিজরত করেন। এ হাবশাতেই তাদের কন্যা হাবীবা জন্মগ্রহণ করেন। এ হাবীবাহ নামেই তাঁকে উম্মু হাবীবা বলা হয় এবং এ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে আছেন।[৪৩৪]

প্রথম স্বামীর মৃত্যুবরণ

মক্কা থেকে হাবশাতে আসার পর স্বামী ওবায়দুল্লাহ এর ভিতর ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। ইসলাম গ্রহণের আগে স্বামী ওবায়দুল্লাহ ছিলো প্রচন্ড মদ্যপায়ী। মদ নিষিদ্ধ হলে অন্যান্যদের মতো সেও তা ত্যাগ করেন। কিন্তু হাবশায় আশার পর ওবায়দুল্লহ আবার মদপানে আসক্ত হয়ে পড়ে। উম্মু হাবীবা স্ত্রী হিসেবে তাকে ফিরানোর এ পথ থেকে প্রাণপন চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এক রাতে উম্মু হাবীবা তাঁর স্বামীকে বিভৎস অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন। এরপর তিনি স্বামীকে ভয় দেখিয়ে সাবধান করার চেষ্টা করেন কিন্তু উল্টো ওবায়দুল্লাহ তাঁকে বলেন, উম্মু হাবীবা! ধর্মের ব্যাপারে বুঝেছি, খ্রিষ্টানদের ধর্মের চেয়ে উত্তম ধর্ম আর নেই। আমি ইতোপূর্বে মুসলমান হলেও এখন পুনরায় আবার খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছি। এর পর উম্মু হাবীবা তাঁকে বহুবার বুঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুই হলো না। সে খ্রিষ্টান হয়ে যায় এবং একদিন মাত্রাতিরিক্ত মদপানে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪৩৫]

৪৩৪. আল-বালাজুরী, Avbmve j Avkivd, মিশরঃ দারুল মা'য়ারিফ, খ. ১, পৃ. ৪৩৮; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫১-৮৫২
৪৩৫. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫১-৮৫২

হাবাশয় নিঃস্ব উম্মু হাবীবা

স্বামী ওবায়দুল্লাহর মৃত্যুর পর থেকে উম্মু হাবীবা সম্পূর্ণ নি:সঙ্গ হয়ে যান এবং মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকেন। এ সংবাদ রাসূল (সা.) এর কাছে পৌছল ইসলামের জন্য উম্মু হাবীবার ত্যাগের কথা চিন্তা করে তিনি উম্মু হাবীবা (রা.) কে বিবাহ করার চিন্তা করেন।[৪৩৬]

উম্মু হাবীবা (রা.) কে মহানবী (সা.) এর বিয়ের প্রস্তাব

মহানবী (সা.) সব দিক বিবেচনা করে বিয়ের প্রস্তাবসহ আমর ইবনে উমাইয়া যাসিরীকে হাবাশায় বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে পাঠান। বাদশাহ নাজ্জাশী নিজের দাসী আবরাহার মাধ্যমে এ প্রস্তাব উম্মু হাবীবার কাছে পৌছান। প্রস্তাব শুনে উম্মু হাবীবা (রা.) এতই খুশী হন যে তিনি আবরাহাকে দু'টি রূপার চুরি, পায়ের দু'টি মল এবং দু'টি রূপার আংটি উপহার দেন। এ বিয়েতে উম্মু হাবীবার পক্ষ থেকে খালিদ ইবনে সাঈদকে উকিল দেয়া হয়।[৪৩৭]

বাদশাহ নাজ্জাসীর তত্ত্বাবধানে বিবাহ সম্পন্ন

বাদশাহ নাজ্জাশী সন্ধ্যায় স্থানীয় সকল মুসলমানকে ডেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। বাদশাহ নিজে নবীজী (সা.) এর পক্ষ থেকে মোহরানা হিসেবে ৪০০ দিরহাম বা দীনার আদায় করেন। এরপর বাদশাহ নাজ্জাশী নিজেই বিয়ে পড়ান। এই বিয়েতে কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[৪৩৮]

হিজরী ৬ষ্ট অথবা ৭ম সালে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে। বিয়ের সময় উম্মু হাবীবা (রা.) এর বয়স হয়েছিল ৩৬/৩৭ বছর। বিয়ের পর উম্মু হাবীবা জাহাজ যোগে মদীনার উদ্দেশ্য রওয়ানা হন।

---

৪৩৬. ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, বৈরুত: দারু সাদির, খ. ৮, পৃ. ৯৮-৯৯
৪৩৭. ইবন কাসীর, Avj-we'vqv Iqvb wbnvqv, বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ, খ. ৪, পৃ. ১৪৩
৪৩৮. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ৪২৭; ইবনে হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২২

বিয়ে করার কারণ

অনেকের মতে রাসূল (সা.) উম্মু হাবীবাকে মূলত দু'টো কারণে বিয়ে করেছিলেন। প্রথমত, স্বামীর মৃত্যুর পর বাচ্চা নিয়ে উম্মু হাবীবা প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। তার কষ্ট ছিল ইসলামের প্রতি মহব্বতের কারণে। তিনি স্বামীর মতোই পুনরায় খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং স্বামীর এ ধরনের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন। দ্বিতীয়, আবু সুফিয়ান ছিলেন সে সময়ের কুরাইশ নেতা যিনি আবু জেহেলের মৃত্যুর পর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। নবুওয়াতের সে প্রথম দিন থেকেই আবু সুফিয়ান রাসূল (সা.) ও মুসলমানদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করে আসছে। বিয়ের পরে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের সাথে শত্রুতার জের কমিয়ে দেয় এবং মক্কা বিজয়ের দিনে সে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

বিয়ের তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল

ইসলাম ও মুসলমানদের এ জাত শত্রুরই কন্যা ছিলেন উম্মু হাবীবা (রা.) এ জন্য রাসূল (সা.) রাজনৈতিক কারণে সূদুর প্রসারী চিন্তা ভাবনা করেই উম্মু হাবীবাকে বিয়ে করেন। ঐতিহাসিক ফলও পাওয়া যায়। আবু সুফিয়ান ক্রমে নরম হতে থাকেন এবং মক্কা বিজয়ের দিনে সদলবলে ইসলাম কবুল করেন।

উম্মু হাবীবা (রা.) এর ঈমানের বলিষ্ঠতা

চরিত্র মাধুর্যে উম্মু হাবীবা (রা.) ছিলেন নেককার ও বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী। তিনি ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে কারো সাথে কোন ধরনের সমঝোতা করতে বা সামান্য দুর্বলতা দেখাতেও রাজি ছিলেন না। এর প্রমান তো আমরা তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ যখন পুনরায় খ্রিষ্টান হন তখনই পেয়েছি।

অন্যদিকে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান একবার মদীনায় আসেন হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়সীমা বাড়ানোর জন্যে। তিনি ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন যে তার কন্যা উম্মু হাবীবা (রা.) কে দিয়েই রাসূল (সা.) এর কাছে প্রস্তাব পেশ করবেন, যাতে সহজেই তা পাশ হয়। এ উদ্দেশ্য তিনি উম্মু হাবীবার গৃহে পদার্পন করেন। একদা আবু সুফিয়ান যখন মেয়ের গৃহে প্রবেশ করে বিছানায় বসতে যান তখন উম্মু হাবীবা (রা.) তা উল্টে দেন। ঘটনার আকস্মিকতায় আবু সুফিয়ান খুব আপমানবোধ করেন এবং বলেন, তুমি এ বিছানায় নিজের পিতাকে বসতে দিবে না। উম্মু হাবীবা (রা.) বললেন, একজন মুশরিক রাসূল (সা.) এর বিছানায় বসুক অবশ্যই আমি তা পছন্দ করি না। কন্যার কথা শুনে আবু সুফিয়ান ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তুমি আমার বিরুদ্ধে খুব বেশি বিগড়ে গেছো।[৪৩৯]

তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান ইন্তিকাল করলে তিন দিন পর তিনি খোশবু চেয়ে নিয়ে হাতে মুখে মাখেন এবং বলেন, ঈমানদার নারীর জন্য তিন দিনের বেশি শোক করা জায়েয নেই, অবশ্য স্বামী ছাড়া। স্ত্রীর শোক করার মেয়াদ হচ্ছে চার মাস দশ দিন। নবীজী (সা.) কে একথা বলতে না শুনলে এ ব্যাপারে আমার কোনো খবরই হতো না।

৪৩৯. তাবাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৯,১০০; ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৯-১০০; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫৩-৮৫৪

হাদীসে তাঁর অবদান

উম্মু হাবীবা (রা.) রাসূল (সা.) থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে তা বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ৬৫ টি হাদীস বর্ণিত হয়ছে। এর মধ্যে দু'টি মুত্তাফিকুন আলাইহি এবং দু'টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উতবা,সালেম ইবনে সেওয়ার হাবীবা, মুয়াবিয়া, আবু সুফিয়ান,আবদুল্লাহ বিন ওৎবা, সালিম বিন সাওয়াব, আবুল জিরাহ, যয়নব বিনতে আবু সালামা, সুফিয়া বিনতে সায়বা, ওরওয়া বিন যুবায়ের, শাহার বিন হাওশাব, আবু সালেহ আসা, সামান প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তিকাল

হিজরী ৪৪ সালে ৭৩ বছর বয়সে উম্মু হাবীবা (রা.) ইন্তিকাল করেন। মদীনায় তাঁকে দাফন করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় জানা যায় তাঁকে হযরত আলীর গৃহে দাফন করা হয়। এর প্রমান হলো জয়নুল আবেদীন (রা.) তাঁর গৃহে খননকালে একটি শিলা লিপি পান তাতে লেখা ছিল এটা রামলা বিনতে সাখারের কবর।[৪৪০]উল্লেখ্য, রামালা তার আসাল নাম ছিল যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৪০ আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২০

৭.১০ হযরত সফিয়্যা (রা.)

পরিচয়: নাম ও বংশ

তাঁর মূল নাম যয়নব। তবে তিনি পরিচিতি হন সফিয়্যা নামে। আরবের প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টনের সময় যে উত্তম মাল দলপতির জন্য রাখা হতো তাকে সফিয়্যা বলা হতো। খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত সকল কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন যয়নব। শেষ পর্যন্ত এ যয়নবকে রাসূল (সা.) এর ভাগে দেয়া হয়। এজন্য তাঁকে সাফিয়্যা বলা হয়। আর এ জন্য তিনি প্রসিদ্ধ হন। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) তাঁকে বিবাহ করে উম্মুল মুমিনীনদের মর্যাদা দান করেন। তাঁর বংশ তালিকা হল- যয়নব বিনতে হুওয়াই ইবনে আখতাব ইবনে সাঈদ ইবনে আমের ইবনে ওবাইদ ইবনে কাআব ইবনে খাযরাজ ইবনে আবু হাবীব ইবনে নুছাইর ইবনে মাইখুম। তাঁর মায়ের নাম ছিল াররা বিনতে সামওয়ান। এ সামওয়ান ইয়াহুদিদের সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্র বনু করাইযার নেতা ছিলেন। হযরত সাফিয়্যার পিতা হুওয়াই ছিলেন হারুন ইবনে ইমরান (আ) এর অধস্তন পুরুষ।[৪৪১]

বীরত্বপূর্ণ পরিবারের মেয়ে

হযরত সফিয়্যা (রা.) এর আব্বা ও দাদা উভয়ই ছিলেন তৎকালীন ইয়াহুদি জাতীর সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ। সে কারণে বনী ইসরাঈলের সমস্ত আরবীয় গোত্রের মধ্যে তাদেরকে আলাদা রকম সম্মান করা হতো। বিশেষ করে বাবা হুওয়াই ইবনে আখতাবকে মর্যাদার শীর্ষে স্থান দেয়া হয়েছিল। ইয়াহুদীরা বিনা বাক্যে তার নেতৃত্বে মেনে চলত। তার নানা সামওয়ান মান-মর্যাদা, শৌর্য-বীর্য এবং বীরত্বের দিক দিয়ে সারা জাযিরাতুল আরবে ছিলেন সম্মানিত ও গর্বিত।[৪৪২]

---

৪৪১. ইবন সাদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১২৫; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫৪
৪৪২. ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Avŏjvg Avb-bevjv, বৈরুত: আল-মুত্তয়ামমাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করন ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ২৩১

প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহ

সফিয়্যা (রা.) এর প্রথম বিয়ে হয় আরবের প্রখ্যাত কবি ও নেতা সালাম ইবনে মিশকাল আল কারাবীর সাথে । প্রথম দিকে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়; কিন্তু পরবর্তীতে মনোমালিন্য ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ফলে সফিয়্যা (রা.) পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। এর পর কেনানা ইবনে আবুল আফীক এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। আবুল আফীক ছিলেন খায়বারের নামকরা দুর্গ আল কামুদ এ সর্দার। এর সময় তাঁর বয়স ছিল সতের বছর।

ইয়াহুদিদের পরাজয় ও বন্দী দশায় সফিয়্যা

খায়বর যুদ্ধে হযরত সফিয়্যার পিতা ও চাচা আবু ইয়াসির রাসূল (সা.) এর চরম শত্রু ছিল। তারা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে চতুর্থ হিজরীতে খায়বারে গিয়ে কিনানা ইবনে আল রাবীর সাথে বসবাস করতে থাকেন। এখানে বসেই হুওয়াই ইবনে আখতাব মুসলমানদের ক্ষতি করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে থাকেন। পরবর্তীতে রাসূল (সা.) এর নেতৃত্বে খায়বার অভিযানকালে মুসলামদের হাতে আলকামুস দুর্গের পতন ঘটে। যুদ্ধে ইয়াহুদীদের চুড়ান্ত পরাজয় ঘটে। বহু নেতৃস্থানীয় ইয়াহুদি মৃত্যুবরণ করে। কেনানা ইবনে আবুল আফীক দুর্গের অভ্যন্তরে নিহত হয়। এমনকি তার পিতা হুওয়াই ইবনে আখতাবও নিহত হন। সফিয়্যা (রা.) পরিবার-পরিজনের অন্যান্য সদস্যের সাথে বন্দী হন।[৪৪৩]

৪৪৩. ইবনুল আসীর, Dm‘ j Mvev dx gwi dwZm mvnvev, বৈরুতঃ দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-‘আরবী, খ. ৫, পৃ. ৪৯০; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫৫-৮৫৬

হযরত সফিয়্যা (রা.) বন্দীনী হিসেবে মুসলিম শিবিরে আসার পর আরবের নিয়ম অনুযায়ী সাহাবী দাহইয়া কলবীর আবেদন মোতাবেক তাঁকে তাঁর ভাগে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি তাঁর মর্যাদার দিক বিবেচানা করে সাহাবী দাহইয়া কালবীর ঘরে যেতে অস্বীকার করেন। এ সময় কতিপয় সাহাবী আরজ করেন যে হে আল্লাহর রাসূল! সফিয়্যা (রা.) বনু কুরাইযা এবং বনু নজীরের মহিলা। এ নেতৃস্থানীয়া মহিলাকে দাহিয়ার হস্তে বাদী হিসেবে সমর্পন করলেন? তাঁর মর্যাদাতো অনেক উচুঁতে আসীন। তিনি আমাদের নেতার জন্যই যথাপোযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের আবেদন কবুল করলেন এবং দাহইয়া কালবীকে অন্য একজন পরিচারিকা দান করলেন। সফিয়্যা (রা.) কে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিলেন।[৪৪৪]

রাসূল (সা.) এর নিকট হযরত সফিয়্যার আশ্রয় চাওয়া

সফিয়্যা কোথায় যেতে রাজি হলেন না। তিনি রাসূল (সা.) এর কাছে বিনীত আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! খায়বার যুদ্ধে আমার পিতা ও আমর স্বামী নিহত হয়েছে। আমার নিকটতম আত্নীয়-স্বজনরাও প্রাণ হারিয়েছে। আর আমি ইয়াহুদী ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছি। বর্তমানে আমার ইয়াহুদী আত্নীয়স্বজন যারা বেঁচে আছে তাদের কেউ আমাকে আশ্রয় দেবে না এবং গ্রহণও করবে না। এ আশ্রয়হীন অবস্থায় আমি কোথায় যাবো? কে আমার এ অসহায় অবস্থার সহায়ক হবে? কে আমাকে স্থান দেবে? ইয়া রাসূল (সা.)! আমি আর কোথাও যাবো না। আমি আপনার অন্তপুরে একজন দাসী হয়ে থাকতে চাই। আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন।[৪৪৫]

---

৪৪৪. mnxn gmwjg, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৩৬৫; Ave ‘vD‘, হাদীস নং-২৯৯৭; ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, বৈরুতঃ দারু সাদির, খ. ৮, পৃ. ১২২

৪৪৫. আল ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ AvÕjvg Avb-bevjv, বৈরুতঃ আল-মুওয়ামমাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করন ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ২৩৫

মহানবী (সা.) এর সাথে বিবাহের আকাঙ্খা

খায়বার যুদ্ধ বিজয়ের পর সফিয়্যা (রা.) বন্দী হয়ে আসলে এ সময় তাঁকে রাসূল (সা.) জিজ্ঞাস করলেন, আমার ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ আছে কী? তিনি উত্তরে বললেন, শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার সময় আমি এ আশা পোষণ করতাম। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আল্লাহ আমাকে আপনার সহচার্য লাভের যে সুযোগ দিয়েছেন সে সুযোগ আমি কীভাবে হারাতে পারি। অন্য বর্ণনায় আছে যে সফিয়্যা (রা.) যখন রাসূল (সা.) নিকট আসলেন তখন তিনি বললেন তোমার পিতা ইহুদী ছিলেন যে আমার প্রতি শত্রুতা পোষন করত। অবশেষে আল্লাহ তাকে নিহত করলেন। তখন সফিয়্যা (রা.) বললেন, হে আল্লাহ রাসূল! আল্লাহ তার কিতাবে বলেছেন-

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"একজনের (পাপের) বোঝা অন্যের ওপর চাপানো হবে না।"[৪৪৬]

হযরত সফিয়্যা (রা.) কে বিবাহের কারণ

বিভিন্ন করণে রাসূল (সা.) সফিয়্যা (রা.) কে বিবাহ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নরুপ:

১. তাঁর শোকাহত হৃদয়কে শান্ত করা ও তাঁকে দ্বীন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য রাসূল (সা.) বিবাহ করেন বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।
২. এ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে বনু নাযীর ও বনু কুরায়জার বিরোধিতা ও শত্রুতা হ্রাসকরণ এবং প্রশমনের অভিপ্রায়ে রাসূল (সা.) সফিয়্যা (রা.) কে বিবাহ করেন বলে অনেকে ধারণা করেন।

৪৪৬. আল-কুরআন-৬:১৬৪;১৭:১৫;৩৫:১৮;৩৯:৭;৫৩:৩৮

৩. হযরত সফিয়্যা (রা.) এর যথাযথ সম্মান বজায় রাখা এবং এ নজীর বিহীন ইহসানের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইহুদি সম্প্রদায় আল্লাহ দ্রোহিতার হাত থেকে ফিরে এসে ইসলাম কবুল করতে অনুপ্রাণিত হয়।

রাসূল (সা.) এর সাথে বিয়ে

সবদিক বিবেচনা করে রাসূল (সা.) সফিয়্যা (রা.) এর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং খায়বর থেকে মদীনায় ফেরার পথে যাবাহা নামক স্থানে তাঁকে বিবাহ করলেন। এটা ছিল হিজরী সপ্তম সালে মহরম মাসের শেষ সপ্তাহে। এ বিয়েতে অলিমা অনুষ্ঠানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[৪৪৭] এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, ইয়াহুদি রমনী সফিয়্যা (রা.) খায়বারের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মুসলমানরা বন্দী হিসেবে এনেছিল। তাঁকেও রাসূল (সা.) উদারতার সাথে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুরোধে তাঁকে স্ত্রীত্বে বরণ করেছিলেন। বিয়ের ফলে আশ্রয়হীনা সফিয়্যা (রা.) সুন্দর ও সর্বোত্তম আশ্রয় লাভ করেন। এ বিয়ের ফলে ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কিছুটা প্রশমন হয়। এমনকি ধীরে ধীরে ইয়াহুদিদের অনেকেই ইসলাম কবুল করেন।

স্বভাব, প্রকৃতি ও আচার ব্যবহার

হযরত সফিয়্যা (রা.) ছিলেন ধীরস্থির মেজাজের চমৎকার একজন মহিলা। জনৈক দাসী অভিযোগ করলেন, তাঁর মধ্যে এখনও ইয়াহুদির গন্ধ পাওয়া যায়। কারণ সে এখনো শনিবারকে ভালোবাসে। এছাড়া ইয়াহুদিদের সাথে এখনও তাঁর সম্পর্ক আছে। ওমর (রা.) যখন অন্য লোকের মাধ্যমে বিষয়টি যাচাই করত চান, তখন তিনি বলেন, শনিবারের পরিবর্তে আল্লাহ যখন শুক্রবার

৪৪৭. *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৮৭; আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৫

দিয়েছেন তখন আর শনিবারকে ভালোবাসার কোন দরকার নেই। ইয়াহুদিদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে বলেন, ইয়াহুদির সাথে আমার আত্নীয়তার সম্পর্ক। আত্নীয়তার প্রতি আমার লক্ষ্য রাখতে হয়। অতঃপর দাসীকে ডেকে জিজ্ঞাস করেন তোমাকে এ ব্যাপারে কে উদ্ধুদ্ধ করেছে? সে বলল, শয়তান। এটা শুনে সফিয়্যা (রা.) চুপ থাকেন এবং দাসীকে মুক্ত করেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার সফিয়্যা (রা.) এর স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন, সফিয়্যা (রা.) ছিলেন বুদ্ধিমতি, মর্যাদাশীল এবং ধৈর্যের অধিকারী। আল্লামা ইবনে কাসির লিখেছেন. রাসূল (সা.) এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। রাসূল (সা.) সফিয়্যা (রা.) কে খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও অসুন্তুষ্টির খোজ-খরব রাখতেন।[৪৪৮]

সতিনদের মধ্যে সাময়িক দ্বন্দ

একদা সফর কালীন সময়ে সাফিয়্যা (রা.) এর উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ সময়ে যয়নাব (রা.) এর সাথে একটি অতিরিক্ত উট ছিল। তাই রাসূল (সা.) যয়নাবকে বললেন, যয়নব! তোমার অতিরিক্ত উটটি সফিয়্যা (রা.) কে সাহায্যের জন্য দাও। যয়নব বললেন, এ ইয়াহুদির মেয়েকে আমি উট দেবো না। এ কথায় রাসূল (সা.) খুবই রাগ করলেন এবং একাধারে দুইমাস যয়নব (রা.) সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখেন। পরবর্তীতে আয়েশা (রা.) মধ্যস্থতায় এর পরিসমাপ্তি ঘটে। আরেকদিন রাসূল (সা.) গৃহে ফিরে দেখলেন সাফিয়্যা (রা.) কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন, আয়েশা এবং যয়নব বলেছেন, আমরা রাসূল (সা.) স্ত্রী এবং বংশ গৌরবের দিক থেকে এক রক্তধারার অধিকারী। সুতরাং আমরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। রাসূল (সা.) বললেন, তুমি কেন বললে

৪৪৮. ইমাম আজ-জাহাবী, wmqvi æ Av۟jvg Avb-bevjv, বৈরুতঃ আল-মুওয়ামমাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করন ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ২৩৫

না, আমি আল্লাহর নবী হারুনের বংশধর ও মুসার ভ্রাতুস্পুত্রী এবং রাসূল (সা.) আমার স্বামী। অতএব, তোমরা কোন দিক থেকে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পারো?[৪৪৯]

ইন্তিকাল

৬০ বছর বয়সে হিজরী ৫০ সালে পবিত্র মদীনাতে হযরত সাফিয়া (রা.) ইন্তিকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তাঁর ভাগিনাকে দেয়া হয়। বাকী সম্পত্তি গরীব মিসকিনদের মাঝে বন্টন করা হয়।[৪৫০]

৪৪৯. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৩৫,১৩৬
৪৫০. নিয়ায ফতেহপুরী, mvnvweqvZ, করাচী: নাফীস একাডেমী, ৩য় সংস্করন, ১৯৬২, পৃ. ১০৫

৭.১১ হযরত মায়মুনা (রা.)

পরিচয়: নাম ও বংশ

পূর্বে তাঁর নাম ছিল বাররা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর স্ত্রী হওয়ার পর নাম রাখা হয় মায়মুনা। তাঁর পিতার নাম হারেস এবং মাতার নাম হিন্দ বিনতে আউফ।[৪৫১] হযরত মায়মুনা ছিলেন কুরাইশ বংশের হাওয়াজিন গোত্রের হারেসের কন্যা। যিনি সা'আশা'আ নামক এলাকায় বসবাস করতেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন রাসূল (সা.) এর চাচা আব্বাস (রা.) এর শালিকা এবং বিশ্ববিখ্যাত সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের খালা। অন্যদিকে তিনি উম্মুল ফজল লুবাবাতুশ সুবরার বোন ছিলেন।

প্রথম বিবাহ ও দ্বিতীয় বিবাহ

মাছউদ বিন আমর বিন উমায়ের সাকাফীর সাথে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হওয়াতে মাছউদ মায়মুনা (রা.) কে তালাক দেন। পরে আবু রহম ইবনে আবদুল্লাহ এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। এ আবু রহম সপ্তম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে মায়মুনা সম্পূর্ণ নি:সঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁর দুলা ভাই আব্বাস (রা.) উদ্যোগী হয়ে রাসূল (সা.) এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। ইসলামের ভবিষ্যত চিন্তা করে রাসূল (সা.) একান্ন বছরের বয়স্কা বৃদ্ধা মায়মুনা (রা.) কে বিয়ে করতে রাজি হন।[৪৫২]

রাসূল (সা.) এর সাথে তাঁর বিবাহ

---

৪৫১. আল-বালাজুরী, Avbmve j Avkivd, মিশর: দারুল মা'য়ারিফ খ. ১, পৃ. ১৪৪; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫৮
৪৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫

৭ম হিজরী সালে যিলক্বদ মাসের হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুসারে রাসূল (সা.) কাযা ওমরাহ পালন করার উদ্দেশ্য মক্কায় রওয়ানা হন। এ সময়ে জাফর ইবনে আবু তালিবকে মায়মুনার কাছে বিয়ের পয়গাম দিয়ে পাঠনো হয়। এ বিয়েতে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে উকিল নিযুক্ত হন।[৪৫৩] রাসূল (সা.) ওমরার উদ্দেশ্য যে ইহরাম বাধেন সেই অবস্থায় এই বিয়ে সম্পন্ন হয়।[৪৫৪] আব্বাস (রা.) এ বিয়ে পড়ান। ওমরা পালন শেষে মদীনায় ফেরার পথে "সরফ" নামক স্থানে এই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এই বিয়ের মহরানা ধার্য করা হয় ৫০০ দিরহাম।[৪৫৫]

বিয়ের ফলে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়

এ বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আব্বাস ও খালীদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেননি। মূলত এ বিয়ের ফলেই এ দু'জন বিশাল ব্যক্তিত্ব ইসলাম কবুল করেন এবং এতে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়। আসলে এ বিয়ের প্রভাব ছিল সূদুরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেন: মায়মুনা (রা.) কে রাসূল (সা.) মক্কায় বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছিলেন তার আত্নীয় ও ৫০ এর উর্ধ্বে ছিল তাঁর বয়স। এ বিয়ে শুধু মাত্র আত্নীয়তার অবলম্বন হিসেবে কাজ করেনি; অধিকন্তু এর ফলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যথা ইবনে আব্বাস ও খালিদ বিন ওয়ালিদ। অনেকের ধারণা রাসূল (সা.) মায়মুনা (রা.) কে বিয়ে না করলে খালিদ বিন ওয়ালিদ হয়তবা ইসলামের ছায়তলে আশ্রয় গ্রহণ করতেন না। সুতরাং একথা নির্দিধায় বলা যায় যে, এ বিয়ে ইসলামে ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছিল।[৪৫৬]

৪৫৩. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩২-১৩৩
৪৫৪. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৯
৪৫৫. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭২
৪৫৬. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ ২০১; আল্লামা শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫৮-৮৫৯

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র, মাধুর্য ও আচার ব্যবহার

হযরত মায়মুনা (রা.) অত্যন্ত পরহেযগার ছিলেন। তিনি আল্লাহর ভয়ে সর্বদা কম্পিত থাকতেন এবং কান্নাকাটি করতেন। তিনি ছোটখাটো আদেশ নিষেধকে সমান গুরুত্ব দিতেন। একবার এক মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মানত করল যে, সুস্থ হলে বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে সালাত আদায় করবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রোগ থেকে করলে মানত পুরা করার উদ্দেশ্য বায়তুল মোকাদ্দাস গমনের জন্য মায়মুনা (রা.) এর নিকট বিদায় নিতে আসে। মায়মুনা (রা.) তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে অন্যান্য মসজিদে সালাত আদায়ের চেয়ে মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ের সওয়াব হাজার গুণ বেশি। তুমি এখানে থেকেই মসজিদে নববীতে সালাত আদায় কর।[৪৫৭] তার সর্ম্পকে আয়েশা (রা.) বলেন, মায়মুনা ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয়কারী এবং আত্নীয়তার সর্ম্পকের প্রতি সবচেয়ে বেশি যত্নবান।[৪৫৮] একাবার তাঁর এক আত্নীয় বেড়াতে আসেন। কিন্তু তাঁর মুখে মদের গন্ধ আসছিল। তাই মায়মুনা (রা.) ক্ষেপে গিয়ে বললেন, ভবিষ্যত আর কখনো আমার কাছে এ অবস্থায় আসবে না।[৪৫৯]

হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান

হাদীস চর্চায় হযরত মায়মুনা (রা.) এর অবদান মোটেই কম নয়। ইবনুজ জওযী (রা.) এর মতে হযরত মায়মুনা (রা.) থেকে ৭৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে ১৩টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার থেকে বর্ণিত হাদীস পুনরুক্তিসহ বুখারীতে ২১টি, মুসলিম শরীফে ১৮টি, তিরমিযীতে ৪টি, আবু দাউদে ১৫টি, নাসাঈতে ২৬টি এবং ইবনে

৪৫৭. ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj Keiv, বৈরুতঃ দারু সাদির, খ. ৮, পৃ. ১৩৯
৪৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
৪৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

সাজাহতে ১১টি সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, আব্দুর রহমান ইবনে সায়েব প্রমূখ সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৬০]

ইন্তিকাল

তিনি হিজরী ৬১ সালে "সরফ" নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। উল্লেখ্য, যে সরফে তাঁর বিয়ে হয়েছিল সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এটা তাঁর জীবনে এক স্বরণীয় ঘটনা। ওফাতের সময় তিনি তাঁর সতিনদ্বয় আশেয়া (রা.) ও উম্মু সালামা (রা.) কে ডেকে বলেন, সাধারণত সতীনদের মধ্যে যা হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে আমাদের মধ্যেও হয়ত সেরকম হয়ে যেতো। আমি এ ব্যাপারে লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে ক্ষমা করে তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করেছি। এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, তুমি আমাকে খুশী করেছো, আল্লাহ তোমায় খুশি করুক। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁর জানাযা পড়ান। তিনি তাঁর লাশ কবরে নামিয়েছিলেন। লাশ বহনের সময়ে আবদুল্লাহ বলেছিলেন, সাবধান! এটা উম্মুল মু'মিনীনের লাশ । বেয়াদবী করো না। এমন কি তোমারা নড়াচড়া করো না। খুব যত্নসহকারে বহন করো।[৪৬১]

৪৬০. আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Av`jvg Avb-bevjv, বৈরুতঃ আল-মুওয়াসসাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ৪১৩
৪৬১. ইবন সা'দ, AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, বৈরুতঃ দারু সাদির, খ. ৮, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

৭.১২ হযরত রায়হানা (রা.)

পরিচয়: নাম ও বংশ

তাঁর মূল নাম রায়হানা। পিতার নাম শামউন। তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ইয়াহুদি বনু নাযীর গোত্রের মেয়ে। তাঁর বংশ তালিকা হল রায়হানা বিনতে শামউন ইবনে যায়েদ। অন্য মতে রায়হানা বিনতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে খানাফা ইবনে শামউন ইবনে যায়েদ।[৪৬২]

প্রথম বিবাহ, বিধবা ও বন্দীদশায় হযরত রায়হানা (রা.)

জানা যায়, তাঁর প্রথম বিবাহ হয় বনু কুরাইজা গোত্রের হাকামের সাথে। এর অল্প কিছুদিন পর হাকামের মৃত্যু হয়। ষষ্ঠ হিজরী সনে যখন মুসলমানরা বনু নাযির ও বনু কুরাইজা গোত্রের সব কিছু দখল করে নেয় তখন রায়হানাকে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে আনা হয়। এরপর কিছুদিন তাঁকে কায়েসের কন্যা উম্মু মুনফিরের কাছে রাখা হয়।[৪৬৩]

হযরত রায়হানা (রা.) কে বিয়ে করতে রাসূল (সা.) এর ইচ্ছা প্রকাশ

মহানবী (সা.) এর বিদ্রোহী ইয়াহুদি গোত্রগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হযরত রায়হানা (রা.) কে আশ্রয় দিতে ও বিয়ে করতে মনস্থ করেন এবং তাঁকে বলেন তুমি আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) কে গ্রহণ করলে আমি তোমাকে আমার জন্য উপযুক্ত মনে করি। রায়হানা বিনতে শামউন রাসূল (সা.) এর প্রস্তাব আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। হযরত রায়হানা (রা.) নিজের ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূল (সা.) এর সাথে তাঁর বিবাহের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন যা ইবনে সা'দ স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আমার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে আলাদা করে দেন এবং তাঁর

৪৬২. ইবন কাসির, Avm-mxivn Avb-bveweq¨vn, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, খ. ৯, পৃ. ১৫৯
৪৬৩. ইউনুফ আল-কানধালুবী, nvqvZm mvnvev, দিমাশক, দারুল কালাম, ২য় সংস্করন ১৯৮৩, খ. ৫, পৃ. ১৪৯

অন্যান্য স্ত্রীগণের ন্যায় একটি ঘরেই আমাদের বাসর হয়। তিনি অন্যান্য স্ত্রীর ন্যায় সমভাবে পালা বন্টন অনুযায়ী আমার ঘরে আগমন করতেন এবং আমার উপর পর্দার হুকুম আরোপ করেন।[৪৬৪]

অপর এক বর্ণনা মতে প্রথমত তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি অস্বীকার করেন। এতে রাসূল (সা.) মনোক্ষুন্ন হন। অতপর তিনি একদিন সাহাবীদের নিয়ে তিনি বসে আছেন। তখন পিছন হতে জুতার আওয়াজ শুনে তিনি বললেন ছালবা ইবনে শুভা রায়হানা ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। অতপর ঠিকই তিনি এসে রাসূল (সা.) কে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দিলেন। অপর আরেক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে স্বাধীন করে বিবাহ করেন।[৪৬৫]

আচার-ব্যবহার ও চরিত্র-মাধুর্য

হযরত রায়হানা (রা.) ছিলেন অপরূপ সুন্দরী এবং অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার ও পুত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি যা চাইতেন রাসূল (সা.) তাঁকে প্রদান করতেন। ফলে রাসূল (সা.) তাঁকে দাসত্বের জীবন থেকে মুক্ত করে ৪০০ দিরহাম মোহরানা প্রদান করে বিয়ে করেন।[৪৬৬]

বিবাহের ফলাফল

ইবনে সা'আদের বর্ণনা মতে, হিজরী ৬ষ্ট সালের মুহরাম মাসে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বিয়ের ফলে ইয়াহুদি গোত্রের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের চমৎকার উন্নতি হয়। উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৪৬৪. ইবন আসাকির, AvZ-ZvixL Avj Kvexi, শামঃ মাতবায়াতুশ শাম, ১৩২৯ হি., খ. ৩, পৃ. ১২১
৪৬৫. প্রাগুক্ত
৪৬৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইন্তিকাল

রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের দশ মাস পূর্বে হযরত রায়হানা (রা.) ইন্তিকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়

৭.১৩ হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)

মিসরের বাদশাহের শুভেচ্ছা উপহার

ইতিহাস খ্যাত হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হওয়ার পর রাসূল (সা.) পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের রাজা বাদশাহের কাছে দূত মারফত ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। এ চিঠির প্রেক্ষিতে মিসরের খ্রিষ্টান বাদশাহ মুকাওকিস সৌহার্দ্র ও শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরুপ আপন চাচাত বোন মারিয়া কিবতিয়া (রা.) কে রাষ্ট্রীয় পর্যাপ্ত উপঢৌকনসহ তৎকালীন প্রথানুসারে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান রাসূল (সা.) এর দরবারে উপহার স্বরুপ পাঠান।[৪৬৭]

মারিয়া কিবতীয়া ইসলাম গ্রহণ ও রাসূলের সাথে তাঁর বিবাহ

উপঢৌকন স্বরুপ প্রেরিত মহিলার সংখ্যা ছিল চারজন। ইবনে কাছীরের বর্ণনা মতে সম্ভবত অপর দুই মহিলা মারিয়া ভাগ্নীদ্বয়ের খাদিমা স্বরুপ ছিলেন। এ উপঢৌকনের সাথে মাবুর নামক একজন খোজা দাস এবং দুলদুল নামক সাদা রঙের একটি খচ্চর ও কিছু কাপড় প্রেরণ করা হয় রাসূল (সা.) এর দুত হাতিব ইবনে আবী বালতার মাধ্যমে । হাতিব (রা.) তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলে মারিয়া ভগ্নীদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মাবুর পরে মদীনায় রাসূল (সা.) এর হাতে ইসলাম কবুল করেন।[৪৬৮]

রাসূল (সা.) আর্ন্তজাতিক রাজনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এ উপহার ও উপঢৌকন গ্রহন করেন। এ সকল উপঢৌকন পাওয়ার পর সর্বপ্রথম রাসূল (সা.) মারিয়ার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ

---

৪৬৭. আল-বালাজুরী, *আনশাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২-১০৩; আল্লামা শিবলী নু'মানী, *সীরাতুন নবী*, (অনু. এ.কে.এম. ফজলুর রহমান মুন্‌শী), ঢাকা: দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮, খ. ২, পৃ. ৮৬০

৪৬৮. প্রাগুক্ত

করেন। মারিয়া আনন্দের সাথে এ দাওয়াত কবুল করে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মারিয়ার সম্মতিতে সম্পূর্ণ ইসলামী বিধান মোতাবেক রাসূল (সা.) তাঁকে বিয়ে করেন। এভাবে মিসরের রাষ্ট্র প্রধান মুকাওকিসের উপহারের সঠিক মূল্যায়ন করেন।[৪৬৯]

সন্তান ইব্রাহিমের জন্মদান

মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে রাসূল (সা.) এর অন্যতম সন্তান ইব্রাহিম। আওয়ালী নামক স্থানে হিজরী ৮ম সালে তাঁর জন্ম হয়। এখানেই হযরত মারিয়া (রা.) বাস করতেন। এখানে ইব্রাহিমের জন্ম হওয়ার কারণে স্থানটি মাশরাবাই ইব্রাহিম নামে পরিচিত লাভ করে। ইব্রাহিমের জন্মকালে ধাত্রী নিযুক্ত ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী আবু রাফের পত্নী বিবি সালমা। তিনি যখন রাসূল (সা.) এর দরবারে হাজির হয়ে পুত্র সন্তান হওয়ার শুভ সংবাদটি দেন তখন রাসূল (সা.) খুশি হয়ে তাঁকে একজন গোলাম দান করেন। ইব্রাহীমের জন্মের সংবাদে রাসূল (সা.) খুব খুশি হন। সাতদিনের মাথায় তাঁর আকীকা দেয়া হয় এবং মাথা মুড়িয়ে চুলের ওজন পরিমানে রূপা গরীবদের মাঝে দেয়া হয়। হযরত ইব্রাহিম (আ:) এর নামে তাঁর নাম করা হয় ইব্রাহীম।[৪৭০]

পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু

সতের বা আঠারো মাস বয়সের সময়ে ইব্রাহীম ধাত্রী মাতা খওলার গৃহে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রাসূল (সা.) সাহাবী আবদুর রহমানসহ সেখানে ছুটে আসেন। হাত বাড়িয়ে মৃত ইব্রাহীমকে কোলে তুলে নেন। আর তখন রাসূল (সা.) এর দুচোখ দিয়ে বাধ ভাঙ্গা পানির জোয়ার আসছিল। আবদুর রহমান আরজ করলেন, ইয়া রাসূল (সা.) আপনার অবস্থা এমন কেন?

---

৪৬৯. প্রাগুক্ত

৪৭০. আলহাজ্জ মাওলানা এ,কে,এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, ((ek be((i ‘((¤úZ¨ R((eb, ঢাকা: তাজ পাবলিশিং হাউস, পৃ. ১৭৯

রাসূল (সা.) বলেন আজ আমার অপত্য স্নেহ অশ্রু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে। ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন ঘটনাক্রমে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সকলে বলাবলি করতে লাগল যে রাসূল (সা.) এর পুত্র মারা গেছে বলেই আজ সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তারা বলতে লাগল যে আকাশ শোকাহত হয়ে পড়েছে। সে জন্যই দুনিয়ায় বিদঘুটে অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু বিশ্ব সংস্কারক রাসূল (সা.) যখন এ সংবাদ শুনলেন তখনই তিনি এ কুসংস্কারের মূল উৎপাটন করার জন্য সকলকে ডেকে বললেন, সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহন হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন। কারো জীবনে ও মরণের সাথে এগুলোর কোনই যোগাযোগ নেই। সুতরাং গ্রহণ লাগা বা না লাগার পেছনে করো মৃত্যুর কোনো মিল নেই।[৪৭১]

নবীজী (সা.) এর মৃত্যুর পর মারিয়া কিবতীয়া (রা.) এর প্রতি ইসলামের প্রথম দু'খলিফার দায়িত্ব পালন

খলিফা আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) মারিয়া (রা.) কে অত্যন্ত সম্মাান করতেন। রাসূল (সা.) এর ইন্তিকালের পর তাঁরা তাঁর প্রতি সাহায্যোর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি মারিয়া কিবতিয়া (রা.) এর মৃত্যুর পর তাঁর আত্নীয় স্বাজনের প্রতি উক্ত দু'জন খলিফা সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য সহাযোগিতা করেছেন।

ইন্তিকাল

পুত্র ইব্রাহীম এর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর মারিয়া কিবতিয়া (রা.) ইন্তিকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

৪৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

অষ্টম অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বহু বিবাহ: তাৎপর্য বিশ্লেষণ

অত্যন্ত দু:খজনক হলেও সত্য যে অনেকে রালূলুল্লাহ (সা.) এর বহুবিবাহ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাই তাদের ভিত্তিহীন সমালোচনার মুখোশ উম্মোচন এবং সঠিক তত্ত্ব প্রকাশের তাগিদে আমরা বলতে চাই যে, অধিক বিবাহ রাসূল (সা.) এর চরিত্র মাধুর্য, দয়া-মায়া, উদারতা, ধৈর্য-সহ্য, শিষ্টাচার, মহত্ব এবং নবুওয়্যাতের উৎকর্ষতার পরিচায়ক। মুয়াল্লিামা মোরশেদা বেগম তার সম্পাদিত *রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন* বইটিতে মহানবী (সা.) এর বহু বিবাহের বেশ কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন যার মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কারণ তুলে ধরা হলো।

১. যৌবনের পচিশতম বয়সে টগবগে যুবক বিশ্বনবী (সা.) সমাজের কাছে নির্মল ও পবিত্র চরিত্রের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। যৌবনের তাড়নায় উদভ্রান্ত হয়েছেন, অপকর্মে সাড়া দিয়েছেন, এমনকি কোন মহিলার প্রতি এরুপ মন মানসিকতা নিয়ে ভ্রুক্ষেপ করেছেন, তার ঘোরতর শত্রুরাও তাঁর প্রতি এমন দোষারোপ করতে সাহস করেনি। ৪০ বছর বয়সের মহিলা খাদীজা (রা.) কে বিবাহ করেন, তাও নিজের ইচ্ছে নয়, বরং খাদীজার (রা.) প্রস্তাবে। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর।[৪৭২] যৌবনের পুরো সময় গোটা যৌবনকাল এরুপ এক বয়স্কা মহিলাকে নিয়েই কাটিয়ে দেন, আর কোন বিবাহ করেননি হযরত খাদিজা (রা.) এর জীবদ্দশায়। তাঁর ৫০ বছর বয়সের সময় ৬৫ বছর বয়স্কা স্ত্রী

৪৭২. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এইচ এম মজতবা হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, ঢাকা: ইসলামিক রির্সাচ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, পৃ. ২১২; আল-ইমাম আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম*, কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হি., খ. ১, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

খাদীজার (রা.) এর মৃত্যু হয়।[৪৭৩] যদি তিনি নারী ভোগের কামনায় উদ্বেলিত স্বভাবের হতেন, তাহলে এ দীর্ঘ সময় আরো দু' চারটি বিবাহ করে নিতেন। কারণ আরবের সেরা সুন্দরীরা তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন। খাদীজা (রা.) এর আগেও আরো দুটি বিবাহ হয়েছিল।[৪৭৪] রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানিবক কারণেই তাঁকে বিবাহ করেন। ২৫ বছর বয়সে একজন বয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করে যৌবনের পুরো সময় তাঁকে নিয়ে কাটিয়ে দেয়া সমালোচনাকারীদের অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় কি? যাদের অন্তর ব্যধিমুক্ত, যারা ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারক, যারা শুভবুদ্ধির অধিকারী, তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। খাদীজা (রা.) এর মৃত্যুর পর অবশ্যই তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন। কিন্তু কেন করেছেন, কোন প্রয়োজনে করেছেন, এ ব্যাপারে সমালোচনাকারীদের চোখ অন্ধ হলেও বুদ্ধিজীবী এবং সঠিক পর্যালোচনাকারীদের চোখ অন্ধ নয়; কেননা তারা জানেন মুহাম্মদ (সা.) নারী কামুকতার জন্যে বহু বিবাহ করেননি বরং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনে বহু বিবাহ করেছিলেন।

২. হযরত খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর পর বিশ্বনবী (সা.) সাওদা (রা.) এর মতো একজন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন। ইসলামের প্রথম আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার জালেম কাফেরদের নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে স্বামী সুকরান মৃত্যুবরণ করলে বৃদ্ধা এ মহিলার জীবনে নেমে আসে চরম নৈরাশ্য ও হতাশা।[৪৭৫] মোটা স্বাস্থ্যের অধিকারী ও অনুভূতিহীন এ বিধবাকে কে বিবাহ করবে? তাঁকে কে আশ্রয় দেবে? কারও প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই। হাবশায় হিজরতকারী দু:খী বিধবা বৃদ্ধা মহিলাকে বিবাহ করে তাঁর প্রতি করুণা এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করা বিশ্বনবীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। কারণ এমন কোন মানবের পক্ষে

---

৪৭৩. ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়া*, হায়দ্রাবাদ: দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩৫৭ হি., খ. ২, পৃ. ৩; আল-ইমাম আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম*, কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হি., খ. ১, পৃ. ১৪০;
৪৭৪. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৭
৪৭৫. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৯-৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব নয় যে নিজের বয়সের চেয়ে ৪ বছরের বড় বা সমান এবং মোটা নারীকে বিবাহ করে জীবন কাটানো। এখানে তাঁর কামুকতার লেশমাত্র ছিল না। যদি তিনি কামুক হতেন তবে নি:সন্দেহে যুবতী আকর্ষণীয় কোন রমণীকে বিবাহ করতেন যা বয়স্কা সাওদা (রা.) এর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল।[৪৭৬]

৩. স্ত্রীগণের মধ্যে কেবল আয়েশা (রা.) ই ছিলেন কুমারী। মহান আল্লাহর ইশারাতেই এ বিবাহের কাজ সম্পাদিত হয়। তখন আয়েশা (রা.) এর বয়স ছিল ৬/৭ বছর, আর রাসূল (সা.) এর বয়স ছিল ৫২ বছর। আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর মতো একজন নি:স্বার্থ কর্মীর মন জয় করার এটি অন্যতম কারণ। তাঁর সাথে বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করার তাগিদে এ বিবাহ ছিল একটি উপযুক্ত উপায় এবং পদক্ষেপ। আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী একজন নির্ভিক মুসলিম। সততা, সরলতা ও শিষ্টাচারিতার কারণে আরব সমাজে একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশেষ ব্যাক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে মূল্যায়ন করা হতো। তিনি হলেন ইসলাম এবং ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জানমাল কুরবানকারী প্রধান ব্যক্তিত্ব। তাঁর কন্যা ব্যতীত কে বিশ্বনবীর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদার অধিকারীনী হতে পারে? তিনি ব্যতীত কে হতে পারে উম্মুল মু'মিনীনের শিরোপার অধিকারী? এ বিবাহের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট সম্পর্ক এবং আনুগত্যের ফলে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ভূমিকা তাঁকে মুসলিম উম্মার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং নবীর প্রধান খলীফার মর্যাদার সমাসীন করেছে। এ বিবাহ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ইশারাতে হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে বিবাহ হওয়ার আগেই হযরত জিব্রাঈল (আ) হযরত আয়শা (রা.) এর ছবি হুজুর (সা.) কে দেখিয়ে বলেছিলেন, ইনি দুনিয়া ও আখেরাতের আপনার স্ত্রী।[৪৭৭]

৪৭৬. আহমদ মনসুর, *বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা)*, ঢাকা: তাসনিম পাবলিকেন্সস, ১৯৯৫, পৃ. ২৬১
৪৭৭. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-৪১,১২৮,১৬১; ইমাম বুখারী (রা) বিভিন্ন অধ্যায়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪২৮; আত-তিরমিযী, হাদীন নং ৩৮৮০

সুতারাং এখানে কামুকতার প্রশ্ন আবন্তর। মহানবী (সা.) যদি প্রকৃত অর্থে কামুকই হতেন তাহলে তিনি হযরত আয়শা (রা.) এর চেয়ে অনেক সুন্দরী রমনীকে বিবাহ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

৪. হযরত উমর (রা.) এর কন্যা হাফসা (রা.) কে বিবাহ করার কারণ হচ্ছে তাঁর প্রথম স্বামী খুনাইস ইবনে হুযাইফা ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করায় হযরত হাফসা (রা.) অসহায় হয়ে পড়েন। অপরদিকে বিধবা হাফসার চিন্তাগ্রস্ত পিতা ওমর (রা.) স্বীয় কন্যার আশ্রয় খুজে আবু বকর এবং ওসমানের কাছে বিবাহ প্রস্তাব করেন। সেখান থেকে ব্যর্থ হওয়ার পর অধিকারচিত্তে রাসূল (সা.) এর মহান দরবারে শরণাপন্ন হন। এমনকি আবু বকর এবং ওসমানের মতো প্রাণপ্রিয় বন্ধুদের অসম্মতি প্রকাশের অসহনীয় বেদনার কথাও বিশ্বনবীর গোচরীভূত করেন। এ মুহুর্তে রাসূল (সা.) ওমর (রা.) কে সান্তনা দিয়ে বলেন: হাফসাকে তাদের তুলনায় উত্তম ব্যক্তি বিবাহ করবে।[৪৭৮] ওমর (রা.) কে সান্ত্বনা প্রদান মুসলিম উম্মার শ্রেষ্টতম দু'জন মহামানবের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি এবং হিজরতকারী বিধবা হাফসার প্রতি আন্তরিকতা প্রর্দশনের তাগিদে এ বিবাহ যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ ছিল তা সহজেই বুঝা যায়। এই বিবাহের সময় মহানবী (সা.) এর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। সুতরাং এই বিবাহের পিছনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কামুকতার প্রশ্ন ছিল বলে যারা অপপ্রচার ও অপবাদে লিপ্ত তাঁরা যে কত বড় মিথ্যার জগতে বাস করে তা কোন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে এই বিবাহের কথা হযরত উমর (রা.) কল্পনাও করেননি যা মহান আল্লাহ তায়ালা বাস্তবায়িত করে হযরত উমর (রা.) এর সাথে মহানবী (সা.) এর আত্নীয়তার বন্ধনকে আর সুদৃঢ় করে তোলেন।

---

৪৭৮. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ আল বুখারী*, হাদিস নং-১৫২,১৫৩; ইমাম আহমেদ, ইবনে সাদ, ইমাম বুখারী, নাসাঈ বায়হাকী প্রমূখ মহাদ্দিস হযরত হাফসা (রা) এর বিয়ে সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫. হযরত হাফসা (সা.) এর মত হযরত যয়নাব বিনতে খুযাইমা (রা.) ও ছিলেন একজন শহীদের বিধবা স্ত্রী। সহায়- সম্বল বলতে তাঁর কোন কিছুই ছিল না। তাঁর প্রথম স্বামী উবায়দা ইবনে হারিছ বদরের যুদ্ধ সূচনাকারী তিন জনের একজন ছিলেন। বদরের যুদ্ধে আহত হয়ে উবায়দা (রা.) শাহাদাত বরণ করার পর অসহায় নি:স্ব ও সহায় সম্বলহীন বিধবা মহিলাকে আশ্রয় হিসেবে রাসূল (সা.) বিবাহ করেন।[৪৭৯] কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পর রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৪৮০]সুতারাং ভোগ-লালসা ও কামুকতার প্রশ্নটি এখানে আবন্তর।

৬. একইভাবে রাসূল (সা.) উম্মু সালামা (রা.) এর মত আরেকজন অসহায়, নি:স্ব ও শহীদের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। উম্মু সালামা (রা.) এর প্রথম স্বামী আবু সালামা রাসূল (সা.) এর দুধ ভাই ছিলেন। স্ত্রীকে নিয়ে হাবশা এবং মদীনায় হিজরত করেন।[৪৮১] আবু সালামা বদর এবং ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ওহুদের যুদ্ধে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।[৪৮২] দু'দুটি হিযরতের পর স্বামীর শাহাদাত বরণের কারণে উম্মু সালামা (রা.) অসহায় এবং দু:খ-কষ্টের চরম সীমায় উপনীত হন। রাসূল (সা.) এর চাচাতো এবং দুধ ভাই আবু সালামার ইয়াতীম সন্তানাদির প্রতি সহানুভূতি প্রর্দশন করে দুধ ভাইয়ের হক আদায় করা রাসূল (সা.) এর জন্য একান্ত কর্তব্য ছিল। উম্মু সালামা (রা.) ছিলেন উঁচু খান্দান এবং সম্মানী বংশের মহিলা। ইসলাম ও মুসলমানের জন্য তার অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানী ছিল। স্বামীর মৃত্যুর কারণে ৪ জন ইয়াতীম সন্তানাদির লালন-পালনের কষ্টে একাকী জীবন যাপন দুরুহ হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় এ বিবাহ তাঁর প্রতি বিশ্বনবীর

৪৭৯. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৯
৪৮০. মহানবী (সা) এর সাথে বিবাহের পর ২/৩ মাস জীবিত ছিলেন এই মহিয়সী নারী। এ মত সমর্থন করেন সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা- এর গ্রন্থাকার ইমাম আয-যাহাবী, খ. ২, পৃ. ২১৮; আর ঐতিহাসিক বালাজুরীর মতে নবীজী (সা) এর সাথে ৮ মাস ঘর-সংসার করার পর ৪র্থ হিজরী সনে তিনি মারা যান। (আনসাবুল আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৪২৯)
৪৮১. ইউসুফ আল-কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৮
৪৮২. সহীহ মুসলিম: কিতাবুল জানায়িয হাদীস নং ৯১৯, আবু দাউদ: আল- জানায়িয, হাদীস নং ৩৩১৫; তিরমিযী: আল- জানায়িয, হাদীস নং ৯৭৭

সহানুভূতি বৈ অন্য কিছু নয়। এই বিবাহ পরোক্ষভাবে আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে সংঘটিত হয়েছিল।

৭. জাহেলী যুগের একটি মারাত্মক কুসংস্কারকে দূর করার জন্যে নবী করীম (সা.)-এর আপন ফুফাতো বোন তালাকপ্রাপ্তা যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) কে বিবাহ করেন। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় রাসূল (সা.) এর অত্যন্ত প্রিয় গোলাম পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেছার সাথে। এ বিবাহ নিয়ে পাশ্চাত্যের পন্ডিতরা সবচেয়ে বেশী বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কামুক ও ভোগ-লিপ্সু বলে নানারুপ অপবাদ প্রদান করে। এ বিবাহের মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত না করে তারা অযথাই মুহাম্মদ (সা.) কে গালি দেয়। উল্লেখ্য, এ বিবাহের মূল কারণ ছিল জাহেলী যুগের কু প্রথার মূলোৎপাটন করা।[৪৮৩] কেননা সে যুগে পালক পুত্রকে আপন পুত্র মনে করা হতো এবং পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পালক পিতার জন্য বিবাহ করা হারাম মনে করা হতো।[৪৮৪] এ কুপ্রথার মুলোৎপাটনের জন্যই এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ নির্দেশে।[৪৮৫] এ বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে নবীজী (সা.) এর ইতস্ততা ছিল। আর এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কিছুটা তিরস্কারও করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ নির্দেশে এই বিবাহ কার্যকর হয়। কাজেই মুহাম্মদ (সা.) এর জন্যে সে ক্ষেত্রে বিবাহ না করার অন্য কোন সুযোগ ছিল না। যারা এ সকল পটভূমি না বুঝে অযথাই মুহাম্মদ (সা.) কে দোষারপ করে তারা নি:সন্দেহে নিন্দনীয় অপরাধ করেছে। কোন মুমিনই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশকে অমান্য করতে পারে না। কেননা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশকে অমান্য

---

৪৮৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, খ. ৫, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৩; আহমদ মনসুর, *বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২

৪৮৪. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ এইচ এস মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স): সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮৩

৪৮৫. কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন “ অতঃপর যায়িদ যখন তার নিকট হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিলো তখন আমরা তালাক প্রাপ্তা যয়নাব কে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম যেন নিজেদের মুখে ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে।” আল-কুরআন, ৩৩:৩৭

করা যায় না। কেননা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার অর্থই হল আল্লাহ তায়ালাকে সরাসরি অস্বীকার করা। সুতরাং মুহাম্মদ (সা.) কে যারা কামুক ও ভোগলিপ্সু বলে তারা সরাসরি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশকেই অমান্য ও উপেক্ষা করে ভয়াবহ শাস্তির জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছে। এ বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে রাসূল (সা.) এর ইতস্তত ছিলো।

৮. রাসূল (সা.) বনু মুসতালিকের মহিলা জুওয়াইরিয়া (রা.) কে আযাদ করে তাঁকে বিবাহ করেন।[৪৮৬] তার পিতা গোত্রের প্রধান ছিলেন। কাজেই বিবাহের মাধ্যমে ঐ গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার তাগিদেই এ বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়। ফলে সাহাবায়ে কিরাম রাসূল (সা.) এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্বরুপ বিনা শর্তে এবং বিনিময় গ্রহণ করা ব্যতীত বনু মুসতালিকের সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করে দেন।[৪৮৭] পরবর্তীতে তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বস্তুত: এ বিবাহ ছিল বনু মুসতালিকের জন্য বিরাট রহমত ও বরকতস্বরুপ এবং সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য একটি শিক্ষনীয় আদর্শ। এ বিবাহের মধ্যে মহানবী (সা.)-এর স্বগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। একটি চির শত্রু গোত্রের সাথে বিবাহরে মাধ্যমে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাকে যদি কেউ ভোগ লিপ্সার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে তবে তা হবে চরম উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও একপেশে অপবাদ।

৯. রাসূল (সা.) আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবিবা (রা.) কে বিবাহ করেন। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে। উম্মু হাবিবা তাঁর প্রথম স্বামীর সাথে হাবশায় হিযরত করেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ সেখানে মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৮৮] হাবশা থেকে আসার পর দু:খিনী বিধবা মহিলার প্রতি সমবেদনা এবং সম্মান স্বরুপ মক্কার কাফেরদের অবিস্মরণীয় নেতা আবু সুফিয়ানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনে এ বিবাহ ছিল

৪৮৬. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১১৬; ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৪-২৯৫
৪৮৭. *আবু দাউদ*, কিতাবুল ইতাক, হাদীস নং ১০৫
৪৮৮. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৮

খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকারান্তরে এ বিবাহের কারণে রাসূল (সা.) এর প্রতি তার শত্রুতার চেতনা শিথিল হয়ে পড়ে, আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় এবং ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।[৪৮৯] বরং তার অন্তরে লুকায়িত অনুভূতির ফল মক্কা বিজয়ের সুপ্রভাতে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের সুরতে প্রকাশ পায়। তার ইসলাম গ্রহণ মক্কার হাজার হাজার কাফেরদের জন্য ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম করে। তিনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের বীর মুজাহিদ ও একনিষ্ট নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্নমুখী অভিযান ও রণকৌশলে এবং বুদ্ধি পরামর্শের জন্য যেমন ছিলেন তিনি বিশ্বনবীর লক্ষ্যের পাত্র, তেমনি ছিলেন সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের জন্য বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু। তিনি এবং তাঁর অনুগত্যকারী সকলেই ইয়ারমুক ও শামসহ বিভিন্ন যুদ্ধ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে এই বিবাহের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) গভীর রাজনৈতিক দূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং নবীজী (সা.) এর উপর ভোগ-লিপ্সার অপবাদ আরোপ করা নিত্যন্তই আবন্তর এবং এর সাথে কামুকতার প্রশ্নটি যুক্ত করা নিতান্ত হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই নয়।

১০. ইয়াহুদীদের ঐতিহাসিক নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা খায়বারের যুদ্ধে বন্দীকৃত সাফিয়্যা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলে রাসূল (সা.) তাঁকে আযাদ করে বিবাহ করেন।[৪৯০] ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব এবং ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তাদেরকে ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্টকরণের জন্য এ বিবাহ ছিল অত্যন্ত উপকারী। তারা একজন নবীর শুভাগমনের কথা পবিত্র তাওরাত এবং ইঞ্জিলের সূত্রে অবহিত ছিলো। অবহিত ছিল বলেই গোপনে বিশ্বনবীর বিষয়ে সম্পূর্ণরুপে

৪৮৯. আহমদ মনসুর, *বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা)*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৩

৪৯০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৫৪৬; আস সহীহ আল বুখারী, হাদীস নং-৩৬০; আবু দাউদ, হাদীস নং-২০৫৪; তিরমিযী, হাদীস নং-১১১৫; নাসাঈ, হাদীস নং-১১৪

বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু পরশ্রীকতারতা ও শত্রুতা ছিল তাদের জন্য বাধা। এমতাবস্থায় সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ইয়াহুদীদের শত্রুতার আগুন নেভানো এবং ইসলামের প্রতি তাদের সমর্থন ও আনুগত্য আদায়ের কামনা বাসনার নিরিখে উক্ত বিবাহ ছিল অত্যন্ত ফলদায়ক উপায় ও কৌশল। সুতরাং এখানে কামুকতার প্রশ্নটি আবন্তর। এই বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বয়স ছিল ৫৮ বছর যখন কামুকতার স্পৃহা মানুষের স্তিমিত হয়ে আসে।

১১. রাসূলুল্লাহ (সা.) বিধবা মায়মুনা বিনতে হারিছকে বিবাহ করেন তাঁর অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে। তিনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, খালেদ ইবেন ওয়ালীদ এবং জাফর তাইয়্যাবের সন্তানাদির খালা। নবীজী (সা.) এর সাথে বিবাহ হওযার পূর্বে তাঁর দু'বার বিয়ে হয়েছিল। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হলে তিনি ২৬ বছর বয়সে বিধবা হন। যাহোক, হিজরী ৭ সনে কাজা ওমারা আদায় করে ফেরার পথে তানয়ীম নামক স্থানের নিকটবর্তী এলাকা 'ছারিফ' নামকস্থানে রাসূল (সা.) এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। একজন সম্মানী দু:খিনী বিধবা মহিলাকে আশ্রয় দেয়া এবং উম্মতের সামনে আদর্শ স্থাপন করাই ছিল বিশ্ব নবীর এ বিবাহের মূল উদ্দেশ্য।

হযরত মায়মুনা (রা.) কে বিবাহ করার সময় মহানবী (সা.) এর বয়স হয়েছিল ৫৯ বৎসর। আর হযরত মায়মুনা (রা.) এর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। এরুপ বয়সে মানুষের যৌন-কামনা বহুগুনে স্তিমিত হয়ে পড়ে। মানুষ এ সময়ে পার্থিব ভোগ লালসার উর্দ্ধে গমন করে। সুতরাং ভোগ লালসার কারণে ৫১ বছরের বৃদ্ধাকে মহানবী (সা.) বিবাহ করেছেন এরুপ অপবাদ প্রদান করা নিতান্তই হাস্যকর। অপরদিকে এই বিবাহের মাধ্যমে মহানবী (সা.) তাঁর এক নি:সঙ্গ অসহায় আত্নীয়াকে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন। এরুপ মানবতাপূর্ণ মহৎ কাজ বিশ্বের ইতিহাসে দুর্লভ। এরপর রাসূল (সা.) এর কাছে রায়হানা ও মারিয়া কিবতীয়া (রা.) হাদিয়া স্বরুপ এলে তাঁদেরকে প্রথমে দাস

হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁদের পছন্দ মোতাবেক ও আল্লাহর নির্দেশে তাঁদেরকে উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের অন্তর্ভূক্ত করেন।[৪৯১]

উল্লেখিত বিরবণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাসূল (সা.) মূলত কয়েকটি কারণে একাধিক বিবাহ করেছেন। কারণগুলো নিম্মরূপ-

১. **আসহায় ও নি:স্ব বিধবা মহিলাদের আশ্রয়দান:** আসলে ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হওয়ার ফলে ইসলামের সে প্রথমযুগেই অসহায় বিধবা মহিলাদের একটি লম্বা কাফেলা দাড়িয়ে যায়। যারা ছিলেন একান্তই অসহায়। কারণ মুসলামন হওয়ার কারণে তাঁদের আত্নীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে একটু আশ্রয় পর্যন্তও দিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) এ অসহায় বিধবা মুসলমান মহিলাদেরকে বিয়ে করার জন্য সাহাবীগণকে উৎসাহ দিতে থাকেন এবং নিজেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

২. **আত্নীয়তার সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য:** মহানবী (সা.) এর অনেকগুলো বিবাহ ছিল আত্নীয়তার সম্পর্ক বাড়ানোর জন্যে। যেমন হযরত হাফসা (রা.), হযরত আয়শা (রা.) ও হযরত মায়মুনা (রা.) তাদের প্রত্যেকের বিয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের পরিবার ও আত্নীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর করা। এভাবে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত আব্বাস (রা.) ও হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) এর সাথে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতার হয়েছিল।

৩. **পারিবারিক একান্ত বিষয়গুলোকে উম্মতকে জানানোর জন্য:** মহানবী (সা.) পুরুষদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো যেভাবে খোলামেলা জানাতে পারেন সেভাবে মহিলাদেরকে মহিলাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলো জানানো একটু কঠিনই ছিল। কিন্তু মহিলা সাহাবীগণ যদি উম্মুহাতুল মুমিনদের কাছে আসতেন তাহলে তাদের জিজ্ঞাসিত সকল

৪৯১. আবুল হাসান 'আলী নদবী, *আস সীরাতুন নববিয়্যা*, বৈরুত: দারুশ শরুক, ১৯৮৩, পৃ. ২৫৬

প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতেন। মহানবী (সা.) এর ইন্তিকালের বহু বছর পর পর্যন্ত নবী-পত্নীদের অনেকেই জীবিত ছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে নবীজী (সা.) এর শিক্ষা উমমাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এখনও জারী আছে।

৪. **পোষ্যপুত্রের স্ত্রী বিয়ে করা যায় এ বিধান চালু করার জন্য:** আরবের লোকেরা এক ধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো যে পালক পুত্রের তালাকা প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা যায় না। কেননা তাঁরা পালক পুত্রকে নিজ পুত্রের মতই মনে করত। এটা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অপছন্দনীয় ছিল। তিনি এ ধরনের কুসংস্কার দূর করার জন্যে পালক পুত্র হযরত যায়েদ (রা.) এর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যয়নাব (রা.) কে নবীজী (সা.) এর সাথে বিবাহের ব্যবস্থা করলেন।

৫. **মুখে ডাকা ভাইয়ের মেয়েও বিবাহ করা যায় তা বাস্তবায়ন করণার্থে:** মহানবী (সা.) কে হযরত আবু বকর (রা.) সবর্দা বড় ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে মনে করতেন। তাই হযরত আয়েশা (রা.) এর বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হলে তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলে বসলেন, এটা কি করে সম্ভব যে আমার মেয়ে আয়শাকে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে বিবহ দিব কেননা আমিতো তাকে ভাই বলে ডেকে থাকি। তখন মহানবী (সা.) তাঁকে জানালেন যে হযরত আবু বকর (রা.) তো আমার দ্বীনি ভাই সহদর ভাই নয়; কাজেই বিয়ের কাজ সম্পন্ন করতে এটা বাধা হবে না। এভাবে হযরত আয়শা (রা.) এর সাথে মহানবী (সা.) এর বিয়ের ফলে আরবে বিদ্যমান কুসংস্কার দূর হয়।

৬. **একান্তই ইসলামের স্বার্থে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে:** মহানবী (সা.) উম্মু সালামা (রা.), সফিয়্যা (রা.), মায়মুনা (রা.) ও মারিয়া কিবতীয়া (রা.) কে বিবাহ করেছিলেন ইসলামের স্বার্থে সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কুটনৈতিক সুবিধা আদায় করার জন্যে। যেমন উম্মু সালামা (রা.) কে বিয়ে করার পর আবু সুফিয়ান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে

এবং মক্কার কুরাইশ বংশের বাকী লোকেরাও তাঁর সাথে মক্কা বিজয়ের দিনে ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়। হযরত মায়মুনা (রা.) কে বিয়ের করার ফলে হযরত আব্বাস (রা.) ও খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইহুদী কন্যা রায়হানা (রা.) কে বিয়ের করার পর আরবের ইয়াহুদী গোত্রের সাথে মুসলমানদের একটি ভাল সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র অনেকাংশেই কমে যায়। আর মিশরের খ্রিষ্টান রাজা মুকাওসের শুভেচ্ছা মূলক পাঠানো উপহারের অংশ হিসেবে মারিয়া কিবতীয়া (রা.) কে গ্রহণ করেন। এর ফলে মিশর ও নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে একটি ভাল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. **সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশে সকল বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়:** নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মহানবী (সা.) কোন কাজই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ব্যতিরেখে করেননি। আল্লাহ তায়ালা যদি অনুমতি না দিতেন তাহলে মহানবী (সা.) এর পক্ষেও বহু বিবাহ করা সম্ভব হত না। তাই এ কথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, মহানবী (সা.) এর কোন বিবাহই আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া সংঘটিত হয় নি। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

“হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ত করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভাগ্নি, ফুফাতো ভাগ্নি, মামাতো ভাগ্নি ও খালাতো ভাগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিযরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমার্পন করে, নবী (সা.) তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল। এটা বিশেষকরে আপনারই জন্য অন্য মুমিনদের জন্য নয়।”[৪৯২] সুতরাং মহানবী (সা.) এ পর্যন্ত যা কিছু

৪৯২. আল-কুরআন, ৩৩:৫০

করেছেন তার সবকিছুতেই মহান আল্লাহ তায়ালার অনুমোদন ছিল। তিনি নিজের খেয়াল খুশিমত কোন কিছু করেন নি।

৮. **সাম্য-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে:** ইসলাম ধর্মে ছোট-বড়, দাস-প্রভু সবাই সমান। মানুষ মাত্রই মানুষের নিকট সমান মর্যাদার অধিকারী। এই নীতিকে বাস্তাবায়ন করে দেখানোর জন্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বহু বিবাহের অনুশীলন করছেন বলে অনেকে মনে করেন। হযরত সাফিয়্যা ও জুহাইরিয়া (রা.) দাসীরুপে নবীজী (সা.) এর গৃহে আগমন করেছিলেন। কিন্তু মানবতার ও সক্ষমতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁদেরকে স্ত্রীরুপে গ্রহণ করে হযরত আয়েশা, হাফসা, মায়মুনা (রা.) প্রমুখ অভিজাত পত্নীদের সম কাতারে এনেছিলেন।

৯. **নারীত্বের মর্যাদা দান:** জাহেলী আরব সমাজে নারীকে পশুর মত মূল্যায়ন করা হত। তাদেরকে মানুষের পর্যায় ভাবা হত না। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের দুর্গতির কোন শেষ ছিল না। এ কারণে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিধবা নারীদেরকে বিবাহ করে কুমারী নারীর সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে দুনিয়াবাসীর সামনে একটা উন্নত আদর্শ তুলে ধরেছেন। হযরত সাওদা, হযরত যায়নাব ও উম্মু সালামা (রা.) সহ আরও অনেককে এ কারণেই বিবাহ করেছিলেন বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়।

১০. **আদর্শের পূর্ণতা দান:** মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সারা বিশ্ব জাহানের জন্যে অনুকরণীয় ও অনুস্বরণীয় আদর্শ। তাঁর চরিত্র, আচার-আচারণ ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে মানব জীবনের করণীয় দিক সমূহ। বিধবাকে বিবাহ করে তার সাথে কেমন আচরন করা কিংবা নাবালেগ নারীকে বিবাহ করলে তার সাথে কেমন আচরণ করা অথবা দাসীকে আযাদ করে বিবাহ করলে সেক্ষেত্রে কেমন বিধান হওয়া উঠিত তা মহানবী (সা.) নিজে অনুশীলন করে জাগতবাসীকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। অন্যথায় জগতবাসী এ সকল ক্ষেত্রে কেমন আচরণ করবে তা জানার সুযোগ পেত না। তার কথা ও বাস্তব জীবনই বলে

দিয়েছে কুমারী, বিধবা ও দাসী স্ত্রী হলে সকলেই তখন সমান মর্যাদার অধিকারী হয় এবং তাদের মধ্যে বাহ্যিকভাবে কোন ধরনের পার্থক্য করতে নাই।

১১. উম্মতের জন্যে দ্বীনি শিক্ষাকে গতিশীল রাখতে: মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) কে ছোট বয়সে বিবাহ করেছিলেন। ছোট বয়সের কচি স্মরণ শক্তি দিয়ে হযরত আয়শা (রা.) মহানবী (সা.) এর যাবতীয় দ্বীনি বিধান সংরক্ষন করে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মাতে মুহাম্মাদী (সা.) এর জন্যে রেখে গেছেন। এভাবে মহানবী (সা.) এর ইন্তিকালের বহু বছর পর পর্যন্ত নবী পত্নীগণ মহানবী (সা.) এর বাণীগুলো সংরক্ষন করেছিলেন এবং সে সকল বাণীর আলোকে তাঁদের কাছে আগত সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

একটি বিষয় এখানে পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন যে চারের অধিক বিবাহ করা অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই রাসূল (সা.) এর এসব বিবাহ হয়েছিল। চারের অধিক বিবাহের বিষয়টি বিশ্বনবী (সা.) এবং তাঁর স্ত্রীগণের জন্য একান্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি বিষয়।[৪৯৩] এরুপ ব্যতিক্রমের আরো অনেক ব্যাপার রয়েছে। যেমন: তাঁর প্রতি বাধ্যতামূলক কিয়ামুল্লাইল, বিরতিহীন রোযা রাখা, তাঁর পরিবারের পক্ষে যাকাত-ফিতরা গ্রহণ করা হারাম, তাঁর কোন উত্তরাধিকারী না থাকা, নবীর স্ত্রীগণের প্রতি গুনাহের শাস্তি অধিক নির্ধারন করা, অধিক নেক আমল করার বাধ্যতামূলক নির্দেশ ইত্যাদি। এ সব কিছুই বিশ্বনবী এবং তাঁর স্ত্রীগণের একান্ত এবং ব্যতিক্রমী নির্দেশ।

পাশ্চাত্য বিশ্বের এবং পরশ্রীকাতর লোকদেরকে রাসূল (সা.) এর সমালোচনা করে এ কথা বলতে শোনা যায় যে তিনি ৫৩ বছর বয়সে অল্প বয়সের কুমারী মেয়ে আয়েশা (রা.) কে কিভাবে বিয়ে করতে পারেন? কিন্তু এদের এরুপ সমালোচনার কোন যৌক্তিক ভিত্তি আমরা খুজে পাইনা।

---

৪৯৩. পবিত্র কুরআনের (৩৩:৫০) সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াতের মাধ্যমে মহানবী (সা) কে এ ব্যতিক্রমের পর্যায়ে রাখা হয়েছে।

বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে স্বয়ং জিবরাঈল (আ:) রেশমের সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আয়েশা (রা.) কে রাসূল (সা.) এর সামনে হাজির করে বলেছিলেন যে, এ মহিলা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য আপনার স্ত্রী।[৪৯৪] এ বিবাহের ব্যবস্থাপনায় আছেন একজন ফেরেশতা, ওহীপ্রাপ্ত নবী এবং নবীর পরম বন্ধু, ছাওর পাহাড়ের সাথী, পবিত্র কুরআনের ভাষায় শ্রেষ্টতম মানব আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম। আর আয়েশা (রা.) হচ্ছেন উম্মুল মু'মিনীন তথা সমকালীন মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহিলা। যাদের কাছে পিতৃতুল্য বয়সের স্বামীর সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্কার বিবাহ অযৌক্তিক এবং অশোভনীয় মনে হয় তাদের একথাও বিবেচনা করা উচিত যে এখানে কোন রহস্য এবং স্বতন্ত্র কোন কিছু থাকতে পারে।

মহানবী (সা.) আয়েশার সাথে এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন যে আয়েশা (রা.) বয়সে ছোট একথা তিনি কখনও বুঝতে পারতেন না। আর বয়সের কারণে ব্যবহারের তারতম্য না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ তিনি আল্লাহর প্রিয় এবং দয়ালু নবী ছিলেন। পবিত্রতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট এবং আল্লাহ প্রদত্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠার প্রতীক। তিনি নবী হিসেবে যেমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি স্বামী হিসেবে এবং পরিবারের জন্যও ছিলেন শ্রেষ্ঠ । প্রকারান্তরে এ বিবাহ তাঁর রিসালাত এবং নবুওয়্যাতের জন্য ছিল উজ্জ্বল প্রমাণ।

রাসূল (সা.) এর সাথে জীবন যাপনকালে আয়েশা (রা.) কখনও ভাবতেও পারেননি যে, তিনি বস্তুজগতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আয়েশা (রা.) যেমন ছিলেন কুমারী ও সুন্দরী

৪৯৪. ইমাম বুখারী (র.) বিভিন্ন অধ্যায়ে উপরোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-২৪২৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৪১, ১২৮, ১৬১

তেমনি আল্লাহ তাঁর নবীকে অতি সুন্দর এবং যৌবন শক্তিতে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন। যৌবন শক্তি, যৌন প্রক্রিয়া এবং জীবন পরিক্রমায় তাঁর কোন নজীর যুবকদের মধ্যেও ছিল না। তাছাড়া তাঁর প্রতি সদা সর্বদা অহী নাযিল হতো। নবী হিসেবে রাসূল (সা.) শারীরিক শক্তির প্রশ্নে বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইচ্ছে করলে একই রাতে সমস্ত স্ত্রীগণের সাথে মিলিত হতে এবং তাদের হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারতেন যা কোন সাধারণ লোকের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। রুপ সৌন্দর্যের প্রশ্নে রাসূল (সা.) এর কোন তুলনা ছিল না। এমনকি ইউসুফ (আ) এর তুলনায়ও তিনি অধিক রুপ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। কোন কোন সময় তা প্রকাশও পেয়ে যেত। সাহাবী বারা (রা.) বলেন রাসূল (সা.) মধ্যম আকারের লোক ছিলেন। একদিন (পাহাড়ে কাজ করা) লাল রংয়ের পোশাক পরিহিত অবস্থায় রাসূল (সা.) কে দেখেছি। এমন লোক আর আমি কোনদিন দেখিনি এবং শুনিওনি।

মহানবী (সা.) এর সাথে বিবাহের কারণে আয়েশা (রা.) যে পদমর্যাদার অধিকারী হন কোন বিবেক বুদ্ধির অধিকারী মহিলা তার আকাঙ্খী না হয়ে পারে না। এ বিবাহের কারণেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ দুনিয়ার বুকেই লাভ করেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রশংসার বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। সুরা নূরের প্রায় এগারোটি আয়াাতে তার চারিত্রিক পবিত্রতা এবং উৎকর্ষতার কথা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন।[৪৯৫] এ গভীর তত্ত্ব এবং রহস্যময় প্রত্যেকটি ঘটনাই মুসলিম উম্মাহ এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পবিত্র সমাজ গড়ে তোলার জন্য এর প্রত্যেকটি নিদর্শনই সীমাহীন গুরুত্ব রাখে।

৪৯৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: আল-কুরআন, ২৪: ১১-২১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা ও নাযিলের প্রেক্ষাপট।

হযরত আয়েশা (রা.) বিশ্বনবীর জীবদ্দশাতেই বিশিষ্ট ফকীহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অসংখ্য মাসআলা-মাসায়েল তিনি রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে জেনে নেন। ফলে সমকালীন এবং পরবর্তী যুগে নারী সমাজের অগণিত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্যে তিনি নবীর সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছিলেন।

সারা বিশ্বের লোকেরা বিশেষ করে মহিলারা রাসূল (সা.) এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাতের পর মদীনায় সমবেত হতেন। আর তিনি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার হুকুম আহকাম এবং রাসূল (সা.) এর সুন্নাতের তরবিয়াত করতেন। তাঁর নির্দেশিত মাসআলা-মাসায়েল এবং বর্ণিত হাদীসসমূহ ফিকাহের কিতাবসমূহে আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ তাঁর দ্বারা সীমাহীন উপকৃত হয়ে চলেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামও তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন। রাসূল (সা.) এর গভীর এবং রহস্যময় তত্ত্ব তাঁর ইবাদত, সালাত, সিয়াম, হজ্ব, ওমরা, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিরাগিতা, দ্বীনতা, হীনতা, মুনাজাত, কান্নাকাটি, যুদ্ধ, সন্ধি, ভেতর-বাইর মোটকথা রাসূল (সা.) এর আদর্শ জীবনের বিস্তারিত বিষয়াদি উম্মতের কাছে পৌছানোর তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মাধ্যম এবং সূত্র। যাদের আয়েশা (রা.) এর জীবনী সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান আছে তারা নি:সন্দেহে একথা বলতে বাধ্য যে বিশ্বনবীর আদর্শ জীবনকে সুসংরক্ষিত করে সঠিক ও সুন্দরভাবে উম্মতের কাছে পৌছনোর জন্য আল্লাহ তায়ালা হযরত আয়েশা (রা.) কে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবেই আদায় করেছেন।

উল্লেখ্য আয়েশা (রা.) এর বিবাহ আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর জীবনেও বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এ বিবাহরে বরকতে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর ঈমানী শক্তি, রাসূল (সা.) এর

সাথে বন্ধুত্বের বন্ধন, সিদ্দীকী মাকাম, আত্নীয়তার সম্পর্ক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সুদৃঢ় হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তে বিশ্বনবী (সা.) এর সাহাবায়ে কিরাম অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম জাতিকে আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর মর্যাদা, উম্মাতের প্রতি তাঁর ইহসান, অবদান এবং কুরবানীর কথা উল্লেখ করে নিদর্শন স্বরুপ নির্দেশ দেন-"মসজিদের দিকের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দাও, কেবল আবু বকরের দরজা খুলে রাখ"।[৪৯৬] রাসূল (সা.) এর এ অসিয়তের কারণে আজও আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর সে দরজা খোলা আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। তাঁকে রাসূল (সা.) "সিদ্দীক" খেতাবে ভূষিত করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বিশ্ব মুসলিম নারী সমাজরে জন্য এক অবিস্মরণীয় আদর্শ। তিনি ১৯ বছর বয়সে বিধবা হন এবং ৬৭ বছর পর্যন্ত একাকী জীবন যাপন করেন। বিশ্বনবীর অন্যান্য স্ত্রীর মতো আয়েশা (রা.) এর বিবাহও উম্মাতের ওপর হারাম করে দেয়া হয়। যৌবনের এই দীর্ঘ সময়ে তিনি পাক পবিত্রতা, শিষ্টাচারিতা, সংযমশীলতা, দূরদর্শীতা, ধৈর্যশীলতা এবং আল্লাহ ভীরুতার পরিচয় দেন। কোনদিন তিনি স্বামীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। রাসূল (সা.) এর স্ত্রী হিসেবে অর্জিত সম্মান মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখেন এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে নবীর স্ত্রীর মর্যাদা লাভের গৌরবকে অগ্রাধিকার দেন। যে সমস্ত নারী যৌবনকালে বিধবা হয়ে যান এবং মৃত স্বামীর স্মরণে তার ইয়াতীম সন্তান সন্ততির লালন পালনের তাগিদে অথবা তাকদীরের ফয়সালার কারণে অবিবাহিতা জীবন যাপন করতে হয় আয়েশা (রা.) তাদের জন্য উজ্জল আদর্শ। আয়েশা (রা.) প্রমাণ করেছেন যে নারী সমাজ অতি মহান, তারা কারো করুণার বস্তু নয় কিংবা নাবালোকের পরাধীন নয়, তারা লোভাতুর নয়, তারা যৌবনের লাগামকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।

৪৯৬. ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র.), *আল-মুয়াত্তা*, কায়রো: দারুল ফাজর, ২০০৫, হাদীস নং ৬৫

বিয়ে শাদী সংক্রান্ত বিশেষত বিয়ের ব্যাপারে ইসলামী উদার ও যুক্তিপূর্ণ আইন প্রসঙ্গে মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম, মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী ও হাফেজ আরিফ হোসাইন যথার্থই মন্তব্য করেছেন। "ইসলাম বিশেষজ্ঞ মনীষীগণ বিবাহ সংক্রান্ত বিধি নিষেধ স্থান কাল পাত্রের নিরিখে আলোচনা করে সে দর্শন এবং যুক্তির বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তাতে বিবাহ সংক্রান্ত আইন কানুনে ইসলামী শরীয়াতের বৈশিষ্ট্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামী নিয়ম শৃংখলাই স্থান, কাল এবং পাত্র নির্বিশেষে নারী সমাজের মান মর্যাদা এবং অধিকার সংরক্ষণে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপনা। কিন্তু ইসলাম নাবালেগা অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও বয়স্কাদের ব্যাপারেও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু তা করেছে প্রয়োজন এবং বিশেষ অবস্থার পরিপেক্ষিতে। যাতে মানুষ সেখানেই হীন স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ না পায় সেজন্য উপযুক্ত শর্তাবলী আরোপ করেছে। এ শর্তাবলীসমূহ উপেক্ষা করার মোটেই অবকাশ নেই"।[৪৯৭]

আহমদ মনসুর তাঁর বিখ্যাত বই 'বহু *বিবাহ: ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.)* এ অত্যন্ত স্পষ্ট করে ইতিহাসের দৃষ্টিতে বহু বিবাহ নিয়ে বিশাদ আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে শর্ত সাপেক্ষে ও প্রয়োজনের তাগিদে বহু বিবাহ দোষের কিছু নয় বরং অনেক সময় অত্যাবশ্যাকীয় হয়ে ওঠে। তিনি যথার্থই বলেছেন: বস্তুতঃ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি প্রতিটি সমাজ ও সভ্যতায় বহুবিবাহ যথারীতি অনুশীলিত হয়েছে। পবিত্র ইঞ্জিল শরীফের অবতরণকালে বহুবিবাহ সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল। পবিত্র ইঞ্জিল বহুবিবাহকে নিষিদ্ধ করেনি, একে বিধিবদ্ধ করেনি; এমনকি এর উপর কোন নিয়ন্ত্রণও আরোপ করেনি। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন অনুশীলনটির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেনি কিংবা একে পরিহার করেনি অথবা একে অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলতে দেয়নি। কুরআনে বহুবিবাহ কতিপয়

৪৯৭. মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

শর্তসাপেক্ষ এবং কতিপয় পরিস্থিতিতে অনুমোদন করা হয়েছে। এটি একটি শর্তাধীন অনুমোদন, ঈমানের কোন অপরিহার্য কিছু নয়। আচার-ব্যবহার, ভরন-পোষন ও সহৃদয়তার ক্ষেত্রে স্ত্রীদের মধ্যে সমতাবিধান ইসলামে বহুবিবাহের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত এবং যারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণে ইচ্ছুক তাদেরকে অবশ্যই এই শর্তটি পালন করতে হবে। সুতরাং এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে ইসলাম বহুবিবাহ আবিষ্কার করেনি এবং একটি বিশেষ নিয়ম হিসাবে বহুবিবাহ চালু করার জন্য ইসলাম উৎসাহ প্রদান করেনি। তবে ইসলাম বহুবিবাহ প্রথাটির বিলুপ্তও ঘটায়নি, কেননা এটি বিলুপ্ত হলে তা শুধু কাগজে কলমেই বিলুপ্ত হতো, বাস্তবে মানুষ এই বহুবিবাহ প্রথা চালু রাখতো এবং এর অনুশীলন করতো। এ সকল কারনেই ইসলাম শর্তাধীন ও নিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহ অনুমোদন করেছে। এদিক থেকে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বিবাহিত সকল স্ত্রীদের সাথে এমন চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করেছেন যা বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় কোন পুরুষের মাঝে দেখা যায়না। এটি মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্রের এক বিষ্ময়কর অবিষ্মরণীয় দিক। এমন চমৎকার ভারসাম্যময়, ভালবাসাপূর্ণ কোমল আচরণ করার মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ প্রদত্ত বহুবিবাহ নামক মহাপরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। মানবজাতির জন্য এটি এক সুগভীর শিক্ষনীয় বিষয় ও মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত হবে। রাসূলের (সা.) এর বিবাহিত জীবন সঠিকভাবে অনুধাবন করার মাধ্যমেই মানবজতি জানতে ও বুঝতে পারবে একজন স্ত্রীর সত্যিকার মর্যাদা কি, জীবনের প্রতিটি অবস্থায় স্ত্রীর প্রতি কিরুপ কোমল আচরণ করতে হবে, স্ত্রীর প্রতি কিরুপ আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা ও সহৃদয়তা প্রদান করতে হবে, একে অপরের সাথী হিসেবে জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করতে হবে, সুখে-দু:খে কিভাবে এক অপরকে সাহায্য করতে হবে প্রভৃতি। বস্তুতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে রাসূল (সা.) তথা ইসলামই নারীজাতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করার মাধ্যমে তাদেরকে বিশ্বের দরবারে এমন একটি

বিশিষ্ট আসন দান করেছে যেমনটি পৃথিবীর আর কোন ধর্মে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এটি ইসলাম ধর্মের একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য।"[৪৯৮]

৪৯৮. আহমদ মনসুর, eû weevn Bmjvg I gnv¤§' (mv), ঢাকাঃ তাসনিম পাবলিকেশন্স, ৮৬-৮৭ ও ২৫৯-২৬৬

নবম অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

আজকের দুনিয়াতে শিক্ষাকে শুধু পড়া ও লেখার মধ্যে সীমিত করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু অতীতে এ রকম ছিল না। শিক্ষার অর্থ যদি জানা ও জানানো ধরা হয়, তাহলে অতীতকালের মানুষের অবদান কম ছিল বলা যায় না। হয়তোবা আজকের মত প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান তাদের ছিল না আর থাকলেও খুবই সীমিত আকারে ছিল। মহানবী (সা.) নিজে পড়তে পারতেন না, লিখতেও পারতেন না; তাই বলে কি তাঁকে অশিক্ষিত ব্যক্তি বলা যাবে? মোটেই না, বরং তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত ও সুপন্ডিত। তিনি নিজে পড়া লেখা না জানলেও যারা পড়া লেখা জানতেন তাদেরকে খুবই মূল্য দিতেন এবং অপরকে পড়া লেখা শিখাতে উৎসাহ দিতেন। বদরের যুদ্ধে বন্দীদের অনেকে পড়া লেখা শিখার বিনিময়ে যুদ্ধ বন্ধী অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের সবাই যে পড়া লেখা জানতেন তা নয়, তবে তারা নিজেরা ছিলেন স্বশিক্ষিত এবং শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। বর্তমান অধ্যায় আমরা ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারে তাদের অবদানের কথাটি সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

৯.১ হযরত খাদিজা (রা.)

মহানবী (সা.) এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.) পড়া লেখা জানতেন কি-না সে ব্যাপারে কোন ধরনের স্পষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে তিনি যে বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন সে

ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে তিনি খুব ভাল হিসাব নিকাশ জানতেন।

পিতা ও পূর্ববর্তী স্বামীদের মৃত্যুর পর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসা বাণিজ্য ভালভাবে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি টাকা পয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রে খুবই হিসাবী ও যত্নশীল ছিলেন বলেই ব্যবসা বাণিজ্যে নিজে সরাসরি জড়িত না হয়ে বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারতেন। হযরত খাদিজা (রা.) এর অনুসন্ধানী জ্ঞানেই রাসুল (সা.) এর শেষ নবী হওয়া নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন বহু আগ থেকেই। এ জন্যে তিনি উদ্যোগী ও আগ্রহী হয়ে তাঁর দাসী নাফিসার মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন এবং নিজের পরিবারের সকলকে ভালভাবে বুঝিয়ে মুহাম্মদ (সা.) কে বিবাহ করেছিলেন। বিয়ের পর মক্কার যে বাড়ীতে তাঁদের দাম্পত্য জীবন শুরু হয় তা ছিল পরবর্তী ইসলামের একটি শিক্ষা কেন্দ্র বা শিক্ষালয়।[৪৯৯] কেননা এ বাড়ীতেই প্রথমদিকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর এ বাড়ীর প্রাচীর ঘেষে গোপনে কুরআন তিলাওয়াত শুনতো মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।[৫০০] হযরত খাদিজা (রা.) নিজ হাতে সেবাদান করতেন এ বাড়ীতে আগমনকারী কুরআন শিক্ষার প্রত্যক ছাত্র ও শিক্ষককে। হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর সীমিত সামর্থ্য ও পরিসীমার মধ্যে তাঁর জানা জিনিসগুলো অন্যদেরকে শিখাতেন। হযরত খাদিজা (রা.) কোন জিনিস খুব দ্রুত অনুধাবন করতে এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝাতে পারতেন বলে তাকে যাইদা (পন্ডিত বা পারদর্শী) বলে ডাকা হত।[৫০১] হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর সকল সন্তান সন্তুতিকে ভদ্রতার জ্ঞান তথা একজন সত্যিকারের মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়ার জন্যে যা যা দরকার তার সব টুকুনই তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

---

৪৯৯. রাশীদ হাইলামায, Lw' Rv (iv), (অনুবাদে মুহাম্মদ আদম আলী), ঢাকাঃ মাকতাবুল ফুরকান, ২০১৫, পৃ.২৩
৫০০. প্রাগুক্ত
৫০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

দুর্ভিক্ষের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আলী (রা.) কে হযরত খাদিজা (রা.) এর সাথে আলোচনা করে দীর্ঘদিন আশ্রয় দান করেছিলেন। এ সময়ে হযরত খাদিজা (রা.) হয়ে উঠেছিলেন হযরত আলী (রা.) এর অভিভাবক। তিনি তাঁকে নিজ সন্তানের মত করে খাতির যত্ন করতেন এবং ভদ্রতার যাবতীয় জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এভাবে হযরত আলী (রা.) পৃথিবীর সবচেয়ে আদর্শ মানুষের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন।[৫০২] হযরত যায়িদ (রা.) যদিও দাস হিসেবে হযরত খাদিজা (রা.) এর গৃহে আসেন তথাপি তাঁর আমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে নিজের পিতা-মাতার প্রয়োজনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকেও শিষ্টাচারের সকল কিছু শিখাতে বাদ দেননি। উম্মে আয়মান রাসূল (সা.) যাকে দ্বিতীয় মা হিসেবে সম্মান করতেন[৫০৩] তিনিও হযরত খাদিজা (রা.) বাড়ীতে তাঁর সান্নিধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) এর প্রথম স্বামীর ঘরের সন্তান হিন্দও দীর্ঘদিন যাবত রাসূল (সা.) এর সান্নিধ্যে ছিলেন এবং হযরত খাদিজা (রা.) থেকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের শিক্ষায় উৎকর্ষতা লাভ করেন। হযরত ইবনে আওয়াম (রা.) তাঁর পিতার মৃত্যুর পর হযরত খাদিজা (রা.) এর বাড়ীতে উঠেন এবং সরাসরি রাসূল (সা.) ও হযরত খাদিজা (রা.) এর তত্ত্বাবধানে বড় হন।[৫০৪] হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে খুবই আদর করতেন এবং ভদ্রতা শিষ্টাচারের যাবতীয় কিছু শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

প্রথম ওহী প্রাপ্ত হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মনে যে ভয়-ভীতি কাজ করছিল তা দূরীকরণে হযরত খাদিজা (রা.) এর অবদানের কথা শেষ করা যায় না। তিনি মুহাম্মদ (সা.) কে অভয়ের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনিই তাঁকে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে

---

৫০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
৫০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
৫০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

নওফেলের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনেক স্বপ্নের ব্যাখ্যাই দিয়েছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)।[৫০৫] হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত খাদিজা (রা.) এর জীবদ্দশায় কোন বিষয়ের পরামর্শের জন্যে বাইরে যান নি। যে কোন বিষয়ের পরামর্শের জন্যে তিনি সর্বপ্রথম হযরত খাদিজা (রা.) কে বেছে নিতেন।[৫০৬] কাজেই রাসূলের জীবনে হযরত খাদিজা (রা.) একজন উত্তম পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতেন। যখনই রাসূল (সা.) কোন বিরুপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি হযরত খাদিজা (রা.) এর কাছে এসে শান্ত হতেন। কাজেই পরামর্শদানের পাশাপাশি হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন সান্তনাদানকারী।

এভাবে হযরত খাদিজা (রা.) নিজের অতুলনীয় গুণ, প্রজ্ঞা, ধৈর্য, সহনশীলতা, সাহসিকতা, পরোপকারী, মানবদরদী প্রভৃতির গুণের মাধ্যমে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুসলমান। কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতনের স্টীম রোলার চলার সময় তিনিই ছিলেন মহানবী (সা.) এর সহায় ও পরামর্শদাতা। শত্রুতার ঝাপ্টায় তিনি যখন অতিষ্ট ছিলেন তখন হযরত খাদিজা (রা.)ই তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। হযরত খাদিজা (রা.) স্বীয় গুণ-গরিমা ও ভালোবাসার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অন্তর রাজ্য দখল করে রেখে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরও এই ভালোবাসায় ভাটা পড়েনি।[৫০৭] হযরত খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর পর একদিন তার ভাগ্নি 'হালা' নবীজী (সা.) এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যেহেতু হালার কন্ঠস্বর হযরত খাদিজা (রা.) এর কন্ঠস্বরের মতই ছিল সেহেতু নবীজী (সা.) হযরত খাদিজা (রা.) এর কথা স্বরণ করে বললেন বোধ হয় 'হালা' এসেছে। মহানবী (সা.) এর এরুপ অনুভূতিতে হযরত আয়েশা (রা.) বলে ফেললেন,

৫০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৫০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
৫০৭. মুল্লা 'মজদুদ্দীন, *সীরাতে মুস্তফা*, দিল্লী: আল- মাকতাবা রাশীদিয়া, ১৩৭৬ হি. খ. ২, পৃ. ৮০

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ঐ বৃদ্ধার চেয়ে অনেক ভালো স্ত্রী দান করেছেন, অথচ আপনি তাঁকে ভুলতে পারেন নি। নবীজী (সা.) প্রতি উত্তরে বললেন, ভুলতে পারি নি এবং কখনও পারবো না। এ কথা বলে তিনি আরও বললেন, যখন লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত তখন হযরত খাদিজা (রা.) আমকে নবী বলে মেনে নিয়েছিল, যখন আমি ছিলাম নি:স্ব ও অসহায় তখন একমাত্র খাদিজা (রা.)ই ছিল আমার সহায়।[৫০৮] এভাবে হযরত খাদিজা (রা.) নিজের জীবন চরিত দিয়ে আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন সুগভীর দাম্পত্য জীবনের আদর্শের কথা। তাঁর জীবনের ত্যাগ ও কুরবানীর ঘটনাবলী উম্মাতে মুহাম্মাদীকে একটি সুখী, মধুময় ও আদর্শপূর্ণ দাম্পত্য জীবন ঘটনে উদ্বুদ্ধ করবে চিরকাল।

৯.২ হযরত সাওদা (রা.)

হযরত সাওদা বিনতে যাম'য়া (রা.) মাতৃহারা কন্যা ফাতিমাসহ অন্যান্যদের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন।[৫০৯] তিনি হযরত ফাতিমা (রা.) কে শিষ্টাচারের কতিপয় জিনিস শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম কিভাবে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন কারা যায় তার শিক্ষাও হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত সাওদা (রা.) এর কাছে থেকেই শিখেছেন। হযরত সাওদা (রা.) বেশ কিছুদিন হযরত আলী (রা.) এর তত্ত্ববধান করেছেন।[৫১০] এ সময়ে তিনি হযরত আলী (রা.) কে তদানন্তন সময়ের কতিপয় ভাল কিছুর দিক যেমন অতিথি পরায়নতা, সাহসিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করেছেন। হযরত সাওদা (রা.) রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। বিদায় হজ্জের সময় নবীজী (সা.) স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন আমার

---

৫০৮. ইবন আব্দুল রব, *আল ইসতীয়াব*, বৈরুত: দারুল জেল, ১৯৫৩, খ. ২, পৃ. ৭৪০-৭৪১; মুল্লা 'মজদুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৫০৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, Avmnv‡e ivm‡j i RxebK_v, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯, খ. ৫, পৃ. ৪৮
৫১০. সূত্র: প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

পরে তোমরা ঘরে অবস্থান করবে।[৫১১] সত্যি সত্যি নবীজী (সা.) এর ইন্তিকালের পর তিনি আর কোনদিন হজ্জ ও ওমরা করার জন্যে মদিনা থেকে বের হননি। তিনি কেন মদিনা থেকে বের হলেন না প্রশ্নের উত্তরে বলতেন আমি হজ্জ ও উমরা দু'টোই আদায় করছি। তাই এখন নুতন করে আবার হজ্জ ও উমরা করার দরকার মনে করছি না, বরং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মত ঘরে বসে যিকির, তেলাওয়াত ও অন্যান্য নফল ইবাদত করাকেই শ্রেয় মনে করছি।

হযরত সাওদা (রা.) একদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সেরে বাড়ীর দিকে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে হযরত ওমর (রা.) এর সাথে দেখা হয়ে পড়ল এবং হযরত ওমর (রা.) নবী পরিবারের বাড়ীর বাইরে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানোকে অপছন্দ করলেন। ফলে হযরত সাওদা (রা.) বিষয়টি বুঝতে পেরে নবীজী (সা.) কে জানালেন। এর কিছুক্ষন পরই হিযাবের বা পর্দার আয়াত নাযিল হল আর এর উপলক্ষ হয়েছিলেন হযরত সাওদা (রা.)।[৫১২] হিযাবের ঘটনার সাথে যুক্ত হতে পেরে হযরত সাওদা (রা.) বেশ খুশি ছিলেন। দানশীলতা হযরত সাওদা (রা.) এর বিশেষ গুণ ছিল। একবার হযরত সাওদা (রা.) খেজুরের থলে ভর্তি দিরহাম নিলেন। তিনি ঐ পুরো থলে ভর্তি দিরহাম দান করে দিলেন। স্বামীভক্তির গুণটিতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। নবীজী (সা.) কে তিনি মনে-প্রাণে ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কুরবানীর নজির পেশ করার ক্ষেত্রে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সতীন হযরত আয়েশা (রা.) কে নিজের রাত্রির বরাদ্দ টুকুও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

৫১১. তাবাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৫; মসনাদে আহমদ, হাদীস নং-৪৪৬, ৩২৪, ৩২৪, ২১৮;
৫১২. mnxn Avj eLvix, ইমাম বুখারী, আস, বাবুল হাদায়াঃ বাবুত তাহরীম

হযরত সাওদা (রা.) সরাসরি পড়া-লেখা না জানলেও তাঁর ভাল স্মরনশক্তি ছিল। তাঁর সূত্রে পাচটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৫১৩] সাহাবীদের মধ্যে আবদুললাহ ইবনে আব্বাস, ইবনুল যুবাইর এবং ইয়াহইয়া ইবন আবদিল্লাহ আল আনসারী তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন।

৯.৩ হযরত আয়েশা (রা.)

উম্মাহাতুল মুমীনীনদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) ই সবচেয়ে বেশী জ্ঞান চর্চাকারী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) শিশুবয়সেই পিতা হযরত আবু বকর (রা.) কাছে থেকে কুষ্ঠি বিদ্যা, ইতিহাস ও কাব্যশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন।[৫১৪] তবে তাঁর আসল শিক্ষা ও প্রশিক্ষন লাভের প্রকৃত সূচনা হয় স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ঘরে আসার পর থেকেই। তিনি লিখতে না জানলেও পড়তে পারতেন। কেননা তিনি দেখে দেখে পবিত্র কুরআন শরীফ পড়তেন। দ্বীনি বিষয় জ্ঞান অর্জন ছাড়াও তিনি ইতিহাস, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ইন্তিকালের পর হযরত আয়েশা (রা.) এর গৃহই ইসলামী জ্ঞান চর্চার এক অতুলনীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা মদীনায় এসে হযরত আয়েশা (রা.) কে নানাবিধ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন আর পর্দার আড়াল থেকে নবী পত্নী হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিতেন। ইরাক, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্জল থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে তাঁর খিদমতে হাজির হতেন এবং বহুমুখী বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইতেন। স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের চেয়ে মহিলারাই ভীর করতেন বেশি। মহিলাদেরকে দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা

---

৫১৩. ইবন হাজার, ZvnhxeZ Zvnhxe, হায়দ্রাবাদঃ দায়িরাতুল মায়ারিফ, ১৩২৫ হি., খ. ১২, পৃ. ৪৫৫
৫১৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ার সময় তিনি অনুরোধ করতেন যে তাঁরা অবশ্যই পুরুষদেরকে জানিয়ে দিবেন।[৫১৫] এভাবে তিনি মহিলাদের মাধ্যমে পুরুষদেরকেও দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। আবার কখনও কখনও পুরুষরা সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তা তিনি বলতে লজ্জা পেতেন না বরং পর্দার আড়াল থেকে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) প্রতি বছর হজ্জে যেতেন। তিনি যেখানে তাবু স্থাপন করতেন সেখানে জ্ঞান পিপাসু ভীড় জমাতেন। তিনি যখন চলতেন, মহিলারা তাঁর চারিদিকে ঘিরে চলতো। ইমামের মত তিনি আগে আগে চলতেন আর বাকীরা চলতো তাঁর পিছনে পিছনে। নারী পুরুষের উত্থাপিত সকল ধরনের মাসয়ালার উত্তর দিতেন এবং বেশী বেশী প্রশ্ন করার জন্যে উৎস দিতেন। তিনি বলতেন তোমরা মায়ের কাছে যে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারো তা আমার কাছেও করতে পারো।[৫১৬] আসলেই তিনি মায়ের মত দরদ দিয়ে প্রত্যেক জিজ্ঞাসুব্যক্তির প্রশ্নের সমাধান দিতেন। উরওয়া, কাসেম, আবু সালামা, মাসরূক ও সাফিয়্যাকে মাতৃ স্নেহে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এরাই আয়েশা (রা.) এর জ্ঞানের সত্যিকারের বাহকরুপে মুসলিম দুনিয়াতে সমাদৃত হয়েছিলেন। ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তাদের যাবতীয় খরচও নিজে বহন করতেন। কোন কোন শিক্ষার্থীর সাথে তিনি এমন মাতৃসূলভ আচরণ করতেন যে তা দেখে তাঁর আপনজনেরাও ঈর্ষা করতো।[৫১৭] এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, তার ছাত্র সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ১২ হাজার।[৫১৮]

---

৫১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
৫১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
৫১৭. প্রাগুক্ত
৫১৮. মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম (সম্পাদিত), ivmj jvn (mv.) Gi ¯xMY †hgb wQ‡jb, ঢাকাঃ পিস পাবলিকেশন, ২০১৫, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়েশা (রা.) এর জীবনী আলোচনা করার সময় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের একজন মুফাসসির বা ব্যাখ্যা কারক। তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াতের বহু জটিল অর্থের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনের শব্দ *কুরু* দ্বারা অনেকে বিশেষকারে ইরাক বাসীরা হায়েজ অর্থ করলেও হযরত আয়েশা (রা.) তা দ্বারা পবিত্রতা অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর মদীনার সকল ফকীহ এ ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা.) কেই অনুসরন করেছেন।[৫১৯] পবিত্র কুরআনের শব্দ *সালাতুল ওয়াসতা* দ্বারা যে আসরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে তা হযরত আয়েশা (রা.) ই স্পষ্ট করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) কেবল হাদীস মুখস্তই রাখতেন না বরং তার সঠিক ব্যাখ্যাদানকারী ছিলেন। জুম্মার নামাযে আসার আগে গোসল করা যদিও ওয়াজিব নয় তারপরও গোসলের গুরুত্ব নিয়ে অনেকের মনের মধ্যে ধোয়াশার সৃষ্টি হলে হযরত আয়েশা (রা.) এর সঠিক পটভূমি বর্ণনা করে বলেন যে, এটা কোন ধরনের আবশ্যক সুন্নাত না হলে ও এর বাহ্যিক গুরুত্ব আছে। আর তা হলো নামাযের পূর্বে লোকেরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে হাতে মুখে ধুলো-বালি লাগাতে পারে আর তাই সাপ্তাহিক ঈদ হিসেবে খ্যাত জুম্মার দিনে জুম্মা নামাযের আগে গোসল করে সুগন্ধি মাখিয়ে পরিস্কার জামা কাপড় পড়ে মসজিদে আসতে পারলে ভালই হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) মুফাসসির ও মুহাদ্দিস হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত ফকীহ বা মুফতি। এক্ষেত্রে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তাহলো প্রথমে সমাধান বের করার জন্যে তিনি পবিত্র কুরআন অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর এ মতটিই অধিকাংশ মুফাসসির মুহাদ্দিস ফকীহ গ্রহণ করেছেন।[৫২০] সেখানে না পেলে রাসূলের হাদীস; সেখানেও না পেলে তিনি নিজের আকল

৫১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
৫২০. মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম (সম্পাদিত), ivmj jvn (mv) Gi ¯xMY †hgb wQ‡jb, ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, ২০১৫, পৃ. ৮২

বা জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে ছিলেন সত্যিকারের একজন জ্ঞান সাধক গবেষক বা মুজতাহিদ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উপর তাঁর প্রচেষ্টা ছিলো বলেই তিনি ইজতেহাদ বা গবেষণা কাজ করার সাহস পেয়েছিলেন। একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ফতওয়া দিলেন যে কোন ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিলে তাকেও গোসল করতে হবে; আর যদি কেউ মৃতের খাটিয়া বহন করে তাকে দ্বিতীয়বার ওযু করতে হবে। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বলে দিলেন যে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর ফতওয়া সঠিক নয়। তবে হ্যা গোসল ও ওযু করতে পারলে ভালো, আবশ্যক নয়।

কুরআন, হাদীস ও ফিকহের জ্ঞানের পারদর্শী হওয়া ছাড়াও হযরত আয়েশা (রা.) বৈষয়িক বিষয়ের জ্ঞানও রপ্ত করেছিলেন। তৎকালীন আরবের প্রচলিত চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) অবহিত ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানের আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির সেবা কিভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করল আপনি চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞান কিভাবে অর্জন করেছেন তখন তিনি বলেছিলেন রাসূল (সা.) এর অসুস্থ অবস্থায় আরবের বড় বড় চিকিৎসকরা যে পরামর্শ বা ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন তা তিনি মনে রেখেছেন।[৫২১] আবার যুদ্ধের ময়দানে অসুস্থ বা আহত ব্যক্তির সেবা যত্নে ওষুধপত্রের সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা দেখে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আসলে তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী ও তীক্ষ্ণ স্মরনশক্তির অধিকারী। একবার দেখে নিতে পারলেই তিনি মনে রাখতে পারতেন।

যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.) চিকিৎসা বিদ্যার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন সেহেতু লোকেরা ইসলামী জ্ঞান চর্চা ছাড়াও চিকিৎসা বিদ্যার কিছু কিছু কৌশল ও ব্যাবস্থাপনার

৫২১. ইমাম ইবনে হাম্বল, Av j -gmbv ', প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৭

জ্ঞান জানার জন্যে তাঁর কাছে আসতেন। আর হযরত আয়েশা (রা.)ও তা তাদেরকে জানিয়ে দিতেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে পিতার মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা.) আরবের ইতিহাস, জাহেলী যুগের রীতি-প্রথা এবং আরবের বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠীর বংশ সম্পর্কে জেনে ছিলেন। জাহেলী আরবের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবরন তিনি দিয়েছেন যা হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে। যেমন- আরবে কত রকমের বিয়ে চালু ছিল, তালাকের পদ্ধতি কেমন ছিল, বিয়ের সময় কি গাওয়া হতো, তারা কোন কোন দিন রাযা রাখতো, হজ্জের সময় কুরাইশরা কোথায় অবস্থান করতো, মৃত ব্যক্তির লাশ দেখে তারা কি কথা উচ্চারন করতো ইত্যাদি। এ কারণে হযরত উরওয়া (রা.) কে বলতে শোনা যায় আমি আরবের ইতিহাস ও কুষ্ঠিবিদ্যায় হযরত আয়েশা (রা.) এর চেয়ে বেশি জানা কাউকে দেখিনি।[৫২২]

ইসলাম পূর্ব যুগের মদীনার আনসারদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তাদের ধর্ম বিশ্বাস, দেব-দেবীর কথা ইত্যাদির বিস্তারিত যে বিবরন হযরত আয়েশা (রা.) দিয়েছেন তা আর কেউ দিতে পারেনি। ইসলামের কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেমন ওহীর সূচনা পূর্ব, ওহী কেমন করে আসতো, ওহীর সময় নবীজীর অবস্থা কিরুপ হতো, নবুয়্যাতের সূচনা পর্বের নানা ঘটনা, হিযরতের ঘটনা, নিজের জীবনের ইফকের ঘটনা ইত্যাদির তিনি বিস্তারিত যে বর্ণনা দিয়েছেন[৫২৩] তা আর কারো বর্ণনায় পাওয়া যায় নি। কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা বর্ণনা এবং নামাযের পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ তাঁর পক্ষেই দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নবীজী (সা.) এর মৃত্যুকালীন অবস্থা, কাফন-দাফনের

৫২২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
৫২৩. ইমাম বুখারী, Avm mnxn Avj eLvix, বাবু বুদয়ুল ওহী, বাবুল হিযরা ও বাবুল ইফক

ব্যবস্থাপনা, কাফনের কাপড়ের সংখ্যা, মাপ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনাতো বিশ্ববাসী তাঁর মাধ্যমে জেনেছে।

যুদ্ধের ময়দানের বহুমুখী অবস্থার কথা তিনিই মুসলিম উম্মাহকে জানিয়েছেন। রাসূল (সা.) এর নৈশকালীন ইবাদতের কথা, ঘর গৃহস্থলীর কথা, তার আদব-আখলাক, স্বভাব-আচরণের কথা তিনি বিস্তারিতভাবে উম্মাহকে জানিয়েছেন। মোটকথা, নবী জীবনের একটি স্বচ্ছ ও সঠিক চিত্র তিনি পরবর্তী প্রজন্মকে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন একজন সুভাষিণী। তিনি অতি স্পষ্ট, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতেন। রাসূলের অনেক বাণীগুলো হযরত আয়েশা (রা.) নিজের ভাষায় বর্ণনা করতেন। সেগুলো পাঠ করলে তাঁর মধ্যে চমৎকার এক শিল্পরুপ পরিলক্ষিত হয়। তাতে রুপক ও উপমা উৎপ্রেক্ষার সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন তিনি রাসূল (সা.) এর ওহী নাযিলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:"প্রথম প্রথম নবীজী (সা.) ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী লাভ করতেন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাতের দীপ্তির মত উদ্ভাসিত হতো।"[৫২৪] এখানে হযরত আয়েশা (রা.) সত্য স্বপ্নসমূহকে প্রভাতের দীপ্তি ও আভার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি সুন্দরভাবে গল্প বলতে পারতেন। একবার তিনি রাসূল (সা.) কে আরবের এগারো সহদরার একটি দীর্ঘ গল্প শুনিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) অতি ধৈর্য সহকারে তাঁর গল্প শুনতেন। গল্প বর্ণনায় তাঁর চমৎকার বাচনভঙ্গি ও যথার্থ উপমা ব্যবহারের কলা-কৌশল লক্ষ্য করা যায়। এটা সবাই স্বীকার করেছেন যে হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ মহিলা বক্তা বা খতিবাহ। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্রসমূহে হযরত আয়েশা (রা.) এর বহু খুতবা বা বহু বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে।

৫২৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

তাবারীর[৫২৫] বর্ণনা হতে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) এর ভাষণ ছিল খুবই স্পষ্ট, উচ্চকণ্ঠী এবং ভাব-গাম্ভীর্যে ভরপুর। তাঁর গলার আওয়াজ অধিকাংশ মানুষকে প্রভাবিত করতো।

হযরত আয়েশা (রা.) এর চিঠিগুলো[৫২৬] পড়লে জানা যায় যে তার ভাব ও ভাষা ছিল চমৎকার, প্রাঞ্জল ও সুন্দর বাক্য চয়নে পূর্ণ। তাই আরবী সাহিত্যের প্রাচীনকালের পন্ডিতেরা তাঁর সে সকল চিঠি পত্রের সাহিত্যগুলো বিবেচনা করে নিজেদের রচনাবলীতে স্থান দিয়েছেন।

পারিবারিক সূত্রে হযরত আয়েশা (রা.) কাব্য চর্চা করতে ভালবাসতেন। ইসলামের কবি কাব ইবনে মালিকের একটি পূর্ণ কাসিদা মুখস্ত করে রেখেছিলেন এবং সময় ও সুযোগমত উদ্ধৃতির আকারে উপস্থাপন করতেন। শুদ্ধরুপে ভাষা শিখার গুরুত্ব উপলব্ধি করে হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের কবিতা শেখাও; কেননা এতে তাদের ভাষা মাধুরীময় হবে।[৫২৭]

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন এমন এক বিষ্ময়কর প্রতিভা যার বর্ণনা ও মূল্যায়ন করে শেষ করা যায় না। তাঁর জীবন ও বিচিত্র মুখী প্রতিভার বিচরণের জন্যে দরকার একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা। যাহোক, এ অল্প পরিসরে তাঁর জীবনের চমকপ্রদ অংশগুলো থেকে কিছু অংশ তুলে ধরলাম মাত্র। সংক্ষেপে যে জিনিসটি না বলে পারছি না তা হলো প্রিয় নবী (সা.) এর ওফাতের সময় হযরত আয়েশা (রা.) এর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। বাকী ৪৮ বছর তিনি বৈধব্যের জীবন

৫২৫. ইবন হাযম, RvgnvivZ Avbmvwe j ÔAvie, মক্কাঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৬২, খ. ১, পৃ. ২৮৬
৫২৬. তিনি নিজে চিঠি লিখতেন না তবে তাঁর সেক্রেটারি দিয়ে চিঠি লিখিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়।
৫২৭. ইবন আবদি রাব্বিহী, Avj-BK'j dvix', কায়রোঃ লুজনাতু নাতুত তালীফ ওয়াত তারজামা, ১৯৬৮, খ. ৫, পৃ. ২৭৪

অতিবাহিত করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি ইসলমী বিশ্বের হেদায়াত, ইলম ও ফজিলত এবং খায়ের ও বরকতের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। তাঁর থেকে ২২১০ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অনেকেই বলেছেন, শরীয়াতের হুকুম আহকামের এক চতুর্থাংশ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।[৫২৮]

৯.৪ হযরত হাফসা (রা.)

হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী এবং তাঁর মধ্যে জানার প্রবল আগ্রহ ছিল। তাঁর মধ্যকার এ গুণটির প্রতি লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.)[৫২৯] কে অনুরোধ করেছিলেন হযরত হাফসা (রা.) কে পড়া-লেখা শিখাতে।[৫৩০] তিনি আগে থেকেই পড়তে পারতেন কিন্তু লিখতে পারতেন না। হযরত শিফা (রা.) রাসূল (সা.) এর অনুরোধে হযরত হাফসা (রা.) কে 'নামলা' নামক ঝাড় ফুকের দোয়াটি[৫৩১] শিখিয়েছিলেন।

দ্বীনি বিষয়ে হযরত হাফসা (রা.) এর গভীর জ্ঞান ছিল। একবার নবীজী (সা.) বললেন আমি আশাকরি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ জাহান্নামে যাবে না। তখন হযরত হাফসা (রা.) কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন আল্লাহতো বলেছেন,

---

৫২৮. শিবলী নু'মানী, *সিরাতুন্নবী*, আ'যমগড়: মাতবা' মা'য়ারিফ, ১৯৫২, খ. ১, পৃ. ৪০৭

৫২৯. সে সময়ে তিনি ছিলেন এক সৌভাগ্যেময়ী মহিলা সাহাবী যিনি লেখা ও পড়া দুটিই জানতেন। অনেককে তিনি পড়া লেখা শিখিয়েছেন।

৫৩০. সুনানে আবী দাউদ, হাদীস নং-৩৭৪;

৫৩১. জাহেলী যুগে হযরত শিফা (রা) এ দোয়াটি পড়ে একপ্রকার ক্ষতরোগের নিরাময়ের ঝাড় ফুক করতেন। ইসলামে গ্রহণের পরে রাসূলের সাথে দেখা করে উক্ত দোয়াটি শুনালে নবীজী (সা) দেখলেন এতে কোন ধরনের শিরকিয়াত নেই বরং রয়েছে আল্লাহর কাছে এক বিশেষ ধরনের প্রার্থনা। তাই তিনি তাকে অনুরোধ করলেন সে যেন হাফসা (রা)–কে তা শিখিয়ে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

“কখনই নয়, তারা তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে।”[৫৩২]

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই যে সেখানে (জাহান্নামে) যাবে না। তখন মহানবী (সা.) কোরআনের আরেক আয়াতের উদ্ধৃতির দিয়ে বললেন, আল্লাহতো এটাও বলেছেন:

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

“অতপর আমি খোদাভীরু লোকদের উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিব।”[৫৩৩] এভাবে ইসলামের যৌক্তিক জ্ঞানের প্রমানাদি পেশ করে হযরত হাফসা (রা.) নবীজী (সা.) এর সাথে আলোচনা করতেন।

তিনি তাঁর পিতা হযরত উমর (রা.) এর ন্যায় তেজস্বী ও অসীম সাহসিকতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন হাফসা বাপের বেটি। বাস্তব জীবনে হযরত হাফসা (রা.) অসীম সাহসিকতার পরিচয় রেখে গেছেন। মহানবী (সা.) এর ইনতেকালের পরে হযরত হাফসা (রা.) জনগণের পক্ষ হতে বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে খলিফাদের সাথে কথা বলতেন। অনেক সময় খলিফাগণও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী সর্বোচ্চ কতদিন পর্যন্ত দূরে থাকতে পারে এরকম একটি জটিল প্রশ্নের সমাধান হযরত উমার (রা.) তাঁর কাছে পরামর্শ গ্রহণ করে সমাধান বের করে ছিলেন। তখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে কোন সৈনিককে যেন চার মাসের অধিকাল আটকে রাখা না হয়।[৫৩৪]

---

৫৩২. আল কুরআন, ১৯: ৮২
৫৩৩. আল কুরআন, ১৯: ৭১
৫৩৪. আলাউদ্দীন ‘আলী আল-মুত্তাকী, Kvbhj ÔDg¥vj, বৈরুতঃ মুত্তয়ামমাতুর রিসালা, ৫ম সংস্করন, ১৯৭৬, খ. ৮, পৃ. ৩০৮; ইউসুফ আল-কানধালূবী, nvqvZm mvnvev, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭৫

হযরত হাফসা (রা.) যে কারনে জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছেন তা হলো পবিত্র কুরআনের কপি সংরক্ষণ। সকলের জানা থাকার কথা যে, রিদ্দার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হযরত আবু বকর (রা.) কে পবিত্র কুরআন লিখে রাখার মাধ্যমে সংরক্ষন করার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছিলো। তিনি যায়িদ ইবনে সাবিতের উপর এর দায়িত্বভার অর্পন করেন। হযরত যায়িদ (রা.) সরকারী পৃষ্ঠ পোষকতায় কাতিবে ওহী ও হাফেজগণের সহযোগীতায় কঠোর পরিশ্রম করে পবিত্র কুরআনের একটি পান্ডুলিপি তৈরি করেন। হযরত উমার (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত হাফসা (রা.) কোরআনের উক্ত পান্ডুলিপিটি অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে থাকেন।

পবিত্র কোরআনের উচ্চারণ নিয়ে যখন সমস্যা হচ্ছিল তখন তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) কেবল কুরাইশী উপভাষায় কোরআন তেলায়াত ও সংরক্ষন করতে চাইলেন। ফলে তিনি হযরত হাফসা (রা.) এর কাছ থেকে সংরক্ষিত পান্ডুলিপি থেকে প্রায় এক লাখ কপি নকল করে তা বিভিন্ন জায়গাতে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মুসলামনেরা যখন পবিত্র কুরআনের লিখন ও পঠনে এক অনিশ্চয়তার মাঝে ছিল তখন হযরত হাফসা (রা.) এর কাছে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি তার সমাধান প্রদান করেছিল। যদি হযরত হাফসা (রা.) যত্ন সহকারে এ পান্ডুলিপি সংরক্ষণ না করতেন তাহলে হযরত উসমান (রা.) এর পক্ষে হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হতো।[৫৩৫] হযরত হাফসা (রা.) পবিত্র কোরআন শরীফের সর্বজন স্বীকৃত পান্ডুলিপিটি এমনভাবে সংরক্ষন করেছিলেন যে কিয়ামত পর্যন্ত তার এ অতুলনীয় অবদানের কথা মুসলমানদেরকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

৫৩৫. মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-১০১

হাদীস বর্ণনায়ও তার অবদান কম নয়। তিনি মোট ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্নিত চারটি হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে উভয় গ্রন্থেই সমভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর এককভাবে বুখারী শরীফে ৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: আবদুল্লাহ ইবনে উমার, হামযা ইবনে আবদুল্লাহ, সাফিয়্যা বিনতে আবী উবায়দা, মুত্তালিব ইবনে আবু হুরায়রা, উম্মু মুবাশশির, আবদুর রহমান ইবনে হারিছ, আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান, শুতাইর ইবন শাকাল, সাওয়া আল খুযাই আল মুসয়্যিার ইবনে রাফে, আল মাজলীয সহ আরও অনেকে।[৫৩৬]

হযরত হাফসা (রা.) সর্বদা মনে করতেন উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে আপোস মীমাংসা হতে পারে এমন কোন বিষয় থেকে দূরে থাকা সমীচীন নয়। যখন তিনি শুনতে পেলেন যে দুমাতুল জান্দালে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যেকার বিরোধ মিটতে যাচ্ছে তখন তিনি তাঁর ভাই আবদুল্লাহকে সেখানে যেতে বলেছিলেন যদিও আবদুল্লাহ ফাসাদ মনে করে সেখানে যেতে চাননি। এভাবে হযরত হাফসা (রা.) সকল ধরনের ফিতনা-ফাসাদ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হোক চেয়েছিলেন। মূলত: কোন ধরনের ঝগড়া-বিবাদকে তিনি পছন্দ করতেন না। হযরত হাফসা (রা.) এর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন পিতা হযরত উমার (রা.) এর মত সাহসী ও দায়িত্বশীল।[৫৩৭] মহানবী (সা.) এর সাথে হযরত হাফসা (রা.) এর দাম্পত্য জীবনে ছোট খোটো বিষয়ে মন মালিন্য যে হয়নি তা নয় বরং ছোট খাটো মন-মানিল্যের প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্যে আদর্শ অনুকরণীয় ও অনুস্বরণীয় বিষয়।

---

৫৩৬. ইবন হাজার, ZvnhxeZ Zvnhxe, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪৩৯
৫৩৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৩

৯.৫ হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.)

হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.) রাসূলে মাকবুল (সা.) এর সাথে বিয়ের মাত্র তিন মাস পরেই ইন্তিকাল করেন বিধায় তাঁর পক্ষে রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীদের মত ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব বেশি অবদান রাখা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তবে তাঁর দানশীলতার ভূয়েসী প্রশংসা করতে হয়। তিনি নিজে প্রচুর পরিমানে দান খয়রাত করতেন এবং অন্যান্যদেরকে তা করতে বলতেন। তিনি জন্মগতভাবেই প্রশস্ত হৃদয় ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ছোট বেলা থেকেই ভূখা-নাঙা ও গরীব-দু:খীদের বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ধনাঢ্য পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও গরীবদের দু:খ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। এমন বহু ঘটনা আছে যে তিনি খেতে বসেছেন এমন সময় ক্ষুধার্থ ব্যক্তি এসে খাবার চেয়েছেন, ব্যাস! তিনি নিজের খাবারটাই দিয়ে দিয়েছেন।[৫৩৮] এ জন্যে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তিনি গরীব-দু:খীদের মা বা উম্মুল মাসকীন নামে পরিচিত হয় উঠেছিলেন।[৫৩৯] কাজেই দান খয়রাতের দিক থেকে তাঁর সাথে অন্যকারো তুলনাকরাটা বেশ কঠিন। তিনি ইসলামী শিক্ষার সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত হয়ে আছেন এবং থাকবেন কিয়ামত পর্যন্ত।

৫৩৮. মুয়াল্লিমা মুরশিদা বেগম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮
৫৩৯. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২৯

৯.৬ হযরত উম্মু সালামা (রা.)

হযরত উম্মু সালামা (রা.) ছিলেন খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শি মহিলা। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উত্তরনে রাসূল (সা.) কে তিনি সঠিক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে সন্ধি চুক্তির পর রাসূল (সা.) বলেন লোকেরা যেন হুদায়বিয়ায় নিজ নিজ পশু করবানী করে। যেহেতু সন্ধির শর্তাবলি দৃশ্যত মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী ছিল সেহেতু মুসলমানেরা মনঃক্ষুন্ন ও বিমর্ষ হয়েছিল। মহানবী (সা.) তিনবার নির্দেশদানের পরেও কারও মধ্যে নির্দেশ পালনের তোড়জোড় দেখা গেল না। নবীজী (সা.) তাবুতে ফিরে এসে স্ত্রী উম্মু সালামা (রা.) এর কাছে ঘটনাটি খুলে বলেন। তখন উম্মু সালামা (রা.) নবীজী (সা.) কে বললেন আপনি কাকেও কিছু বলবেন না। বরং বাইরে গিয়ে নিজেই কুরবানী করুন এবং ইহরাম ভাঙ্গার জন্যে মাথার চুল ফেলে দিন। নবীজী (সা.) তাঁর পরামর্শ মত কাজে করেন। লোকেরা যখন দেখলো রাসূল (সা.) তাঁর নির্দেশ মত নিজেই আমল করেছেন তখন সবাই কুরবানী করে মাথার চুল মুন্ডিয়ে ইহরাম ভঙ্গ করে ফেলে। সত্যিই তিনি ছিলেন কুটনৈতিক বুদ্ধিতে দূরদর্শী এবং সময়োপযোগী পরামর্শদাতা। তাঁর যর্থাথ বাস্তবসম্মত ও সময় উপযোগী পরামর্শের কারণে মুসলমানেরা এক কঠিন সমস্যাকে নিমিষেই সমাধান করতে পেরেছিলেন।[৫৪০]

হযরত উম্মু সালামা (রা.) প্রতিবাদী কন্ঠের অধিকারী ছিলেন। একদা হযরত উমর (রা.) নবী পত্নীদের ব্যাপারে একটু ঘাটাঘাটি করতে আসলে তিনি কর্কশ কন্ঠে তাঁর প্রতিবাদ করে বলেন, ইবনে খাত্তাব! এ আশ্চর্যের ব্যাপার যে আপনি নবীজী (সা.) ও তাঁর স্ত্রীদের একান্ত ব্যক্তিগত

---

৫৪০. ইমাম আহমাদ আবনে হাম্বল, Av¡j-gmbv', হাদীস নং ৩১৯

ব্যাপারেও নাক গলাতে এসেছেন।[৫৪১] উমাইয়া যুগে কতিপয় লোক যখন হযরত আলী ও নবী পরিবারকে গাল-মন্দ করতেছিল তখন ও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) খুবই লজ্জাশীল ছিলেন। প্রথম দিকে নবীজী (সা.) এর সাথে একান্ত সময় কাটাতে তিনি লজ্জা পেতেন। পরবর্তীতে তিনি নবীজী (সা.) এর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করলেন। নবীজী (সা.) যখনই তাঁর ঘরে আসতেন তখনই তিনি নিজ হাতে রান্না করে তাঁর মেহমানদারী করাতেন।

তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণ ছিল প্রবল। নবী পত্নীনগণের মধ্যে দুটি গ্রুপ ছিল। এক ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আায়েশা (রা.) আর অপর ভাগে ছিলেন হযরত উম্মু সালামা (রা.)। তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথা সবাই মেনে চলত এবং অনুরোধ রক্ষা করত।

এত গভীর আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও অভিজাত পরিবারের মেয়ে উম্মু সালামা (রা.) ছিলেন খুবই সাদা-সিদে ও নিরহংকারী। যখনই ভুল হয়ে গেছে বুঝাতে পারতেন সাথে সাথেই তওবা করতেন। একদিন তিনি নবীজী (সা.) এর কাছে হযরত আয়েশা (রা.) এর বিষয়ে কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু নবীজী (সা.) এর বাচনভঙ্গী দেখে বুঝতে পারলেন যে এটা নবীজী (সা.) অপছন্দ করেন। সাথে সাথেই তিনি তওবা করলেন এবং জীবনে আর কোনদিন ঐ বিষয়ে আলোচনা করেন নি।

মানুষের খুশির সংবাদে তিনি খুশি হতেন এবং নিজে থেকেই তা প্রচার করতেন। তাঁর গৃহে নবীজী (সা.) এর অবস্থানরত সময়ে ওহী আসল যে আবু লুবাবার তত্তবা কবুল হয়েছে। সাথে সাথেই নবীজী (সা.) এর অনুমতি নিয়ে তা তিনি তাঁকে জানিয়ে দিলেন।

---

৫৪১. ইমাম বুখারী, Avm mnxn Avj eLvix, হাদীস নং-৩৮০; ইউসুফ আল-কানধালূবী, nvqvZm mvnvev, দিমাশক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করন ১৯৮৩, খ. ১, পৃ. ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম হুসাইনের শাহাদতের ভবিষ্যৎ বাণী নবীজী (সা.) তাঁর কাছেই সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছেন। যেদিন ইমাম হুসাইন কারবালার প্রান্তরে শাহাদাৎ বরণ করেন সেদিনও তিনি মহানবী (সা.) কে স্বপ্নে দেখে বুঝতে পারেন যে ইমাম হুসাইন (রা.) আর পৃথিবীতে নেই তিনি শহীদ হয়েছেন।[৫৪২] ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পরেই তিনি ইরাকবাসী ও উমাইয়া শাসকের প্রতিবাদ করেছিলেন।

মহানবী (সা.) এর সাথে বিবাহের পরে তাঁর কোন সন্তান হয় নি। তবে তাঁর পূর্ব স্বামীর ঔরসে চার সন্তানের জননী হয়েছিলেন। তিনি সন্তানদেরকে খুবই আদর যত্ন করতেন। রাসূল (সা.) এর সাথে বিবাহের কথা যখন হচ্ছিল তখন তিনি তাঁর সন্তানদের শর্ত দিয়েছিলেন। শর্ত মেনেই নবীজী (সা.) তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি সন্তানদেরকে সব সময় নিজের কাছে রাখতেন এবং উত্তমরুপে দেখা-শোনা করতেন। তিনি যেমন তাঁর সন্তানদের আদর্শ মা ছিলেন ঠিক তেমনি আদর্শ স্ত্রীও ছিলেন। তাঁর পূর্ব স্বামী আবু সালামার সাথেও খুবই মিষ্টি মধুর সম্পর্কের সাথে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু অকাল মৃত্যুতে নিঃস্ব হয়ে পড়া উম্মু সালামা (রা.) সন্তানদেরকে মেনে নেওয়ার শর্তে নবীজী (সা.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি এত বেশি দান করতেন যে দান করার পর হাতে কিছু আছে কি না তা খেয়াল করতেন না। তাঁর দান করা ও বদন্যতার গুণের কারণে তাকে যাদুর রবিক বা মুসাফিরের পাথেয় উপাধি দেওয়া হয়েছিল।[৫৪৩]

তিনি ঐতিহ্য সংরক্ষনের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। রাসূল (সা.) এর প্রতি ভালবাসার স্মৃতি স্বরূপ তাঁর দেহ মোবারকের একটি পশম তিনি নিজের কাছে সংরক্ষন করে ছিলেন।[৫৪৪] সাহাবীদের কেউ

৫৪২. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, Avj-gmbv', হাদীস নং-২৯৮
৫৪৩. ইবন আবদিল বার, Avj-Bmwev, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮
৫৪৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

কোন দু:খ বেদনা পেলে এক পেয়ালা পানি এনে তাঁর সামনে রাখলে তিনি সেই পবিত্র পশম মোবারকটি পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতেন এবং সেই পানি পান করতে বলতেন রোগীকে। সেই পানির বরকতে তার সকল দু:খ বেদনা কষ্ট দূর হয়ে যেত।[৫৪৫]

যেদিন নবীজী (সা.) তাঁর গৃহে তাশরিফ আনতেন সেদিন হযরত উম্মু সালামা (রা.) নবীজী (সা.) এর রাত্রি বেলার নফল নামাযের জন্যে বিছানাকৃত জায়নামাযের গা গেষে বিছানা পাততেন। যাতে নবীজী (সা.) এর রুহানী বরকত তিনি লাভ করতে পারেন। তিনি নবীজী (সা.) এর আরাম-আয়াশের প্রতি এতই খেয়াল রাখতেন যে নিজের দাস সাফীনাকে সর্বক্ষণ মহানবী (সা.) এর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

হযরত উম্মু সালামা (রা.) খুবই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি একদা নবীজী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোরআনে সর্বদা পুরুষকে উদ্দেশ্য করে বিধি-বিধান কথা বর্ণনা করে; মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করে না কেন? তাঁর এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আযযাবের ৩৫ নং আয়াত অবর্তীণ হয় যেখানে পুরুষ মহিলা উভয়কেই আল্লাহ তায়ালা সম্ভোধন করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
صَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا

৫৪৫. আল-বালাজুরী, Avbmve j Avkiv d, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৫৮

"নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী, পুরুষ যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্যে আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[৫৪৬]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কম নয়। হাদীস বর্ণনার দিক হতে মহিলাদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) এর পরেই তাঁর অবস্থান। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাা মোট ৩৭৮টি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একত্রে তার ১৩১৮টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। আর এককভাবে ইমাম বুখারী (রা.) ৩টি এবং ইমাম মুসলিম ১৩টি হাদীস বর্ণনা করছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসে শারঈ বিধি-বিধান, ইবাদত, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, নারী বিষয়ক, পবিত্রতা, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় স্থান লাভ করেছে।

তিনি অত্যন্ত সুন্দরকরে পবিত্র কুরআন তেলায়াত করতে পারতেন। একদা কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে জানতে চাইল নবীজী (সা.) এর তেলায়াত সম্পর্কে। তিনি বললেন নবীজী (সা.) একটি আয়াত আরেকটি আয়াত থেকে পৃথক করে পড়তেন। তারপর নিজেই কিছু আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন।[৫৪৭]

৫৪৬. আল কুরআন, ৩৩:৩৫
৫৪৭. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, Avj-gmbv', প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩১৭

তিনি ছিলেন উস্তাদুল অসাতিযাহ বা শিক্ষকের শিক্ষক। মদীনায় বয়জেষ্ঠ্য সাহাবীরা যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) যাদেরকে জ্ঞানের সাগর বলা হত তাঁরা তাঁর দরজায় ধর্ণা দিতেন।

তিনি যে অত্যন্ত বিচক্ষন ও ধৈর্যশীল ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। নবীজী (সা.) ইনতেকালের পূর্বে ফাতিমা (রা.) কে গোপনে কয়েকটি কথা বলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তা শুনার জন্যে সাথে সাথেই ফাতিমা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু ফাতিমা (রা.) তৎক্ষনাত বলেন নি। কিন্তু বিচুক্ষন ও ধৈর্যশীল উম্মু সালামা পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে ফাতিমা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিলেন নবীজী (সা.) ইন্তিকালের পূর্ব মহুর্তে তাঁকে কি বলেছিলেন।[৫৪৮] হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর গৃহে ওহী নাযিল হত। তিনি হযরত জিব্রাইল (আ) কে বিশিষ্ট সাহাবী দাহইয়া আল কালবীর রুপে দেখেছিলেন। তিনি জ্ঞান প্রজ্ঞা ও দুরদর্শীতার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতেন। ইমামূল হারমাইল বলেন, হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর চেয়ে বেশি সঠিক সিদ্ধান্ত দানের অধিকারী কোন নারী আমার নজরে পড়ে।

এভাবে বহুমুখী শিক্ষমূলক কাজের মাধ্যমে হযরত উম্মু সালামা (রা.) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ও প্রসার ঘটাতে সক্ষম হন।

৯.৭ হযরত যায়নাব (রা.)

হযরত যায়নাব (রা.) এর মাধ্যমে জাহেলী যুগের কু-প্রথা ইসলামে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। লোকেরা তাঁর পূর্ব স্বামী হযরত যায়িদ ইবনে হারিছকে মহানবী (সা.) এর পালক পুত্র মনে

---

৫৪৮ ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৫

করত। আসলে তিনি ছিলেন মহানবী (সা.) এর সেবাদাস। কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁর সাথে নিজ পুত্রর মতই ব্যবহার করতেন আর যায়িদ (রা.) মহনবী (সা.) এর সাথে পিতার ন্যায়ই ব্যবহার ও শ্রদ্ধা করতেন। ফলে লোকদের মনের মধ্যে এ কথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে যায়েদ হচেছ মুহাম্মদ (সা.) এর পূত্র। কিন্তু বাস্তবে তিনি এমন ছিলেন না। লোকেরা পূর্ব বিশ্বাস অনুযায়ী ধরে নিয়েছিল যে পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা যায় না; কিন্তু আল্লাহর বিধান এ রকম ছিল না। ইসলামের দৃষ্ঠিতে পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ সেটা প্রমান করার জন্যে মহানবী (সা.) তাঁর পালক পুত্র যায়িদ ইবনে হারিছকে (রা.) এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) কে আল্লাহর নির্দেশে বিবাহ করেন। হযরত যায়নাব (রা.) সম্পর্কের দিক দিয়ে ছিলেন মহানবী (সা.) এর ফুফতো বোন। যাহোক, প্রথম দিকে এরকম বিয়েতে অনেকেরই মেনে নেওয়া কষ্ঠ হলেও পরবর্তীতে সকলেই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে এ বিবাহের মাধ্যমে জাহেলী যুগের কালো প্রথা বাতিল করাই উদ্দেশ্য।[৫৪৯] আর এ অধ্যায়ের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন হযরত যায়নাব বি্নতে জাহাশ (রা.)।

হযরত যায়নাব (রা.) কে কেন্দ্র করে জাহেলী যুগের কু-প্রথা উৎপাটনের জন্যে সূরা আহযাবের ৩৭,৪০ ও ৫৩ নং আয়াত নাযিল হয়। হযরত যায়নাব (রা.) এর বিবাহ অনুষ্ঠানের ওলীমাকে কেন্দ্র ইসলামী সামাজিক আচরণের বিস্তারিত বিধানও নাযিল হয়েছিল। হযরত যায়নাব (রা.) এর সাথে মহানবী (সা.) এর বিবাহের সিদ্ধান্তটি ছিল স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার, কোন মানুষের নয়। আর এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জাহেলী যুগের কু-প্রথা পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা যায় না তা চিরতরে বাতিল করার জন্য এভাবে হযরত যায়নাব (রা.) এর মাধ্যমে এক বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটেছিল।

৫৪৯. ইবনুল আসীর, Dm' j Mvev dx gwi dwZm mvnvev, বৈরুত: দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩

হযরত যায়নাব (রা.) একজন হস্তশিল্পী ছিলেন। তিনি নিজ হাতে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চামড়া দাবাগাত করে পাকা করতেন এবং তাঁর থেকে যে আয় হতো তা সবই অভাবী মানুষকে দিতেন।[৫৫০] হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে তিনি নিজ হাতে সূতা কেটে মহানবী (সা.) এর যুদ্ধবন্দীদেরকে দিতেন। আর তাঁরা তা দিয়ে কাপড় বুনতো, নবীজী (সা.) সে কাপড় যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করতেন।[৫৫১] রাসূলের ইন্তিকালের পরে বায়তুল মাল থেকে তাঁর জন্যে বারাদ্দকৃত সকল মালামাল তিনি গরীব দু:খীদের মাঝে বিতরন করে দিতেন। বায়তুল মাল থেকে তিনি কিছু গ্রহণ করতেন না; কারণ তিনি নিজের সংসার চালানোর জন্যে নিজেই কঠোর পরিশ্রম করতেন।

হযরত যায়নাব (রা.) এর ব্যক্তিসত্ত্বা ও দানশীলতা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সেই আমার সাথে খুব দ্রুতই মিলিত হবে।[৫৫২] মহানবী (সা.) এর ইন্তিকালের কয়েক বছরের মাথায় হযরত যায়নাব (রা.) ইন্তিকাল করেন। অথচ তিনি ছিলেন ছোট খাটো মানুষ। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যৎ বাণীর তাৎপর্য বুঝতে পেরে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারী ছিলেন হযরত যায়নাব (রা.)। এটা তাঁর শারীরিক গঠনে দিক দিয়ে নয় বরং এ জন্যে যে তিনি নিজের হাতে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতেন এবং তা দিয়ে সংসার চালাতেন এবং মুক্ত হস্তে দান খয়রাত করতেন।[৫৫৩] সত্যিই হযরত যায়নাব (রা.) এর মৃত্যুতে মদীনার গরীব মিসকিন ও অভাবী মানুষেরা তাদের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবককে হারিয়েছেন। ইয়াতিমরা হয়ে পড়েছিলেন অস্থির ও ব্যাকুল। কেননা তিনি ছিলেন অভাবী, ইয়াতিম, দারিদ্র ও অসহায় মানুষের ভরসার জায়গা ও আশ্রয়স্থল।

---

৫৫০. আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqviæ Avˆjvg Avbbevjv, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৭
৫৫১. ইউসুফ আল-কানধালূবী, nvqvZm mvnvev, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৯
৫৫২. আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqviæ Avˆjvg Avbbevjv, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৮
৫৫৩. ইমাম মুসলিম, mnxn gmwjg, হাদীস নং-২৪৫৩; ইমাম বুখারী, Avm mnxn Avj eLvix, হাদীস নং ২২৬

হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি মহানবী (সা.) থেকে হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং তা বর্ণনার কাজেও অবদান রেখেছেন। মহানবী (সা.) থেকে তিনি মোট ১১টি হাদীস বর্ণনা করেছে। হাদীস পুনরুক্তিসহ বুখারীতে ৫টি, মুসলিমে ৩টি, তিরমিযিতে ২টি, আবু দাউদে ২টি, নাসাঈতে ২টি ও ইবনে মাজায় ২টি সংকলিত হয়েছে।

এভাবে হযরত যায়নাব (রা.) তাঁর বিভিন্নমুখী শিক্ষামূলক কর্ম-কান্ডের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন আমাদের সকলের হৃদয়ে।

৯.৮ হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)

জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.) ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহিলা এবং সীমাহীন আত্নমর্যাদাবোধের অধিকারী। সত্য ও ন্যায়ের পথের লড়াকু সৈনিক। একদা হযরত উমর (রা.) নবীজী (সা.) এর বিবিদের জন্যে ভাতা নির্ধারন করলেন, কিন্তু সাফিয়্যা ও জুয়াইরিয়ার জন্যে নির্ধারণ করলেন অর্ধেক ভাতা এ যুক্তিতে যে তাঁরা কোন সময়ে দাসীর মর্যাদার ছিলেন। হযরত উমরের এরূপ আচরণের তাঁরা ক্ষুদ্ধ হলেন এবং ভাতা নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁরা সমতার দাবী জানালে হযরত উমার (রা.) তাদের দাবী মানতে বাধ্য হলেন।[৫৫৪] এভাবে নবীজী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণও উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে প্রতিবাদী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

৫৫৪. ইউসুফ আল-কানধালূবী, nvqvZm mvnvev, দিমাশক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করন ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ২১৬

জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.) মহানবী (সা.) থেকে মোট সাতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর মধ্যে ইমাম বুখারী একটি এবং ইমাম মুসলিম দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৫৫] তাঁর কাছে যারা হাদীস শুনতেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত কয়েকজন হচেছন- ইবনে আব্বাস, জাবির ইবনে উমার, উবাইদ ইবনে আস, সাবাক, তুফাইল, আবু আইয়ূব মুরাগী, মুজাহিদ, কুবাইব, কুলসুম ইবনে মুসতালিক, আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, ইবনে আল হাদ প্রমূখ।[৫৫৬]

৯.৯ উম্মু হাবীবা (রা.)

উম্মু হাবীবা (রা.) অত্যন্ত মজবুত ঈমানের অধিকারী ছিলেন। ইসলামের জন্যে তিনি অসম্ভব ধৈর্য, দৃঢ়তা ও বিচক্ষনতা দেখিয়েছেন তা তুলনা করা যায় না। ইসলামের আবির্ভাবের কালেই তিনি স্বীয় মেধা ও বুদ্ধি দ্বারা সত্যকে চিনতে পেরেছিলেন। সত্যের জন্যে তিনি বাবা-মা, ভাই-বোনসহ সকল আত্মীয় বন্ধুদের ছেড়ে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। যে স্বামীকে অবলম্বন করে সবকিছু ছাড়লেন বিদেশ বিভূইয়ে সে স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তিনি সত্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হলেন না । তিনি তাঁর বিশ্বাসের উপর পর্বত পরিমান অটল ছিলেন। আর এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর সুগভীর ঈমানের কারণে। আল্লাহর প্রতি মজবুত ঈমানের পাশাপাশি তিনি মহানবী (সা.) কে সব কিছু উজাড়করে ভালবাসতেন। এর প্রমান পাওয়া যায় যখন তিনি মুশরিক পিতা আবু সুফিয়ানকে তা স্বামীর বিছানায় বসতে বারণ করেছিলেন তার মাধ্যমে।[৫৫৭] তিনি পিতার মুখের উপর বলে দিয়েছেন আপনি মুশরিক মহানবী (সা.) এর বিছানায় বসার যোগ্যতা রাখেন না। রাসূলের প্রতি কী পরিমান ভালোবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা থাকলে তিনি আপন পিতার সাথে এমন ব্যবহার করতে পারেন।

---

৫৫৫. ইমাম বুখারী, Avm mnxn Avj eLvix, হাদীস নং২০৩; ইমাম মুসলিম, mnxn gmwjg, হাদীস নং-১০৭৩ ও ২৭২৬; আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Avÿjvg Avbbevjv, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৩
৫৫৬. নিয়ায ফতেহপুরী, mvnwweqvZ, করাচী: নাফীস একাডেমী, ১৯৬২, পৃ. ৯৭
৫৫৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

নবীজী (সা.) এর হাদীসের উপর তিনি নিজে যেমন কঠোরভাবে আমল করতেন তেমনি অন্যদেরকেও আমল করতে বলতেন। একবার তিনি নবীজী (সা.) এর মুখে শুনলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন বারো রাকাত নফল নামায আদায় করবে তাঁর জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। এ হাদীস শোনার পর হতে উম্মু হাবীবা (রা.) প্রতিদিন বারো রাকাত নফল নামায আদায় করতেন এবং নিকটাত্মায়ীদেরকে অনুরূপ আমল করতে বলতেন। নিজের পিতার ইন্তিকালের তিন দিন পর তিনি সুগন্ধি কপালে মাখেন আর বলেন স্বামী ছাড়া কোন মৃত ব্যক্তির জন্যে তিন দিনের বেশি শোক করা জায়েয নেই।

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) মোট ৬৫টি হাদীস বর্ণনা করছেন। তার মধ্যে দুটি হাদীস মুত্তাফিকুন আলাইহি এবং দুটি ইমাম মুসলিম একক ভাবে বর্ণনা করেছেন।[৫৫৮] যে সকল রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- তাঁর স্বীয় কন্যা হাবীব, স্বীয় ভাই মুয়াবিয়া, উতবা, আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা, স্বীয় পিতা আবু সুফইয়ান, সালিম ইবনে সাওয়ার, আবুল জারবাহ, সাফিয়্যা বিনতে শায়বা, যায়নাব বিনতে উম্মু সালামা, উরওয়া ইবনে যুবাইর, আবু সালিহ আস সাম্মাম, শাহর ইবনে হাওশাব, আনবাসা, শুতাইব ইবেন শাকাল, আবুল মালিহ- আমি আল হজ্জালী প্রমূখ সাহাবীগণ।

৯.১০ হযরত সাফিয়্যা (রা.)

৫৫৮. আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi Av‡jvg Avb bevjv, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৯

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা.) লেখাপড়া জানতেন। তিনি প্রায়ই তাঁর ইয়াহুদী আত্নীয় স্বজনের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরে চিঠি লিখতেন। তাঁর এ দাওয়াতী কাজের ফলেই তাঁর অনেক আত্নীয় স্বজন ইসলাম কবুল করেছেন। তিনি ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন। এ জন্যে অনেকে তাঁর কাছ থেকে মাসয়ালা মাসায়েল জানতে চেয়েছেন ও জেনে নিয়েছেন।

ছহীরা বিনতে হায়দার হজ্জ পালন করার সময় সাফিয়্যা (রা.) এর সাথে দেখা করতে এসে দেখেন যে, কুফার একদল মহিলা মাসয়ালা জিজ্ঞাস করার জন্যে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন আর তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।[৫৫৯] ছহীরাও একই উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তিনি কুফার মহিলাদের মাধ্যমে নবীজী (সা.) এর হুকুম জানতে চান। এ প্রশ্নটি শুনে হযরত সাফিয়্যা (রা.) বলেন ইরাকীরা এই মাসয়ালাটি প্রায় জিজ্ঞাসা করে থাকে।[৫৬০]

হযরত সাফিয়্যা দশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেগুলো ইমাম যয়নুল আবেদীন, ইসহাক ইবনে আবিদুল্লাহ, ইবনে হারিছ মুসলিম, ইবনে সাফওয়ান রিনানা, ইয়ায়িদ ইবনে মু'আদ্দক প্রমূখ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণিত দশটি হাদীসের মধ্যে একটি মুত্তাফিকুন আলাইহে স্থান পেয়েছে।

হযরত সাফিয়্যা (রা.) খুব ভালকরে রান্না করতে পারতেন। নবীজী (সা.) যখনই তাঁর ঘরে আসতেন তখনই তিনি তাঁকে সুন্দর করে রান্না করে খাওয়াতেন। এমনকি নবীজী (সা.) যখন অন্য

৫৫৯. মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
৫৬০. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, Avj-gmbv', হাদীস নং ৩৩৭

বিবিগণের ঘরে আসতেন তখনও তিনি নবীজী (সা.) কে মাঝে মাঝে তাঁর রান্নাকরা খাবার পাঠাতেন।

হযরত সাফিয়্যা (রা.) স্বভাবগতভাবেই ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দানশীল। ইবনে সাদ লিখেছেন, যে ঘরখানিতে তিনি বসবাস করতেন জীবদ্দশায় তা দানকরে গিয়েছেন। আল্লামা যুরকানীর বর্ণনায় জানা যায়, উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে মদীনায় আসার পর তিনি নিজের কানের সোনার দু'টি দুল হযরত ফাতিমা (রা.) ও অন্য আযওয়াজে মুতাহহারের মধ্যে ভাগ করে দেন।[৫৬১]

হযরত উসমান (রা.) যখন বিদ্রোহী কতৃক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন নবীজী (সা.) এর পত্নী হযরত সাফিয়্যা সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেলেন। কখনও তিনি নিজে আবার কখনও অন্যের সাহয্যে হযরত উসমান (রা.) এর খাবার-পানীয়সহ অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌছাতেন।[৫৬২] এক্ষেত্রে তিনি নিজের জীবনের ঝুকি নিতে কার্পন্য করেননি। হযরত সাফিয়্যা (রা.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে বিপদের সময় মানুষকে সাহায্য করতে হয়, পাশে দাড়াতে হয় এবং জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়।

আবার তাঁকে আমরা প্রতিবাদী হতে দেখি। হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.) এর স্ত্রীদের মধ্যে যারা জীবনের কোন পর্যায় দাসী ছিলেন না তাদের প্রত্যেকে বারো হাজার দিরহাম নির্ধারণ করলেন অপরদিকে জীবনের কোন পর্যায় দাসত্বের জীবন বরণকারী প্রত্যেকে যখন ছয় হাজার দিরহাম নির্ধারণ করলেন; তখন হযরত সাফিয়্যা (রা.) যৌক্তিকভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে এর

---

৫৬১. ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৭
৫৬২. আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Avðjvg Avbbevjv, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৯

প্রতিবাদ করলে খালিফা উমর (রা.) সে দাবী মানতে বাধ্য হলেন।[৫৬৩] হযরত সাফিয়্যা (রা.) এভাবে উম্মাতে মুহাম্মাদী কে যৌক্তিক বিষয়ে নিজের স্বার্থ আদায়ের জন্যে প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছেন।

৯.১১ হযরত মায়মুনা (রা.)

নবী পত্নী হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রা.) খুব পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস ও শুদ্ধ ধ্যান-ধারণার মহিলা ছিলেন। একবার এক মহিলা অসুস্থাবস্থায় মানত করে যে যদি তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন তাহলে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে নফল নামায পড়বেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং মানত পূরণের উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস দিকে রওনা দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। যাওয়ার আগে হযরত মায়মুনা সাথে দেখা করতে আসলে তিনি তাকে বুঝালেন যে মদিনার মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের সওয়াব অন্য মসজিদের নামায আদায়ের সওয়াবের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং তুমি সেখানে না গিয়ে এখানেই থাক এবং ইচ্ছামত নফল নামায পড়।[৫৬৪]

ধার শোধ করার প্রবল ইচ্ছা থাকলে ধার করা যায় এ শিক্ষা আমরা বাস্তবিকভাবে ও ব্যাপকভাবে তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনি একবার একটু বেশি ধার করে ফেললেন। কেউ একজন বলল, এত ধার শোধ করার উপায় কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন যে ব্যক্তি শোধ করার প্রবল ইচ্ছা রাখে আল্লাহ নিজেই তা শোধ করে দেন।[৫৬৫] হযরত মায়মুনা (রা.) এর মধ্যে দাসমুক্ত করার প্রবল

৫৬৩. ইউসুফ আল-কানধালূবী, nvqvZm mvnvev, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৬,২১৮
৫৬৪. আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Avঁjvg Avbbevjv, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৪
৫৬৫. ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

আগ্রহ ছিল। একবার তিনি একজন দাসীকে মুক্ত করে দিলে মহানবী (সা.) বললেন এতে তুমি অনেক সওয়াব অর্জন করেছো।[৫৬৬]

শরীয়াতের বিধি বিধানের ব্যাপারে তিনি ভীষণ কঠোর ছিলেন। এ ব্যাপারে কোন রকমের শৈথিল্যতা বা নমনীয়তা তিনি দেখাতেন না। একবার তাঁর এক নিকট আত্নীয় দেখা করতে আসলে তাঁর মুখ থেকে মদের গন্ধ অনুভব করলেন। তিনি লোকটিকে শক্ত করে ধমক দিলেন এবং সাবধান করলেন যে সে যেন আর কোনদিন তাঁর কাছে না আসে।[৫৬৭]

একদা তিনি দাসীর মাধ্যমে সংবাদ পেলেন যে মাসিকের সময় হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঁর স্ত্রীর বিছানা পৃথক থাকে। তৎক্ষনাত দাসীকে পাঠিয়ে দিয়ে বলতে বললেন যে মহানবী (সা.) কখনও তাঁর বিবিদের মাসিকের সময় বিছানা পৃথক করতেন না। একদিন ইবনে আব্বাসের চুল দাড়ি অবিন্যস্ত দেখে হযরত মায়মুনা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে যে চুল দাড়ি ঠিকমত বিন্যস্ত করছো না? উত্তরে ইবনে আব্বাস জানালেন যে তাঁর স্ত্রীর মাসিক চলছে বিধায় তিনি তাঁর চুল-দাড়িতে চিরুনী দিতে পারছেন না। এরূপ জবাব শুনে হযরত মায়মুনা ইবনে আব্বাস (রা.) কে রাসূল (সা.) এর সাথে তাঁদের মাসিক অবস্থায় কি হত জানিয়ে দিয়ে বললেন, আমাদের মাসিক অবস্থায় নবীজী (সা.) আমাদের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন এবং কুরআনের তিলায়াত পর্যন্ত করতেন। শুধু কি তাই সে অবস্থায় আমরা মাদুর উঠিয়ে মসজিদে রেখে আসতাম । এভাবে হযরত মায়মুনা (রা.) এর মাধ্যমে ইসলামের বিরাট পন্ডিত ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

৫৬৬. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, Avj-gmbv', প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩২
৫৬৭. ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩৯; আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Avjvg Avbbevjv, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৪

(রা.) এরও ভুল ভেঙ্গে যায় এবং এর পর হতে তিনি মহানবী (সা.) এর রেখে যাওয়া বিধান মোতাবেকই স্ত্রীদের সাথে আচরণ করছেন।

হযরত মায়মুনা (রা.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। মহানবী (সা.) থেকে তিনি হাদীস শিক্ষালাভ করেছেন এবং পরবর্তীতে তা বর্ণনাও করেছেন। ইবনুজ জাওযী (রা.) এর মতে হযরত মায়মুনা (রা.) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৭৬টি। এর মধ্যে সহীহ মুসলিম ও বুখারীতে ১৩টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ৭টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ১টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৫৬৮] অন্যগুলো হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু হাদীসের মাধ্যমে শরীয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হযরত মায়মুনা (রা.) এর থেকে যারা হাদীস শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম হলো- হযরত আবদুললাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, ইবনুল হাদ আব্দুর রহমান, ইবনুস মায়িব, ইয়াযিদ ইবনে আসাম, উবায়দুললাহ আল খাওলানী, নাফবা, আতা ইবনে ইয়াসার, সুলায়মান ইবনে ইয়াসার, ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ, কুরাইব, উবায়দা ইবনে সিবাক, উবায়দুললাহ ইবনে আবদুললাহ, আলীয়া বিনতে সুবায় প্রমুখ হাদীস বর্ণনাকারী।

৯.১১-১২ হযরত রায়হানা ও মারিয়া কিবতীয়া (রা.)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত রায়হানা ও মারিয়া কিবতীয়া (রা.) এর ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ও প্রসার সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় নি। তবে এ দু'জন মহিয়সী নারী সম্পর্কে আমরা এতটুকু জেনেছি যে ইসলামের কারণে তাঁরা বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মহনবী (সা.) এর সাথে বিয়ের পর হতে

৫৬৮. মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

ইন্তিকালের পর্যন্ত তাদের পরিসরে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিয়েছিলেন। নিজেরা পুত:পবিত্র থেকেছেন এবং যারা তাঁদের কাছে আসতেন তাদেরকে পুত:পবিত্র থাকতে বলতেন। তাঁরা সকলকে ধৈর্য্যের শিক্ষা দিতেন। হযরত রায়হনা সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্বেও ইসলামের কারণে কষ্টকর জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন এবং এতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.) মিসরের বাদশাহ মুকাওকিস এর খুবই কাছের ছিলেন। মিশর থেকে মদিনায় এসে ইসলামের দাওয়াত পাওয়া মাত্রই মুসলমান হলেন এবং মহানবী (সা.) এর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। মহানবী (সা.) তাঁর সেবায় ও আন্তরিকতায় খুবই খুশি ছিলেন। পুত্র ইবারাহীমের মৃত্যুও তাঁকে টলাতে পারেন নি যেখানে মহানবী (সা.) এর চোখ দিয়ে অশ্রু পর্যন্ত বের হয়েছিল। তিনি খুবই ধৈর্যশীল ও সংযমী ছিলেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনের অংশগ্রহণ চোখে না পড়লেও একথা বলার অবকাশ রাখে না যে ধৈর্য, সংযম ও ত্যাগের মহান শিক্ষাই উম্মাতে মুহাম্মাদী (সা.) এর জন্যে রেখে গেছেন।

দশম অধ্যায়

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারে মহানবী (সা.) এর সম্মানিত সহধর্মীনীদের কর্ম প্রয়াস

১০.১ হযরত খাদিজা (রা.)

ইসলামের ইতিহাসে হযরত খাদিজা (রা.) একজন প্রাণবন্ত উজ্জীবিত ও অনুকরণীয়-অনুস্বরণীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। তিনি এক বিস্ময়কর জীবন অতিবাহিত করেছেন যা সকলের জন্যে পরম আদর্শনীয়। তিনি সবসময়ে পরিপাটি জীবন যাপন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, সম্মান এবং আভিজাত্য খুব বেশি পরিচিতি ছিল এবং আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। এজন্যে সবাই তাঁকে তাহিরা বলে ডাকতো। আরবী শব্দ 'তাহিরা' এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও পুত:পবিত্র। এমন একটা সময় তাঁকে এ নামে ডাকা হত যখন সামাজিক মূল্যবোধ সর্বোতভাবেই বিনষ্ট হয়েছিল।[৫৬৯]

তিনি ছিলেন কুরাইশ মহিলাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মহিলা। কুরাইশগণ তাঁকে একটা বিশেষ সম্মাসূচক নামে ডাকতো। হযরত খাদিজা (রা.) কোন জিনিস খুব সহজেই ও দ্রুত অনুধাবন করতে পারতেন এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য অনায়াসেই উদঘাটন করতে পারতেন। ফলে এ সকল পারদর্শিতার জন্যে তাকে আরবের লোকেরা 'যাইদা' বা পন্ডিত ব্যক্তি বলে জানতো।[৫৭০]

হযরত খাদিজা (রা.) মক্কার পৌত্তলিক পরিবেশে বড় হলেও পৌত্তলিক সংস্কৃতির ছোয়া থেকে তিনি দূরে ছিলেন। পারিবারিক কারণে বিশেষকরে নিকটাত্মীয় ওয়ারাকা ইবনে নওফেল এর

---

৫৬৯. রাশীদ হাইলামায়, *খাদিজা (রা)*, (অনু, মুহাম্মদ আদম আলী), ঢাকা: মাকতাবুল ফুরকান, ২০১৫, পৃ. ২৫
৫৭০. প্রাগুক্ত

কারণে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। আহলে কিতাবধারীদের ধর্ম তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে তিনি জানতেন। মক্কায় প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস এবং ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জ্ঞান তাঁকে স্বাধীন এক ধর্ম বিশ্বাসের ধাবিত করেছিল। আর সেটি ছিল হানাফী তথা দেব- দেবীর পূজা পার্বন থেকে দূরে থেকে এক আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া।

হযরত খাদিজা (রা.) মানুষের সাথে মিশতেন, তবে মানুষের খারাপ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হতেন না। কোন এক উৎসবের সকালে মক্কার মহিলারা এক স্থানে সমবেত হয়েছিল। হযরত খাদিজা (রা.)ও ছিলেন তাদের মধ্যে তবে তিনি তাদের সাথে গাল-গল্প না করে পবিত্র কাবা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ এক অপরিচিত আগন্তকের কথা শুনে সবাই ঐ ব্যক্তিকে বকাবকি করছিল। কিন্তু দূরদর্শী খাদিজা (রা.) গভীর মনোযোগের সাথে ঐ ব্যক্তির কথাগুলো খেয়াল করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে ঐ লোকটি আসলে পাগল নয় বরং একজন অধ্যাত্মিক পুরুষ যিনি শেষ নবীর আগমনের সংবাদ দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন তোমাদের মধ্যে কেউ কি সৌভাগ্যবান মহিলা আছে যিনি আখেরী নবীর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে?[৫৭১] এ কথা তাঁর অন্তর-মনে দারুন ছাপ রাখে এবং তখন থেকেই তিনি শেষ নবীর স্ত্রী হওয়ার আশা করতে থাকেন।

হযরত খাদিজা (রা.) দক্ষ ব্যবসায়ী প্রশাসক ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত লোক নিয়োগ করতেন। মূলত: তাঁর ব্যবসা ছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। যারাই তাঁর অধীনে কাজ করেছেন তাঁরা কেউ বলতে পারবেন না যে হযরত খাদিজা (রা.) কারও সাথে খারাপ আচরণ করেছেন। তাঁর অমায়িক, শালীন, কোমল ও ভদ্র ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

---

৫৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

যাহোক, তাঁর ব্যবসায়ী কাজে চাচা আবু তালেবের পরামর্শে হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত খাদিজা (রা.) এর ব্যবসায়ে যোগদান করেন। পূর্ব থেকেই হযরত খাদিজা (রা.) মুহাম্মদ (সা.) এর বিশ্বস্ত ও যোগ্যতার কথা শুনে আসছিলেন। এবার স্বয়ং তিনি মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে কথা বলে খুবই মুগ্ধ হলেন। দূরদর্শী হযরত খাদিজা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নেতৃত্বে চলমান ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে তাঁর নির্ভরযোগ্য দাস মাইসারাকে পাঠালেন যাতে মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বিস্তারিত খবর জানা যায়। কাফেলা ফিরে আসলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যাবতীয় হিসাব নিকাশ বুঝে দিলেন—এতে হযরত খাদিজা (রা.) আরও অনেক খুশী হলেন। দাস মাইসারাকে জিজ্ঞাসা করে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে সংঘটিত সকল কিছুর বিস্তারিত বিবরণ শুনে পন্ডিত ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গিয়ে খুলে বললেন। সকল কিছুর বিবরণ শুনে পন্ডিত ওয়ারাকা খাদিজা (রা.) কে স্পষ্টকরে বললেন যে তিনি প্রতিশ্রুত শেষনবী।[৫৭২] হযরত খাদিজা (রা.) আর আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না বাসায় এসে কবিতার মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) কে বিয়ে করার অব্যক্ত বাসনা পোষণ করতে লাগলেন।[৫৭৩] যদিও সে কবিতাগুলো আর সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায় নি; তবে বহু মাধ্যমে জানা গেছে যে, হযরত খাদিজা (রা.) কাব্যিক মনের মানুষ ছিলেন। তিনি যখন মনের মাধুরী মিশিয়ে ছন্দময় কবিতার কিছু লাইন আবৃতি করছিলেন তখন তাঁর দাসী নাফিসা তা বুঝতে পেরে তাঁর অনুমতি নিয়ে মহানবী (সা.) এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে চাচা আবু তালিবের কাছে আসলেন।[৫৭৪] চাচা আবু তালিব ভাতিজা মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে আলাপ আলোচনা করে বিয়েতে মত দিলেন।

৫৭২. প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪-৪৫
৫৭৩. প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৫
৫৭৪. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩২

বিয়ের অনুষ্ঠানের দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেলে হযরত খাদিজা (রা.) দূরের ও কাছের আত্নীয়, পাড়া-প্রতিবেশি ও বন্ধ-বান্ধবীদেরকে দাওয়াত দিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) কী পরিমানের সাংস্কৃতিক মনা ছিলেন তার প্রমান তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখলেই বুঝা যায়। তবে একক প্রচেষ্টায় ও ব্যবস্থাপনায় সারা দিন ধরে বাড়ীতে বৈধ সকল ধরনের আনন্দ উৎফুল্লতার ব্যবস্থা করেছিলেন। দফ বা তাম্বুরি বাজানোর বিশেষ ব্যবস্থা ছিল সেখানে।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে নেচে-গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিল। মক্কার গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের অধিকাংশই এ বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বর কনেকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আবার অনেকেই কবিতার মাধ্যমে ছন্দকারে তা বর্ণনা করছিলেন।[৫৭৫]

হযরত খাদিজা (রা.) এর বিয়ের ওয়ালী কে ছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট মত-বিরোধ আছে। কেউ বলেছেন চাচা আবার কারো মতে বাবা। ওয়ালী যেই হোক না কেন হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর ওয়ালীকে বিয়েতে রাজী করিয়েছিলেন এবং বিবাহের সময় তার গায়ে নতুন পোষাকও পরিধান করিয়েছিলেন যা ছিল সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে আসলেই দুর্বোধ্য ও জটিল কাজ।[৫৭৬]

হযরত খাদিজা (রা.) এর সামাজিক জ্ঞান ছিল অপরিসীম। বিয়েতে তিনি মহানবী (সা.) এর দুধমাতা হালিমা আস সাদিয়া (রা.)কেও নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যেন ছেলে মুহাম্মদ (সা.) এর বিয়েতে আনন্দ প্রকাশ করতে পারেন। বিয়ে চলাকালীন যাবতীয় অনুষ্ঠান থেকে একটু অবসর পেলেই খাদিজা (রা.) বিবি হালিমার কাছে এসে মুহাম্মদ (সা.) এর শিশুকাল সম্পর্কে জানতে

৫৭৫. রাশীদ হাইলামায, প্রাগুক্ত পৃ.৫৩
৫৭৬. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৭-৯৮

চাইতেন। বিয়ের পরের দিন বিবি হালিমা (রা.)কে বিদায় দিতে এসে বেশ কিছুদূর পথ এগিয়ে দিয়েছিলেন।[৫৭৭]

হযরত খাদিজা (রা.) এর কমন সেন্স ছিল অনেক বেশি। তিনি জানতেন মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষে বিয়ের অনুষ্ঠান ও বৌভাতের আয়োজন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি নিজেই বিয়ের খরচাদি বহন করেছিলেন এবং দুই উকিয়া সোনা ও রুপা মহানবী (সা.) কে উপহার দিয়েছিলেন যেন নবীজী (সা.) তা দিয়ে নিজের পোশাক, মোহরানা ও ওয়ালীমার বন্দোবস্ত করতে পারেন।[৫৭৮]

হযরত খাদিজা (রা.) শুধু পয়সার দিক থেকেই স্বাবলম্বী ছিলেন না বরং কাজ কর্মের দিক থেকেও তিনি ছিলেন স্বাধীন ও স্বাবলম্বী। বিয়ের পর ঘর সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম শুধু দাসীর উপর ছেড়ে দেননি বরং অধিকাংশ কাজ-কর্মই তিনি নিজে করেছেন এবং সর্বদা মহানবী (সা.) এর আরাম-আয়েশের প্রতি খেয়াল রেখেছেন।

বিয়ের পরে তাঁদের দাম্পত্য জীবন মক্কার যে বাড়ীতে শুরু হয় তা কেবল তাদের নিজেদের বাড়ী ছিল না বরং তা ছিল সকল আর্ত-পীড়িত ও অভাবী মানুষের আশ্রয়স্থল। এ বাড়ীতেই অন্যান্যদের মধ্যে হযরত আলী, যায়িদ, উম্মে হিন্দ ও যুবাইর ইবনে আওয়াম আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং হযরত খাদিজা (রা.) এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। এ থেকে বুঝা যায়, হযরত খাদিজা (রা.) খুবই ভাল তত্ত্বাবধায়ক ও প্রশিক্ষক ছিলেন। এ বাড়ীতে উম্মে আইমন যাকে মহানবী (সা.) দ্বিতীয় মা বলে ডাকতেন হযরত খাদিজা (রা.) এর খাতির-যত্নেই বাকী জীবন কাটিয়েছিলেন।[৫৭৯]

---

৫৭৭. রাশীদ হাইলামায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৫৭৮. ইউসুফ আল-কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৫২
৫৭৯. রাশীদ হাইলামায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭

হযরত খাদিজা (রা.) খুবই স্বামী ভক্তিকারী ছিলেন। বয়সে মহানবী (সা.) এর চেয়ে ১৫ বছরের বড় হলেও তাঁর কোন আচরণেই মহানবী (সা.) কে ছোটকরার বা ছোট হওয়ার কারণ ফুটে ওঠেনি; বরং সর্বদা তিনি মহানবী (সা.) কে তুষ্ট করার যথা সাধ্য চেষ্ট করেছেন। অনেক সময় তিনি মহানবী (সা.) কে ও পরামর্শ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.) কে তিনি ভিতর থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর জন্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে তিনি কোন দিনও দ্বিধাবোধ করেননি। উল্লেখ্য, বিয়ের পর তাঁর সম্পদের সবকিছুই মহানবী (সা.) এর মালিকানায় অর্পণ করেছিলেন এবং তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন সেখান হতে ইচ্ছামত খরচ করার।

মহানবী (সা.) ও খাদিজা (রা.) এর দম্পতির পাঁচ জন ছেলে-মেয়ে হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের প্রতিই খুবই যত্নবান ছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)। জীবনের কোন মুহূর্তেই তাদের প্রতি অবজ্ঞা বা অবহেলা প্রদর্শন করেন নি। এতে প্রমানিত হয়, তিনি শুধু ভালো স্ত্রীই ছিলেন না বরং ভালো মাও ছিলেন।

ওহী নাযিলের পূর্ববতী সময়ে মহানবী (সা.) মাঝে মাঝে ভয় পেতেন ও পেরেশানীতে পড়তেন। একইভাবে প্রথম ওহী নাযিলের সময়কালেও বিরুপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন এবং আচমকা ভয় পেয়ে যান। এ সময়গুলোতে হযরত খাদিজা (রা.) মহানবী (সা.) এর প্রতি উত্তম পরামর্শদাতা ও অভিভাবকের ন্যায় ভূমিকা পালন করেছেন।[৫৮০] রাশীদ হাইলামায যথার্থই মন্তব্য করেছেন

৫৮০. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৬

“যখনই রাসূল (সা.) কোন বিরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি খাদিজা (রা.) এর কাছে এসে শান্তি পেতেন।”[৫৮১]

হযরত খাদিজা (রা.) কেবল মহানবী (সা.) এর স্ত্রীই ছিলেন না বরং তিনি বিনা যুক্তিতে সবার আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রথম মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তাঁর যে ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত রয়েছে; এর সাথে অন্যকারো তুলনা হয় না। তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে শিয়াবে আবু তালিবে দীর্ঘ দু’টি বছর অতিবাহিত করেন। তাঁর মৃত্যুতে নবীজী (সা.) সত্যিই অতি উত্তম পরামর্শদাতা ও অভিভাবককে হারিয়েছিলেন।

১০.২ হযরত সাওদা বিনতে যাময়া (রা.)

হযরত সাওদা বিনতে যাময়া (রা.) মহানবী (সা.) কে হযরত খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর পর খাদিজা (রা.) এর মত করে সেবা দানের চেষ্টা করেন। তবে তাঁর শারীরিক স্থূলতায় ও বয়স্কজনিত কারণে তিনি পুরোপুরি সেভাবে পেরে উঠেননি।[৫৮২] হযরত সাওদা (রা.) এক চরম দুর্দিনে মহানবী (সা.) এর স্ত্রী হয়ে আসেন যখন মহানবী (সা.) এর অতি আপন দু’জন (খাদিজা ও আব্দুল মোতালেব) ইন্তিকাল করেন। অপরদিকে মক্কার কুরাইশ কাফেরাও নবীজী (সা.) ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রাও বাড়িয়ে দিয়েছে। এরূপ এক দুর্দিনে হযরত সাওদা (রা.) মহানবী (সা.) এর পাশে থেকে তাঁকে সাহস ও উৎসাহ যোগাচ্ছিলেন।

---

৫৮১. রাশীদ হাইলামায়, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৭
৫৮২. ড. আহমাদ আস-শালবী, *আত-তারীখ আল-ইসলামী*, কায়রো, ১৯৮২, খ. ১, পৃ. ৩২৮

হযরত সাওদা (রা.) সর্বদা মায়ের গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি নবী নন্দিনী উম্মু কুলছুম ও ফাতিমা (রা.) কে এমনভাবে লালন পালন করেন যে তাঁরা কোনদিনই তাঁদের মায়ের অভাব অনুভব করেননি।[৫৮৩] তিনি শুধু তাঁদেরকে আদরই করেননি বরং অতি যত্ন ও মহব্বতের সাথে তাঁদেরকে উত্তম আচরণ ও ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন এবং সেই সাথে ঘর গৃহস্থলীর যাবতীয় কাজ-কর্ম কিভাবে সুন্দরভাবে সমাধান করা যায় সে শিক্ষাও তিনি তাঁদেরকে দিয়েছিলেন।

তিনি হযরত আয়েশা (রা.) কে নিজের সতীন না ভেবে অতি আপনজন ভেবেছেন। তাঁর সাথে রাসূলের সান্নিধ্যে থাকার বরাদ্দকৃত রাত্রও তিনি হযরত আয়েশা (রা.) কে দান করেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায়, তিনি কেমন উদার মনের মহিয়সী নারী ছিলেন। ব্যবহার ও আচরণের দিক থেকে তিনি স্বল্প ভাষিণী ও মধুর আচরণের অধিকারী ছিলেন। তিনি সর্বদা স্বল্পে তুষ্ট থাকতেন এবং মানুষের সাথে খুবই চমৎকার ব্যবহার করতেন।

হযরত সাওদা (রা.) বেশ রসিক ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি এমন এমন রশিকতাপূর্ণ কথা বলতেন যা শুনে মহানবী (সা.)ও হেসে ফেলতেন। একবার তিনি নবীজী (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, কাল রাতে আমি আপনার সাথে সালাত পড়ছিলাম। আপনি রুকুতে এত বেশি দেরী করছিলেন যে, আমার মনে হচ্ছিল নাক ফেটে রক্ত ঝড়বে। এ কারণে আমি আমার নাক অনেকক্ষন টিপে ধরেছিলাম। নবীজী (সা.) তাঁর এ কথা শুনে মুচকি হাসি দিয়েছিলেন।[৫৮৪]

---

৫৮৩. মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
৫৮৪. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৪

একবার তিনি হযরত আয়েশা ও হাফসা (রা.) এর সাথে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দু'জন একটু কৌতুক করে বললেন, আপনি কি কিছু শুনেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, কোন বিষয়ের কথা বলেছেন? তখন তাঁরা তাঁকে দাজ্জালের বের হওয়ার কথা বললে তিনি ভীষন ভয় পেয়ে পাশেই অবস্থিত তাবুতে ঢুকে পড়লেন। তাঁর এ কান্ড দেকে হযরত হাফসা ও আয়েশা (রা.) হাসতে হাসতে নবীজী (সা.) এর নিকটে আসলেন এবং তাঁদের কৌতুকের কথা বললেন। তখন নবীজী (সা.) তাবুর দরজায় দাড়িয়ে বললেন এখনো দাজ্জাল বের হয়নি। তখন সাওদা (রা.) মহানবী (সা.) এর কথায় আশ্বস্ত হয়ে উক্ত তাবু থেকে বের হলেন।[৫৮৫] এ থেকে সহজেই বুঝা যায় হযরত সাওদা (রা.) কত সরল সহজ মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোন ধরনের প্যাচ-গ্যোচ বা বক্রতা ছিল না। তিনিই এতই সরল মনের মহিয়সী নারী ছিলেন যে, সাধারণ কৌতুকের বিষয়কেও তিনি কৌতুকের বিষয় হিসেবে বিশ্বাস করতে চাইতেন না। তাঁর অতি সরল বিশ্বাসের কারণে মাঝে মাঝে তিনি একটু বোকামীর পরিচয় দিতেন আর তাঁর এ আচরণে অন্যেরা একটু খানি হাস্যরসের বিষয় খুজে পেতেন।

১০.৩ হযরত আয়েশা (রা.)

হযরত আয়েশা (রা.) ছোট বেলা থেকেই সৃষ্টিশীল বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। পিতা হযরত আবু বকর (রা.) এর মাধ্যমে তিনি আরবের সংস্কৃতির যে সকল ভাল ভাল দিক ছিল তার সবটুকুই শিখেছিলেন। তিনি চমৎকার ব্যবহারের ও রুচিশীল আচরণের মহিয়সী নারী ছিলেন। বাল্যবয়সে তিনি সহপাঠীদের সাথে পুতুল খেলতে পছন্দ করতেন। তাঁর কাছে বহু রকমের পুতুল সংগ্রহে ছিল। এমনকি বিয়ের পরও তিনি পুতুল খেলা হতে বিরত হতে পারেন নি। এমনও দেখা গেছে যে, মহানবী (সা.) শ্বশুর বাড়ীতে আগমন করেছেন অথচ স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) তখনও

৫৮৫. সাঈদ আনসারী, *সিয়ারু সাহাবীয়াত*, আজমগড়: মাতবা'আ মাআরিফ, ১৩৪১ হি. পৃ. ১৮

বান্ধবীদের সাথে পুতুল খেলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর এ ধরনের খেলা-ধুলা দেখে মহানবী (সা.) কখনও বিরক্ত বোধ করতেন না বরং হযরত আয়েশা (রা.) এর মন-মানসিকতা বুঝে তিনিও তাঁর সাথে সায় দিতেন। অনেক সময় এমন হতো যে হযরত আয়েশা (রা.) অন্যদের সাথে পুতুল নিয়ে খেলছেন তখন রাসূল (সা.) তাদের গৃহে আগমন করেছেন এবং হঠাৎ তাদের মধ্যে হাজির হয়েছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) তাড়াতাড়ি পুতুলগুলো লুকিয়ে ফেলতেন আর অন্য সাথীরা নবীজী (সা.) কে দেখামাত্র ছুটে পালাতো। মহানবী (সা.) শিশুদেরকে খুবই ভালবাসতেন। তাদের খেলাধুলাকেও তিনি খারাপ মনে করতেন না। তিনি পালিয়ে যাওয়া শিশুদের ডেকে এনে হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে খেলতে বলতেন।[৫৮৬]

শিশুদের খেলাধুলার মধ্যে দু'টি খেলা ছিল হযরত আায়েশা (রা.) এর খুবই প্রিয়। খেলা দুটি হচ্ছে পুতুল খেলা ও দোল খাওয়া।[৫৮৭] একদিন মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) এর পুতুল গুলোর মধ্যে একটি দু'ডানাওয়ালা ঘোড়ার পুতুল দেখে বললেন ঘোড়ার কি ডানা হয়? হযরত আয়েশা (রা.) প্রতি উত্তরে বললেন কেন? সোলায়মান (আ.) এর ঘোড়াগুলোর তো ডানা ছিল—একথা তো আপনার জানা থাকার কথা। হযরত আয়েশা (রা.) এর এমন উপস্থিত জবাব শুনে মহানবী (সা.) মুচকি হাসি দিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) এর কথাকেই সমর্থন দিলেন।[৫৮৮]

হযরত আয়েশা (রা.) ছোট বেলা থেকেই খুব পরিপাটি ও সাজানো-গোছানো ছিলেন। বিয়ের সময়ে তিনি হাওফ নামক এক প্রকার রুচিশীল ও শালীন পোশাক পছন্দ করতেন। পিতা হযরত

---

৫৮৬. মুসলিম শরীফ, *সহীহ মুসলিম*, ফাদায়িলুস সাহাবা, *ইমাম বুখারী আস সহীহ আল বুখারী*: কিতাবুল আদব বাবুল ইনবিসাত ইলান্নাস

৫৮৭. ইমাম আবু দাউদম কিতাবুল আদব

৫৮৮. মিশকাত শরীফ: *আশরাতুন নিসা*, হাদীস নং-৭৫; ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান কিতাবুল আদব-বাবুল লাব বিল-বানাত*

আবুবকর (রা.) সে সময়ে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মেয়ে হযরত আয়েশা (রা.) কে মোটামুটি সুন্দর রুচিশীল ও আভিজাত্যের প্রতীক বহন করে—এমন পোশাক ক্রয় করে দিতেন।

বিয়ের পর স্বামীর ঘরে এসে হযরত আয়েশা (রা.) কে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। স্বামীর সংসারে না ছিল তাঁর সুন্দর বাড়ী, সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র বা জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ। এমন দিন তাঁকে কাটাতে হয়েছে যখন কোন খাবার ছিল না। রাত্রির পর রাত্রি কপি বাতিতে আলো জ্বালানোর মত কোন তৈলও অবশিষ্ট ছিল না।[৫৮৯]

মিতব্যয়িতা ও অল্পেতুষ্টির কারণে মাত্র একজোড়া পরিধেয় বস্ত্র রাখতেন। তাই একখানা ধুয়ে অন্যখানা পরতেন।[৫৯০] তিনি একটি দামী জামা পড়তেন যার মূল্য ছিল সে সময়ে পাঁচ দিরহাম। বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানে তাঁর সে জামা কনেকে সাজানোর জন্যে তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া হত।[৫৯১] কখনো কখনো জাফরান দিয়ে রঙ করা কাপড় হযরত আয়েশা (রা.) পড়তেন। আবার মাঝে মাঝে অলংকারও পড়তেন। ইয়েমেনের তৈরি সাদা কালো মোতর একটি বিশেষ ধরনের হার গলায় পড়তেন। আঙ্গুলে সোনার আংটি পড়তেন।[৫৯২] মাঝে মাঝে তিনি রেশমীর চাদরও ব্যবহার করতেন।[৫৯৩]

পোশাকের ব্যাপারে শরীয়াতের বিধি বিধানের প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)। একবার ভাতিজী হাফসা বিনতে আবদুর রহমান মাথায় একটি পাতলা ওড়না দিয়ে তার

---

৫৮৯. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আল মুসনাদ*, হাদীস নং-২০৭১৪৭২
৫৯০. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ আল বুখারী*, বাবু হালতুসালিল আল মারয়াতুফী সাত্তাবিন হাদাত ফীহে
৫৯১. প্রাগুক্ত, বাবুল ইসতিয়ার লিল আরুস
৫৯২. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ আল বুখারী*, বাবু মা ইয়ালবাসুল মুহামবিনসিলাস সিয়ার বাবুত তায়াম্মুম ইফক ওয়া খাতা মিননিসা
৫৯৩. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৮

সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি সেটা নিয়ে নেন এবং তাকে পূর্ণ একটি ওড়না দিয়ে দেন।[৫৯৪] একদা তিনি এক বাড়ীতে মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। গৃহকর্তার বারন্ত বয়সের দু'মেয়েকে ওড়না ছাড়াই নামায পড়তে দেখলেন। নামায শেষে তিনি তাদেরকে বললেন ভবিষ্যতে তারা যেন ওড়না বা চাদর ছাড়া নামায না পড়ে।[৫৯৫]

হযরত আয়েশা (রা.) একটু রঙ-বেরঙের জিনিসপত্র বেশি পছন্দ করতেন। একদা ছবি অংকিত দরজার পর্দা উপহার হিসেবে পেলেন এবং খুশি হেয় তা দরজায় টানিয়ে দিলেন।[৫৯৬] মহানবী (সা.) এর দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হলে তা তিনি পরবর্তীতে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলেন এবং ছবি অংকিত অংশটি ছিড়ে ফেলে দেন।

হযরত আয়েশা (রা.) যে সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তা ছিল ক্ষমা করার সংস্কৃতি। ইফকের ঘটনায় জড়িত রাসূলের দরবারী কবি হযরত হাসসান বিন ছাবিত (রা.) কেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাকে ঘৃণা না করে সারা জীবন সম্মান করেছেন। জীবনে তিনি বহু মানুষকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর নিজের সতীনদের সাথেও তিনি খারাপ আচরণ করেননি। মানবিক দুর্বলতার কারণে কখনও তাঁদের মধ্যে মনো- মালিন্য হলে পরক্ষণই তিনি তা স্বাভাবিক করে নিতেন। একদা ভাগিনা আবদুল্লাহ বিন যোবয়ের (রা.) এর সাথে কথা না বলার কসম করেছিলেন। পরবর্তীতে আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের ক্ষমা চাইলে তাঁকে তিনি মাফ করে দিয়েছিলেন এবং কসম ভাঙ্গার কাফফারা স্বরুপ চল্লিশ জন গোলাম আযাদ করে দিয়েছিলেন।[৫৯৭]

৫৯৪. ইবন সাদ, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫০
৫৯৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৭৯৬
৫৯৬. ইমাম বুখারী, আস সহীহ আল বুখারী, বাবুততাসবীর
৫৯৭. তালিবুল হাশেমী, *মহিলা সাহাবী*, (অনুবাদে আব্দুল কাদের), ঢাকা:আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ. ৪২

হযরত আয়েশা (রা.) ন্যায় ও সত্যের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। উসমান (রা.) এর কথিত হত্যাকারী নিজ ভাই মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে তিনি কখনও ক্ষমা করেননি। যদিও উষ্ট্রের যুদ্ধে মুহাম্মদ বিন আবুবকর এর সহায়তায় হত্যাকান্ড হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এবং তারই নেতৃত্বে এক কাফেলা পাহাড়াদারের মাধ্যমে তিনি যুদ্ধস্থল থেকে মক্কায় পৌছেছিলেন। মূলত ভুলবসতভাবে সংঘটিত হয়ে যাওয়া এ যুদ্ধ আসলে হযরত আয়েশা (রা.) এর পক্ষ হতে ছিল না বরং হযরত আলী (রা.) কে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যকারীদের বিচারের উদ্দেশ্যে চাপ প্রয়োগ করার জন্যে হযরত আয়েশা (রা.) এর পক্ষ হতে এক বিশাল গণজমায়েত ও কৌশল ছিল। যাহোক, এখানে সে যুদ্ধের কারণ, কৌশল ও ফলাফল বর্ণনা করা উদ্দেশ্যে নয় বরং হযরত আয়েশা (রা.) যে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষের লড়াকু সেনিক ছিলেন তাঁর উদহারণ হিসেবে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হল।

হযরত আয়েশা (রা.) এর স্বভাবের মধ্যে কোন লোক দেখানো, নিন্দা করা বা শোনা, কারো সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি ছিল না। সর্বদা তিনি মানুষের উপকারী, হিতাকাঙ্খী ও পরম বন্ধুই ছিলেন। যদিও তাঁর নিজের সন্তান-সন্ততি ছিল না; কিন্তু তিনি অন্যের সন্তান-সন্ততিকে নিজের কাছে এনে উত্তম আচরণ ও ব্যবহারের শিক্ষা দিতেন। অনেক ইয়াতিম শিশুকে তিনি আশ্রায় দিয়ে নিজের কাছে রেখে বিবাহ শাদী পর্যন্ত দিয়েছেন। তাঁর দিল এতই নরম ছিল যে তিনি মানুষের বিপদ আপদ দেখলে সহ্য করতে পারতেন না। যেভাবে পারতেন সেভাবেই সাহায্য করতেন বিপদে পতিত সহায় সম্বলহীন মানবতাকে। এভাবে নিজের অর্থ-সম্পদের সব টুকুনই তিনি সমাজকল্যাণ ও জনকল্যাণের স্বার্থে নি:স্বার্থভাবে বিলি-বন্টন করে দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন খুবই সাহিত্যিক মনার মহিয়সী নারী। কবিতা ও গল্প মুখে বলা, মাঝে মাঝে অন্যকে শোনানো ও বানানো তাঁর খুবই পছন্দের বিষয় ছিল। নবীজী (সা.) কেও তিনি বহু গল্প ও

কবিতার চরণ শুনিয়েছিলেন আর মহানবী (সা.) তা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। মাঝে মাঝে তিনি কবিতার কিছু কিছু লাইন বানাতেন এবং সুযোগমত আবৃত্তি করতেন। তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড থেকে আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি সংক্ষেপে তা হল তিনি খুবই রুচিশীল, ভদ্র, মার্জিত, শালীন, পরোপকারী ইত্যাদির মত মহান ও মহৎ মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তিনি যা বলতেন, যা করতেন, যা পড়তেন, যা ব্যবহার করতেন—সবই ছিল মুসলিম সাংস্কৃতিক কর্ম-কান্ডের জন্যে পথ-নির্দেশিকা ও অনুস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর চিন্তা-ধারা, অধ্যবসায় ও জীবন-আচরণ দিয়ে উম্মাতে মুহাম্মদীকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন কিভাবে রুচিশীল ও ভদ্র মননের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড করতে হয় । গবেষণা পত্রের আকার কলবরে বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে হযরত আয়েশা (রা.) এর সাংস্কৃতিক কর্ম কান্ডের আলোচনা এখানেই শেষ করতে হচ্ছে।

১০.৪ হযরত হাফসা (রা.)

হযরত হাফসা (রা.) খুবই সাদা-সিধে জীবন যাপন করতেন। তাঁর জীবনে কোন ধরনের ভোগ-বিলাসিতার ছোয়া লাগেনি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটু রাগী স্বভাবের ছিলেন এবং যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন। মহানবী (সা.) এর সাথে তিনিও প্রথম দিকে কথার পিঠে কথা বলতে চাইতেন তবে পিতা হযরত উমর (রা.) এর ভয়ে ও কড়া শাসনে সে অভ্যাস থেকে ফিরে আসেন।[৫৯৮] হযরত হাফসা (রা.) খুবই সরল মনের অধিকারী ছিলেন এবং কিছুটা ভীতু ধরনেরও ছিলেন। তিনি দাজ্জালের ভায়ে ভীতু থাকতেন। তবে সর্বদা তিনি নফল ইবাদত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি লেখাপড়া শিখার প্রতি আগ্রহী ছিলেন বিধায় মহানবী (সা.) একজন শিক্ষিত মহিলা হযরত শিফা (রা.) কে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন হযরত হাফসা (রা.) কে লেখাপড়া শিখান। হযরত

৫৯৮. ইমাম বুখারী, *আস সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং-১৯৫-১৯৬; ইউসুফ আল-কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৮২-৬৮৩

হাফসা (রা.) তার কাছ থেকে কতিপয় ঝাড়ফুকের দুয়াও শিখেছিলেন।[৫৯৯] হযরত হাফসা (রা.) আরেকটি বিখ্যাত কর্মের সাক্ষী হয়ে আছেন। আর তা হলো দীর্ঘদিন তিনি নিজের কাছে পবিত্র কুরআনের কপি সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন এবং হযরত উসমান (রা.) এর চাহিদামত সরবরাহ করে কুরাইশদের আরবী উপভাষায় পবিত্র কুরআন সংকলনের গৌরবের সাথে মিশে আছেন নবী পত্নী হযরত হাফসা (রা.)।

১০.৫ হযরত যায়নাব বিনতে খোযায়মা (রা.)

হযরত যায়নাব বিনতে খোযায়মা (রা.) বাল্য বয়স থেকেই প্রশস্ত হৃদয় ও উদার মনের অধিকারী ছিলেন। ফকির-মিসকিনদের সাহায্যের জন্য সর্বদা সদা প্রস্তুত ছিলেন এবং ভূখা-নাঙাদেরকে অত্যন্ত উদারতার সাথে খাবার খাওয়াতেন। এসব গুণাবলীর জন্যে তিনি জনসাধারণের কাছে উম্মুল মাসকিন বা অসহায় দারিদ্রদের অভিভাবক নামে খ্যাত ছিলেন।[৬০০] হযরত যায়নাব বিনতে খোযায়মা (রা.) নবীজী (সা.) এর সাথে বিবাহের মাত্র তিন মাস পরে ইন্তিকাল করেন বিধায় তাঁর পক্ষে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসারে খুব বেশি অবদান রাখা সম্ভব হয় নি। তবে ইসলামের জন্যে তাঁর যে অপরিসীম ত্যাগ তিতিক্ষা এবং মানবতার জন্যে বিশেষত গরীব, অহায় ও মিসকিনদের জন্যে তাঁর যে দয়া ও মমতা ছিল তা সত্যিই এক অসাধারণ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে এবং সুস্থ সংস্কৃতির অঙ্গনে তা চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। তাঁর এ মহান গুণ যুগ থেকে যুগান্তরে সকলের জন্যে অনুপ্রেরণার ও উৎসাহ উদ্দীপনার উৎস হিসেবে কাজ করবে নি:সন্দেহে।

১০.৬ হযরত উম্মু সালামা (রা.)

---

৫৯৯. তালিবুল হশেমী, *মহিলা সাহাবী*, (অনুবাদে আব্দুল কাদের), ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ৪৭
৬০০. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৪৭

হযরত উম্মু সালামা (রা.) খুবই সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের মেয়ে ছিলেন। ইসলামের কারণে ত্যাগ স্বীকার করতে গিয়ে তিনি একেবারে নি:স্ব ও অসহায় হয়ে গিয়েছিলেন। নবীজী (সা.) এর সাথে বিবাহরে পূর্বে তিনি আবু সালামার সাথে দীর্ঘদিন যাবত সুখের সংসার করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই পতী ভক্তিকারী। তাঁদের দু'জনের দাম্পত্য জীবনের ভালবাসার কাহিনী নিয়ে সবাই বলাবলি করতো। যুদ্ধে আহত হয়ে আবু সালামা (রা.) এর মৃত্যু হলে অনেকেই তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু খুবই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও অভিজাতমনের অধিকারী উম্মু সালামা সকলের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যন করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তাঁকে স্পষ্ট করে বললেন যে তাঁর তিন জন সন্তান রয়েছে এবং তিনি নিজেই খুবই অভিমানী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। হুজুর (সা.) তাঁর এ সকল কথা শুনলেন এবং বুঝতে পারলেন যে উম্মু সালামা অত্যন্ত সরল মনে বাস্তবতার কথা বলেছেন। হুজুর (সা.) এতে কোন কিছু মনে করলেন না বরং সরল মনার কথাগুলো শুনে খুশি হয়ে বললেন যে তাঁর এ সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ব হতেই অবগত আছেন। হুজুর (সা.) এর কাছ থেকে এভাবে কথা শুনে উম্মু সালামা (রা.) বিয়েতে মত দিলেন।[৬০১] এ থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট বুঝা যায় তা হলো আসলেই উম্মু সালামা সাহসী, দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অভিজাত মনের মহিয়সী নারী ছিলেন।

তিনি প্রাকৃতিকভাবেই একটু বেশি লজ্জা শরমের অধিকারী ছিলেন। মহানবী (সা.) এর সাথে বিবাহের পর বেশ কিছুদিন যাবত লজ্জায় স্বাভাবিক সম্পর্কে আসতে পারেন নি । পরে অবশ্যই তা নিজ থেকেই স্বাভাবিক করে নিয়েছেন।[৬০২] উম্মু সালামা (রা.) খুবই নরম দিলের ও দরদী মনের নারী ছিলেন। একদিন মহানবী (সা.) কে অসুস্থ দেখে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তার এরূপ

৬০১. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খন্ড-৮, পৃ. ৯০-৯১
৬০২. প্রাগুক্ত

ক্রন্দনের শব্দ শুনে মহানবী (সা.) তাঁকে নিষেধ করলে পরবর্তীতে তিনি আর এরুপ কান্না-কাটি করতেন না।[৬০৩]

উম্মু সালামা (রা.) জন্মগতভাবেই একটু রুপ চর্চা করতে পছন্দ করতেন। একদা খুব শখ করে স্বর্ণের একটি হার পরলেন এ আশায় যে, তা দেখে মহানবী (সা.) বোধ হয় একটুখানি খুশি হবেন। কিন্তু হুজুর (সা.) তা দেখে একটুখানি অপছন্দ করলেন।[৬০৪] হুজুর (সা.) এর মুখের ভঙ্গিমা দেখে উম্মু সালামা (রা.) এর বুঝার বাকী রইল না যে মহানবী (সা.) তা অপছন্দ করেন। তৎক্ষণাত তিনি গলা থেকে হার খুলে ফেললেন এবং বাকী জীবনে আর কোনদিন ঐ হার গলায় পারেননি। হযরত উম্মু সালামা (রা.) অত্যন্ত যাহিদ বা ইবাদত বন্দেগীকারী ছিলেন। নফল নামায ও রোযাসহ ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রমযান মাস ছাড়াও প্রত্যেক মাসেই তিনি আবশ্যিকভাবে তিনটি রোযা রাখতেন। আদেশ নিষেধ পালনে তিনি সীমাহীন যত্নবান ছিলেন।[৬০৫]

উম্মু সালামা (সা.) খুব সুন্দরকরে রান্না করতে পারতেন। মহানবী (সা.) তাঁর গৃহে আসলে তিনি নিজেই তাঁকে রান্না করে খাওয়াতেন। এমনকি নবীজী (সা.) অন্য স্ত্রীর ঘরে থাকলেও তিনি মাঝে মাঝে খাবার পৌছে দিতেন। ঘর সংসার গুছানোর জন্যে তেমন কিছু না থাকলেও যা ছিল তা দিয়েই তিনি নিজের সংসারের যাবতীয় কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করতেন। উল্লেখ্য, একটি বালিশ, দু'টো মশক এবং আটা পেশার দু'টি যাতা ছাড়া আর তেমন কিছুই তাঁর সংসারে ছিলনা।

---

৬০৩. তালিবুল হশেমী, *মহিলা সাহাবী*, (অনু. আব্দুল কাদের), ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২, পৃ.৫৭
৬০৪. প্রাগুক্ত
৬০৫. প্রাগুক্ত

উম্মু সালামা (রা.) স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদতের দিনে তিনি হুজুর (সা.) কে স্বপ্ন দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে ইমাম হুসাইন কারবালার প্রান্তরে শাহাদাৎ বরণ করছেন। ফলে তিনি দীর্ঘক্ষণ ক্রন্দন করতে থাকেন এবং মদীনাবাসীদেরকে ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের সংবাদটি প্রদান করেন।[৬০৬]

উম্মু সালামা (রা.) এর কণ্ঠ ছিল সুললিত ও মিষ্টি মধুর। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সুরে সুরে মহনবী (সা.) এর স্টাইলে পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত করতে পারতেন। যারা নবীজী (সা.) এর তেলাওয়াত শুনেছেন তাঁরা অনেকেই বলেছেন উম্মু সালামা (রা.) এর তেলাওয়াতের মহানবী (সা.) তেলাওয়াতের কাছাকাছি ছিল।[৬০৭] উম্ম সালামা অত্যন্ত ধীর স্থীর ও ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতেন বলে তাঁর চিন্তা, ভাবনা ও পরামর্শ ছিল বাস্তবতার খুবই কাছাকাছি। তিনি ভালো যুক্তিবীদ ও গভীর দূরদর্শী ছিলেন বলে জানা যায়। এর বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়কালের চলমান সংকট দূরীকরণে তিনি যে পরামর্শ দিয়েছেন মহানবী (সা.) সে আলোকে কাজে করেছিলেন বলে কঠিন ও জটিল সমস্যা খুব দ্রতই কেটে যায় এবং সমগ্র পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায় চলে আসে। এভাবে উম্মু সালামা (রা.) এর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে লোকেরা তাঁর কাছে আসত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্যে। তিনি তাদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাস্তবতায় নিরিখে দিতেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভে ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ও সৃষ্টিশীল মানুষ।

১০.৭ হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)

৬০৬. তালেবুল হাশেমী, *মহিলা সাহাবী*, (অনু. আব্দুল কাদের), ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী , ২০১২ পৃ. ৫৭-৫৮
৬০৭. প্রাগুক্ত

উম্মুহাতুল মোমেনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) এর মাধ্যমে জাহেলী যুগের বেশকিছু খারাপ সাংস্কৃতিক প্রথার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। পালক পুত্রের তালাকাপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ নয় জাহেলী যুগের এমন একটি কু-প্রথাকে সূমূলে উৎপাটনের ক্ষেত্রে হযরত যায়নাব (রা.) উপলক্ষ্য হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, মহনবী (সা.) নিজের সেবাদস হযরত যায়েদ (রা.) কে স্বাধীন করে দিয়ে নিজের ছেলের মতই আদর করতেন। লোকেরা যায়েদকে মহনবী (সা.) এর পালক পুত্র মনে করত। আর মহানবী (সা.) হযরত যায়েদের কল্যাণার্থেই নিজের ফুফাতো বোন হযরত যায়নাব (রা.) কে যায়েদের সাথে বিবাহ দিয়ে ছিলেন। এর মাধ্যমে নবীজী (সা.) চেয়েছিলেন যে ইসলামে সকলেই সমান, এখানে দাস-দাসী ও স্বাধীন নারীর মধ্যে মর্যাদাগত তেমন কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়ার নয়।[৬০৮] বরং সেই আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ যিনি যতবেশি আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাসেন। মহনবী (সা.) এর পরামর্শমতে হযরত যয়নাব (রা.) হযরত যায়েদ (রা.) কে বিবাহ করলেন বটে কিন্তু কিছু দিন পরই বংশ মর্যাদা ও স্বাধীনতার দিকটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হযরত যায়নাবের মন হযরত যায়েদকে মানতে পারলো না। যার ফলে হযরত যয়নাব (রা.) ও যায়েদ (রা.) উভয়েই পরামর্শকরে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালেন। এ ঘটনা থেকে অতি সহজেই প্রমান পাওয়া যাচ্ছে যে স্বাধীন নারীর সাথে আজদকৃত দাসের বিবাহ সম্পর্ক যদিও বৈধ তবে কুফু বা পছন্দের দিক দিয়ে তা বেমানান। যদিও মুরব্বীদের পরামর্শে কনে প্রথমদিকে এরুপ বিবাহ মেনে নিলেও পরবর্তীতে তা ঝামেলায় এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদের পর্যায় রূপ নেয়। এ ঘটনার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে যয়নাব-যায়দের বিবাহ বিচ্ছেদ। সুতরাং কুফুয়ূর দৃষ্টিতে এরূপ বৈসাদৃশ্যের বিবাহরে চিন্তা না করাই শ্রেয়। হযরত যয়নাব-যায়েদের বিবাহ বিচ্ছেদ সে কথাই স্পষ্টকরে বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছিল।

৬০৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩

দ্বিতীয়ত, জাহেলী যুগের লোকেরা পালক পুত্রকে আপন পুত্রের মতই গ্রহণ করতো। লোকেরা হযরত যায়েদ (রা.) কে মুহাম্মদ (সা.) এর পুত্রই মনে করত এবং যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ নামে তাঁকে ডাকতো। যেহেতু পালক পুত্র আপন পুত্রের মতই সেহেতু তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম মনে করত জাহেলী যুগের আরবরা। কিন্তু আল্লাহর বিধানে পালক পুত্র কখনও আপন পুত্রের মত নয়।[৬০৯] তাই তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম নয়। এ সত্যটি সবাইকে জানানোর জন্যে মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত যায়েদ (রা.) এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা.) কে বিয়ে করার জন্যে মহানবী (সা.) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৬১০] পূর্বেই বলা হয়েছে হযরত যায়নাব (রা.) ছিলেন এ ঘটনার উপলক্ষ্য মাত্র।

এখানে যে জিনিসটি স্পষ্ট হল তা হচ্ছে হযরত যায়নাব (রা.) ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা মহিলা। নিজের অমত থাকা স্বত্বেও ফুফাতো ভাই মহানবী (সা.) এর পরামর্শমতে হযরত যায়েদ (রা.) কে বিয়ে করেছিলেন বটে তবে নিজের ভিতরে লুকায়িত বংশ মর্যাদা ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে উক্ত বিবাহ মেনে নিতে পারেন নাই। যাহোক, হযরত যায়েদ (রা.) এর সাথে ছাড়াছড়ি হয়ে যাওয়ার পরে মনে মনে মহানবী (সা.) তালাকপ্রাপ্তা অসহায় নি:স্ব নিজের ফুফাতো বোন হযরত যয়নাব (রা.) কে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহ নিয়ে লোকমুখে সাংঘাতিক সমালোচনার ঝড় উঠতে পারে—এ ভয়ে তিনি সাহস পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনায় ছিল, মুহাম্মদ (সা.) যেন যয়নাব (রা.) কে বিবাহ করে তাঁর অসহাত্বের অবসান ঘটান এবং সেই সাথে জাহেলী যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারকে চিরতরে নির্মূল করেন।

---

৬০৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সূরা আহযারের ৪০ নং আয়াতের সরল অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।
৬১০. আল কুরআন, ৩৩:৩৭

Dhaka University Institutional Repository

যে যায়েদ (রা.) হযরত যয়নাব (রা.) কে তালাক দিলেন সেই যায়েদ (রা.) কে-ই নবীজী (সা.) তাঁর নিজের বিয়ের পয়গাম দিয়ে হযরত যায়নাব (রা.) এর কাছে পাঠালেন।[৬১১] মহানবী (সা.) এর প্রতি যায়েদের কী পরিমান শ্রদ্ধা থাকলে এবং হযরত যায়েদ (রা.) এর প্রতি কী পরিমান আস্থা ও বিশ্বাস থাকলে এরুপ কাজের জন্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভরসা রাখতে পারে—এটাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির সৌন্দর্য্যের দিক—যে সৌন্দর্যের প্রতি বিশ্ববাসী আকৃষ্ট হতে বাধ্য।

তালাক প্রদানকারী স্বামী হযরত যায়েদ (রা.) এর কাছ থেকে মুহাম্মদ (সা.) এর বিয়ের পয়গাম শোনা মাত্রই হযরত যয়নাব (রা.) বিয়েতে রাজী হয়ে যাননি। তিনি হযরত যায়েদ (রা.) কে সময় নিয়ে জানাবেন বলে জানিয়েছেন। ইতোমধ্যে তিনি ইসতিখারের সালাত আদায় করেন এবং সালাতের মাধ্যমে মনের মধ্যে রাজী সূচক ভাব আসলে বিয়েতে তাঁর সম্মতি প্রদান করেন। অপরদিকে সূরা আহযাবের ৩৭ নং আয়াতের মাধ্যমে হযরত যয়নাব (রা.) জানতে পারলেন যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ওয়ালী বা অভিভাবক হয়ে তাঁকে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে বিবাহ দিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এতে তাঁর কোন আপত্তি থাকার কথা নয় বরং তিনি মহাখুশী হলেন এই ভেবে যে আল্লাহ তায়ালাই আসমানে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। হযরত যায়েদ (রা.) নিজে যখন মহানবী (সা.) এর পক্ষ হতে বিয়ের পয়গাম নিয়ে হযরত যয়নাব (রা.) এর কাছে আসলেন তখন হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নাব (রা.) এর সাথে যে ব্যবহার করেছিলেন—তা ছিল সত্যিই ইসলামী সংস্কৃতির এক অপূর্ব আচরণ ও শিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত। হযরত যায়েদ (রা.) যখন যয়নাবের কাছে আসলেন তখন তিনি তাঁকে আটা চটকাতে দেখেছিলেন। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই আমার অন্তরে তাঁর সম্পর্কে এক বড় ধরনের সম্ভ্রান্ত বোধ দৃষ্টি হয়।

---

৬১১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

আমি তাঁর প্রতি চোখ তুলে তাকানোর হিম্মত হারিয়ে ফেলি। কারণ, রাসূল (সা.) তাঁকে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন। আমি একটু পেছনে সরে আসি।[৬১২] অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নাব (রা.) এর ঘরের দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলেন, যয়নাব! আমি রাসূল (সা.) এর বিয়ের পয়গাম নিয়ে এসেছি। হযরত যয়নাব (রা.) উত্তর দিলেন এখন আমি কাজ করছি। আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসতিখার ব্যতিত কিছু বলতে পারি না। এ কথা বলে তিনি মসজিদের দিকে যেতে থাকেন।[৬১৩]

এসব ঘটনা ও বর্ণনা থেকে আমরা যে জিনিসটি স্পষ্ট বুঝতে পারি তা হলো হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন খুবই ধীর স্থির ও শান্ত মনের মানুষ। তিনি চটকরে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। সময় নিয়ে বুঝে শুনে সিদ্ধান্ত নিতেন। ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর এখানে যে অবদান তা হচ্ছে বুঝে শুনে সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে সর্বদা আল্লাহর সাহয্য কামনা করা ।

বিয়ের ওলীমার বা বৌ ভাতের অনুষ্ঠান যে জাকজমক বা রাজকীয় ভাবে করা যায় তা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে হযরত যয়নাব (রা.) এর বিবাহ পরবর্তী ওলীমার অনুষ্ঠানই প্রমান করে। ওলীমা অনুষ্ঠানে মহানবী (সা.) প্রায় তিনশত লোককে গোশত রুটি দিয়ে মেহমানদারী করান[৬১৪] যা অন্য কোন বিবির ওলীমা অনুষ্ঠানে সম্ভব হয় নি। এ ওলীমা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাহলী যুগের আরবদের কয়েকটি বদ অভ্যাসের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উৎপাটন করা হয়েছে। সেটা হল ওলীমা অনুষ্ঠানের পরেও লোকেরা বিনা অনুমতিতে বর-কনের কাছে যেত এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের খোশ গল্পে মেতে উঠত। হযরত যয়নাবের ওলীমা অনুষ্ঠানের এরুপ কিছু

৬১২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪
৬১৩. প্রাগুক্ত
৬১৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭; ইউসুফ আল-কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬০-২৬১

Dhaka University Institutional Repository

আচরণ কতিপয় লোকের দ্বারা সংঘঠিত হচ্ছিল; মহানবী (সা.) মনে মনে খুবই বিরক্ত হচ্ছিলেন কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিলেন না। জাহলী যুগের উক্ত অভ্যাসটি ছিল খুবই বিরক্তকর এবং রুচিশীল সমাজের জন্যে বেমানান সই। ইসলাম ধর্মের মত অত্যন্ত রুচিশীল, শালীন ও ভদ্র জীবন আদর্শের জন্যে তা কিছুতেই বর দাশতের পর্যায় পড়ে না। ফলে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিলের মাধ্যমে জাহেলী যুগের উক্ত বিরক্তের ও বদ অভ্যাসের প্রতিবাদ জানান।[৬১৫] আর এ ক্ষেত্রে নি:স্বন্দেহে উপলক্ষ হয়েছিলেন হযরত যায়নাব (রা.) নিজে। তাঁর ওলীমা অনুষ্ঠানের আরেকটি বরকতপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। হযরত আনাস (রা.) এর আম্মাজান উম্মু সুলাইম হাইস নামক (খেজুর আকিত ও চর্বি) এক প্রকার খাবার তৈরি করে ওলীমা অনুষ্ঠানে পাঠান। রাসূল (সা.) সে খাবারের পত্রটির উপর হাত রেখে দু'আ করলেন এবং এর পর হযরত আনাস (রা.) কে বললেন পরিবেশন কর। তিনি প্রত্যেককে বসে বিসমিল্লাহ বলে এবং নিজের পাশ থেকে খাবার খাওয়ার জন্যে বললেন। হযরত আনাস (রা.) এর ভাষ্যনুযায়ী সে পাত্রের খাবারে এত বেশি বকরত হল যে তা বিপুল পরিমান লোকজন খেয়ে শেষ করতে পারল না।

হযরত যয়নাব (রা.) ধারণার উপর ভিত্তিকরে কথা বলতেন না। হযরত আয়েশা (রা.) এর ইফকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেকেই কেবল ধারণার বশীভূত হয়ে হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে আজে বাজে মন্তব্য করছিলেন। স্বাভাবিকভাবে সতীনরা এ রকমের দুর্বল মুহূর্তে তার প্রতিদ্বন্দী সতীনকে ঘায়েল করার কথা। কিন্তু আমরা হযরত যয়নাব এর জীবনে তাঁর সম্পর্কে উল্টটা হতে দেখি। হযরত আয়েশা (রা.) এর এ রকম চরম দুর্দিনে একদা মহানবী (সা.) হযরত যয়নাব (রা.) কে আয়েশা (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে হযরত যয়নাব (রা.) স্পষ্ট করে তাঁর মতামত তুলে ধরলেন যে, তিনি ভালো ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানেন না। এ হচ্ছে হযরত যয়নাব (রা.) যিনি

৬১৫. আল-কুরআন, ৩৩:৫৩

নিজের সতীনের দুর্দিনে পাশে দাড়িয়েছিলেন এবং মানুষের ভুল ধারণার প্রতিবাদ করছিলেন। পরে হযরত আয়েশা (রা.) এর পবিত্রতা ঘোষণা করে আল কুরআনে দশটি আয়াত নাযিল হয়। আর সেই সাথে হযরত যায়নাব (রা.) এর সত্যবাদিতা ও উন্নত নৈতিকতা প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) আজীবন হযরত যয়নাব (রা.) এর এ ঋন মনে রেখেছেন এবং সারা জীবন তিনি মানুষের কাছে সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।[৬১৬]

হযরত যায়নাব (রা.) নিজে একজন বিখ্যাত হস্ত শিল্পকার ছিলেন। তিনি চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে পারতেন, আবার সূতা কাটতে পারতেন। চামড়া প্রক্রিয়াজাত ও সূতা কাটার মাধমে তিনি যে আয় করতেন তার পুরোটাই গরীব, মিসকিন ও অভাবী মানুষকে দিতেন। পারতপক্ষে তিনি বায়তুল মাল থেকে নিজের জন্যে কোন ধরনের ভাতা গ্রহণ করতে চাইতেন না যেহেতু তিনি নিজে অর্জন করতে পারতেন।

মূলত: তিনি ছিলেন খুবই দানশীল। ইয়াতিম, দুস্থ ও অভাবগ্রস্থদের আশা ভরসা কেন্দ্রস্থল বলে পরিচিত ছিলেন। গরীব দু:খীদের প্রতি তাঁর দয়া-মমতার শেষ ছিল না।[৬১৭] তাঁর এ রকম দানশীলতার অভ্যাসের কারণে তাঁর দৈহিক গঠন খাটো হওয়া সত্বেও মহানবী (সা.) তাঁকে লম্বা হাত বিশিষ্ট মহিলা বলেছেন।[৬১৮] আসলেই তিনি মনের দিক দিয়ে ছিলেন অনেক প্রশস্ত দিলের অধিকারী। তাঁর মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির অনেক শিক্ষা ও এর বাস্তবায়ন হয়েছে।

১০.৮ হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)

৬১৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২
৬১৭. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০৪
৬১৮. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪২৭

উম্মুহাতুল মোমেনীন হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও স্বাধীনচেতা মহিয়সী নারী। ছোট বেলা থেকেই দৃঢ়চেতা ও স্বাধীনসত্তার মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর পিতা হারেস ছিলেন ইয়াহুদী গোত্র বুন মুস্তালিকের সর্দার। বনু মস্তালিকের যুদ্ধে মুসলমানরা জিতে গেলে যুদ্ধবন্দীদের সাথে হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)ও দাসত্বের জীবনে পদার্পন করলেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকে স্বাধীন চেতনায় বড় হয়ে উঠা হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) তা মনে নিতে পারছিলেন না বলে মহানবী (সা.) এর কাছে বন্দীদশার অবসানের সাহায্য চাইলেন। স্বেচ্ছায় মুসলিম হলে নবীজী (সা.) তাঁর বংশীয় পদ মর্যাদার দিকে খেয়াল রেখে তাঁকে বিয়ে করলেন; এর ফলে হয়ে গেলেন উম্মাহাতুল মোমেনীনদের একজন।[৬১৯] পরবর্তীতে তাঁর পিতা হারেস তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চাইছিলেন; কিন্তু হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) মহানবী (সা.) এর স্বর্গীয় সাহচর্য ছেড়ে পিতার সাথে ফিরে গেলেন না।[৬২০] আর বাকী জীবন এভাবে ইসলামের খেদমতের আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর কারণে তাঁর পিতাসহ গোত্রের অধিকাংশ লোকই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে ইসলামের দুশমনি ছেড়ে তাঁরা সবাই ইসলাম রক্ষায় এগিয়ে আসলেন।

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) দেখতে যেমন সুন্দরী ছিলেন তেমনি ছিল তাঁর ব্যবহারও ছিল মুগ্ধ করার মত।[৬২১] কোন লোক যদি একবার তাঁর সান্নিধ্যে আসতো সে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হয়ে পারতো না। তাঁর কথা শোনা মাত্রই লোকের মনে একটা স্থায়ী মমতার চিন্তা ফুটে উঠতো।

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) একজন ইবাদত গুজার মহিলা ছিলেন। তিনি প্রায় সর্বক্ষণিকই ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এক দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ঘরে প্রবশে করে দেখেন হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)

---

৬১৯. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ সীরাতু ইবনে হিশাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৪-২৯৫
৬২০. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলাম আননুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৩
৬২১. মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

তাসবীহ পাঠ করছেন। নবীজী (সা.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জুয়াইরিয়া! তুমি কি সব সময়ই এ আমল করে থাকো? তিনি উত্তরে বললেন, "জী, হ্যা"। আবার একদিন ভোরে হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) মসজিদে বসে দোয়া করছিলেন এ অবস্থায় নবীজী (সা.) তাঁকে দেখে চলে যান এবং দুপুরের দিকে ফিরে এসে তাঁকে ঐ অবস্থায়ই দেখেন।[৬২২]

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) এর বর্ণনা মতে নবী (সা.) এর গৃহে আগমনের তিন দিন পূর্বে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে ইয়াসরিবের দিক হতে এক পূর্ণ চাঁদ এসে তাঁর কোলে পড়েছে। এ স্বপ্নের কথা আমি কাউকে বলি নি। কিন্তু যুদ্ধ পরাজিত হওয়ার পরে যখন মহনবী (সা.) কে দেখলাম তখন আমার মনে স্বপ্নে দেখা চাঁদের কথা মনে পড়ল। আর স্বপ্নের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন তখনই ঘটেছে যখন তাঁর সাথে আমার বিবাহের কাজ সুসম্পন্ন হল।[৬২৩]

হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) নরম স্বভাবের হলেও সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে লড়াকু ও প্রতিবাদী ছিলেন। হযরত উমর (রা.) ভাতা বিতরনের সময় হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) কে জীবনের কোন এক পর্যায় দাসত্বের কথা তুলে ধরে অন্যান্য বিবিগণের তুলনায় অর্ধেক ভাতা দিতে চাইলেন তখন হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) হযরত উমরের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলেন। ফলে হযরত উমর (রা.) তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন এবং মহানবী (সা.) এর বিবিগণের মধ্যে ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বৈষম্য রাখলেন না। এভাবে হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) তাঁর বিভিন্নমুখী কর্ম-কান্ডের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রসার ঘটিয়েছেন।

---

৬২২. প্রাগুক্ত
৬২৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৭৪

১০.৯ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)

উম্মুহাতুল মোমেনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর পিতা আবু সুফিয়ানের বংশগত মর্যাদা ও স্বামীর খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সত্য ও ন্যায়ের পথ ইসলামে অবিচল ও অটুট ছিলেন। কোন বিপদই তাঁকে সত্যের পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে নি। হাবশায় হিযরতকালীন সময়ে তাঁর উপর নেমে আসা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার উপর অবিচল বিশ্বাস ও আস্থার কোন কমতি ছিল না। হাবশায় তাঁর উপরে নেমে আসা দুর্দিনে হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে ইয়া উম্মাল মু'মিনীন বা বিশ্বাসীদের মাতা বলে ডাকছে।[৬২৪] পিছনে ফিরে দেখেন কেউ নেই অথচ আওয়াজ তিনি স্পষ্টই শুনেছিলেন। এরূপ পরিবেশে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। পরবর্তীতে তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন যে মহানবী (সা.) অচিরেই তাঁকে বিয়ে করবেন এবং এর ফলে তিনি সারা বিশ্বের মু'মিনীনদের মা জননীতে পরিণত হবেন।[৬২৫] এর থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট বুঝা যায় তা হলো তিনি স্বপ্ন বা দৈব বাণীর যথা সম্ভব সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারতেন।

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর কষ্টকর দিনাতিপাতের কথা শুনে মহানবী (সা.) বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে দূত মারফত উম্মু হাবীবা (রা.) কে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন। চিঠি পাওয়া মাত্রই বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁর দাসী আবরাহাকে উম্মু হাবীবার কাছে বিয়ের সংবাদ দিয়ে পাঠালেন।[৬২৬] উক্ত সুসংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি বাদশাহর দাসী আবরাহাকে নিজের দু'টি রুপার চুড়ি, কানের দুল ও একটি নকশা করা আংটি উপহার দিলেন। এ থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট বুঝা যায় তা হলো শুভ

---

৬২৪. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৭
৬২৫. প্রাগুক্ত
৬২৬. ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৩

সংবাদ বহনকারীকে কিছু উপহার বা উপঢৌকন প্রদান করা। কেননা যিনি সুসংবাদ বা শুখ সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে স্বভাবতই সে কিছু আশা করে থাকতে পারে। তাই তাঁকে আশাহত করা ঠিক নয়, কষ্ট হলেও তাঁকে কিছু উপহার দেওয়া ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের লক্ষণ। ইসলামী সংস্কৃতির এরুপ সুন্দর শিক্ষাটি আমারা হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

বাদশাহ নাজ্জাশী হাবশায় বসবাসরত মুসলমানদেরকে দরবারে ডেকে এনে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর মামাতো ভাই খালিদ ইবনে সাঈদকে উকিল নিযুক্ত করে চারশত দীনার ধার্য করে ও তা নগদ আদায় করে রাসূল (সা.) এর সাথে উম্মু হাবীবা (রা.) এর বিবাহের কাজ সুসম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠানে মাহরের টাকা উকিলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং উকিল খালিদ ইবনে সাঈদ তৎক্ষনাতই উক্ত টাকা উম্মু হাবীবা (রা.) এর কাছে পৌছে দেন। বিয়েতে খুতবা পাঠ করেন স্বয়ং বাদশাহ নাজ্জাশী। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে উকিল খালিদ ইবনে সাঈদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৬২৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে উম্মু হাবীবা (রা.) এর বিবাহের অনুষ্ঠান থেকে ইসলামী সংস্কৃতির বেশ কয়েকটি দিক স্পষ্টত ফুটে উঠেছে। প্রথমত, তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে মহরের টাকা নগদ পরিশোধ করা হয়েছে যা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম একটি সৌন্দর্য্যের দিক। দ্বিতীয়ত, বিয়ের সময় মেয়ের পক্ষ হতে উকিল নির্ধারণ করা; সেটাও সুসম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয়ত, বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আপ্যায়ন করা; সেটাও ভালমত সম্পন্ন হয়েছে। স্বয়ং বাদশাহ নাজ্জাশী মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষ হতে উকিল হয়ে নিজেই বিবাহের খুৎবা বা ভাষণ দেন ও দুয়া করেন। পরবর্তীতে উম্মু হাবীবা (রা.) হাবশা থেকে মদীনায় ফিরে আসলে মদীনাতে মহানবী (সা.) ওলীমা বা বৌ ভাতের

৬২৭. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২২

আয়োজন করেছিলেন।[৬২৮] এভাবে দেখা যায় যে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর বিয়ের আয়োজন থেকে ওলীমা পর্যন্ত সকল কিছুতে ইসলামী সংস্কৃতির সবকিছুই উপস্থিত ছিল।

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) দ্বীনের ব্যাপারে কোন ধরনের দুর্বলতা বা শৈথিল্যতা প্রদর্শন করেনি। মহানবী (সা.) এর ভালোবাসার ক্ষেত্রেও তিনি কোন ধরনের দুর্বলতা দেখাননি। একদা কুফরী অবস্থায় নিজ পিতা আবু সুফিয়ান মেয়ে উম্মু হাবীবা (রা.) এর গৃহে প্রবেশ করে বিছানায় বসতে চাইলে উম্মু হাবীবা (রা.) তাকে বারণ করলেন এবং বললেন প্রিয় নবীজী (সা.) এর বিছানায় তোমার মত মুশরেকের বসার অধিকার নেই।[৬২৯] এ থেকে বুঝা যায় কতটা আশেকে রাসূল ও আশেকে ইসলাম হলে তাঁর মধ্যে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করতে পারে। পিতা মাতার চেয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.)ই সবচেয়ে ভালবাসার প্রাপ্য এ সত্যটি উম্মু হাবীবা (রা.) উম্মাতে মুহাম্মদী (সা.) কে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনি জাহেলী যুগের আরেকটি খারাপ প্রথাকে দূর করেছিলেন। পিতা আবু সুফিয়ান (রা.) এর ইন্তিকালের তিন দিন পরেই হযরত উম্ম হাবীবা (রা.) খোশবু চেয়ে গায়ে মাখান আর বলেন রাসূল (সা.) এর নির্দেশে হচ্ছে ঈমানদার মহিলার জন্যে স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নেই। শুধু মাত্র স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারে।[৬৩০] অথচ সে সময়ে নিকটাত্মীয় মারা গেলে দীর্ঘদিন শোক পালন করতে হতো অথবা শোক পালন করার মত অবস্থায় সবাই থাকতো। যা হোক, উম্মু হাবীবা (রা.) পিতার মৃত্যুর তিন দিন পর খোশবু মেখে শোকাহত অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসা বাহ্যিকভাবে নিষ্ঠুর মনে হলেও এতেই

৬২৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১
৬২৯. ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮০
৬৩০. তালিবুল হাশেমী, *মহিলা সাহাবী*, (অনু. আব্দুল কাদের), ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী ১৯৯০, পৃ. ৭০

রয়েছে শোক পালনের ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনার বাস্তবায়ন যা হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) খুবই আবিদাহ ছিলেন। একদা মহানবী (সা.) এর মুখ থেকে শুনলেন যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১২ রাকাত নফল নামায পড়বে তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে।[৬৩১] এ হাদীস শোনার পর হতেই তিনি প্রতিদিন ১২ রাকাত নফল নামায পড়তেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ অভ্যাসের সাথেই ছিলেন। জীবনে এর ব্যাঘাত ঘটান নি। ইসলামী সংস্কৃতিতে আমল যত কমই হোক না কেন তা নিয়মিতভাবে পালন করার ও এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার গুরুত্ব অপরিসীম—এ সত্যটি আমরা হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর নিয়মিত ১২ রাকাত নফল নামায পড়ার মত আমল থেকে জানতে পারি।

১০.১০ হযরত সাফিয়্যা (রা.)

উম্মুল মোমেনীন হযরত সাফিয়্যা (রা.) ছিলেন বনু কোরায়জার নেতৃস্থানীয় সরদার সামবিলের কন্যা। বংশের দিক থেকে তিনি ছিলেন হযরত হারুন (আ.) এর বংশের মেয়ে।[৬৩২] খায়বার যুদ্ধে ইয়াহুদিদের পরাজয়ের পর মালে গনীমাতের অংশ হিসাবে এসেছিলেন হযরত সাফিয়্যা (রা.)। মহানবী (সা.) তাঁর বংশ মর্যাদা বিবেচনায় আজাদ করে দিয়ে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যাওয়ার অথবা নবীজী (সা.) এর কাছে থেকে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলে তিনি দ্বিতীয়টি বেছে

৬৩১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫
৬৩২.তালিবুল হাশেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

নিলেন।[৬৩৩] আর নবীজী (সা.) তাঁকে বিবাহ করে উম্মুহাতুল মোমেনীনদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর বিয়ের ওলীমাতে মহানবী (সা.) উপস্থিত সবাইকে পেটভরে আহার করিয়েছিলেন।

হযরত সাফিয়্যা (রা.) খুবই সংস্কৃতিমনা ছিলেন। তিনি যখন মদীনাতে উম্মুহাতুল মোমেনীন হিসেবে আগমন করেন তখন হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁকে দেখতে আসলেন। এ সময় তিনি নিজের কানের মূল্যবান ঝুমকা খুলে হযরত ফাতিমা (রা.) কে পরিয়ে দেন এবং তাঁর সাথে আগত অন্যান্য মহিলাকেও কোন না কোন গহনা উপহার দিয়েছিলেন।[৬৩৪] নতুন জায়গাতে আগমনকালীন সময়ে দেখতে আসা ব্যক্তিকে উপহার দেওয়া ইসলামী সংস্কৃতির একটি শিষ্টাচারের দিক এরূপ শিক্ষাটি আমরা তাঁর কাছেই পাই।

হযরত সাফিয়্যা (রা.) অত্যন্ত নম্র স্বভাব, প্রশান্ত অন্তর এবং ধৈর্যশীল ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর ইহুদী হওয়ার ভৎর্সনা বা ঠাট্টা বিদ্রুপ তাঁর জন্য বড় অন্তর্জ্বালার ব্যাপার ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে চলতেন এবং কাউকেই কোনদিন কঠিন জবাব দেননি।[৬৩৫] একদা হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত যায়নাব (রা.) গর্বকরে বললেন আমরা নবীজী (সা.) এর স্ত্রী এবং অন্যদিকে তাঁর নিকটাত্মীয়; কিন্তু তুমি নবী করীম (সা.) এর স্ত্রী হলেও তাঁর নিকটাত্মীয় নও বরং তুমি ছিলে ইসলামের শত্রু ইহুদীদের কন্যা। এরূপ কথা শুনে তিনি খুব কাদলেন । নবীজী (সা.) তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঐ ঘটনাটি খুলে বলেন। তখন নবীজী (সা.) তাঁকে বললেন, তুমি কেন তাদেরকে বল নি যে আমার পিতা হযরত হারুন (আ.), আমার চাচা হযরত মুসা (আ.),

৬৩৩. প্রাগুক্ত
৬৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৬৩৫. প্রাগুক্ত

আর আমার স্বামী হচ্ছেন স্বয়ং মুহাম্মাদ (সা.)।[৬৩৬] এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় হযরত সাফিয়্যা (রা.) ছিলেন খুবই সরলমনার মহিয়সী নারী। তিনি কথার পিঠে কথা বলার কৌশল জানতেন না অথবা জানলেও তা প্রয়োগ করতেন না বরং সে ক্ষেত্রে ধৈর্য্যধারণ করাকেই শ্রেয় মনে করতেন।

হযরত সাফিয়্যা (রা.) খুবই ভালভাবে খাবার রান্না করতে পারতেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর বর্ণনা মতে তিনি সবচেয়ে ভালভাবে ও সুস্বাদু করে খাবার রান্না করতে পারতেন।[৬৩৭] তিনি নিজ হাতে রান্না ও ঘর গৃহস্থলীর যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতেন। তিনি কখনও অলসতাকে প্রশ্রয় দেননি। বরং কায়িক পরিশ্রম করাকেই তিনি পছন্দ করতেন। হযরত সাফিয়্যা (রা.) সর্বদা আত্নীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মাধুর্যপূর্ণ সম্পর্কের কারণে তাঁর আত্নীয় স্বজনের অনেকেই পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে হবে এমন শিক্ষা ইসলামী সংস্কৃতির কোথাও নেই। বরং তাদের সাথে সর্বদা সুসম্পর্কই বজায় রাখতে হবে এমন মহান ও মহৎ শিক্ষাই রেখে গেছেন হযরত সাফিয়্যা (রা.)।

তিনি ছিলেন বিপদের বন্ধু ও সাথী। হযরত উসমান (রা.) যখন বিদ্রোহী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে ছিলেন তখন হযরত সাফিয়্যা (রা.) নিজে গোপনে হযরত উসমান (রা.) এর গৃহে খাবার পৌছানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।[৬৩৮] বিপদের সময় মানুষের পাশে দাড়াতে হয় এবং প্রয়োজনে নিজের জীবনের ঝুকি নিতে হয়—এরূপ শিক্ষা আমরা হযরত সাফিয়্যা (রা.) এর কাছে থেকেই পেয়ে থাকি।

৬৩৬. তালিবুল হাশেমী, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৫
৬৩৭. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৬
৬৩৮. প্রাগুক্ত

যুদ্ধের ময়দানে পড়ে থাকা নিহত আত্নীয় স্বজনের লাশের পাশ দিয়ে যুদ্ধ বন্দী শত্রুকেও আনতে নেই ইসলামী সংস্কৃতির এমন শিষ্টাচারের ও মানবিক শিক্ষা আমরা হযরত সাফিয়্যা (রা.) এর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকেই পাই। হযরত বিলাল (রা.) যখন হযরত সাফিয়্যা (রা.) কে যুদ্ধ বন্দী অবস্থায় ধরে নিয়ে আসলেন তখন ঐ রাস্তায় তাঁর পূর্ব স্বামী ও পিতাসহ অন্যান্যদের লাশ পড়েছিল। ঐ লাশ দেখে হযরত সাফিয়্যা (রা.) এর সত্যিই কষ্ট হয়েছিল সেটা বুঝতে মহানবী (সা.) এর বাকী ছিল না। তাই তিনি হযরত বিলাল (রা.) কে ধমক দিয়ে বললেন, হে বিলাল! তোমার ভিতরে দয়া, মায়া, মমতা বলতে কি কিছু নেই? যে রাস্তায় তার আত্নীয় স্বজনের লাশ পড়েছিল সে রাস্তায় নিষ্ঠুরের মত তুমি কিভাবে হযরত সাফিয়্যা (রা.) কে আনতে পারলে? এতে হযরত বিলাল (রা.) খুবই লজ্জিত হলেন; আর এ রকম হবে না বলে মনে মনে তওবা করলেন।[৬৩৯] যাহোক, এ ঘটনা থেকে ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা পাওয়া গেলে যে নিহত ব্যক্তির পাশ দিয়ে তার আপনজনকে আনতে নেই; কেননা এতে জীবিত ব্যক্তির মনে দারুন কষ্ট হয়।

দ্বীনি ইলম ও ফজিলতের ক্ষেত্রে হযরত সাফিয়্যা (রা.) এর মর্যাদা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষন ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি ইঙ্গিতবহ ঘটনা থেকে সম্ভাব্য ঘটতে যাচ্ছে এমন কিছুর ধারণা পেয়ে যেতেন। একরাত্রে হযরত সাফিয়্যা (রা.) স্বপ্নে দেখলেন যে আসমান থেকে চাঁদ নিক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর কোলে এসে পড়লো। স্বপ্নের কথা পিতাকে বললে সে ক্রোধান্বিত হয়ে অত্যন্ত জোরে তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগকরে হযরত সাফিয়্যা (রা.) থাপ্পোর মারে। সেই থাপ্পোরের ফলে হযরত সাফিয়্যা (রা.) এর চেহারায় আঙ্গুলের দাগ বসে যায়। এতদসত্ত্বেও সে বলল, তুমি কি আরবের

৬৩৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৩

রাণী হওয়ার স্বপ্ন দেখ?[৬৪০] যাহোক, উক্ত স্বপ্ন দেখার পর হতে হযরত সাফিয়্যা (রা.) গভীরভাবে উপলব্ধি করতেছিলেন যে তিনি অচিরেই আরবের রাণী হবেন; তবে কিভাবে হবেন তা তাঁর জানা ছিল না। অবশেষে সেই মোক্ষম সময় এলো; তিনি মহানবী (সা.) কে বিয়ে করলেন, আর এর ফলে সত্যিই তিনি শুধু আরবের নয় বিশ্ব জাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর রাণী তথা উম্মুহাতুল মোমেনীনদের একজন হওয়ার গৌরব অর্জন করলেন। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে যে কথাটি না বলে পারা যায় না তা হলো স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করাটা ইসলামী সংস্কৃতিতে তেমন দোষের কিছু নয়, বরং অনেক সময়ে মানুষের দেখা স্বপ্নগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটতে যাওয়া বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে।

১০.১১ হযরত মায়মুনা (রা.)

উম্মুহাতুল মোমেনীন হযরত মায়মুনা (রা.) এর মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির রুচিশীল একটি আচরণের বিকাশ হতে দেখি। একদা নবী করিম (সা.) হযরত মায়মুনা (রা.) এর বাড়ীতে আসেন। সেখান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনে গুই সাপের গোশত পরিবেশন করা হল। নবীজী (সা.) গুই সাপের গোশত খেলেন না কিন্তু তাঁর অনুমতিতে অন্যারা খেলেন। নবী করিম (সা.) খেলেন না বিধায় হযরত মায়মুনা (রা.)ও খেলেন না। সেদিন যদি হযরত মায়মুনা (রা.) উক্ত গুই সাপের ভুনা গোশত খেতেন তাহলে ইসলামী শরীয়াতের সংস্কৃতিতে গুই সাপের গোশত খাওয়াটা অরুচির মধ্যে পড়ত না; বরং তা রুচিশীল আচরণের মধ্যেই পড়ত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিতে তা অরুচিশীল খাবার হিসেবে থেকে যেত। যাহোক, নবী পত্নী হযরত মায়মুনা (রা.) নবীজী (সা.) এর সাথে না খেয়ে

৬৪০. প্রাগুক্ত

আমাদের সামনে উদাহরণ হয় থাকলেন যে সাপের গোশত ইসলামী শরীয়াতের সংস্কৃতিতে বৈধ হলেও রুচিশীল খাবারের মধ্যে পড়ে না।[৬৪১]

হযরত মায়মুনা (রা.) এর বিবাহ হয়েছিল উমরাহ চলাকলীন সময়ে অথবা উমরা সবেমাত্র শেষ হয়েছে এমন সময়ে। তাঁর বিয়ের সময় মহানবী (সা.) চারশত দিরহাম নগদ প্রদান করেছিলেন। বিবাহে মাহর নগদই পরিশোধ করতে হয় এমন শিক্ষাই এ বিয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। এ বিয়েতে নবীজী (সা.) ওলীমার আয়োজন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মক্কার কুরাইশ মুশরিকের চাপাচাপির কারণে সময়ের অভাবে তার আয়োজন করতে পারেন নি। এখান থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট হলো তা হচ্ছে বিয়ের পর উপস্থিত সবাইকে নিয়ে খাওয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা বর পক্ষের রুচিশীল আচরণের মধ্যে পড়ে। এখানে রয়েছে ইসলামী সংস্কৃতির আচরণের খুবই সুন্দর ও সৌন্দর্যপূর্ণ দিক।[৬৪২]

পরিশোধ করার দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে ধার করা ইসলামী সংস্কৃতিতে যে অনুমোদন যোগ্য তা আমারা হযরত মায়মুনা (রা.) থেকে জানতে পারি। হযরত মায়মুনা (রা.) একটু বেশী ধার কর্য করতেন। তাঁর ধার-কর্য পরিশোধের উপায নিয়ে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি শোধ করার প্রবল ইচ্ছ রাখে আল্লাহ তাআলা তা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি খুবই দানশীল ছিলেন। একবার তিনি দাসীকে মুক্তি দিলে মহানবী (সা.) তাঁকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, এতে তুমি অনেক সওয়াব পেলে হে মায়মুনা![৬৪৩] বেশী দান খয়রাত করা এমন কি

৬৪১. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭
৬৪২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮-২৮৯
৬৪৩. প্রাগুক্ত পৃ. ২৯০

সম্ভব হলে দাস-দাসীকে মুক্তি দেওয়া যে ইসলামী সংস্কৃতির মহানুভবতার শ্রেষ্ঠ দিক—সে শিক্ষা অনায়েসেই হযরত মায়মুনা (রা.) এর ব্যবহারিক জীবন থেকে জানতে পারি।

হযরত মায়মুনা (রা.) ইসলামী শরীয়াতের আদেশ-নির্দেশের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। একদা তাঁর কোন এক আত্মীয় তাঁর কাছে আসলো। তিনি তার মুখের দুর্গন্ধ থেকে বুঝতে পারলেন যে কিছুক্ষন আগে হয়তো মদ্যপান করে আসছে। তিনি লোকটিকে এমনভাবে শাসালেন যে লোকটি ভয়ে চলে গেল[৬৪৪] এবং হযরত মায়মুনা (রা.) তাকে আরও বলে দিলেন যে সে যেন জীবনে কোনদিন তার সাথে সাক্ষাত করতে না আসে। এ থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট হল তা হচ্ছে ইসলামী শরীয়াতের লংঘনকৃত কোন বিষয়কে হযরত মায়মুনা (রা.) নমনীয়ভাবে দেখতেন না। বরং সে ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বড়ই কঠোর ও কঠিন।

কোন একদিন হযরত মায়মুনা (রা.) জানতে পারলেন যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মাসিক অবস্থায় স্ত্রী কাছ থেকে দূরে আছেন। তৎক্ষনাতই তিনি তাঁকে সাবধান করে দিলেন যে এটা ইসলামী সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্য কোন পন্থা নয়; কেননা মহানবী (সা.) সর্বদা স্বাভাবিক আচরণ ও ব্যবহার করেছেন তাঁর সহধর্মীনীদের সাথে তাঁদের মাসিক অবস্থায়ও। কাজেই হযরত মায়মুনা (রা.) এর কাছ থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে কোনক্রমেই মাসিক অবস্থানরত স্ত্রীকে দূরে রাখা ইসলামী সংস্কৃতির রুচিশীল ও শালীন আচরণের মধ্যে পড়ে না।

১০.১২ হযরত রায়হানা (রা.)

৬৪৪. ইউসুফ আল-কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৯৭

উম্মুল মোমেনীন হযরত রায়হানা (রা.) বনু কুরায়জার যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী হিসেবে দাসত্বের জীবনে পর্দাপন করেন। পরে মুক্তি পেয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে মহানবী (সা.) তাঁকে বিবাহ করে মুমিনদের মায়ের কাতারভূক্ত করলেন।[৬৪৫] হযরত রায়হানা (রা.) সর্বদা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলাকে জীবনের ব্রতী হিসেবে গ্রহণ করেন। ইসলামী সংস্কৃতির যে রুচিশীল পর্দা ব্যবস্থা তা তিনি খুব কাঠোরভাবে মেনে চলতেন। হুজুর (সা.) তাঁকে খুবই ভাল জানতেন ও ভালবাসতেন। অপরদিকে হযরত রায়হানা (রা.)ও হুজুর (সা.) এর সব ফরমায়েশ পূরণ করতেন এবং নবীজী (সা.) এর ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নশীল ছিলেন। তিনি দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন বলে জানা যায়। সাধ্যের ভিতরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর কাপড় চোপড় পরতে তিনি পছন্দ করতেন। তাঁর যা ছিল তা নিয়ে তিনি সন্তুষ্টি ও সুখী থাকার চেষ্টা করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি পুত:পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর নিষ্কুলুষ চরিত্র দেখে সবাই অবাক হাতে বাধ্য হত। এভাবে তাঁর কর্ম ও চরিত্রগুণে তিনি ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ভূমিকায় অবদান রেখেছেন।

১০.১৩ হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.)

উম্মুহাতুল মোমেনীন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) মিসরের খ্রিষ্টান শাসক মুকাওকিস এর অতি পচ্ছন্দের একজন ছিলেন। মুকাওকিস তাঁকে মহানবী (সা.) এর জন্যে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে পাঠায়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে নবীজী (সা.) তাঁকে নিজের কাছে রাখলেন। যতদুর জানা যায়, নবীজী (সা.) তাঁকে বিবাহ করে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দান করেছেন।[৬৪৬] তিনি হুজুর (সা.) এর সন্তান ইব্রাহিম (আ.) কে জন্মদান করেছিলেন। ১৭-১৮ মাস পর উক্ত সন্তান ইন্তিকাল করলে হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) ক্রন্দন বুকে চেপে সহ্য

---

৬৪৫. তালিবুল হাশেমী, *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৬৪৬. মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬

করেছিলেন। এ থেকে অমারা শিক্ষা নিতে পারি যে অতি আপনজনের মৃত্যুতে ধৈর্যহারা হতে নেই বরং ধৈর্য ধারণ করে মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফেরাত কামনা করাই ইসলামী সংস্কৃতির শিক্ষা।

যারা হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) কে হুজুর (সা.) এর বিবাহিত স্ত্রীদের মধ্যে ধরতে চান না তারাও স্বীকার করতে বাধ্য যে নবীজী (সা.) এর অন্যান্য স্ত্রীর সাথে যেমন আচরণ করেছেন ঠিক তেমনি আচরণ করেছেন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) এর সাথে। হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) ইসলামের সকল বিধি বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলতেন। যেহেতু হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) মিসরের কিবতীয়াদের মধ্যে ছিলেন সেহেতু হুজুর (সা.) তাঁর কারণে মুসলমানদেরকে সকল কিবতীয়ার সাথে ভালো আচরণের করার কথা বলেছেন। হুজুর (সা.) আরও স্পষ্টকরে বলেছেন, কিবতীয়াদের সাথে ওয়াদা ও বংশ উভয় সম্পর্ক রয়েছে উম্মাতে মুহাম্মাদীর। তাদের সাথে বংশের সম্পর্কের ধরণ হলো হযরত ইসমাইল (আ.) এর মা এবং মহানবী (সা.) এর পুত্র ইব্রাহিমের মা (মারিয়া) উভয়ই একই বংশের। আর প্রতিশ্রুতি বা চুক্তির ব্যাপারে হলো তাদের সঙ্গে সে সময়ের মুসলমানদের চুক্তি ছিল।[৬৪৭]

হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) এর শারীরীক গঠন খুবই সুশ্রী ছিল। তিনি নিজের থেকেই অনেক গোছানো ও পরিপাঠি ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ রুচিশীল ও ভদ্র আচরণের মহিয়সী নারী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর সৌন্দর্য্য, রুপ-লাবণ্য ও রুচিশীল ব্যক্তিত্বের প্রতি ঈর্ষা করতেন বলে জানা যায়।[৬৪৮]

৬৪৭. তালিবুল হাশেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৬৪৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) যেহেতু স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন সেহেতু ইসলামের যাবতীয় বিধানের পূর্ণাঙ্গ অনুস্মরণ -অনুকরণ তিনি নিজ থেকেই মেনে নিয়েছেন অতি আনন্দ উৎসাহের সাথে। এ থেকে আমরা যে জিনিসটি স্পষ্ট করে জানলাম তাহলো ইসলামী সংস্কৃতির সকল গ্রহণযোগ্য আচার আচরণ নিজ থেকেই সানন্দে ও আগ্রহের সাথে গ্রহণ করাই কাম্য। হাফিজ ইবনে কাছির আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)কে অত্যন্ত পবিত্র ও নেক চরিত্রের অধিকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এভাবে হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) নিজ ইচ্ছায় ধর্ম ও রুচিশীল আচরণের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতিতে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। যুগে যুগে, দেশে দেশে মুসলমানগণ তাঁর মহৎ ও মহান কর্মের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি আরও বেশি যত্নবান হবে বলে আশা করি।

একাদশ অধ্যায়

আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনে উম্মুহাতুল মো'মিনীনদের ভূমিকার বিশ্লেষণ

আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে কী বুঝায় অনেকের কাছে তা আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির মনে হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে মৌলিকভাবে ইসলাম ধর্মের মৌলিক নীতিমালা তথা কুরআন ও হাদীসের দিক নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝিয়ে থাকে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল অধ্যাত্নিক শিক্ষা ব্যবস্থা অথবা কেবল জাগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝিয়ে থাকে না বরং আধ্যাত্নিক ও জাগতিক উভয় ব্যবস্থাকে বুঝিয়ে থাকে; কেননা সমান্তরালভাবে ইসলাম ধর্ম উভয় জগতকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। তাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন একদিকে আখেরাতমূখী এবং অপরদিকে ঠিক তেমনি দুনিয়ামুখীও বটে। কেননা স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তাঁর কাছে চাইতে শিখিয়েছেন এভাবে যে,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

“আমাদের প্রভু! দুনিয়াতে আমাদের মঙ্গল দান কর আর কল্যাণ দান কর আখিরাতে এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তি থেকে আমাদেরকে পরিত্রান দান কর”।[৬৪৯] সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে হলিষ্টিক বা সামগ্রিক ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে মানব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সকল কিছু বা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তাই বলা যায়, মুলত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা হলো পূর্নাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা বা আদর্শ অনুকরণীয় শিক্ষা ব্যবস্থা।

৬৪৯. আল কুরআন, ০২:২০১

অবএব, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এক মুখীতা নয় বরং বহুমুখীতায় বিদ্যমান। আধ্যত্ন, ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রশাসন পরিচালনা, ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন ইত্যাদি সকল কিছু এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। বর্তমান অধ্যায় আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকার যৌক্তিক বিশ্লেষণ।

১১.১ হযরত খাদিজা (রা.)

হযরত খাদিজা (রা.) যদি তাঁর বাড়ীটিকে কুরআন শিক্ষার জন্যে ছেড়ে না দিতেন তাহলে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র কোথায় হতে পারতো? হযরত খাদিজা (রা.) শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন পুরোদমে বিধায় নিজের আপন বাড়ীটিকে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নিজে তাঁর সন্তান-সন্ততিসহ বাড়ীতে আশ্রায় নেওয়া হযরত আলী ও যায়েদ ইবনে হারিছসহ অন্যান্য সকলকে নিজের সন্তানের মত হাতে কলমে মানবিক গুণাবলী যথা শিষ্টাচার, ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়ীতা ইত্যাদি শিক্ষা দিয়েছেন।[৬৫০] এখন একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন চলে আসে যদি তিনি এ মহৎ ও মহান গুণাবলী তাদেরকে শিক্ষা না দিতেন তাহলে তাঁরা কোথায় শিখতেন, কিভাবে শিখতেন এবং অন্যকেই বা কিভাবে শিখাতেন তা নিয়ে অনেক প্রশ্নের অজানা ও অনিশ্চিত উত্তর নিয়ে অযথা সময় কাটাতে হতো।

হযরত খাদিজা (রা.) বিভিন্ন সময় মহানবী (সা.) কে যেভাবে পরামর্শ এবং বিপদ আপদ থেকে যেভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন[৬৫১] তিনি যদি সেখান না হতেন তাহলে এত সুন্দর পরামর্শ ও সান্ত্বনাই বা মহানবী (সা.) কোথায় পেতেন? এসব স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তরে শুধু এটা বলা যায় যে

৬৫০. রাশীদ হাইলামায, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৬-৫৭
৬৫১. প্রাগুক্ত পৃ. ৬৪

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত খাদিজা (রা.) এর মত শিক্ষাবিদ মহিয়সী রমনীর প্রয়োজন ছিল অতুলনীয় বলেই মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সা.) এর জীবনের চরম প্রতিকূলতার সময়ে হযরত খাদিজা (রা.) কে উত্তম সঙ্গীনী হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

১১.২ হযরত সাওদা (রা.)

হযরত খাদিজা (রা.) এর অনুপস্থিতিতে হযরত সাওদা (রা.) মহানবী (সা.) এর পরিবারে ও গৃহে আশ্রায় নেওয়া হযরত আলী (রা.) সহ আরও অনেককে আরবে প্রচলিত ভদ্রতা, শিষ্টাচারের ও অমায়িকতার গুণাবলী শিক্ষা দিয়েছেন।[৬৫২] হযরত ফাতেমা (রা.) কে তিনি নিজ কন্যার মতই ঘর-গৃহস্থলীর যাবতীয় ব্যবহারিক কাজ-কর্ম হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবী (সা.) এর ঐ সকল দুর্দিনে যদি হযরত সাওদা (রা.) এর মত একজন অভিজ্ঞ ও ঘর-গৃহস্থলির কাজ পরিচালনায় দক্ষ মহিয়সী নারী না থাকতো তাহলে নবীজী (সা.) হয়তো অসুবিধায় পড়তেন বিধায় আল্লাহ তায়ালা নবীজীর জীবনে তাঁর মত একজন মহিয়সী নারীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

১১.৩ হযরত আয়েশা (রা.)

হযরত আয়েশা (রা.) এর মত একজন বিদগ্ধ নারী না থাকলে মহানবী (সা.) এর জীবনে সংঘটিত ঘটনাগুলো উম্মতে মুহাম্মদীকে কে এত সুন্দর ও সুচারুভাবে উপস্থাপনা করতে পারতেন? মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র সহধর্মীনীদের সাথে কিভাবে ব্যবহার করতেন তথা অন্দর মহলের জীবন-আচরণ ও দর্শন কেমন ছিল যাতে রয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের জন্যে পথ নির্দেশিকা তা কে এত পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে আমাদের কাছে পেশ করতে পারতো যদি হযরত আয়েশা (রা.) এর মত তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির ও প্রখার মেধা সম্পন্ন নারী নবী জীবনে না আসতো? যদি

---

৬৫২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) না আসতেন তাহলে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ধানে মুসলিম দুনিয়াতে আরও অনেক বছর অপেক্ষা করতো হতো। মহানবী (সা.) এর জীবনে হযরত আয়েশা (রা.) এর উপস্থিতি উম্মতে মুহাম্মদী তথা বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে বিশেষ রহমত। তাঁর কাছে থেকে হাজার হাজার নর নারী ইসলামী শিক্ষার যে জ্ঞান আহরণ করেছেন তা নি:সন্দেহে কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বে আদর্শ শিক্ষার উৎসমূলে আলো ছাড়াতে থাকবে। সারা বিশ্বের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাত নির্বিশেষে সবাই তাঁর দ্বারা শিক্ষাব্রতী ও অধ্যাবসায়ে আত্ম নিয়োগ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে নি:সন্দেহে। সমকালীন সাহিত্য, ইতিহাস ও বংশনামা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) এর পারদর্শিতা বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেয়।[৬৫৩] বহুমূখী প্রভিভাধর হযরত আয়েশা (রা.) যদি নবী জীবনে না আসতেন তাহলে উম্মাতে মুহাম্মাদী কিভাবে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে অনুপ্রাণিত বোধ করতে পারাতো সে প্রশ্নের উত্তর সহজে প্রদান করা যায় না। কার কাছেই বা তারা বহুমূখী জ্ঞানের আলো পেত? এ সকল প্রশ্নের উত্তর মিলা সত্যিই কঠিন ও জটিল। হযরত আয়েশা (রা.) ই এ সকল কর্মকান্ডের জন্যে যথার্থ ছিলেন বলেই তিনি নবী জীবনে ছোট বয়সে পদার্পণ করে নবী (সা.) এর প্রতিটি বিষয়কে টেপ রেকর্ডের মত করে সংরক্ষণ করে পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোর ব্যবস্থা করে গেছেন। ইসলামী আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ও বিস্তারের ক্ষেত্রে নি:সন্দেহে তিনি পথিকৃত ও আদর্শ। মূলত তাঁর গৃহ ছিল ইসলামী আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। তিনি যদি নিজের গৃহকে এবং নিজেকে ইসলামী জ্ঞান চর্চার জন্যে উম্মুক্ত না করতেন তাহলে এক চতুর্থাংশ ইসলামী জ্ঞান ভান্ডার হয়তো বা চিরকালের জন্যে হারিয়ে যেত বা উদ্ধার করা অনেক কঠিন হত।

১১.৪ হযরত হাফসা (রা.)

৬৫৩. প্রাগুক্ত পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

নবী পত্নী হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন সত্যিই এক অসাধারণ মহিলা। লেখা পড়া শিখতে আগ্রহী সাবার জন্যে তিনি এক অনুপম উৎসব্যঞ্জক। তাঁর বিশেষ আগ্রহের কারণে মহানবী (সা.) তাঁকে লেখার কাজটি শিখানেরা জন্যে সে সময়ের লেখা জানলেওয়ালা নারী হযরত শিফা (রা.) কে নিজে অনুরোধ করেছিলেন।[৬৫৪] আজকের তুলনায় সে সময়ে লেখা শিখানো ও শিক্ষার কাজটি ছিল খুবই দুর্বোধ্য ও জটিল। হযরত শিফা (রা.) কাছ থেকে তিনি কেবল ঝাড়-ফুকের দুয়াটিই শিখেন নি বরং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার কতিপয় ব্যবহারিক জ্ঞানও শিখে নিয়েছিলেন।[৬৫৫] পরবর্তীতে তিনি নিজে মহান শিক্ষিকার মত পরবর্তী প্রজন্মকে তা শিখিয়ে দিয়েছেন অতি আন্তরিকতার সাথে। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় বয়সপ্রাপ্ত নারী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ বা প্রদান করা যে শ্রেয় পদ্ধতি তা আমরা হযরত শিফা (রা.) এর কাছে থেকে হযরত হাফসা (রা.) এর শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে স্পষ্ট করে দেখতে পাই।

হযরত হাফসা (রা.) বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করছেন এবং অনেক কঠিন ফিকহী মাসয়ালার মতামত পেশ করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ভালকরে বুঝতে পারতেন। ফলে তাঁর পক্ষে কুরআন, হাদীস ও ফিকহের বেশ কিছু জটিল ও জিজ্ঞাসিত বিষয়ে যেভাবে সমাধান বের করা সম্ভব হয়েছে তা হয়তো অন্য কারো পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে উঠত।

তিনি যেভাবে পবিত্র কুরআনের সংকলিত কপিটি নিজের কাছে বিশাল দায়িত্ব মনে করে যেভাবে সংরক্ষন করেছেন তা অন্য কারো পক্ষে বেশ কঠিনই মনে হত বিধায় আল্লাহ তায়ালা হযরত হাফসা (রা.) এর মত এত দায়িত্ব বা যত্নশীল নারীকে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রী হিসেবে কবুল

৬৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ.২১৩
৬৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

করেছিলেন। হযরত হাফসা (রা.) না থাকলে কিভাবে এত বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন হতো আমাদের জানা নেই। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজের জন্যেই মহান রাব্বুল আলামীন উপযুক্ত মানুষের ব্যবস্থা করেন এটাই আমাদের সাধারণ বিশ্বাসের কথা।

১১.৫ হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.)

হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা.) নবীজী (সা.) এর সাথে বিবাহের মাত্র তিন মাসের মাথায় ইন্তিকাল করেন[৬৫৬] যার ফলে তাঁর পক্ষে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা জানা যায় নি। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে রুচিশীল আচরণ ও ব্যবহারের ধারক-বাহক ছিলেন তা-ই তিনি তাঁর কাছে আগন্তুক কোন ব্যক্তিকে শিখাতেন ও বোঝাতেন। তিনি জনকল্যাণ মূলক ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্ম-কান্ড যেমন দান খয়রাত করা তথা ইয়াতিম, অনাথ ও অসহায় মানবতাকে সাহায্য-সহাযোগিতা নিজে করতেন[৬৫৭] এবং অন্যান্য মানুষকে অনুরুপ কাজ করতে বলতেন।

১১.৬ হযরত উম্মু সালামা (রা.)

হযরত উম্মু সালামা (রা.) আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনে উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগিকতা ও যুক্তিবাদীতার জন্য জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি এত বেশি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ছিলেন যে তা অন্য কোন নবী পত্নীগণের সাথে তুলনা করা যায় না। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু আবেগ ও আধ্যত্মিকতার উপর যে নির্ভরশীল নয় তা আমরা হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর জীবন-চরিত ও দর্শন আলোচনার সময় বেশ কয়েবার উল্লেখ করেছি। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও ক্ষুরধার যুক্তির কারণে উত্তপ্ত পরিবেশকে তিনি ঠান্ডা ও শীতল করতে পারতেন এবং নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসতে

৬৫৬. মুয়াল্লিমা মোরশেদা বেগম (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
৬৫৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬

পারতেন কঠিন পরিস্থিতিকে। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের সময়কার ঘটনাবলীতে যার অনেক প্রমান পাওয়া যায়।[৬৫৮] তাঁর অনুরোধের প্রেক্ষিতে আল কুরআনে সরাসরি মহিলাদেরকে প্রসঙ্গে করে আয়াত নাযিল হয়েছে।[৬৫৯] তিনি নিজে সুন্দর করে কুরআন তেলায়াত করতেন আর মানুষকে সেভাবে তেলায়াত করা শিক্ষা দিতেন।[৬৬০] হযরত উম্ম সালামা (রা.) লেখা-পড়াকে কেবল তথ্যমূলক ভান্ডারের মধ্যে সীমিত না রেখে বরং তার ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক শিক্ষার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা যে মানুষকে সকল দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে থাকে তার প্রমান আমরা তাঁর জীবনে পেয়ে থাকি। তিনি নিজের ছেলে মেয়েদেরকে আদর যত্ন করে শিষ্টাচারের সকল শিক্ষা প্রদান করে ঘরে গৃহস্থলির যাবতীয় কাজ নিজ হস্তে করতেন। এমনকি তিনি খুবই সুন্দরকরে ও সুচারুভাবে রুচিশীল খাবার তৈরি করতে পারতেন। এভাবে তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

১১.৭ হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)

কুসংস্কার ও কু-প্রথা ইসলামী আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে পারে না-তা দূরীকরণের উপলক্ষ্য হয়েছিল হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) । তিনি নিজে কর্মমূখী শিক্ষার বাস্তব দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। হযরত যায়নাব (রা.) একজন বিখ্যাত হস্তশিল্পী ছিলেন ।[৬৬১] এ বিদ্যাটি শিখে তিনি তাঁর বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি কখনও অলস জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন না। নিজ হাতে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করে তা বিক্রি করে আয় করতেন। তা থেকে নিজে আবশ্যিক

৬৫৮. প্রাগুক্ত পৃ. ২৩৭-২৩৮
৬৫৯. আল কুরআন ৩৩:৩৫ “নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী-তাদের জন্যে আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।”
৬৬০. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৫
৬৬১. প্রাগুক্ত পৃ. ২৬৪

প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতেন এবং বাকী যা থাকতো তা গরীব মিসকিন ও অসহায়কে দিয়ে দিতেন। শিক্ষা যে মানুষকে স্বাবলম্বী ও কর্মমূখী করে তার উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)। তিনি নিজের মধ্যেই কর্মমূখী শিক্ষাকে লুকিয়ে রাখেন নি বরং তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে ছিটায়ে দিতে বদ্দ পরিকর ছিলেন। বহুমূখী কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি মহানবী (সা.) এর হাদীস শিক্ষা ও তা বর্ণনায় অবদান রাখেন।

১১.৮ হযরত জুয়াইরিয়া (রা.)

নিজের যথোপোযুক্ত প্রাপ্য আদায়ের স্বার্থে যুক্তি ও প্রজ্ঞার যে প্রতিবাদী ব্যবহার করা দরকার তা আমরা হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) এর কাছ থেকে শিখতে পারি। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্তি ও প্রজ্ঞার ব্যবহার বাদ দিয়ে হতে পারে না; বরং ইসলামী আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা যুক্তি ও প্রজ্ঞার যথোপোযুক্ত ব্যবহার সর্বদা উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে আসছে। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে হযরত জুয়ারিয়া (রা.) এর যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মেনে নিয়েছিলেন[৬৬২] এবং পরবর্তীতে তিনি নিজেই জুয়াইরিয়া (রা.) এর যুক্তির ভূয়সী প্রশংসা পর্যন্ত করেছিলেন। হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) খুবই যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি সর্বদা যুক্তি দিয়ে কথা বলতেন এবং যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে তাঁর কাছে আগত নারী পুরুষকে শিখাতেন। হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) এর শিক্ষা পদ্ধতির ধারণ থেকেই আমরা আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই।

১১.৯ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)

৬৬২. ইউসুফ আল-কানধালূবী, nvqvZm mvnvev, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৬

আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় ভোগের শিক্ষা দেওয়া হয় না বরং সর্বদা সেখানে ত্যাগের মহিমাই ভাস্বর হিসেবে থাকে-এ দৃষ্টান্তটি আমরা উম্মহাতুল মোমেনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর জীবন চরিত থেকে সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। পূর্বেই তাঁর অতুলনীয় ত্যাগের কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখনোর চেষ্টা করেছি যে তিনি কী চরম দুর্দিনে দুর্ভিসহ জীবন যাপন করেছিলেন। তবুও তিনি ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে সবকিছুকে সহ্য করেছেন। তাই সারা জীবন তিনি ত্যাগ ও তিতিক্ষার মহান শিক্ষায় ব্রতী হয়ে তাঁর কাছে আগত সকলকে উক্ত ত্যাগ ও তিতিক্ষার শিক্ষা এবং ধৈর্য ধারণ করার জন্যে আশ্বস্ত করতেন। তিনি এতই স্পষ্টবাদী এবং সত্য ও ন্যায়ের লড়াকু শিক্ষক ছিলেন যে তাঁর নিজের পিতাকে পর্যন্ত ছাড় দেন নি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীজী (সা.) এর বিছানায় পিতাকে মুশরিক অবস্থায় বসতে বারণ করেছিলেন।[৬৬৩] আবার পিতার মৃত্যুর পর মনে কষ্ট থাকা সত্বেও ইসলাম নির্ধারিত শোক সীমানার বাইরে তিনি এক মুহূর্তও অতিক্রম করেন নি। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার একনিষ্ঠ কর্মী ও প্রদর্শক হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) হাদীস বর্ণনা ও ফিকহী মাসয়ালা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১১.১০ হযরত সাফিয়্যা (রা.)

হযরত সাফিয়্যা (রা.) নিজে লেখা ও পড়া উভয়ই জানতেন এবং সময় ও সুযোগ পেলে তা মানুষকে শিখাতেন। তিনি তাঁর জানা বিষয়গুলো নিজের ইয়াহুদী আত্মীয় স্বজনের কাছে চিঠির মাধ্যমে প্রচার করতেন।[৬৬৪] তাঁর এমন কর্ম থেকে আমরা বলতে পারি সত্যিকারের আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল পুথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না; বরং শিক্ষার সুফল পৌছে দেয়ার

৬৬৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪
৬৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

জন্যে চিঠির আশ্রয় নেওয়া যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা আজকের ইলেকট্রনিকস যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রভূত উন্নয়নের যুগে কারো বুঝার বাকী থাকার কথা নয়। শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে সুন্দর বাচন ও অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে তা আমরা হযরত সাফিয়া (রা.) এর জিজ্ঞাসিত মাসয়ালার প্রতি উত্তরের বাচন ও ভাব-ভঙ্গি থেকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝতে পারি। হযরত সাফিয়া (রা.) ব্যবহারিক জীবনে একজন স্বাবলম্বী মহিলা ছিলেন। তিনি সুন্দর করে রান্না করতেন[৬৬৫] এবং মানুষকে সুন্দর রান্নার কলা-কৌশলও শিক্ষা দিতেন। নিজের জিনিস অন্যকে খুশি মনে উপহার দেওয়া তাঁর বিশেষ গুণে পরিণত হয়েছিল ।[৬৬৬] তাঁর কাছে আগত মহিলাদেকে তিনি পরস্পর পরস্পরের প্রতি উপহার-উপঢৌকনের আদান-প্রদানের শিক্ষা দিতেন। বিপদের সময় বিপদে পতিত ব্যক্তির পাশে দাড়াতে হয়[৬৬৭] এবং প্রয়োজনে ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত বিষয়ের জন্যে দাবী-দাওয়া পেশ করতে হয় এমন মহান শিক্ষা আমরা তাঁর মত মহিয়সী নারীর জীবন চরিত থেকে জানতে পারি। কাজেই আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা কখনও এমন কতিপয় মহৎ গুণাবলীর বাইরে কল্পনা করা যেতে পারে না।

১১.১১ হযরত মায়মুনা (রা.)

উম্মুহাতুল মোমেনীন হযরত মায়মুনা (রা.) খুবই পন্ডিত নারী ছিলেন। মানুষের কঠিন ইচ্ছে পূরণের বিষয়টিকে তিনি সহজ ও সাবলিল করে দিয়েছিলেন বলে তাঁর জীবন চরিত থেকে জানা যায়। কাজেই আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জীবনে ইচ্ছা অকাঙ্খার কঠিন বিষয়টিকে সহজ করে দেওয়া। শিক্ষা মানুষের জীবনকে কঠিন করার জন্যে নয় বরং সহজ করা জন্যে তার যথার্থ প্রমান তিনি রেখে গেছেন হযরত মায়মুনা (রা.)। তাঁর জীবনী আলোচনার সময় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক মহিল সুস্থ হয়ে অসুস্থ অবস্থার মানত পূরণের জন্যে বায়তুল মুকাদ্দাসে রওনা

৬৬৫. প্রাগুক্ত
৬৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
৬৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৯৯

দিতে চাচ্ছিলেন ঠিক সে সময়ে হযরত মায়মুনা (রা.) তাকে থামালেন[৬৬৮] এবং বললেন তুমি দূরে না গিয়ে ধারে কাছের মদিনার মসজিদে নববীতে নামায আদায় কর এবং তাতেই তোমার মানত পূরণ হয়ে যাবে। এ থেকে যা স্পষ্ট বুঝা যায় তাহলো তিনি একইসাথে ফকিহবীদ তথা মুজতাহিদ ছিলেন বলেই ফিকহ শাস্ত্রের একটি মাসয়ালকে তিনি নিজের বুদ্ধি ও যুক্তি খাটিয়ে সহজ পদ্ধতির ও পন্থায় বলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধার করা প্রশংসীয় গুণের কিছু না হলেও অতি প্রয়োজনের সময় যে ধার করা অপরিহার্য হয়ে উঠে এবং সে সময় ঋন পরিশোধের প্রবল ইচ্ছা নিয়ে ধারা করা যায় তা হযরত মায়মুনা (রা.) আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে শিখিয়েছেন। ইসলামী আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন ক্রমেই শরীরাতের ওযর ছাড়া শরীয়াতের আবশ্যিক বিষয়ের প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শনের কোন সুযোগ নেই তা হযরত মায়মুনা (রা.) আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিকটাত্নীয়কেও ছাড় দেননি।[৬৬৯] মানুষ ভূলের উর্দ্ধে নয় এ কথাটির সত্যতা তাঁর জীবন আচরণ থেকে আরও বেশী স্পষ্ট হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মত বিশাল পন্ডিত ব্যক্তি জহেলী যুগের আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্ত্রীকে ঋতুস্রাবের দিনগুলিতে বয়কট করতে দেখলে তিনি নিজে তাঁকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনেন এবং মুহাম্মদ (সা.) এ সময়ে কেমন ব্যবহার করতেন তা জানানোর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ভুল ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হন।

এ থেকে সহজে প্রমান পাওয়া যায় যে, ভুল যেই করুক না কেন তা অত্যন্ত শালীন ও ভদ্র ভাষায় এবং আচরণের মাধ্যমে সংশোধনের ব্যবস্থা করাই ইসলামী আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।

৬৬৮. ইবন সাদ, AvZ-ZvevKvZ Avj Keiv, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৩৯;
৬৬৯. আল ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi Avjvg Avb bevjv, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৪

১১.১২-১৩ হযরত রায়হানা ও মারিয়া কিবতীয়া (রা.)

উম্মুল মোমেনীন হযরত রায়হানা (রা.)[৬৭০] ও মারিয়া কিবতীয়া (রা.)[৬৭১] আন্তরিকতাপূর্ণ হৃদয় ও মন দিয়ে ইসলামী আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখে গেছেন। তারা উভয়ই পরম ধৈর্যশীল, সহনশীল ও পুত:পবিত্র চরিত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের হৃদয়-মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার স্থান দখল করে নিয়েছেন। তাদের কাছে আগত দর্শনার্থী ও সাক্ষাতকারী নারী পুরুষকে শরীয়াতের মাসয়ালা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জবাব দিতে না দেখলেও বা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান না থাকলেও কিংবা কুরআনের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পারদর্শিতা না দেখাতে পারলেও মানব জীবনের ব্যবহারিক আচরণের যে শিক্ষা তাঁরা নিজেরা গ্রহণ করেছেন এবং অপরকে গ্রহণ করার জন্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন তা সত্যিই বিরল। "যতটুকু জান ততটুকু আমল কর"- এ শ্লোগানের সাথে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। আর হযরত রায়হানা ও মারিয়া কিবতীয়া (রা.) উভয়ই ছিলেন এর বাস্তব নমুনা তথা উজ্জল দৃষ্টান্ত।

এভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ ছিলেন উম্মাতে মুহাম্মাদী (সা.) এর জন্যে আদর্শ অনুকরণীয় শিক্ষক। তাঁদের প্রত্যেকের কাজ-কর্মই ছিল আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে পথ প্রদর্শক স্বরুপ। তাঁরা প্রত্যেকে মানব জীবনের একেক দিকে খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা সত্য সম্পর্কে যা জানতেন তাই অন্যদেরকে জানিয়ে দিতেন। তাঁদের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা জিঙ্গাসিত বিষয়ের সঠিক উত্তর জানা থাকলে বলতেন নচেৎ অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির

৬৭০. তালিবুল হাশেমী, প্রাগুক্ত পৃ. ৭৯-৮০
৬৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২

কাছে যেতে বলতেন। তাঁরা সর্বদা ইবাদত গুজারী, আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ ভরসাকারী, সঠিক আমলকারী, মানবদরদী ও পরোপকারী ছিলেন। আর তাঁদের কাছে আগতদেরকে তাঁরা এ সকল বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

তাঁদের কাছে মহানবী (সা.) এর যে সকল বাণী সংগ্রহে ছিল তাঁর সবটুকুই তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মকে জানিয়ে গিয়েছেন। মানুষের দু:খ কষ্ট লাঘবের জন্যে তাঁরা দান-খয়রাতের যে নযীর স্থাপন করে গেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। নিজেরাতো বেশী বেশী দান করতেন আবার সেই সাথে অন্যদেরকে দান করতে উদ্bুদ্ধ করতেন। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা.) এর বিধি নিষেধের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকে ছিলেন সদা প্রস্তুত। দ্বীন ইসলামের প্রতি তাঁরা যেমন সোচ্চার ও অবিচল ছিলেন ঠিক অনুরুপভাবে অন্যান্য মানুষকে মহান আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন বিধানের প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার যথার্থ শিক্ষাই আমরা মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবন চরিত থেকে পাই। ইসলাম ধর্মের খুটি নাটি বিষয়ের দিক-নির্দেশনাও আমরা উম্মুহাতুল মোমেনীনদের জীবন থেকে লাভ করতে পারি। মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীদের অনেকেই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে প্রতিবাদমূখর হতে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন হযরত উম্মু সালামা (রা.) হযরত উমর (রা.) কে পর্যন্ত ছাড় দেন নি। একদা হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.) এর একান্ত পারিবারিক বিষয়ে কথা বলতে আসলে তৎক্ষণাত হযরত উম্মু সালামা (রা.) হযরত উমর (রা.) কে লক্ষ্য করে বললেন, “হে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)! আপনার উচিত হবে না নবীজী (সা.) এর একান্ত পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা।”[৬৭২] কেবল হযরত উম্মু সালামা (রা.) ই নন বরং মহানবী (সা.) এর আরও অনেক স্ত্রীও প্রতিবাদ করতে পিছপা হতেন না। যেমন হযরত রায়হানা ও জুয়াইরিয়া

৬৭২. ইমাম মুসলিম, mnxn gmwjg, বাবল ঈলা; ইমাম বুখারী, Avm-mnxn Avj eLvix, হাদীস নং-৭২০

Dhaka University Institutional Repository

(রা.) উভয়েই হযরত উমর (রা.) এর সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে হযরত উমর (রা.) কে আরও বেশী ন্যায়-নিষ্ঠাবান ও সুষ্ঠু বিচারক হতে সাহায্য করেছেন।[৬৭৩]

হযরত হাফসা (রা.) যুক্তিবাদী ও তার্কিক মননের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রতিটি কথা ও কাজের পিছনে যুক্তি খোজে বেড়াতেন। মহানবী (সা.) এর সংসারে আগমনের পরে সংসার জীবনের প্রথমদিকে নবীজী (সা.) এর কথার পিঠে তিনিও কথা বলতেন।[৬৭৪] সে কথা অবশ্য যুক্তি দিয়েই বলতেন। পরে পিতা হযরত উমর (রা.) এর শাসনের ফলে সে অভ্যাস থেকে তিনি অবশ্য বেরিয়ে আসেন। যাহোক, আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্তি দিয়ে কথা বলার গুরুত্ব যে অপরিসীম তা আমরা হযরত হাফসা (রা.) এর জীবন চরিত ও কর্ম-কান্ডের মাধ্যমে বুঝতে পারি। সারা জীবন হযরত হাফসা (রা.) পড়া-লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শিক্ষা শুধু প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমিত থাকবে না বরং মহানবী (সা.) এর কথানুযায়ী দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ ও বিতরনে ব্যস্ত থাকতে হয় সে মহান শিক্ষা দর্শনের বাস্তব রুপায়ন আমরা উম্মুহাতুল মোমেনীনদের জীবনে স্পষ্ট করে দেখতে পাই। শিক্ষা শুধু তাত্ত্বিক বিষয়ের মধ্যে সীমিত থাকার বিষয় নয় বরং ব্যবহারিক জীবনে একে প্রয়োগ করে দেখানো অপরিহার্য—হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীদের জীবনই এর বাস্তব প্রমান। উম্মুহাতুল মোমেনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছেন। তিনি নিজ হস্তে সুন্দরভাবে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরে বিক্রি করতেন এবং এ থেকে অর্জিত আয় দিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটাতেন এবং কিছু বাকী থাকলে গরীব মিসকিনকে দান করতেন।[৬৭৫]

---

৬৭৩. ইউসুফ আল-কানধালুবী, nvqvZm mvnvev, দিমাশক: দারুল কালাম, ২য় সংস্করন ১৯৮৩, খ. ২, পৃ. ২১৬

৬৭৪. ইমাম বুখারী, Avm mnxn Avj eLvix, হাদীস নং-১৯৫-১৯৬; ইউসুফ আল-কানধালূবী, nvqvZm mvnvev, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৮২-৬৮৩

৬৭৫. আল-ইমাম আয-যাহাবী, wmqvi æ Avÿjvg Avb-bevjv, বৈরুত: আল-মুওয়াসমাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করন ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে তিনি তাঁর হস্তশিল্পের কাজকে কর্মমূখী পেশায় পরিণত করেন এবং এর মাধ্যমে মানুষকে কর্মক্ষম করার চেষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ কেবল ঘরে বসে থাকতেন না বরং প্রয়োজন পড়লে ঘরের বাইরে এসে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আঞ্জাম দিতেন। এমনকি যুদ্ধ বিগ্রহের অভিযানে তাঁরা বের হতেন এবং আহতদের সেবা যত্ন করতেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণে আমরা তাঁদের অনেককে আদর্শ নার্স বা সেবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। হযরত আয়শা (রা.) নিজে এ রকম দায়িত্ব পালন করেছেন। ন্যায়ের পথের লড়াকু সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) প্রধান সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন। যদিও সে যুদ্ধ ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে হয়েছিল এবং এতে উভয় পক্ষের ক্ষতি সাধিত হয় বিপুল পরিমানে। যাহোক, এ থেকে যে জিনিসটি বুঝা যাচ্ছে, তা হল হযরত আয়েশা (রা.) সহ উম্মুহাতুল মোমেনীনদের অনেককেই প্রয়োজনে যুদ্ধের মত কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং যুদ্ধের প্রশিক্ষন তাঁদের অনেকেই নিতেন। কাজেই যুদ্ধ বিদ্যার কতিপয় বিষয়াবলী আমরা উম্মুহাতুল মোমেনীনদের কাছ থেকেই জানতে পারি। এভাবে একে পর এক মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণ তদান্তীন অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্বর ও অসভ্য সমাজে ইসলাম ধর্মের আলোকিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রচার প্রসারে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল।

তাঁরা একেক জন ছিলেন জ্ঞান জগতের দিকপাল। উদাহরণ হিসেবে হযরত আয়েশা (রা.) কে উল্লেখ করলেই বুঝা যায় যে জ্ঞানের এমন কোন শাখা-প্রশাখা ছিল না যেখানে তাঁর পদচারণা পড়ে নাই। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাসিসর, ইতিহাসবীদ, চিকিৎসক, জোতির্বিদ্যাসহ আরও অনেক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে তিনিই

সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬৭৬] তবে তিনি শুধু হাদীস শাস্ত্র বা হাদীস বর্ণনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন নি। সমকালীন বিশ্বের জ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখাতে অতি উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে বিচরণ করেছেন, শিখেছেন এবং শিখিয়েছেন। তাঁর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছ থেকে কেবল ইসলামী জ্ঞানই অর্জন করেন নি বরং পার্থিব বিষয়াবলী সম্পর্কিত অনেক জ্ঞানও তারা মা আয়েশা (রা.) এর কাছ থেকে শিখেছিলেন। আর হযরত আয়েশা (রা.) অত্যন্ত দরদ দিয়ে সে বিষয়গুলো ছাত্র-ছাত্রীকে জানিয়েছিলেন ও শিখিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর বহুমূখী পান্ডিত্যের কাছে সে যুগের নামকরা ও বিখ্যাত পুরুষ পন্ডিতগণও হার মেনেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর ঘর, তাবু বা বাসস্থান ছিল সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি যেখানে যেতেন বা থাকতেন লোকেরা সেখানেই ভীড় জমাতো এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু জানতে চাইত, শিখতে চাইত। আর হযরত আয়েশা (রা.)ও অতি উৎসাহ ও আনন্দের সাথে তাঁদের জিঙ্গাসিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এভাবে শিক্ষার গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি কখনও বিরক্তবোধ করেন নি বরং আনন্দিতই হয়েছেন।

অনুরূপভাবে উম্মু সালামা (রা.)ও শিক্ষা দীক্ষার কাজ করতে গিয়ে আনন্দবোধ করেছেন। তাঁর কথা ও কাজ এতই সুন্দর, সুস্পষ্ট ও যুক্তিবাদী ছিল যে সেখানে ঘুরিয়ে কথা বলার বা অস্পষ্টতার কোন লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হয় নি।[৬৭৭] সুতরাং তাঁর জীবন চরিত থেকে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার যে মৌলিক উপাদান ও উপকরন পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে কথা বা বক্তৃতা হতে হবে সুস্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত এবং সেখানে বক্রতার কোন ধরনের সুযোগ থাকা যাবে না। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা

---

৬৭৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, nv'xm PPvq gwnjv mvnvex‡'i Ae'vb, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করন ২০১০, পৃ. ২২০-২৯৭, ৩১১; মাওলানা নূরুর রহমান, D¤§j gÖwgbxb nhiZ Av‡qkv wmwÏKv (iv.), ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭, পৃ. ২৪৫, ২৫৩, ৩৫২-৩৬৮; ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬২

৬৭৭. আলহাজ্ব মাওলানা এ,কে,এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, wek bexi 'v¤úZ¨ Rxeb, ঢাকাঃ তাজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৬, পৃ. ১৫২-১৫৩; ইউসুফ আল-কানধালূবী, nvqvZm mvnvev, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৪

কেবল আধ্যত্মিকতা বা পরকালমুখী হবে না বরং পার্থিব বা জাগতিক বিষয়াবলী সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা ও দিক-নির্দেশনামূলক হতে হবে। মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবন-চরিত ও জীবন-দর্শন থেকে সে রকমই ধারণা পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) এর কোন স্ত্রী আধ্যাত্মিকতা চর্চা করতে গিয়ে বৈরাগ্যবাদকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন নি, বরং তাঁরা জগত-সংসারে ব্যস্ত থেকে অতি সাধারণ জীবন-যাপন করে আধ্যাত্মিকতার চর্চা করছেন। তাঁরা অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুভাবে দুনিয়াবী ও আখিরাতের কাজ-কর্মের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে সাধারণ মানুষের সাথে বিশেষ করে মহিলাদের সাথে মিশতেন এবং মানুষের জাগতিক দু:খ-দুর্দশা মোচনের জন্য সামর্থ অনুযায়ী কাজ করতেন। তাঁরা কেবল আখেরাতের বয়ানই দিতেন না বরং দুনিয়াতে ভালোভাবে, সুন্দরভাবে, মান-সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য পার্থিক জগতের সাথে সম্পর্কিত সকল ধরনের বৈধ কাজ-কর্ম করার জন্য মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করেছেন। তাঁরা ইয়াতিম, বিধবা, সহায়-সম্বলহীন মানুষের পাশে অবস্থান করেছেন এবং তাদের প্রতি সাহায্য-সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় হযরত খাদিজা (রা.) এর যে অপরিসীম অবদান ছিল তাঁর কোন তুলনা হয় না। হযরত খাদিজা (রা.) অঢেল সম্পদ মানব কল্যাণ ও মানব সেবায় বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর বাড়ীটিকে অবহেলীত ও আশ্রয়হীন মানুষের আশ্রকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন নিষ্কলুস চরিত্রের অধিকারী। অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগেও তিনি সকল ধরনের খারাপ কাজের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর পুত:পবিত্র চরিত্র ও সকল ধরনের মানবীয় গুণাবলীর কারণে জাহেলী যুগের লোকেরা তাকে ‘তাহিরা’ বা পুত:পবিত্র চরিত্রের অধিকারী বলে ডাকতো। হযরত খাদিজা (রা.) জাহেলী ও ইসলামী যুগে সকলের কাছে নিজেকে আদর্শবান নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক মনের মানুষ হলেও নিজেকে কখনও পার্থিব বা জাগতিক বিষয়াবলী থেকে দূরে রাখেন নি বরং সফল ব্যবসায়ী প্রশাসক ও উদ্যোক্তা হিসেবে সকলের কাছে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যেহেতু হযরত

খাদিজা (রা.) সকল দিক হতে একজন আদর্শবান মহিল ছিলেন সেহেতু তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল আদর্শ শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা। তিনি তাঁর নিজ গৃহকে পরিণত করেছিলেন সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে মানুষকে মানুষ বানানো তথা যথার্থ মূল্যবোধ শিক্ষা দিয়ে মানুষের মধ্যেকার প্রভুত্ব দূর করে মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের মাধ্যমে একজন মানুষকে নৈতিক মানুষে পরিণত করা হত। হযরত খাদিজা (রা.) এর উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে ছিলেন হযরত আলী (রা.)। তিনি হযরত আলী (রা.) কে পার্থিব-অপার্থিব সকল ধরনের জ্ঞানই শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর আরেকজন উল্লেখযোগ্য ছাত্র হলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)। উপহার সূত্রে হযরত যায়েদ (রা.) হযরত খাদিজা (রা.) এর দাস হলেও তিনি তাঁকে নিজের সন্তানের মত রেখেছেন এবং মানবীয় গুণাবলীর যাবতীয় দিক ও বিভাগ অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এভাবে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের সকলেই নিজ নিজ যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী আদর্শ শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে যথাযথ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন যথার্থ অর্থে সকল মানুষের শিক্ষক। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন আদর্শ জীবন-যাপনের ধারক ও বাহক। তাঁদের জীবন আচরণ ও কর্মপ্রয়াস থেকে মানব জাতীর জন্য অনেক কিছু শিখার আছে। এ সকল মহান উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁদের মত বহু গুণী ও জ্ঞানী মহিলাদেরকে মহানবী (সা.) এর স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা দান করেছিলেন এবং সেই সাথে মহানবী (সা.) এর মিশন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উত্তম সাথীতে পরিণত করেছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে উম্মুহাতুল মোমেনীনদের অবদানের বিশ্লেষণ

সুস্থ সংস্কৃতি বলতে তাই বুঝায় যা মানুষকে শারীরীক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বচ্ছ রাখতে পারে। এখানে ইসলামী সংস্কৃতিতে যে বিশ্বাসটি রাখতে হয় সেটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; কাজেই তিনি সবচেয়ে ভালো জানেন কোন কাজ করলে মানব জাতি প্রকৃত অর্থেই সুস্থ ও স্বচ্ছ থাকতে পারে। অনেক সময় মানুষ নিজের ভাল করতে গিয়ে আবেগ তাড়িত হয়ে খারাপ করে ফেলে। কাজেই মানুষের নিজের পক্ষে এমনকি নিজের ভালোর জন্যে শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক সময় চুড়ান্ত ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। অতএব আল্লাহ তায়ালার বিধান মোতাবেক মানব জীবনে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-ভাবনা পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্থ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আগেই কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংস্কৃতি হচ্ছে তা- যা মানুষ করে। মানুষ চিন্তা করে ও সে চিন্তা বাস্তাবায়ন করে বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে। আবার এমন চিন্তা করে যা বাস্তাবায়নের পর্যায়ে পড়ে না তাকে বলে কল্পনা। আবার লেখা-পড়া শিখে জীবন ধারণের জন্যে বহুমুখী কর্মের সাথে নিজেকে সংযুক্ত করতে হয়। নিজেকে সমজাতীয় মানুষ থেকে রক্ষার জন্যে গ্রহণ করে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা। অনুরূপভাবে অন্যান্য হিংস্র অহিংস্র প্রাণী থেকে নিজেকে রক্ষার ব্যবস্থাপনাও মানুষকে শিখতে হয়। মানুষকে আরও শিখতে হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করার উপায় হিসেবে বহুমূখী ব্যবস্থাপনা। নিজের শরীরকে আবৃত রাখার জন্যে তাকে পড়তে হয় পোশাক-পরিচ্ছেদ। নিজের আচার-আচারণ, ব্যবহার পরিশুদ্ধকরণ এবং চিত্তকে বিনোদন দেওয়ার জন্যে আনন্দদায়ক কর্মকাণ্ডের উপস্থাপনাসহ আরোও অনেক কর্মকন্ডকে সম্পাদন ও সুসম্পন্ন করতে হয়।

এভাবে সংস্কৃতি মানব জীবনের সম্পূর্ণ বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। কিন্তু অত্যন্ত দু:খজনক হলেও সত্য যে আমরা সংস্কৃতিকে বৃহৎ পরিসরের অর্থ থেকে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে আসছি। আর সেটা হচ্ছে সংস্কৃতি বলেতে কেবল যে চিত্রটি মনের আয়নায় ভেসে উঠে সেটা হলো কতিপয় পরিশোধিত ভদ্র আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ধরণ, শিল্পকলা এবং চিত্ত-বিনোদনমূলক কর্মকান্ড। যাহোক, বর্তমান অধ্যায়ে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের অবদানের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মধ্যেই সীমিত থাকার চেষ্টা করব।

১২.১ হযরত খাদিজা (রা.)

উম্মুহাতুল মোমেনীন হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন খুবই সংস্কৃতিমনা। এ কথা তাঁর জীবন চরিত আলোচনার সময় আমরা বলেছি। তিনি যে সংস্কৃতিমনা ছিলেন তার বড় দৃষ্টান্ত হলো নিজের বিয়ের অনুষ্ঠানে আনন্দ করার জন্যে তিনি দফ বাজানো ও সীমিত পরিসরে গান গাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৬৭৮] বিয়ের অনুষ্ঠানে আরবের বড় বড় নেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তাঁদের অধিকাংশই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। তিনি নিজে সফল ব্যবসায়ী ও পরিচালক ছিলেন। নেতৃত্বের গুণ ছিল তাঁর মধ্যে অপরিসীম। তিনি মানুষকে সহজেই বুঝাতে পারতেন এবং নিজের যুক্তির প্রতি টানতে পারতেন। তাঁর চেয়ে জ্ঞানী ও বুঝবান ব্যক্তির সাথে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা ও তাদের পরামর্শ শোনা তাঁর অভ্যাসগত আচরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মহানবী (সা.) এর জীবনে তিনি কেবলই স্ত্রী হিসাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেন নি বরং কখনও কখনও তিনি উত্তম বন্ধু, পরামর্শদাতা, সান্তনাদানকারী তথা অভিভাবকের ন্যায় ভূমিকা পালন

৬৭৮. রাশীদ হাইলামায, *খাদিজা (রা)*, (অনু. মুহাম্মদ আদম আলী), ঢাকা: মাকতাবুল ফুরকান, ২০১৫, পৃ. ৫৩

করেছেন।[৬৭৯] মক্কায় তার গৃহটি ছিল নব দীক্ষিত মুসলিমদের ইসলাম চর্চার জন্যে এক সুনির্ভরযোগ্য প্রাণকেন্দ্র। এখানে যে শুধু ইসলামই চর্চা হয়েছে তা নয় বরং সেখানে অভিভাবকহীন ও আশ্রয়হীন অনেক মানুষের ঠাঁই হয়েছিল। হযরত খাদিজা (রা.) তাঁদেরকে দেখা-শোনা করতেন এবং সেই সাথে সর্বোত্তম আচার-ব্যবহার তিনি শিক্ষা দিতেন। হযরত খাদিজা (রা.) নিজে ইসলামের উপর অটল-অবিচল ছিলেন এবং মানুষকে ইসলামের অমীয় বাণী তথা সুস্থ সংস্কৃতি বিনির্মানের জন্যে ইসলামী মূলনীতি যথা তাওহীদ রেসালাত আখিরাতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

হযরত খাদিজা (রা.) এর কল্পনা শক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং তাঁর অধিকাংশ স্বপ্ন বা কল্পনা সত্য ঘটনার ইঙ্গিত বহন করত। পোশাক-পরিচ্ছেদ ও আচার ব্যবহারে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে লুকায়িত আভিজাত্বের দিকটি ফুটে উঠত। তিনি এতই দরদ মাখা মন নিয়ে মানুষের সাথে কথা বলতেন যে যার সাথে যখন কথা বলেছেন সে তখন তাঁকে অতি আপন বা কাছের কেউ ভাবতে শুরু করত। মহানবী (সা.) এর সাথে বিবাহের পূর্ব থেকে তথা আরবের অন্ধকার যুগেই তিনি চারিত্রিক উৎকর্ষতা সাধন করেছিলেন বলে লোকেরা তাঁকে তাহিরা বা পুত:পবিত্র চরিত্রের অধিকারী নামে ডাকতো।[৬৮০] জাহেলী যুগের আরবের প্রচলিত খারাপ জিনিসগুলো তাঁকে কখনও প্রভাবিত করতে পারেনি। এমনকি ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকেও। ধর্মীয় বিশ্বাসগত ব্যাপারে তিনি মুষ্টিমেয় কয়েকজন হানাফী সম্প্রদায়ের সাথেই অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগই পেয়েছেন এবং উভয় যুগেই শ্রেষ্ঠত্বের আসীনে নিজেকে সমাসীন করতে সক্ষম হয়েছেন নিজের চারিত্রিক উৎকর্ষতা, অধ্যবসায় এবং সুস্থ ও স্বচ্ছ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের মাধ্যমে।

---

৬৭৯. ইবন আবদিল বার, *আল-ইসতিয়াব*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৮৩
৬৮০. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন- নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১১

১২.২ হযরত সাওদা (রা.)

হযরত সাওদা (রা.) তাঁর নিজের ত্যাগ তিতিক্ষা ও আন্তরিকতাপূর্ণ কর্মকান্ডের করণে জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছেন। হযরত খাদিজা (রা.) এর অনুপস্থিতিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে সাময়িক অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হয়েছিলেন তা তিনি তাঁর অতি আন্তরিকতাপূর্ণ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচার ব্যবহারের মাধ্যমে দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৮১] আগেই বলা হয়েছে, মহানবী (সা.) এর মা হারা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) এবং গৃহে আশ্রয় নেওয়া অন্যান্যদেরকে সেবা করার পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিখিয়েছিলেন। তাঁর ব্যবহার এতই চমৎকার ও আন্তরিক ছিল যে হযরত ফাতিমা (রা.) নিজের মায়ের আদর যত্নের অভাব বোধ করেননি। তিনিও হযরত খাদিজা (রা.) এর ন্যায় মহানবী (সা.) কে মাঝে মাঝে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সতীনে সতীনে যেখানে দন্দ্ব-সংঘাত লাগার কথা ছিল অথচ তিনি সেখানে বড় বোনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) যেদিন নবীজী (সা.) এর গৃহে বৌ হিসেবে আগমন করেন সেদিন তিনি বয়সে অনেক ছোট বলে সংসার জীবনের অনেক কিছুই তিনি বুঝেন নি। সেই আয়েশা (রা.) কে তিনি সংসার জীবনের সব কিছু পুঙ্খানুপঙ্খানরুপে শিখিয়ে দিয়েছেন। হযরত সাওদা (রা.) এত বেশি সরল মনের মানুষ ছিলেন যে মাঝে মাঝে তাঁর সরলতা অন্যকে একটুখানি হাসির খোরাক দিত। ইসলমী সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হিযাবের আয়াত নাযিলের উপলক্ষ হয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর কোমল হৃদয় বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের প্রতি এত বেশি আবেগময়ী মায়া প্রদর্শন করেছিলো যে তিনি ভু লেই গিয়েছিলেন যে তাঁরা ইসলাম ধ্বংসের পক্ষের শক্তি।[৬৮২] তিনি ব্যবহারিক জীবনে খুব বেশি কৌশলী না হলেও ব্যক্তিজীবনে

৬৮১. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম*, কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হি., খ. ২, পৃ. ৬৭
৬৮২. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৩; ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৫

একজন অতি উত্তম চরিত্রের মহিলা ছিলেন এবং নিজের অঙ্গন থেকে যতটুকু পেরেছেন সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের জন্যে কাজ করে গেছেন।

১২.৩ হযরত আয়েশা (রা.)

সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে হযতর আয়েশা (রা.) এর অবদানের কথা শেষ করা যায় না। তিনি একাধারে বিদ্যান, সংস্কৃতিমনা, শিক্ষাবীদ, শিক্ষক, নেতা প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হয়ে আছেন।

তাঁর প্রতিটি কাজ-কর্মে সুস্থ সংস্কৃতির জন্যে যে সকল আবশ্যক গুণাবলী থাকতে হয় তাঁর প্রতিটি জিনিসই উপস্থিত ছিল। ছোট বেলায় তিনি সমবয়সীদের সাথে রঙ-বেরঙের পুতুল নিয়ে খেলা করতেন এবং দোল খাওয়া খুব পছন্দ করতেন।[৬৮৩] বিয়ের পরও বেশ কিছু দিন তিনি উক্ত অভ্যাস অব্যাহত রেখে ছিলেন। মহানবী (সা.) এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। মাঝে মাঝে তিনি জিতে যেতেন আবার কখনও মহানবী (সা.) তাঁকে জিতিয়ে দিতেন। আবার মাঝে মাঝে হেরে যেতেন। যখন তিনি জিতে যেতেন খুবই খুশি হতেন এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতেন আবার যখন হেরে যেতেন তখন একটুও কষ্ট পেতেন না বরং মহানবী (সা.) এর কাজের প্রশংসা করতেন ও মূল্যায়ন করতেন। মহানবী (সা.) এর সাথে মান-অভিমান হলে তিনি ইব্রাহিম (আ) এর প্রভূর কথা উল্লেখ করতেন আর আবেগের মুহূর্তে বা সাধারণ অবস্থায় মুহাম্মদ (সা.) এর প্রভুর নামে কাজ করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটি রঙ-বেরঙের নকশা করা কাপড়-চোপর নকশা করা, তলোয়ারের খাপ ও আসবাবপত্র পছন্দ করতেন।[৬৮৪] উপহার পাওয়া প্রাণীর ছবি অংকিত পর্দার কাপড় খুব পছন্দ করে খুশী মনে গৃহের দরজায় টানিয়ে দিয়েছিলেন;

৬৮৩. ইবন সাদ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬২
৬৮৪. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৮

তবে মহানবী (সা.) এর অপছন্দের কারণে তা আর অব্যাহত রাখেন নি। কোন কিছু ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পারলে সাথে সাথেই অনুতপ্ত হতেন এবং কাফফারা বিধানের পর্যায়ে পড়লে তা আদায় করে ফেলতেন। তিনি এত বেশি ক্ষমাশীল ও দয়াবান ছিলেন যে ইফকের ঘটনার অপবাদকারীদেরকেও মাফ করে দিয়েছিলেন।[৬৮৫]

তাঁর চালাকী বুদ্ধি ভালোই ছিল। মাঝে মাঝে কাউকে না ঠকিয়ে বা না বঞ্চিত করে কিছু কিছু চালাকি বুদ্ধি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। পরে আবার এ জন্যে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নিতেন। তাঁর কাছে সবাই সমান ছিলেন। তিনি আপন পর ভেবে চিন্তাও করতেন না; আবার সিদ্ধান্তও নিতেন না। হযরত উসমান (রা.) এর কথিত হত্যাকারী নিজ ভাই মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে তিনি কোন ধরনের ছাড় দেননি। হযরত আলী (রা.) এর সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কারণ ছিল হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার প্রক্রিয়া তরান্বিত করার জন্যে চাপ প্রয়োগের কৌশলমাত্র। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সেখানে ছিল না। আগেই বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বেশ চালাকী ও কৌশলী বুদ্ধিকে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। কখনও এক্ষেত্রে সফল হয়েছেন আবার কখনও এক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারেননি। সকল অবস্থায়ই তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখতেন। জীবনে খুব বেশি খুশি হতে গিয়ে আত্মহারা হননি বা অস্বাভাবিক আচরণ করে বসেন নি। আবার ব্যর্থতার সময় চরম হতাশায় ভোগেন নি বরং অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) কবিতা শোনা ও শোনাতে ভালোবাসতেন।[৬৮৬] কবিতায় বিষয়বস্তু ভাল হলে

৬৮৫. তালিবুল হাশেমী, *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৬৮৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, খ. ৫, পৃ. ১৯৮-২০৮

অদ্যপান্ত মুখস্ত করে সময় সুযোগ বুঝে জায়গামত শুনিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে নিজেই নিজের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে পছন্দ করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। তাঁর প্রতিটি যুক্তিপূর্ণ ও রসালো কথা শুনলে শ্রোতার মনে তা বারবার শুনতে ইচ্ছে জাগত। আর তিনিও পারতেন শ্রোতামন্ডলীকে গল্প শোনাতে। আর অন্য কারো মাধ্যমে আরবী ভাষার যথার্থ ব্যাকরণ, তাত্ত্বিকতা ও উপমার প্রায়োগিকতার সাথে চিঠি লিখিয়ে যথাযথ স্থানে পৌছানোর ব্যবস্থা করতেন। নানা ধরণের কর্ম-কান্ডের মাধ্যমে এভাবে বহুমূখী প্রতিভাধর হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর দীর্ঘদিন যাবত ইসলামী সংস্কৃতির দিক নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে গেছেন।

১২.৪ হযরত হাফসা (রা.)

হযরত হাফসা (রা.) ছিলেন লেখা পড়া জানা মহিয়সী নারী। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুমতিক্রমে হযরত শিফা (রা.) এর থেকে নামলা নামক ঝাড় ফুঁকের দুয়াটি শিখে নিয়ে মানুষের সেবার জন্যে হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগ করতেন।[৬৮৭] প্রথম দিকে হযরত হাফসা (রা.) মহানবী (সা.) এর সাথে কথার পিঠে কথা বলার প্রবণতা থাকলেও পরবর্তীতে বাবা হযরত উমর (রা.) এর ধমকের কারণে তা ঠিক করে নিয়েছিলেন। তবে তিনি যুক্তি দিয়ে কথা বলতে চাইতেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে হযরত হাফসা (রা.) এর খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। তাঁরা দু'জনে নবীজী (সা.) এর অন্যান্য স্ত্রীর উপর প্রভাব খাটাতে চাইলেও পারেন নি। কেননা অপর পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত উম্মু সালামা (রা.) এর মত বিখ্যাত বিচক্ষন ও দুরদর্শী মহিয়সী নারী। যাহোক,

৬৮৭. ইউসুফ আল-কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৮২

যেহেতু তিনি লেখা ও পড়া উভয় জানতেন আবার নবী পত্নী সেহেতু হযরত উমর (রা.) পবিত্র কুরআনের সংকলিত কপিটি তাঁর কাছেই সংরক্ষনের ব্যবস্থা করেন। আর তিনি এ দায়িত্বটি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করে জগৎ বিখ্যাত হয়ে আছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই রুচিশীল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও অভিজাতপূর্ণ আচরণকারী ও চিন্তাবীদ মহিলা ছিলেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শালীন ও পরিশালীত রূপের বহি:প্রকাশ ঘটেছিল। অনেক ধরণের নফল নামায, রোযা ও দান খয়রাত ছিলো তাঁর অনুপম সাংস্কৃতিক জীবনের আরেকটি ভূষণ।

১২.৫ হযরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা (রা.)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা (রা.) মহনবী (সা.) এর সাহচর্যে খুব বেশি সময় কাটাতে পারেননি। বিয়ের মাত্র তিন/চার মাসের মাথায় ইন্তিকাল করেন এবং স্বয়ং নবীজী (সা.) এর জানাযা ও দোয়ায় সিক্ত হয়ে কবর শায়িত হন। যাহোক, যতদূর জানা যায় সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে তিনি আমাদের জন্যে যে আদর্শ রেখে গেছেন তা হচ্ছে তাঁর বেহিসাবী দান খয়রাত করা। তিনি গরীব দুখীর প্রতি এতই দয়া-মায়া মমতাবান ছিলেন যে তাদেরকে দান করার সময় নিজের জন্যে কিছু অবশিষ্ট থাকলো কিনা তা খেয়াল করতেন না। অনেক সময় দান করার পর নিজেকে অনাহারে বা কষ্টের মধ্যে রাখতে হত। তাঁর এ মহৎ গুণের কারণে জাহেলী যুগ থেকেই তিনি উম্মুল মাসাকিন বা মিসকিনদের মা (অভিভাবক) অর্থে ডাকা হতো।[৬৮৮] আরেকটি গুণের কথা না বললেই নয় তা হচ্ছে তাঁর পূর্ব স্বামী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) কে উহুদের যুদ্ধের শাহাদৎ করার পর শত্রুরা তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করে লাশ বিকৃতি করে ছিটিয়ে ফেলে রাখে। স্বামীর এমন অবস্থার দৃশ্য অবলোকন করে অনেক ব্যথিত হয়ে

৬৮৮. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৭৪

ছিলেন বটে[৬৮৯] কিন্তু এরূপ কঠিন শোককে ধৈর্য্যের মাধ্যমে তিনি শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। সুতরাং শোককে কিভাবে ধৈর্য্যের মাধ্যমে শক্তিতে পরিণত করতে হয় তা আমরা তাঁর মত মহিয়ষী নারীর জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

১২.৬ হযরত উম্মু সালামা (রা.)

নবী পত্নী হযরত উম্মু সালামা (রা.) দানশীল ও অতিথি পরায়নাতার জন্যে সেই জাহেলী যুগেই যাদুর রাকিব বা কাফেলার পাথেয় হিসাবে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেন।[৬৯০] মক্কার ধনী ও অভিজাত পরিবারের কন্যা এবং আরেক ধনী ও অভিজাত পরিবারের স্ত্রী হিসাবে ভালই সুখ ও আনন্দের সাথে দিনাতিপাত করেছিলেন। কিন্তু ইসলামের দাওয়াতে সারা দিতে গিয়ে এ আদর্শ দম্পতি একেবারে নি:স্ব হয়ে পড়েন।[৬৯১] পূর্ব স্বামী হযরত আবি সালামা (রা.) এর মৃত্যু হলে সন্তানদেরকে নিয়ে ভীষন কষ্টের মধ্যে পতিত হলেন। পরবর্তীতে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে বিবাহের পরে তাঁর জীবনের অনিশ্চয়তা ঘুচে যায়। যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো জীবনের এত চড়াই-উৎরাই কিভাবে ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার সাথে অতিক্রম করতে হয় সে শিক্ষাটি তিনি আমাদের সবার জন্যে রেখে গেছেন। মহানবী (সা.) যখন তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা নি:স্বন্দেহে লোভনীয় প্রস্তাব ছিলো। কিন্তু তিনি তা সরাসরি অস্বীকার না করে শর্ত দিয়ে ও তা আদায়ের নিশ্চয়তা পেয়ে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।[৬৯২] তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে তিনি খুবই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও অভিমানী মহিলা আবার একাধিক সন্তানের জননী । কাজেই তাঁকে বিবাহ করতে গেলে প্রস্তাবক এগুলো মেনে তিনি রাজী থাকবেন। নচেৎ তিনি বিবাহ করবেন না। মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে এগুলোর নিশ্চয়তা পেয়েই তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

---

৬৮৯. আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ দানাপুরী, *আসাহুস সিয়ার*, প্রাগুক্ত, ৬১৯
৬৯০. ইবন হাজার, *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮
৬৯১. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লা আন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৩
৬৯২. ইবন সাদ, *আত-তাবাকাত আল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯০,৯১

কাজেই ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে ও বর্তমান সমস্যাকে লুকিয়ে পরবর্তী কাজ না করার যে মহান শিক্ষা তিনি রেখে গেছেন তা সারা বিশ্বে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে এক মাইল ফলকের ভূমিকা রাখে নি:সন্দেহে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি এত বেশি লাজুক ছিলেন যে মহানবী (সা.) এর সাথেও দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিক করতে কিছুটা সময় লেগেছিল।[৬৯৩] লজ্জা-শরম মানব জীবনের বিশেষত ভদ্র মহলের একটা বিশেষ গুণ তা আমরা উম্মু সালামা (রা.) এর জীবন চরিতে পাই। নিজ হাতে কর্ম করা নবীদের সুন্নাত। হযরত উম্মু সালামা (রা.) নিজ হাতে ঘর সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন। খুবই সুস্বাদু করে খাবার রান্না করার কলা-কৌশলের আদর্শ তিনি রেখে গেছেন। যে কাজ করে তার ভূল হয়। এ শিক্ষা তিনি আমাদের জন্যে রেখে গেছেন। কাজ-কর্মের কোথায় ভুল ধরা পড়লে সাথে সাথেই তিনি অনুতপ্ত হতেন এবং অঙ্গীকার করতেন যে অনুরুপ ভূলে যেন আর না হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ করে মহানবী (সা.) গোটা পরিবেশকে সহজে ও দ্রুত সময়ের মধ্যে আয়ত্বে আনতে পেরেছিলেন।[৬৯৪] কাজেই সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শী ও বিচক্ষনতার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করার কোন উপায় নেই। মহানবী (সা.) এর ঔরসে তাঁর কোন সন্তান জন্ম না হলেও তাঁর পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তানদেরকে তিনি নিজেই লালন পালন করেছেন এবং সুস্থ সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্যে যা যা দরকার তা তিনি তাদের সকলকে অকপটে শিক্ষা দিয়েছেন। কাজেই একাধারে তিনি ছিলেন আদর্শ মা, গৃহিনী, বৌ, মেয়ে, কুটনীতিবিদ, শিক্ষক, শিক্ষাবীদ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি ইত্যাদি।

৬৯৩. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৯৩
৬৯৪. ইউসুফ আল কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৪

সুস্থ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। এ ক্ষেত্রে তার জুড়ি পাওয়া যায় না। তিনি মহনবী (সা.) এর একটি পশম হিন্না ও কাতাম এ সংরক্ষন করে রাখেন[৬৯৫] যা অন্য স্ত্রীরা করেছেন বলে জানা যায় না। মহিলাদেরকে সরাসরি উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে যেন কোন আয়াত নাযিল হয় তার এরূপ অনুরোধের কারণে তৎক্ষনাত সুরা আহযাবের ৩৫নং আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। কাজেই আধুনিক দৃষ্টান্তে তিনি যে নারীবাদী ছিলেন উক্তি করলে ভুল হবে না। তিনি তাঁর ধৈর্য্য ও বিচক্ষন বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত হযরত ফাতেমা (রা.) কে নবীজী (সা.) এর বলে যাওয়া কথাগুলো জানতে পেরেছিলেন যা হযরত আয়েশা (রা.) তৎক্ষণাত জানতে চাইতে গিয়ে পারেন নি। কাজেই এতে প্রমান হচ্ছে যে ধৈর্য্য ও বিচক্ষনতার মাধ্যমে যা অর্জন করা সম্ভব তা অধৈর্য্য ও অবিচক্ষনতার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। সুতরাং সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার সময় অবশ্যই ধৈর্য্য ও বিচক্ষনতার গুণটি সামনে রাখতে হবে বারবার। হযরত উম্মু সালমা (রা.) এতই সৌভাগ্যবান ছিলেন যে তিনি হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে দাহইয়া আল কলবী নামক সাহাবীয় রূপে দেখেছিলেন[৬৯৬] এবং নবীজী (সা.) এর ইন্তিকালের পর বেশ কয়েকবার নবীজী (সা.) কে স্বপ্নে দেখতে পান। তিনি যে স্বপ্নগুলো দেখতেন তার অধিকাংশই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যেত এবং তার উপর ভিত্তি করে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করতেন আর লোকেরাও তা বিশ্বাস করত। যা পরবর্তীতে অধিকাংশ সময়ে বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

যেমন কারবালায় ইমাম হোসাইনের শাহাদাৎ এর দিনে তিনি নবীজী (সা.) কে স্বপ্নে বলতে শুনেছেন যে কারবালায় ইমাম হুসাইন শাহাদাৎ বরণ করেছে। স্বপ্নে দেখা উক্ত ঘটনাটি সাহাবীদেরকে জানালে সবাই বিশ্বাস করলেন এবং এর কয়েকদিন পরে জানা গেল যে সত্যিই

৬৯৫. আল-বালজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯৫
৬৯৬. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ৩৪

ইমাম হুসাইন ঐ দিনই পরিবার ও সঙ্গী সাথীদের অধিকাংশকে নিয়ে কারবালায় শাহাদাৎ বরণ করেছেন।[৬৯৭] হযরত উম্মু সালামা (রা.) প্রতিবাদী স্বভাবের ছিলেন। তিনি হযরত উমার (রা.) কে কড়া জবাব শুনিয়ে দিয়েছিলেন। কারবালার প্রান্তরে ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাৎ বরণের জন্যে ইরাক বাসীকে দায়ী করেছিলেন এবং সর্বপরি উমাইয়া শাসকদের অত্যাচার, নির্যাতনের ও দুর্ব্যবহারের নিন্দা ও সমালোচনায় মুখর হয়ে ছিলেন উম্মু সালামা। মাঝে মাঝে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে প্রতিবাদী হতে হবে এমন সাহসিকতার কথা আমরা হযরত উম্মু সালামা (রা.) জীবন চরিত থেকে জানতে পারি ও অনুপ্রাণিত হই।

১২.৭ হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)

হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) জাহেলী যুগের কু প্রথা দুরীকরণে উপলক্ষ হয়েছিলেন। পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা যাবে না; কেননা সে তো আপন পুত্রের মত এবং তার স্ত্রীতো আপন পুত্রের স্ত্রীর মত। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী সাংস্কৃতিক জীবনে বানানো পুত্র যে আপন পুত্রের মত নয় এ কথাটি প্রমান করায় জন্যেই আল্লাহ তায়ালা যায়নাব-যায়েদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে হযরত যায়নাবের বিবাহের ব্যবস্থা করে দিলেন।[৬৯৮] এভাবে মারাত্মক একটি কু-প্রথা ও ভুল ধারণার মূলোৎপাটন হয়েছিল উক্ত ঘটনার মাধ্যমে। বিয়ের ওলীমা অনুষ্ঠান জাক-জমক করা এবং তাতে ছেলের পক্ষেই যাবতীয় খরচাদি করা যে সুস্থ সংস্কৃতির একাটি অপরিহার্য অংশ তার প্রমান আমরা হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশের বৌভাত বা ওলীমা অনুষ্ঠানের মধ্যে পাই। শুধু শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নাই এমন একটি মহান শিক্ষার জ্বলন্ত প্রমান আমরা হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) এর কাছে থেকেই পাই। হযরত আয়েশা

৬৯৭. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-২৯৮
৬৯৮. আল-বালাজুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৫

(রা.) এর ইফকের ঘটনায় মহানবী (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে হযরত আয়েশা (রা.) এর প্রতি ভাল ধারণা ছাড়া অন্য কিছু তিনি পোষণ করেন না। পরবর্তীকালে পবিত্র কুরআনে হযরত আয়েশা (রা.) এর পুত পবিত্রতা ঘোষণা করলে হযরত যায়নাব (রা.) এর ধারণাকে মুহাম্মদ (সা.) সহ সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করতেন। ইসলামী সাংস্কৃতিক জীবনে সকলে স্বাবলম্বী হবে এটাই কামনা করা যায়—সেক্ষেত্রে হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) অন্য আরেক রকমের দৃষ্টান্ত। চামড়াজাত শিল্প এর মাধ্যমে তিনি নিজে আয় করতেন এবং নিজের আবশ্যক খরচ মিটানোর পর বাকী অর্থ দান করে দিতেন।[৬৯৯] জমা করে রাখতেন না। বায়তুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ করতেন না এ কারণে যে তিনি নিজে অর্জন করতে সক্ষম।

১২.৮ হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.)

হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.) অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশীল ও আত্ম মর্যাদা সম্পন্ন মহিয়সী নারী ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি যুদ্ধ বন্দী অবস্থায় মুসলমানদের কাছে দাসত্বের জীবনে পদার্পন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মত স্বাধীনচেতা নারীর পক্ষে দাসত্বের জীবন মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বিধায় স্বাধীন জীবন যাপনে ফিরে আসার আকুতি জানালে মহানবী (সা.) তাঁর দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে মহানবী (সা.) তাঁকে বিবাহ করে উম্মুহাতুল মোমেনীদের অন্তর্ভূক্ত করেন। মহানবী (সা.) এর সাথে তাঁর বিবাহের ফলে তাঁর ইয়াহুদী গোত্র বনু মুসতালিক শত্রুতা বন্ধ করে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচারণ করতে শুরু করে। আল ওয়াকিদীর বর্ণনায় এসেছে নবীজী (সা.) কে বিবাহ করার তিন দিন পূর্বে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে ইয়াসরিবের দিক থেকে আগত পূর্ণিমার চাঁদ তার কোলে এসে পড়ল।[৭০০] উক্ত

---

৬৯৯. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৭
৭০০. ইবন কাসির, *আল- বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫৯

স্বপ্নটি মহানবী (সা.) কে বিবাহে করার ইঙ্গিত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতিতে সত্য স্বপ্নের একটা গুরুত্ব আছে যদিও তাতে শতভাগ বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি খুবই সম্ভ্রান্ত গোত্রের ছেলে জীগুফার স্ত্রী ছিলেন। ফলে ছোট বেলা থেকেই খুবই স্বাচ্ছন্দের সাথে বড় হয়েছেন। একদিকে তিনি যেমন রুপ লাবন্যের অধিকারী ছিলেন এবং অপরদিকে তিনি ব্যবহার ও আচরণে অত্যন্ত শালীন, ভদ্র ও আমায়িক ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এর ভাষ্যনুযায়ী তাঁর মধ্যে মধুরতা ও ছলা-কলা উভয় রকমের গুণ বিদ্যমান ছিলো। হযরত আয়েশা (রা.) আরও মন্তব্য করেছেন, যে কেউ তাঁকে দেখলেই তাঁর অন্তরে স্থান করে নিতেন। একদিকে তিনি যেমন নরম ও অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন অপরদিকে তিনি ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্যে শান্তিপূর্ণ পথে যুক্তিবাদীতার সাথে প্রতিবাদমুখর ভূমিকা পালন করত দ্বিধাবোধ করতেন না। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর ভাতা নীতির সমালোচনা করেছেন এবং যুক্তিপূর্ণ উপায়ে তার সমাধান বের করতে তিনি হযরত উমর (রা.) কে বুঝাতে সক্ষমও হয়েছিলেন।[৭০১] কাজেই তাঁর জীবন চরিত থেকে যে জিনিসটি আমরা সহজেই নিতে পারি তা হচ্ছে প্রয়োজনে নরম ও অমায়িক ব্যক্তিকেও শক্ত ও প্রতিবাদমুখর হওয়া লাগতে পারে ন্যায্য ও বৈধ দাবী আদায়ের স্বার্থে।

১২.৯ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)

উম্মুহাতুল মোমেনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) ত্যাগ-তিতীক্ষা স্বীকারের এক জলন্ত উদাহরন । সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে তিনি আপন আত্মীয় স্বজনকে ছাড়তে কুন্ঠাবোধ করেন নি। মহানবী (সা.) এর সম্মানের কাছে অন্য কারো সম্মান যে ক্ষীণ তা তিনি স্পষ্ট করে আমাদেরকে দেখিয়ে

৭০১. ইউসুফ আল-কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৬

দিয়েছিলেন। তাঁর পিতা যখন নবীজী (সা.) এর বিছানায় বসতে চাইলো তিনি কড়া কথায় পিতাকে সেখানে বসতে নিষেধ করলেন এবং বললেন নবীজী (সা.) এর সম্মানের সাথে তুলনা করোতো দুরের কথা তাঁর বিছানায়ও বসার যৌক্তিকতা নেই একজন মুশরিকের।[৭০২]

এ থেকে স্পষ্ট হল যে সত্য ও ন্যায়ের সামনে মিথ্যা যতই বড় দেখাক না কেন মূলত এর কোন ভিত্তি নেই। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর বিবাহ অনুষ্ঠানের ওলীমা খুবই জাক জমকভাবে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়েছিল—একবার হাবশায়, আরেকবার মদিনায়।[৭০৩] এ থেকে বুঝা যায় বিবাহের বৌভাত বা ওলীমা অনুষ্ঠান একাধিকবার হতে পারে জাক জমকতার সাথে যদি বর পক্ষের সামর্থ থাকে বা চায়। উপহার-উপঢৌকন দেওয়া ইসলামী সংস্কৃতির একটি অংশ এর উজ্জল উদাহরণ হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) রেখে গেছেন। তাঁকে যখন শোনানো হল যে মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে বিবাহ করতে যাচ্ছেন তখনই তিনি সংবাদদাতাকে নিজের মূল্যবান গয়না উপহার দিয়েছিলেন[৭০৪] যা আমাদেরকে শিক্ষাচ্ছে যে কোন শুভ বা ভাল সংবাদ প্রদানকারীকে কিছু উপহার উপঢৌকন দিয়ে খুশী করা। ব্যক্তিগত পর্যায়ে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) এর একটি প্রশংসনীয় অভ্যাস ছিল যে তিনি যদি কোন আমল করতেন তা ছোট বড় যা-ই হোক না কেন তা সর্বদা অব্যাহত রাখতেন। যেমন ১২ রাকাত নফল নামায তিনি প্রতিদিন নিয়ম করে পড়তেন এবং অপরকে পড়তে বলতেন। এ থেকে যে জিনিসটি আমরা বুঝতে পারি ভাল কাজ ছোট হলেও তা অবহেলা করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা এমন একটি ছোট আমলের কারণেও আমাদের বড় বড় গুনাহ ও অপরাধ মাফ করে দিয়ে তাঁর পিয়ারা ও মাহবুব বান্দাদের কাতারে শামিল করে নিতে পারেন।

---

৭০২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪
৭০৩. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২১
৭০৪. ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

১২.১০ হযরত সাফিয়্যা (রা.)

উম্মুল মোমেনীন হযরত সাফিয়্যা (রা.) পিতৃ ও মাতৃকূলের দিক দিয়ে দারুন কৌলিন্যের অধিকারী ছিলেন।[৭০৫] তাঁর পূর্ববর্তী স্বামী খায়বারের অতি প্রসিদ্ধ দুর্গ আল কামুসের নেতা ও বড় কবি ছিলেন।[৭০৬] বুঝাই যাচ্ছে তাঁর বাল্য ও যৌবন কাল কেমন শান-শওকতে কেটেছে। পারিবারিকভাবেই তিনি খুবই সংস্কৃতিমনা ও ভদ্র আচরনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। ইসলামে আসার পর ইসলামী দিক নির্দেশনা পেয়ে তিনি আরও বেশি রুচিশীল, ভদ্র, আমায়িক ও মার্জিত আরচণের অধিকারী হয়ে উঠলেন। জীবনে কখনও অধৈর্য্য হয়েছেন এমন কথা জানা যায় না। আল-কামুস দুর্গের পতনের পরে তার আত্নীয় স্বজনের মৃত লাশগুলোর পাশ দিয়ে বন্দী অবস্থায় তাঁকে নেওয়া হচ্ছে অথচ তিনি একটুও বিচলিত হননি। দৃঢ় পদক্ষেপে হেটে চলেছেন বলে জানা যায়। পরে অবশ্য হযরত বিলাল (রা.) কে তিরস্কার করা হয় হয়েছিল তাঁর বাপ, ভাই ও পূর্ববর্তী স্বামীর লাশের পাশ দিয়ে তাঁকে এভাবে নিয়ে আসার কারণে। যাহোক, তাঁর জীবন চরিত থেকে যে জিনিসটি সহজে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার জন্যে বেছে নেওয়া যেতে পারে তা হলো জীবনে কখনও অধৈর্য্যশীল না হওয়া। তাঁর জীবন থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে তা হচ্ছে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা। তিনি মদিনায় আগমন করেই নবী নন্দীনী হযরত ফাতিমা (রা.) কে নিজের অলংকার থেকে বেশ কয়েকটি মূল্যবান অলংকার উপহার প্রদান করেন। তিনি ছিলেন বিপদের সময় উপকারী বন্ধু। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হযরত উসমান (রা.) যখন বিদ্রোহী কর্তৃক ঘেরাও হয়ে আছেন তখন তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর বাসায় খাবার পৌছানোর ব্যবস্থা করেছেন।[৭০৭] কাজেই তাঁর জীবন আচরণ আমাদেরকে শিখাচ্ছে বিপদের সময় মানুষের পাশে অবস্থান করা ও সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়ানো।

৭০৫. নিয়ায ফতেহপুরী, *সাহাবিয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
৭০৬. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩১
৭০৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৭

তিনি প্রতিবাদীও ছিলেন। হযরত উমর (রা.) এর ভাতা বন্টন নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে সম-বণ্টন নীতির দাবীটি মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন।[৭০৮] কাজেই তাঁর জীবন চরিত ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদী হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে।

তিনি ভালোভাবে রান্না করতে পারতেন এবং প্রায়ই সুস্বাধু খাবার রান্না করে মহানবী (সা.) এর কাছে পৌছিয়ে দিতেন। তাঁর এ গুণটি নি:সন্দেহে মুসলিম নারীকে ভালভাবে রান্না-বান্না শিখাতে উদ্বুদ্ধ করে। মুসলমান হওয়ার পরও হযরত সাফিয়্যা (রা.) তাঁর ইহুদী আত্নীয় স্বজনের সাথে আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তিনি বলেছেন তারা আমার আত্নীয় স্বজন। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ইসলাম ধর্ম কখনও নির্দেশ প্রদান করেনি।[৭০৯] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে আত্নীয় স্বজন অমুসলিম হলেও তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইসলাম অনুসারী নারী পুরুষের কর্তব্য। তিনি ছিলেন খুবই দানশীল ও দানবীর। একদা তাঁর দাসী তাঁর বিরুদ্ধে শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে অপবাদ দিয়েছিলো। দাসী সে অপবাদ রটানোর কথা স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে সাথে সাথে তিনি তাকে মাফ করে দিলেন এবং সেই সাথে তাকে মুক্ত করেও দিলেন।[৭১০] তাঁর জীবন চরিতের এ আদর্শ থেকে আমরা গ্রহণ করতে পারি যে কেউ দোষ স্বীকার করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। ঘুমের মধ্যেকার স্বপ্ন কেবলই অনর্থক কিছু বহন করে এমন নয়। বরং কিছু কিছু সময়ে স্বপ্ন যে সত্য ঘটনা বা ঘটতে যাওয়া এমন কিছুকে ইঙ্গিত করে তার প্রমান আমরা হযরত সাফিয়্যা (রা.) এর স্বপ্ন দেখানো ঘটনায় দেখতে পাই। মহানবী (সা.) এর সাথে বিবাহের বেশ কিছু দিন পূর্বে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে আকাশের

৭০৮. ইউসুফ আল-কানধালূবী, *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৬,২১৮
৭০৯. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৩
৭১০. প্রাগুক্ত

পূর্ণিমার চাঁদ তার কোলে এসেছে।[৭১১] স্বপ্নের কথা তার মা কিংবা বাবাকে বললে তারা তার গালে থাপ্পর মেরেছিল এ বলে যে তুমি কি আরবের বাদশাহ মুহাম্মদ (সা.) কে বিবাহ করতে ইচ্ছা করছো নাকি? সেই থাপ্পরের দাগ নবীজী (সা.) এর গৃহে পদার্পণের পরও স্পষ্ট বুঝা যেত। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতিতে স্বপ্নের সব দেখা ও ঘটনাকে অনর্থক মনে করা ঠিক নয়, বরং কিছু কিছু ঘটনা যে ঘটমান বা ঘটতে যাওয়া ঘটনার ইঙ্গিত প্রদান করে তা হযরত সাফিয়্যা (রা.) এবং তাঁর দেখা স্বপ্নের ঘটনা থেকে প্রমান পাওয়া যায়।

১২.১১ হযরত মায়মুনা (রা.)

উম্মুল মোমেনীন হযরত মায়মুনা (রা.) এর মাধ্যমে খাবারের রুচি সম্মত বিষয়টি ইসলামী সংস্কৃতিতে উঠে আসে। একদিন তাঁর বাসায় গুই সাপের ভূনা গোসত পরিবেশন করা হলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মৌন সম্মতিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ খেলেন। কিন্তু নবীজী (সা.) খেলেন না বিধায় (সম্ভবত) হযরত মায়মুনা (রা.)ও খেলেন না।[৭১২] সেদিন যদি হযরত মায়মুনা (রা.) খেতেন তাহলে গুই সাপের গোশতের মত অরুচীকর খাবার খাওয়া আর ইসলামী সংস্কৃতিতে অরুচীর পর্যায়ে পড়তো না।

হজ্জের মৌসুমে ইহরাম থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে নবীজী (সা.) হযরত মায়মুনা (রা.) কে বিবাহ করেছিলেন।[৭১৩] এ বিয়েতে নগদ দেন-মোহর পরিশোধ করা হয় এবং ওলীমার আয়োজন করা হয়। সুতরাং বিয়েতে মোহরটা নগদই পরিশোধ হওয়া উচিত এবং ছোট পরিসরে হোক আর বড় পরিসরে হোক ওলীমার আয়োজন করা ভাল—এমন সামাজিক অনুষ্ঠানের শিক্ষা আমরা হযরত

৭১১. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ৩৩৬
৭১২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭
৭১৩. ইবন হিশাম, *আস-সীরাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭২

মায়মুনা (রা.) কে উপলক্ষ্য করেই পেয়ে থাকি। হযরত মায়মুনা (রা.) ধার-করজ করতেন আবার তা যথাসময়ে পরিশোধও করতেন।[৭১৪] কাজেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে পরিশোধ করার দৃঢ় ইচ্ছায় ধার-করজ করা যে না জায়েয বা খারাপ কাজ এমন ধারণা না করার শিক্ষা আমরা তাঁর জীবন-চরিত থেকে উদাহরণ হিসেবে পেয়ে আসছি। ইসলামী শরীয়তে মদ পান করা অবৈধ বা হারাম। যে বা যারা এ রকম পানীয়তে নেশাগ্রস্থ তাদের ব্যাপারে কোন ধরনের ছাড় না দেওয়ার শিক্ষা আমরা তাঁর থেকেই পাই। একদা তাঁর এক আত্মীয় মদ পান করে আসলে তিনি তার মুখের গন্ধ থেকে বুঝতে পারলেন যে লোকটি ঐ খারাপ অভ্যাস ছাড়তে পারে নাই। ফলে তিনি তাকে শক্ত করে ধমক দেন এবং তাঁর কাছে না আসতে বললেন।[৭১৫] এ থেকে আমরা ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার জন্য যে জিনিসটি বুঝতে পারি তা হচ্ছে অন্যায়কারীকে কোনভাবেই প্রশ্রয় না দেওয়া যদিও অন্যায়কারী নিজের আত্মীয়ও হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর একটি কু-অভ্যাসকে তিনি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তিনি যখন শুনতে পেয়েছিলেন যে ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে ইবনে আব্বাস (রা.) স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকে তখনই তিনি তাঁকে এরূপ করা হতে দূরে থাকতে বললেন নিজের জীবনের সাথে মহানবী (সা.) এর ব্যবহার ও আচরণের কথা উল্লেখ করে।[৭১৬] এভাবে হযরত মায়মুনা (রা.) বহুমূখী কর্ম প্রতিভা ও কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার এক অনুপ্রেরণা ও উৎস হিসেবে কাজ করে গেছেন।

১২.১২-১৩ হযরত রায়হানা (রা.) ও মারিয়া কিবতীয়া (রা.)

উম্মুল মোমেনীন হযরত রায়হানা ও মারিয়া কিবতিয়া (রা.) যে ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা উম্মাতে মুহাম্মদীকে কিয়ামত পর্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে থাকবে। হযরত রায়হানা

৭১৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ৩৩২
৭১৫. আল-ইমাম আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'ল আন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৪
৭১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-২৯১

(রা.) যেমন সুন্দরী ছিলেন তেমনি সুন্দর ছিল তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও পবিত্র চরিত্র। তাঁর বেশ-ভূষায় ও চিন্তা-চেতনায় সর্বদা শিষ্ঠাচারিতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত।[৭১৭] মূলত তিনি ছোটবেলা থেকেই সংস্কৃতিমনা ছিলেন বলে এটা সম্ভব হয়েছিল। ইসলামে এসে নবীজী (সা.) এর সহচর্যের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শের শিক্ষার দ্বারা সংস্কৃতিমনায় পরিশুদ্ধ রূপ ধারণা করে এবং সে দিকেই তিনি লোকদেরকে আহ্বান করতে থাকেন। মহানবী (সা.) তাঁর আচার-ব্যবহারে খুবই খুশী থাকতেন এবং মুগ্ধ হতেন। অপরদিকে হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করে বাকী জীবন সম্পূর্ণরূপে ইসলামী সংস্কৃতির ধাচে পরিচালনা করেছেন।[৭১৮] হযরত মারিয়া মিশরের সুশিক্ষিত সমাজের একজন সদস্য ছিলেন আবার অপরদিকে মিশরের রাজা মুকাওকিসের দরবারে অবস্থান করেছিলেন।[৭১৯] রাজকীয় বিভিন্ন প্রথা, আচার-ব্যবহার তথা উন্নত সংস্কৃতির সাথে বহু বছর যাবত যুক্ত থাকায় তাঁর মন-মননে ও বাহ্যিক আচরণে রুচিশীল সংস্কৃতির চিন্তা ও কর্মকান্ডই প্রকাশ হত। যাহোক, এত সুযোগ সুবিধায় বড় হয়ে উঠা হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) ইসলাম ধর্মের আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনাবলীর আলোকে নিজের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন এবং ইসলামের আলোকে তাঁর পরিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনা ও বাহ্যিক কর্ম-কান্ড দিয়ে পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মের জন্যে অনুকরণীয় ও অনুস্মরণীয় আদর্শ হয়ে রয়েছেন।

---

৭১৭. আহমদ মনসুর, *বহু বিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা)*, ঢাকা: তাসনিম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ. ৫৩
৭১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
৭১৯. প্রাগুক্ত

উপসংহার

আল্লাহ প্রদত্ত ও মনোনীত এবং নবী-রাসূলগণ কর্তৃক প্রদর্শিত ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নামই হচ্ছে ইসলাম। ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি তা-ই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সংস্কৃতি একটি বিশাল ও বৃহৎকার বিষয় যার মধ্যে শিক্ষাও অন্তর্ভূক্ত। যাহোক ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি মানব জীবনের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নিয়ামত ও রহমত। বিশ্বের সকল মানুষ যদি ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি মেনে চলত তাহলে আজকের পৃথিবী নি:সন্দেহে বেহেস্তের একটি টুকরায় পরিণত হতো।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভূমিকা কেমন ছিল তা বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছে। যে কথাটি স্পষ্ট করে বলে নেওয়া দরকার তা হচ্ছে বর্তমান দুনিয়াতে যে সুশৃঙ্খল পন্থায় ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার বিষয়টি দেখা যায় আবার বিভিন্ন স্যাটালাইট চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা, ম্যগ্যাজিন, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে যেভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিত হতে দেখা যাচ্ছে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীর কোথাও আজকের মত এ সকল ঘটনাবলী সংঘটিত হয় নি নি:সন্দেহে। সে সময় শিক্ষার বিষয়টি অনেকটাই দুর্ভেদ্য ও জটিল ছিল। আর সংস্কৃতির বিষয়টি তাদের মধ্যে ছিল তবে তা আজকের সুবিন্যস্ত পরিভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে হয়তোবা ছিল না। লেখা ও পড়ার গুরুত্ব সবার মাঝে ছিল না। তবে মুষ্টিমেয় লোকেরা লিখতে পারতেন আবার যারা পড়তে পারতেন, তারা সবাই লিখতে পারতেন না। সে সময়ে যারা লিখে লিখে কোন কিছু সংরক্ষন করতে চাইতো তাদেরকে দুর্বল ভাবা হত; কাজেই অনেকেই এ রকম অপবাদ শোনার ভয়ে লিখে রেখে কোন

কিছু সংরক্ষন করার চেষ্টা করতেন না বরং লেখার পরিবর্তে তারা মুখস্ত করে কোন কিছুকে স্মৃতিতে ধারন করতেন। এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মুসলিমগণ মহানবী (সা.) এর নেতৃত্বে ও দিক-নির্দেশনায় লেখা ও পড়া উভয়ের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সাহাবাগণের মধ্যে অনেকেই পবিত্র কুরআন মুখস্ত করতেন আবার যারা লিখতে পারতেন তাঁরা তা বিভিন্ন উপকরণে যেমন চামড়া, গাছের ছাল, পাথর, হাড় ইত্যাদিতে লিখে রাখতেন। আবার মাঝে মাঝে যা লেখা হয়েছে তা মনের স্মৃতিপটে ধারনকৃত বিদ্যার সাথে মিল আছে কি না অথবা লেখাটিতে কোনক্রমে ভুল হয়েছে কি-না তা মিলিয়ে ও তুলনা করে দেখতেন।

কাজেই মহানবী (সা.) এর সময়কালের ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনায় আরবের প্রচলিত শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে একটু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও ভিন্নধর্মী ছিল নি:সন্দেহে। ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে কেবল পুরুষ সাহাবীদের অবদানই সেখানে ছিল না বরং মহিলা সাহাবীদেরও যথেষ্ট অবদানও ছিল। অত্র অভিসন্দভর্টি যেহেতু মহানবী (সা.) এর পবিত্র সহধর্মীনীদের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেহেতু অন্যান্য মহিলা সাহাবীদেকে উল্লেখ করার সুযোগ ছিল না। শিক্ষা ক্ষেত্রে নবীজী (সা.) এর পবিত্র স্ত্রীগণের (রা.) অবদানের আলোচনায় এ পর্যন্ত যা উঠে এসেছে তার সারাংশ হচ্ছে উম্মুহাতুল মোমেনীনগণের প্রত্যেকেই ইসলামী শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও বিস্তার সাধনে যার যার অবস্থান থেকে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তারা সবাই যে লেখা পড়া জানতেন তা নয়; কিন্তু সকলেই ছিলেন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত; আবার ওহী ভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে আলোকিত মহিয়সী নারী। তাঁরা ছিলেন সত্যিকারের জ্ঞানী, গুণী ও প্রজ্ঞাবান। নিজেরা ছিলেন আলোকিত মানুষ এবং নবীজী (সা.) এর সহচার্যে প্রাপ্ত আলোর দিশার ধারক ও বাহক। তাঁরা যতদিন জীবিত ছিলেন সেই বেহেশতী জ্ঞানের ধারাই অব্যহত রেখেছেন এবং মানুষের মাঝে এর প্রচার ও প্রসার ঘটনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। হযরত খাদিজা (রা.)

ছিলেন ব্যবসায়ী, প্রশাসক ও পরিচালক; হযরত সাওদা (রা.) ছিলেন ঘর গৃহস্থলীর কাজের প্রশিক্ষক; হযরত আয়েশা (রা.) একাধারে মুফাস্সির, মুহাদ্দিস ও মুফতি ছিলেন; হযরত হাফসা (রা.) পবিত্র কুরআনের সংকলিত কপির সংরক্ষক ছিলেন; হযরত যায়নাব (রা.) গরীব দু:খীর অভিভাবক ছিলেন; হযরত উম্মু সালামা (রা.) কূটনীতি ও উপস্থিত বুদ্ধিতে পারদর্শী এবং ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন ও দুরদর্শী ছিলেন; হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) সে যুগের কুপ্রথার উচ্ছেদের উপলক্ষ্য হয়েছিলেন; হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) ন্যায় সঙ্গত বিষয়ের জন্যে প্রতিবাদী ছিলেন; হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) মহানবী (সা.) এর মর্যাদার প্রশ্নে পিতাকে ছাড় না দেওয়ার মানসিকতার অধিকারী; হযরত মায়মুনা (রা.) জাহেলী যুগের দৃষ্টিভঙ্গি ভাঙ্গতে বাক পটুতার পরিচয় দিয়েছিলেন; হযরত সাফিয়্যা (রা.) শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদের ভাষা শিখানোর শিক্ষক; হযরত রায়হানা (রা.) খুবই অমায়িক ও মধুময়ী ব্যবহারের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন, আর হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.) ধৈর্যশীল আচরণে শিষ্টাচার ও ভদ্রতার জ্ঞান শিখানোর ক্ষেত্রে খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের পাশাপাশি উম্মুহাতুল মোমেনীনের (রা.) সবাই ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গনে যার যার অবস্থান থেকে অবদান রেখেছেন। তাঁরা সবাই খুবই রুচিশীল, ভদ্র, নম্র, অমায়িক, বন্ধুত্বপূর্ণ ও মহানুভব ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহারে সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষতার সন্ধান পাওয়া যায়। হযরত খাদিজা (রা.) ব্যক্তিগতভবে শালীন ও শিক্ষামূলক গান-বাজনা পছন্দ করতেন। হযরত সাওদা (রা.) সুন্দর করে ঘর গোছানোর কাজে পারদর্শী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) খেলা-ধুলা ও রঙ-বেরঙের প্রতি আকর্ষিত ছিলেন এবং সাহিত্য তথা কবিতা শোনা ও শোনানোর প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। হযরত হাফসা (রা.) বির্তক- বিদ্যায় পারদর্শী ও ঝাড় ফুকের মাধ্যমে সেবাদানকারী ছিলেন। হযরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা (রা.) ধৈর্যশীল

আচরণ ও কোমলীয় ব্যবহারের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) একাধারে সুসাহিত্যিক, কাব্যপটু ও আত্ম-মর্যাদাবান ছিলেন। হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) নিজে জাহেলী যুগের অপসংস্কৃতিক প্রথা দূরীকরণের উপলক্ষ হয়েছিলেন। হযরত জুয়াইরিয়া (রা.) অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, স্বাধীনচেতা ও প্রতিবাদকারী স্বভাবের ছিলেন। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) সঠিক জায়গায় সঠিক জিনিস রাখার বা মূল্যায়নে দক্ষ ছিলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা.) দান-খয়রাত ও উপহার প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদার মনের অধিকারী ছিলেন, আবার বিপদে পতিত ব্যক্তির পাশে নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে সাহায্য সহায়তা প্রদানকারী ছিলেন। হযরত মায়মুনা (রা.) সত্য জানানোর বিষয়ে লজ্জা-শরমের তোয়াক্কাকারী ছিলেন না। হযরত রায়হানা (রা.) চমৎকার ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও খুবই অমায়িক ব্যবহারের মহিয়সী নারী ছিলেন। আর হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.) মিসরের প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত রাজদরবারের সাংস্কৃতিক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছোট বেলা থেকেই রুচিশীল, ভদ্র ও মার্জিত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ছিলেন বিধায় ইসলামী সংস্কৃতির দ্বারা আরও বেশি পরিচালিত ও পরিশুদ্ধতার মাইল ফলকে পরিণত হয়েছিলেন।

এভাবে উম্মুহাতুল মোমেনীগণ তাঁদের মেধা, মনন, যোগ্যতা, দক্ষতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে আমরা যতবেশি আলোচনা করব ততবেশি নিজেদেরকে আলোকিত করতে পারবো। তাঁরা সকলে এত বেশি জ্ঞানী-গুণী ও প্রজ্ঞাবান ছিলেন যে তাঁদের সম্পর্কে অসংখ্য অভিসন্দর্ভ রচিত হলেও পরিপূর্ণভাবে তাঁদের জীবন ও কর্মের সম্পূর্ণ উপস্থাপন করা যাবে না। বরং নতুন নতুন আঙ্গিকে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কেননা তাঁরা সকলে ছিলেন সারা বিশ্বের সবার জন্যে আদর্শ ও অনুকরনীয় মা-জননী। মানুষ যদি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা

Dhaka University Institutional Repository

করতে চায় অথবা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি কিংবা সুস্থ ও স্বচ্ছ শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গভীর অনুসন্ধান করতে চায়; আর এক্ষেত্রে যদি মহিলাদের অবদান ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায় তাহলে ঘুরে ফিরে উম্মুহাতুল মোমেনীনদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে অবদান ছিল তা অবশ্যই সর্বাগ্রে আলোচনায় আসতে বাধ্য। পরিশেষে সমগ্র বিশ্বের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে উম্মুহাতুল মোমেনীগণের রেখে যাওয়া আদর্শের ছাপ পড়ুক এবং সে আলোকে সজ্জিত হয়ে মানবতার যথার্থ কল্যাণ ও মঙ্গল বয়ে আনুক-এই আন্তরিক কামনা করছি।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনীনের (রা.) শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শে চলার তাওফিক দান করুন।

সবশেষে মহান আল্লাহর নিকট বিনীত প্রার্থনা, আমার এ গবেষণাকর্ম দ্বারা আমাকে ও এর পাঠককূলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন! মহান আল্লাহই সর্ববিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী।

وَ اللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابْ

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَّسُوْلُ اللهِ وَعَلٰى اَصْحَابِه وَاَزْوَاجِه وَاَهْلِ بَيْتِه

وَاَحْبَابِه وَجَمِيْعُ اُمَّتِه اَجْمَعِيْنَ- يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ- اٰمِيْنَ

MšcÄx

Avj-KiAvb I Zvdmxi welqK Mšvejx

Avj-KiAvbj Kvixg

আল তাবারী, ইমাম জারীর ঃ RwgDj evqvb dx Zvewjj KiAvb, রিয়াদঃ মুয়াস্‌সাতুর রিসালাত, ২০০০

আল আন্দালুসী, মুহাম্মদ ইবন ইউসুস আবু হাইয়ান আল সারনাতি ঃ Zvdwmi Avj-evnvi Avj-gwnZ, বৈরুত, তা.বি।

আল-বাগাভী, আবু মুহাম্মাদ আল-হুমায়ুন ইবন মাসুদ আল-ফাররা ঃ gqwjøg Avj-Zvbwhj (তাফসীরে বাগাভী), বৈরুত, ১৯৮৭

আল-বায়যাভী, আল-ক্বাদী নাসিরুদ্দিন আবু সাদ আব্দুল্লাহ ইবন উমর ইবন মাহমুদ আল সিরাজী ঃ Av‡bvqviæj Zvbwhj Iqvj Avmiviæj Zvôfxj (তাফসীরে বায়যাভী), বৈরুত দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, ৩য় সংস্করন, ১৯৮৮

আল ফাররা, আবু যাকারিয়্যা ইহইয়া ইবন ইয়াজিদ ঃ gvqvbx Avj-KiAvb, বৈরুত, ৩য় সংস্করন, ১৯৮৩

আল ইস্পাহানি, আবুল কাসিম আল হাসান ইবনু মুহাম্মদ ঃ Avj-gdiv'vZ wd-Mvixwej KiAvb, বৈরুত, তা.বি।

আল-জামাখশারী,আবুল কাসিম মুহাম্মদ ইবন উমর ঃ Avj-Kvkkvd Avj nvKvBK Avj-ZvbRxj, বৈরুতঃ দারুল মায়ারিফ,

তা.বি.।

আব্দুল বাকী, ফুয়াদ ঃ gÔRvgj gvdvnwim wj Avjdwhj KiAvb, বৈরুতঃ দারুল জায়ল, ১৯৮৭

আল-কাত্তান, নান্না ঃ gvewnm dx Djwgj KiAvb, কায়রোঃ মাকতাবা ওয়াহাবা, ৭ম সংস্করন, ১৯৯০

আকরাম খা, মোহাম্মদ ঃ KiAvb kixd, ঢাকাঃ ঝিনুক পুস্তিকা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

আল-কুরতবী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবু বকর আল-আন্দালুসী ঃ Avj-Rvwg wj-AvnKvwgj KiAwbj Kvixg, বৈরুত, ১৯৬৫

আল-রাযী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন উমর ঃ gvdwZûj MvBe (AvZ-Zvdmxiæj Kvexi), বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮১

আত-তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর ঃ RvgxDj eqvb AvZ-Zvbfxjj KiAvb, বৈরুতঃ দারুল ফিকর ১৯৮৮

আল-যামাখশারী, আবুল কাসিম যারুল্লাহ মাহমুদ ইবন উমার ঃ Avj-Kvkkvd Avb nvKvBwKj Zvbwhj Iqv Dqbj AvKwfj wd-Dqwnj Zwfj, বৈরুত, তা.বি.।

ইবন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ঃ Zvbfxiæj wgKevm wgb Zvdmxi Beb AveŸvm, বৈরুত, তা.বি.।

ইবন কাছির, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইমাদুদ্দিন ইবন উমার ইবন কাছির ইবন দাও কুরায়শী আল-দামাশকী ঃ Zvdmxiæj KiAvbj Kvixg, (সম্পাদনায় আব্দুল আজীজ ঘুনায়ম ও অন্যান্য), কায়রো, তা.বি.।

Dhaka University Institutional Repository

ইবন কুতায়বা, আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম ঃ Zvdmxiæ Mwwiej KiAvb, (সম্পাদনায় আসসাইয়্যেদ আহমাদ আল-সাকুর), বৈরুত, ১৯৭৮

ইবন কাছীর, হাফিজ ঃ Zvdmxiæj KiAwbj Avhxg, মিসরঃ দারু তাব আহ্, ১৯৯৯

ইবন কাছীর, হাফিজ Zvdmx‡i Be‡b KvQxi, (অনু. অধ্যাপক আখতার ফারুক), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি.।

ইমাম তাবারানী ঃ Avj-gÖRvg Avj Kvexi, মিশরঃ আল মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, ২য় সংস্করন, তা.বি.।

ইমাম তাবারানী ঃ Avj-gÖRvg Avm mvMxi, মিশরঃ মাওকাউ জামিউল হাদীস, তা.বি.।

তানতাবী, ড. মুহাম্মদ সাইয়্যিদ ঃ AvZ Zvdmxiæj IqwmZ, মিসরঃ দারুস সা’ আদাহ, তা.বি.।

ফকরুদ্দীন, ইমাম আল-রাযী ঃ Zvdmxiæj Kvexi, কায়রোঃ আল-মাতবা‘আ আল-বাহিয়্যা ১৯৩৪

মুহাম্মদ শফী, মুফতী ঃ gv Av‡idj KiAvb, (অনু. মাওলানা মহিউদ্দিন খান), মদীনা মনোয়ারাঃ খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রন প্রকল্প ১৪১৩ হি.।

মুহাম্মদ শফী, মুফতী : Zvdmxiæj gv Awidj KiAvb, (অনু. মহিউদ্দিন খান), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করন-১৯৯১

মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, ইমাম কুরতবী : Avj Rwgô wj AvnKwgj KiAvb, কায়রোঃ দারুল হাদীস ২০০২

মাহমুদ আলূসী, আল্লামা সায়্যিদ : iæûj gvÔAvbx, ইরাকঃ মাতবা আতুস সা'আদাহ, ১৩৫০ হি.।

মোল্লাজিউন, শায়খ আহমদ : Zvdmxi Avj-Avngw'qv, বোম্বে, ১৩২৭ হি.।

সেন, ভাই গিরিশচন্দ্র : ‡KviAvb kixd: evsjvq Abev',

কলকাতাঃ হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৯

সেন, ভাই গিরিশচন্দ্র : †KviAvb kixd: evsjvq Abev', ঢাকাঃ খোশরোজ কিতাব মহল, তা.বি.।

সম্পাদনা পরিষদ : Avj KiAvbj Kwig, (অনুদিত) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩।

<u>Avj-nv'xm welqK Mš'vejx</u>

আবু যাহু, মুহাম্মদ : Avj-nv'xm Iqvj gnwÏmb, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৯৮৪

আলবানী, শায়খ নাসিরুদ্দীন ঃ Avj-nv'xm ûw¾qvZb, কুয়েতঃ দারুল সালাফিয়া, ১ম সংস্করন, ১৯৮৬

আলী, আল-কারী মুল্লা হানাফী ঃ wgiKvZj gvdvZxn dx kiwn wgkKwZj gvmvexn, মুলতানঃ মাজালসু ইশা'য়াতল মা'আরিফ, ১ম সংস্করন, ১৯৬৬

আবু দাউদ, ইমাম ঃ Avj-Rwg Dm-mbvb, রিয়াদঃ মাকতাবাহ আর রুশাদ, ২০০৫

আহমদ ইবনে শু'আইব, ইমাম নাসায়ী ঃ Avm-mbvb, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশাদ, ২০০৫

আলী, জিলহজ্জ ঃ nv'x‡mi cwiPq, ঢাকাঃ সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯২

আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনুল আশয়াছ ইবন ইসহাক ঃ mbv‡b Awe 'vD' (ভাষ্যকারঃ শায়খ আহমদ সাদ), কায়রো, ১৯৮৩

আল বায়হাকী, আবু বকর আহমদ ঃ Avm-mbvbj Kwei, (ভাষ্যকারঃ আলী উদ্দিন ইবনুল আলী), বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফাহ তা.বি।

আল-বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ঃ Avm-mnxn Avj-eLvix, বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯২

আল-দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ঃ mbvbj 'wigx, বৈরুত, ১৯৮৭

আজমী, নূর মুহাম্মাদ ঃ nv‘x‡mi ZË¡ I BwZnvm, ঢাকাঃ এমদা-দীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২

আব্দুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ ঃ nv‘xm msKj‡bi BwZnvm, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করন, ১৪১২ হি.।

আলীয়াভী, আইনুল বারী ঃ nv‘x‡mi msiÿb h‡M h‡M, কলকাতাঃ কওমী প্রেস, ১৯৯৪

আলীয়াভী, আইনুল বারী ঃ nv‘x‡mi BwZeË, কলকাতাঃ কওমী প্রেস, ১৯৯২

আত-তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাহ ঃ Avj-RvwgDj mvnxn, কায়রো, ১৯৮৭

আল-হাকিম, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ঃ wKZve gvwidvwZ Djgj nv‘xQ, সম্পাদনায় সাইয়্যিদ মুয়াযযাম হুমায়ন, মদীনা মুনাউওয়া, ২য় প্রকাশ ১৯৭৭

আল-হালাবী, আলী ইবন বুরহানুদ্দিন ঃ Bbmvbj Dqb wd mxivZ Iqvj gvgb (Avm-wmivZ Avj nvjwveq¨vn), বৈরুত, ১৯৮০

আত-তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর ঃ ZvwiLi ivmj Iqvj gjK, সম্পাদনায় মুহাম্মদ আবুল কদল ইবরাহিম, কায়রো, ১৯৮৭

আত তাবরেযী, শাইখ ওয়ালী উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে ঃ *মিশকাত মাসবীহ*, অনু. মাওলানা

আব্দুল্লাহ ওরফে খতীব : নূর মোহাম্মদ আ'জমী (রহ.), ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৫

আজ-যুহরী, মুহাম্মদ ইবন মুসলিম ইবন উবাইদুল্লাহ ইবনে শিহাব : Avj-gwMvRx Avj-bveweq¨vn, সম্পাদনায় ড. সুহাইল জাক্বার, দামেশকো, ১৯৮১

ইহসান, আমীমুল : nv'xm msKj‡bi BwZnvm, (অনু. মাওলানা রশীদ মোঃ ইউসুফ), ঢাকা: ইসলামী একাডেমী, ১৪১১ হি.।

ইবন হাম্বল, আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ : Avj gmbv' wjj Bgvg Avngv' Beb nv¤j, কায়রো, ১৯৮৯

ইসলাম, মো: শফিকুল (ড.) : *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০

ইবন মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ আল কাজভিনি : mbvb Beb gvRvn, কায়রো, তা.বি।

ইমাম মহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আন নববী (রহ.) : *রিয়াদুস সালেহীন*, অনু. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, মাওলানা মুহাম্মদ মুসা ও মাওলানা শামছুল আলম খান, ঢাকা: বাংলাদেশ

ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৫

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ঃ Avj-gmbv‘, মিশরঃ আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ্ তা.বি।

ইমাম মালিক ইবন আনাস ঃ Avj-gqvËv, কায়রোঃ দার-আল-ফাজর, ২০০৫

ইমাম বায়হাকী ঃ ïAvej Cgvb, কায়রোঃ মাওকাউ জামি‘আল-হাদীস, তা.বি।

ইমাম হাকিম ঃ Avj-gmZv‘iK, কায়রোঃ মাওকাউ ইয়া‘সুব, তা.বি।

ইমাম দারিমী ঃ Avm-mbvb, বৈরুতঃ দারু ইহয়ায়িস সুন্নাতিন নববীয়া, তা.বি।

ইমাম বায়হাকী ঃ mbvbj Keiv, দক্ষিন হায়দ্রাবাদ, তা.বি।

নাসাঈ, আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবন শুয়াইব ইবন আলী ঃ mnxn mbvbj bvmvC, বৈরুত, ১৯৮৮

মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, ইমাম আবুল হুসাইন ঃ gmwjg kixd, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, ইমাম বুখারী ঃ eLvix kixd, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, ইমাম বুখারী ঃ Avj-Av‘ve j-gdi‘, (অনূদিত) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪

মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, আততিরমিযী ঃ wZiwghx kixd, (অনূদিত) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ ঃ mbv‡b Be‡b gvRvn, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০১

মালিক, আবু আব্দুল্লাহ মালিক ইবন আনাস ইবন মালিক ঃ Avj-gqvËv, বৈরুত, তা.বি।

মুসলিম, আবুল হুসায়ুন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিশাপুরী ঃ mnxn gmwjg, ইস্তানবুল, তা.বি।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ খতীব তারবেযী ঃ ‡gkKvZ kixd, ঢাকাঃ সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০১০

শফিকুল ইসলাম, ড. মোঃ ঃ nv‘xm PPvq gwnjv mvnvex‡‘i Ae‘vb, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০

হাকিম নিশাপুরী ঃ gwidvZ Djwgj nv‘xm, বৈরুতঃ দারুল মাতাবাতুল হিলাল, ১৯৮৯

mxivZ (Rxebx) welqK Mš’vejx

আয-যাহাবী, আল-ইমাম ঃ wmqvi æ AvÔjvg Avb-bevjx, বৈরুতঃ আল-মুওয়াসাসাতুর রিসালাহ্, ১৯৯০

আল- মুবারকপুরী, সফিউর রহমান ঃ Avi-iwnKj gvLZg, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৯৯৪

আল-মুযী, জামাল উদ্দীন ঃ Zvnhxej Kvgvj dx AvmgvBi wiRvj, বৈরুতঃ মুয়াসসাতুর রিসালা, ১৯৮৮

আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন ঃ wmqvi æ Avôjwgb Avb-bevjv, বৈরুতঃ মুআসসাতুর রিসালা, ১৯৪২

আব্দুল মুসতাফা আজামী, হযরত মাওলানাঃ ঃ *সীরাতে মুস্তাফা*, ঢাকা, ১৯৯০

আয-যাহাবী, শামসুদ্দীন ঃ ZvixLj Bmjvg Iqv ZvevKwZj gvkvni Iqvj AvôAvjvg, কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হি.।

আনসারী, সাঈদ মাওলানা ঃ wmqvi æm mvnvweq¨vZ, (অনু. মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৬

আকরাম খাঁ, মাওলানা মোঃ ঃ ‡gv¯Ídv Pwiÿ, ঢাকাঃ ঝিনুক পুস্তিকা, ৪র্থ সংস্করন, ১৯৭৫

আব্দুল খালেক ঃ mvB‡q'j gimwjb, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪

আল-আন্দালুসী, আবু মুহাম্মদ আলী ইবন আহমদ ইবন সাদ ইবন হাযম ঃ Rvqvgx Avj-wmivZ-Avb-bveweq¨v, বৈরুত,১৯৮৩

আল-বালাজুরী, আবুল আব্বাস আহমদ ইবন ইহইয়া ইবন জারীর আল-বাগদাদী ঃ dZûj ej'vb, বৈরুত, ১৯৮৭

আল-বালাজুরী, আবুল আব্বাস আহমদ ইবন ইহইয়া ঃ Avbmvej Avkivd, মিশরঃ দারুল

ইবন জারীর আল-বাগদাদী মাআরিফ, ১৯৫৯

আল-যাহাবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহম্মদ ইবন উসমান ঃ ZwiLj Bmjvg (Avm-wmivZ Avb-beweq¨v), সম্পাদনায় ড. উমর আব্দুস সালাম তাদমুরী, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.।

আল-যাহাবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহম্মদ ইবন উসমান ঃ wmqvi Ô Avjvg Avj-bevjv, সম্পাদনায় শায়খ শুয়াইব আল-আরনাউট ও অন্যান্য, বৈরুত, ১৯৯২

আল-যাহাবী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহম্মদ ইবন উসমান ঃ Avj-gMbx wdj ‘Ôdv, সম্পাদনায় নূরুদ্দীন অতির, তা.বি।

ইবনে হিশাম ঃ mxiv‡Z Be‡b wnkvg, (অনু. আকরাম ফারুক), ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০

ইবনে হিশাম ঃ wmivZbex (mv.), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি।

ইবন সাদ ঃ AvZ-ZvevKvZ Avj-Keiv, বৈরুতঃ দারু সাদির, তা.বি।

ইবনু কাসির, ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ঃ Avm-mxivZb beweq¨v, তা.বি।

ইবন হিশাম, আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ঃ mxivZb beexq¨v, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি।

ইবনে ইসহাক ঃ mxiv‡Z imjjøvn (mv.), ঢাকাঃ

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

ইবন আবদুল বার, আবু উমর ইউসুফ ইবন আবদিল্লাহ আল নামরী ঃ Avj-‘ivi wd BLwZmvi æj gvMvRx Iqvj wmqvi, সম্পাদনায় শওকী-দাইফ, কায়রো, ১৯৬৬

ইবন হিব্বান, আবু হাছিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ আল-বাছাতি ঃ Avm-wmi vZb beexq¨vn Iqv AvLevi æj †Lvj vdvn, সম্পাদনায় আস সাইয়্যিদ আজিজ বেক ও অন্যান্য, বৈরুত, ১৪০৭ হি।

ইবন হিশাম, আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ঃ Avm-wmi vZb beexq¨vn, সম্পাদনায়, মুস্তাফা আল সাক্কা ও অন্যান্য, কায়রো, ১৯৫৫

ইবন ইসহাক, আবু মুহাম্মদ আল-মুলতাবি ঃ wKZve j wmqvi Iqvj gvMvRx, সম্পাদনায় ড. সুহাইল জাকার, বৈরুত, ১৯৭৮

ইবন কাছির, আবুল ফিদা ইসমাঈল ঃ Avj -we‘vqv Iqvj wbnvqv, বৈরুত, তা.বি।

ইবন কাছির, আবুল ফিদা ইসমাঈল ঃ Avm-wmi vZb beexq¨vn, বৈরুত, ১৩৯৬ হি.।

ইবন কাছির, আবুল ফিদা ইসমাঈল ঃ kvgvCj i ivmj, সম্পাদনায় ড. মুস্তফা আব্দুল ওয়াহিদ, বৈরুত, ১৯৮৮

ইবন কাছির, আবুল ফিদা ইসমাঈল ঃ Avj-dmj wd-wmi vZi ivmj, সম্পাদনায় মুহাম্মদ ঈদুল কাতরাভী ও

মহিউদ্দিন মুস্তাউ, বৈরুত, ১৪০৫ হি. ।

ইবন কুতায়বা, আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম আল দিনুরী ঃ Avj-gvAwid, বৈরুত, ১২৯০ হি. ।

ইবন সাদ, মুহাম্মদ ইবন সাদ ইবন মানী আবু আব্দুল্লাহ ঃ AvZ-ZvevKvZ Avj Keiv, বৈরুত, তা.বি ।

ইবন যুবালাহ, মুহাম্মদ ইবন হাসান ঃ gbZvLve wgb wKZwe Avhlqvb bex mvjøvjøvû AvjvBwn lqv mvjøvg, সম্পাদনায় ড. আকরাম দিয়াতুল উমরী, মদীনা মোনাউওরাঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮১

ইমাম তিরমীযী (র.) ঃ kvgwqjb bex (mv.), অনু. শাইখ আব্দুর রহীম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪

ইসফাহানী (র.), হাফিয আবু শায়খ ঃ AvLjvKb bex (m.), অনূদিত, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৪

কানদাহলভী, ইউসুফ ঃ nvqvZm mvnvev, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিক, তা.বি ।

কানধলবী, আল্লামা ইদরীস ঃ mxivZj g¯Ídv (mv.), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪

গোলাম মুস্তফা ঃ wekbex, ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৪

ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, আল্লামা ঃ *আর রাহীকুল মাখতুম*, অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী, ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ১৯৯৯

তাকী, ড. এফ.এম.এ.এইচ ঃ evsjv mwn‡Z¨ gnv¤§‘ (mv.) Gi PwiZ Dcv‘v‡bi HwZnwmKZv, প্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস (ডিগ্রী প্রাপ্ত), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩

দানাপুরী, আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ ঃ আসাহুস সিয়ার , ঢাকাঃ কতুবখানা রাশিদীয়া, ১৯৯০

নুরুর রহমান, মাওলানা ঃ D¤§j gÔwgbxb nhiZ Av‡qkv (iv.), ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৭

নদভী, সাইয়্যেদ সুলায়মান ঃ mxiv‡Z Av‡qkv, লাহোরঃ মাকতাবা-মাদীনীয়্যা, তা.বি।

নদভী, সাইয়্যেদ সুলায়মান ঃ bexB ingZ, লাখনৌঃ দারুল উলুম, ২য় সংস্করন, ১৯৮১

নোমানী, আল্লামা শিবলী ও নাদভী, সৈয়দ সুলায়মান ঃ mxivZbex (mv.), ঢাকাঃ দি তাজ পাবলিশিং হাউস, তা.বি।

নোমানী, আল্লামা শিবলী ঃ mxivZb bex (Qvjøvjøvû AvjvB‡n Iqv Qvjøvg), সম্পাদনায় মাওলানা মহিউদ্দিন খান, ঢাকাঃ প্যারাডাইজ

লাইব্রেরী, ১৯৭৪

নোমানী, আল্লামা শিবলী ঃ mxivZbex (mv.), ঢাকাঃ দি তাজ পাবলিশিং হাউস, তা.বি।

নদভী, সাইয়্যিদ আহমাদ ঃ mxivZbex, আযমপড়ঃ মাতবা ‘আতুল মা‘আরিফ, ১৯৫১

নিয়ায, ফতেহপুরী ঃ gwnjv mvnvex, (অনু. গোলাম সোবহান সিদ্দিকী), ঢাকাঃ আল ফালাহ্ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯

বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ঃ AvZ-ZwiL Avj Kwei, সম্পাদনায় আব্দুর রহমান ইবন ইহইয়া আল-মালামী, তা.বি।

মজদুদ্দীন, মোল্লা ঃ mxiv‡Z g¯Ídv, দিল্লীঃ রশীদিয়া কুতুবখানা, ১৯৫৭

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মাদানী, (ড.) ঃ *কুরআন সুন্নাহর আলোকে যেমন খুশি তেমন সাজো*, ঢাকাঃ মডার্ন পাবলিশার্স, ২০১০

মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, শায়খুল হাদীস মাওলানা ও মুজতবা হোছাইন, ড. এ এইচ এম ঃ *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮

মুসতাফা আস সিবায়ী, (ড.) ঃ *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, অনু. আকরাম ফারুক, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮

রশীদ, আব্দুল মজীদ ঃ nhiZ Av‡qkv wmwÏKx (iv.), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

সালমান মনসুরপুরী, কাযী মোহাম্মদ সোলায়মান ঃ ivngvZzwjøj Avjvwgb, দিল্লীঃ হানিফ বুক ডিপো, ১৯৩০

সম্পাদনা পরিষদ ঃ ‘vBivZzj gvÔAvwiwdj Bmjvwgq¨v, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি।

সম্পাদনা পরিষদ ঃ nhiZ ivm‡jj Kixg (mv.): Rxeb I wkÿv, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭

হায়কল, ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন ঃ gnvbexi (mv.) Rxeb PwiZ, (অনু. আব্দুল আউয়াল), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৪

Ab¨vb¨ Mšvejx

আলম, ড. রশিদুল ঃ gmwjg ‘k‡bi fwgKv, বগুড়াঃ সাহিত্য সোপান, ২০০৪

আমীন, আহমাদ ঃ wKZvej AvLjvK, কায়রোঃ মাকতাবা আন-নাহদাতিল মিসরিয়্যা, ১৯৮৫

আজরফ, দেওয়ান মোহাম্মদ ঃ Rxeb mgm¨vi mgvav‡b Bmjvg, ঢাকাঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১

আব্দুল মাবুদ, (ড.) মুহাম্মদ ঃ *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দশম প্রকাশ, ২০১৬

আব্দুল মাবুদ, (ড.) মুহাম্মদ ঃ *রাসূলুল্লাহ (সা.) শিক্ষা দান পদ্ধতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১

আব্দুস সালাম, মাওলানা *বিশ্ব নবীর পারিবারিক জীবন*, ঢাকা, ১৯৯৭

আল-বালাজুরী, আবুল হাসান ঃ Avbmvej Avkivd, মিশরঃ দারুল মা'আরিফা, তা.বি।

আবূ শুক্কাহ্ আব্দুল হালীম ঃ ivm‡ji h‡M bvix ¯vaxbZv, (সম্পাদনায় আব্দুল মান্নান তালিব), ঢাকাঃ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অরগানাইজেশন, ১৯৯৫

আল-কারদাবী, (ড.) ইউসুফ ঃ Bmjv‡g nvjvj-nvivg‡gi weavb, (অনু. মাওলানা আব্দুর রহীম), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪।

আব্দুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ ঃ আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮

আল-তাবারী, ইমাম জারীর ঃ ZvixLi iæmj Iqvj gjK, কায়রোঃ

মাওকা‘উল ওয়ারবাক, তা.বি।

আব্দুল কাদের, আহমদ ঃ RwZ fvlv ms¯wZ ¯vaxbZv, ঢাকাঃ প্রিমিনেন্ড পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, (ড.) খন্দকার আ.ন.ম ঃ GnBqvDm mbvb, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৭।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, (ড.) খন্দকার আ.ন.ম ঃ Bmjvgx AvKx‘v, ঢাকাঃ আল-আকাবা পাবলিকেশন্স, তা.বি।

আইয়ুব, অধ্যাপক হাসান ঃ Bmjvgx ‘kb I ms¯wZ, (অনু. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

আব্দুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ ঃ cwievi I cwiewiK Rxeb, ঢাকাঃ খায়রুল প্রকাশনী, ১৯৯৩

আব্দুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ ঃ *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০১২

আমীর আলী, স্যার সৈয়দ ঃ ‘¨v w¯úwiU Ae Bmjvg, (অনু. ড. রশীদুল আলম), কলকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৭৭

আব্দুস সালাম ঃ Av‘k I ev¯ÍeZv, (অনু. এ.এম. হারুন অর রশীদ), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮

আস সাবায়ী, ডক্টর মুহাম্মদ ঃ *স্বর্ণযুগে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ*, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ঢাকা: আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, ২০০৯

আব্দুস শহীদ নাসিম ঃ *আসুন আমরা মুসলিম হই*, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৮

আহাম্মদ মনসুর *বহুবিবাহ, ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.)*, ঢাকা: তাসনিম পাবলিকেন্স, ১৯৯৫

আলী নদভী, সাইয়েদ আবুল হাসান (র.) ঃ *ইসলাম: ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি*, অনু: আবু সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ):, ঢাকা: মাকতাবুল হেরা, ২০১৬

আব্দুল হালিম ঃ wekRM‡Zi c‡iPq, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৭

আবুল হোসেন ঃ *ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ২০১৩

আব্দুস সালাম, মাওলানা ঃ *বিশ্বনবীর বিবিগণ,* ঢাকা: সালাউদ্দিন বইঘর, ২০00

আলী, সাইয়্যেদ হামেদ ঃ GKwaK weevn, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২

আয যাহাবী, আল-ইমাম ঃ ZvixLj Bmjvg Iqv ZvKvZ Avj-gvkvnxi Iqv AvÔjvg, কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৭৬ হি।

আব্দুল জলীল, (ড.) ঃ *কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব*, ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

আব্দুস শহীদ নাসিম *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭

আখতার, শাহীন ঃ bvix I AvBb, ঢাকাঃ বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, ১৯৯২

আল-মিয্যী, জামাল উদ্দীন ইউসুফ ঃ Zvnhxe Avj Kvgvj dx AvmgvDi wiRvj, বৈরুত, ১৯৮৮

আবু ইউসুফ ঃ wKZvej LvivR, বৈরুতঃ দারুল মা-আরিফা, ১৯৭৯

ইবন হাজার ঃ ZvnhxeZ Zvnhxe, হায়দ্রাবাদঃ দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩২৫ হি।

ইবন হাজার ঃ Avj-Bmvev dx Zvgqxhm mvnvev, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (সংকলিত) ঃ *শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

ইবনুল জাওযী ঃ wmdvZm mvdIqv, হায়দ্রাবাদঃ দায়িরাতুল মায়ারিফা, ১৩৫৭ হি.।

ইবনু কাসীর, ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ঃ Avj-we‘vqv Iqvb-wbnvqv, বৈরুতঃ মাকতাবাতুল মা‘আরিফা, ৬ষ্ঠ সংস্করন, ১৯৮৫

ইসহাক মুলতাকী, হযরত মাওলানা ঃ *উম্মতের মায়ের যুগে যুগে*, অনু. মোহম্মদ খালেদ, ঢাকা: বার্ড কম্প্রিন্ট; এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০১০

ইবন কুদামা, মুওয়াফফাক উদ্দীন ঃ Avj gMbx, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রিয়াযিল হাদীসিয়া, তা.বি।

ইবনু খালদুন ঃ Avj-gKvÏgv, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি।

ইবনু সাদ ঃ AvZ-ZvevKvZj Keix, বৈরুত, দারুল ফিকর, তা.বি।

ইবনে কাছীর, হাফেজ ঃ Kvmvmj Aw¤qv, কায়রোঃ মাওকা‘উ ইয়াসুব, তা.বি।

ইবনুল আছির ঃ Avj-Kwgj dxZ-ZvixL, কায়রোঃ মাওকা'উল ওয়াররাক, তা.বি।

ইমাম শায়বানী ঃ Avm-wmqvi Avj-Kvexi, বৈরুতঃ মাওকাউ ইয়াসূব, তা.বি।

উমর, বদরুদ্দীন ঃ ms¯wZi msKU, ঢাকাঃ শ্রাবন প্রকাশনী, ২০০৩।

উমরী, সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন ঃ Bmjvgx mgv‡R bvix, (অনু. মোঃ মোজাম্মেল হক), ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১

ওবায়দী, ইসহাক ঃ h‡M h‡M bvix, ঢাকাঃ শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৭

কানিজ মুস্তফা, সাইয়্যেদা ঃ Bmjv‡g bvixi AwaKvi, কলিকাতাঃ বানী প্রকাশ, ১৯৯১

কাওকাব সিদ্দিক, ড. ঃ gmwjg bvixi msMvg, ঢাকাঃ সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণা সংস্থা, ১৯৯২

খান, মাওলানা হারুনুর রশীদ ঃ KiAvb I nv‘x‡mi Av‡jv‡K cYv½ gvbe Rxeb, ঢাকাঃ আজীম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭

আব্দুল খালেক ঃ *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

খাওলী, আলবহী ঃ bvix: Bmjv‡gi ‘wó‡Z, (অনু. মোঃ নুরুল হুদা, ঢাকাঃ সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮

চৌধুরী, মোতাহের হোসেন ঃ ms¯‹wZ K_v, ঢাকাঃ প্রীতম প্রকাশনী, তা.বি।

চৌধুরী, হাসান আলী *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৮৬

জালালুদ্দীন সুয়ূতী ঃ ZwwiLj Ljvdv, মিশরঃ মাওকা'আল ওয়াররাক,তা.বি।

জামাল আল বাদাবী, (ড.) ঃ *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, অনু. ডা. আবু খুলদুন অল মাহমুদ ও ড. শারমিন ইসলাম মাহমুদ, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১২

তালিব, আব্দুল মান্নান ঃ AvawbK h‡Mi P¨v‡jÄ I Bmjvg, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১

তালিবুল হাশেমী ঃ *মহিলা সাহবী*, আব্দুল কাদের, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২

দৌলতনা, মমতাজ ঃ ag, hw³ I weÁvb, ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৬

দেহলভী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ : û¾vZjøwnj ewjMv, দিল্লীঃ রশিদীয়া কুতুবখানা, ১৩৭৩ হি.।

নাজ্জার, আব্দুল ওয়াহাব : Avj-Ljvdvqi iwk'b, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি।

নিয়ায ফতেহপুরী : *মহিলা সাহাবী*, অনু. গোলাম সোবাহান সিদ্দিকী, ঢাকাঃ প্রফেসর'স বুক কর্ণার, ২০১৫

নাসির উদ্দীন হেলাল : *আহলে বাইত বা বিশ্বনবীর পরিবার*, ঢাকাঃ সুহৃদ প্রকাশনী, ২০০০

ফতেপুরী, নিয়ায : mvnvexqvZ, করাচীঃ নাফিস একাডেমী, ১৯৬২

ফজলুর রহমান মুন্সী, মাওলানা, এ,কে,এম : wek bexi 'v¤úZ¨ Rxeb, ঢাকাঃ দি তাজ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৬

ফরীদ উদ্দীন আত্তার, হযরত শেখ (রহ.) : *তাযকেরাতুল আউলিয়া*, অনু. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ঢাকাঃ মীনা বুক হাউস, ২০০৩

ফজলুর রহমান মুন্সী *বিশ্বনবীর দাম্পত্য জীবন*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ১৯৮৬

বারুদী, শামসুল : Pjw"PÎ RM‡Z Bmjvg, (অনু. মোহাম্মদ আব্দুল মোনায়েম) ঢাকাঃ আশ-শিফা

রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৩

বুকাইলী, ডঃ মরিস ঃ evB‡ej, KiAvb I weÁvb, (অনু. আখতারুউল আলম), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬

ভুইয়া, আবুল কাশেম ঃ hM wR½vmv I cwievi, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮

মুহাম্মদ, ড. কাজী দীন ঃ mwnZ¨ I ms¯‹wZ weKv‡k ivmj jøvn (mv.) Gi Ae'vb, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২০ হি.।

মো: নুরুজ্জামান, আলহাজ্জ মৌলানা ঃ *রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সহধর্মিনীগণ*, ঢাকা: বাংলাদেশ, তাজ কোম্পানী, ১৯৯৬

মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নুমানী ঃ *ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক জীবন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯

মাহমুদ আহমদ গাযনফর ঃ *শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহাবী বা জান্নাতী নারী*, অনু. মুহাম্মদ শামছুল হুদা, ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউজ, ২০০৪

মোহাম্মদ কুতুব ঃ *আমরা কি মুসলমান?*, (অনু. মুহাম্মদ মূসা), ঢাকা: আল হেরা প্রকাশনী, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ রেজাউল করিম, (ড.) ঃ *ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বরুপ*, ঢাকা: ইউনির্ভাসাল ইসলামিক থ্যট, ২০০৪

মোহাম্মদ নুরুজ্জামান ঃ *সংগ্রামী নারী*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩

মাহমুদুল হাসান, মাওলানা ঃ *নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা*, ঢাকা, ১৯৯৫

মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম, মাওলানা ঃ *জান্নাতী দশ রমনীর জীবনী*, ঢাকা: মীনা বুক হাউজ, ২০০৪

মোরশেদা বেগম, মুয়াল্লিমা (সংকলক) ঃ *জান্নাতী ২০ রমনী*, ঢাকা: পিস পাবলিকেশন্স, ২০১১

মোরশেদা বেগম, মুয়াল্লিমা (সংকলক) ঃ *রাসূলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন*, ঢাকা: পিস পাবলিকেশন্স, ২০১১

মাইকেল এইচ. হার্ট ঃ *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী*, অনু. মো: মোখলেছুর রহমান, ঢাকা: আফতাব ব্রাদার্স, ২০০৫

মজুমদার, মোঃ জয়নুল আবেদীন ঃ Avgv‡`i ms¯‹…wZ wePvh© welq I P¨v‡jÄ mgn, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০১

মুহাম্মদ মাববুবুর রহমান, (ড.) ও হাছিনুর রহমান, ঃ *ইসলামী গবেষণা পদ্ধতি*, ঢাকা:

মো: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২

মুহাম্মদুল্লাহ, মুফতি মাওলানা ঃ Kms¯'vi, nv'xm I mvgwRK weÁvb, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

মুহাম্মদ আব্দুল বারী ঃ *দর্শনের কথা*, ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস, ১৯৭৩

যাকারিয়া, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ঃ wcq bex (mv.) Gi weweMY, সিলেটঃ বন্ধু লাইব্রেরী এন্ড পাবলিকেশন, ১৯৯৭

রিজভী, মাওলানা আমিন খান ঃ Bmjv‡gi 'wó‡Z bvUK, Mvb, Qwe I A½ ms‡hvRb, ঢাকাঃ মামুন প্রকাশনী, তা.বি.।

রাশীদ হাইলামায় ঃ *আয়েশা রাযিয়াল্লাহ আনহা*, অনু. মুহাম্মদ আদম আলী, ঢাকাঃ মাকতাবুল ফুরকান, ২০১৫

রাহেলা মিয়াজী ঃ *বেহেশতী দশ রমনীবা শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহাবী*, ঢাকাঃ মূলধারা প্রকাশন, ২০০৫

রেজাউল করিম, ড. মুহাম্মদ *রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষানীতি*, ঢাকা: প্রফেসর'স বুক কর্ণার, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

রাধা কৃষ্ণ, সর্বপল্লী স্যার : ag I mgvR, (অনু. শ্রী শুভেন্দ্র কুমার মিত্রী), কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

রাশীদ হাইলামায় : *খাদিজা (রা.)*, অনু. মুহাম্মদ আদম আলী, ঢাকা: মাকতাবুল ফুরকান, ২০১৫

শামসুল আলম, এ.জেড.এম : gmwjg ms¯‹wZ, ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২

শামছুল আলম, এ. জেড এম *মহানবী (সা.) এর পরিবার*, ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রার্দাস, ২০০৫

শাজাহান কবির, ড. মোঃ : *বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি*, ঢাকা: দিক দিগন্ত, ২০০৯

সালাহউদ্দীন, মুহাম্মদ : Bmjv‡g gvbewaKvi, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫

সুলায়মান নদভী, আল্লামা সাইয়েদ : *সীরাতুস সাহাবীয়াত*, অনু. হাফেজ ফজলুল হক শাহ, ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন্স, ২০১২

সাদাত আলী, মোহাম্মদ : *মহানবীর (সা.) বিবাহ*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৮

সাইয়্যেদ কুতুব, শহীদ ঃ *ইসলামে সামাজিক সুবিচার*, অনু. মাওলানা করামত আলী নিযামী, ঢাকা: এ,এইচ পি প্রকাশনী, ২০১৫

সদরুদ্দীন ইসলাহী, মাওলানা ঃ Bmjv‡gi mgvR ‘kb, (অনু. আব্দুল মান্নান তালিব), ঢাকাঃ খন্দকার প্রকাশনী, ২০০৩

সম্পদনা পরিষদ ঃ ‰‘bw›‘b Rxe‡b Bmjvg, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০

হিন্দী, আলাউদ্দীন ঃ Kvbhj D¤§vj, বৈরুতঃ মুয়াসসাতুর রিসালা, ১৯৮৫

হক, আরিফুল ঃ mvs¯‹wZK AvMvmb I cwZ‡iva, ঢাকাঃ দেশজ প্রকাশন, ২০০০

হামিদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ ঃ Bmjvg cwiPq, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫

হাবীবুল্লাহ সোহাইল রায়পুরী, মুফতী ঃ *কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার আইন, নারীনীতি ও বর্তমান প্রেক্ষাপট*, চট্টগ্রামঃ দারুল মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, ২০১১

হাসান আইয়ূব ঃ *ইসলামের সামাজিক আচারণ*, অনু. এ.এন.এম সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: আহসান পাবলিকেন্স, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

Bs‡iwR fvlvq iwPZ Mšvejx

Afza, Nazhat, and Ahmad, Khurshid : *The position of Women in Islam,* Kuwait: Islamic Book Publishers, 1982

Al-Hatimy, Said Abdullah saif : *Women in Islam,* Lahore: Islamic Publications Ltd, 1979

Ali, Moulana Muhammad : *The Holy Quran, English Translation with text,* Lahor, 1978

Ali, Abdullah Yusuf : *The Holy Quran Text, Translation and Commentary,* U.S.A: Amana Corporation, 1989

Ali, Ahmad : *Al-Quran: A Contemporary Translation,* Delhi: Oxford University Press, 1987

Ali, Mowlana Muhammad : *The Holy Quran, English Translation and Commentary,* Illinois: Specially Promotions Co. Incorporation, 1985

Dhaka University Institutional Repository

Asad, Muhammad : *The Message of the Quran,* London: E.J. Brill, 1980

Ati, Hamudah Abd Al : *The Family Structure in Islam,* U.S.A: American Trust Publicaitons, 1977

Abdus Salam : *Ideas and Realities,* Singapore: Wordl Scientific Publishers Co., 1987

Ali, Muhammad : *The Living Thoughts of Prophet Muhammad,* London: Gassel, 1950

Ali, Muhammad : *Muhammad the Prophet,* Lahore, 1951

Al-Waqidi : *Muhammad at Madina,* (From Kitab al-Maghazi, tr. by Von J. Wellhausen), Berlin, 1882

Ahmed, Nur : *Forty Great Men & Women in Islam,* Chittagong: Bangladesh Co-operative Book Society, 1959

Ali, S. Ameer : *The Spirit of Islam,* London: Christophers, 1961

Asad, Mohammad : *Islam at Crossroads,* Arafat Publications, 1955

Amin, Mohammad : *Wisdom of Prophet Mohammad*, Lahore: Lion Press, 1946

Al-Attas, Syed al-Naquib : *Aims and Objectives of Islamic Education,* Jeddah: King Abdul Aziz University, 1979

Abdur Rauf : *Renaissance of Islamic Culture and Civilization,* Lahore: Sh, M. Ashraf, 1965

Abdul Mabud Chowdhury, Imam : *Hazrat Muhammad (PBUH) and Islam*, Dhaka: IJB Publication, 2009

Abdul Hai, Saiyed : *Muslim Philosophy*, Dhaka-Islamic Fiundation Bangladesh, 1982

Abdul Laif, S. : *Bases of Islamic Culture,* Delhi: Idarah, 1977

Ali, S. Ameer : *A Short History of the Saraceens,* London: Macmillan and Co. 1961

Ali, Muhammad Mohar : *Sirat Al-Nabi (Sm) and The Orientalists,* Madinah: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Quran, First Edition 1417AH/1997CE.

Arberry, A. J. : *The Quran Interpreted,* Oxford Classics, 1988

Abbott, Nabia : *Aisha: The Beloved of Muhammad,* Chicago: University of Chicago Press, 1985

Ahmad, Hazrat Mirza Bashiruddin Muhammad : *The Life of Muhammad,* Pakistan: Rabwah, n.d.

Bosworth, Smith, R. : *Mohammad and Mohammedanism,* London, 1889

Besant, Dr. Annie : *The Life and Teachings of Muhammad,* Madras, 1922

Board of Editors : *The Scientific Indications in the Holy Quran,* Dhaka: Islamic Foundation, Bangladesh, 1990

Chappa, Abdul Karim : *Beauty and Wisdom of the Holy Quran,* Karachi: Sufi Textile Printing Mills, 1964

Daniel, F. Salvador : *The Music and Musical Instruments of the Arabs,* (ed. by Henry Geore Farmer), London, 1915

Daniel, Norman : *Islam and the West,* Edinburgh: Edinburgh University Press, 1980

Doraldson, D.M : Studies in Muslim Ethics, London,1963

Engineer, Asghar Ali : *The Rights of Women in Islam,* London: C. Hursts Company, 1996

Faruqui, Momtaz Ahmed : *Anecdotes from the Life of Prophet Mohammad,* Lahore: Dar al-Kutub al-Islami, 1962

Farid, Malik Ghulam : *The Holy Quran English Translation & Commentary (with Arabic Text),* Rabwah, First edition, 1969

Gibb, H. A. R : *Mohammadanism: A Historical Survey,* London, 1953

Ghurye, G.S. : *Culture and Society,* Bombay: University of Bombay, 1947

Gibb, H.A.R : *Muhammadinism,* London: Oxford University, Press, 1953

Gulick, Robert L. : *Muhammad: The Educator,* Lahore: Institute of Islamic Culture, 1961

Giuillauime, Alfred : *The Life of Muhammad,* Oxford: Oxford University, Press, 1955

Hashim, Abul : *The Creed of Islam,* Dhaka: Umar Brothers, 1950

Horndy, A.S. : *Oxford Advanced Learner's Dictonary,* New York: Oxford University Press, 2003

Hart, Michal H. : *The 100: A Ranking of The Most Influential Persons in History*, India: Meera Publication, n.d.

Hitti, Philip K. : *History of the Arabs*, London: The Macmillan Press Ltd., Tenth Edition, Printed in China, 1993

Hughes, Thomas Patrick : *Dictionary of Islam,* Delhi: Rupa and Co., 1988

Hamidullah, M. : *The Battlefields of Prophet Muhammad*, Hyderabad: Habib & Co., 1982

Husain, S. Athar : *The Glorious Calipate,* Lack now, 1977

Holt, P. M. : *Cambridge History of Islam,* Cambridge: Cambridge University Press, 1970

Ibn Saad : *Kitab al-Tabaqat al-Kabir,* (tr.by S. Md. Moinul Haq), Pakistan Historical Society, 1967

Ibn Hajar : *Isaba fi Tamyiz al-Sahaba,* tr. & ed. by Sprenger, Calcutta, 1875

Jafery, Syed Md. Askari (Tr.) : *Nahjul Balagha*, Karachi: Associated Printers, n.d.

Jones, Beveu : *Women in Islam,* Lucknow, 1941

Klein, F.A. : *The Religion of Islam,* New Delhi: Cosmo Publications, 1978

Khan, Ahmed Jamil : *Hundred Great Muslims,* Lahore: Feroz Son Ltd., 1984

Khalifa, Dr. Rashad : *Quran: The Final Testament, Tucson:* Islamic Productions, 1989

Khan, Abdus Salam : *Essence of the Teachings of the Quran*, Thatta: Medina Publications, 1950

Khan, Syed Ahmad : *Essays on the Life of Mohammad,* Lahore: Primier Book House, 1969

Khan, Md. Muhsin (tr.) : *Sahih al-Bukhari,* Medinah al-Munawara Islamic University, 1973

Khan, M. Hamiduddin : *History of Muslim Educations (712-1950),* Karachi: Academy of Educational Research, 1967

Kamaluddin, Khawja : *Islam and Civilization,* London: Working Muslim Mission, 1931

Mohyuddin, Ata : *The Prophet,* Lahore: Feroz sons, 1955

Muir, William : *The Caliphate,* Beirut: Kharats, 1963

Maryam Jameelah : *Islam in Theory and Practice,* Lahore: Yusuf Khan, 1967

Malik, Fida Hussain : *Wives of the Prophet,* New Delhi, 1985

Malik, Fida Hussain : *Wives of the Prophat,* Lahore: Asraf Publications, 1983

Madani, S.M : *Family of the Holy Prophet,* New Delhi: Adam Publication, 1984

Mahbubur Rahman : *Outlines of Islamic Socity,* Dhaka, 1989

Malik, Fida Husain : *Wives of the Holy Prophet (S.A.Sm),* Delhi: Adam Publishers Distributors, 1990

Narayam, B. K. : *Mohammad, The Prophet of Islam: A Flame in the Desert,* New Delhi: Lancers Publishers, 1978

Nadwi, Abul Hasan Ali : *Islam and the World***,** (tr. by kidwai, Sh. M. Asraf), Lahore, 1966

Dhaka University Institutional Repository

Nasr, Syed Hussain : *Idesa and Realities of Islam,* London: Allen & Unwin, 1966

Nicholson, R.A : *A Literary History of the Arabs,* India: Adam Publishers & Distributors, 1994

Naheed, Kiswar : *Women Myth and Realities,* Lahore: Sange-e-Meel Publication, 1993

Pickthall, Marmaduke : *The Meaning of the Glorious Quran, Text and Explanatory Translation,* New Delhi: Taj Company, 1985

Poole, S. Lane : *The Speeches and Table Talks of Prophet Mohammad,* New Delhi: Kitab Bhavan, 1979

Rahman, Afzalur : *Muhammad as a Military Leader,* London: Muslim School Trust, 1980

Rosenthal, Franz : *The Classical Heritage of Islam*, London: R & K Paul, 1975

Robson, Games D. (tr.) : *Mishkat al-Masabih,* Lahore, 1965

Rustum and Zurayk : *History of the Arabs and Arabic Culture,* Beirut, 1940

Siddiqui, Abdul Hamid (tr.) : *Sahih Mislim,* New-Delhi: Kitab Bhavan, 1978

Sharif, M. M. : *Islamic and Educational Studies,* Lahore: Institute of Islamic Culture, 1964

Said, Edward W. : *Orientalism,* First Publish in 1978, Reprint, (Penguin) 1987

Shweder, Richard levine Robert : *Culture Theory: Essay on Mind, Self and Emotion,* Cambridge: Cambridge University Press, 1964

Saeed, Ahmed : *Hadees-e-Qudsi,* Translated by Muhammad Salman, Delhi: Dini Book Depot, 1988

Dhaka University Institutional Repository

Saheeh International Riyadh : *The Quran: Arabic with Corresponding English Meaning*, Riyadh: Abul Kashem Publication House, 1997

Subbamma, Malladi : *Women Tradition and Culture*, New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1985

Sattar, Dr. M. A. : *The Quranic Stories*, Dhaka: Islamic Foundations Bangladesh, 1979

Sarwar, Hafiz Ghulam : *Muhammad: The Holy Prophet*, Lahore: Sk. M. Ashraf, 1949

Siddiqui, A. H : *Life of Muhammad*, Islamic Pubications, 1969

Taylor, E. B. : *Primitive Culture*, London, 1981

Tiwari, Kedar Nath : *Comparative Religion*, Delhi Motilal Banarsidaee, 1983

Dhaka University Institutional Repository

Vidyarthi, A. Haq : *Muhammad in World Scripture*, Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1990

Watt, W. M : *Muhammad at Mecca,* New York: Oxford University Press, 1953

Watt, W. M. : *Muhamad at Medina,* Oxford: Clarandon Prss, 1956

Watt, M. W. : *The Majesty That was Islam,* London: Sidgwick & Jackson, 1928

Zakaria, Rafiq : *Muhammad and the Quran,* India: Penguin Books, 1991

Awfavb I wek‡Kvl

আব্দুল হাফিজ, আবুল ফজল মাওলানা ঃ wgmevûj jMvZ, অনু. হাবীবুর রহমান, ঢাকা: থানভী লাইব্রেরী, ২০০৩

নাসির হেলাল ঃ ‡jLK Awfavb, ঢাকা: ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৫

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র : msm‘ evsjv Awfavb, কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ২০০০

মু‘জামুল কুরআন সম্পাদনা পরিষদ : gÔRvgj KiAvb: cwelÎ KiAvb, KiAv‡bi ZiRgv I cbv½ kãmPx, ঢাকাঃ ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ২০১২

রহমান, আফযালুর : nhiZ gnv¤§‘ (mv.): Rxebx wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১

শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ : evsjv GKv‡Wwg †jLK Awfavb, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৮

সম্পাদনা পরিষদ : mxivZ wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ৪-১৪, ২০০৬

সম্পাদনা পরিষদ : msw¶ß Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ১, দ্বিতীয় সংস্করন, ডিসেম্বর ১৯৮৬

সম্পাদনা পরিষদ : msw¶ß Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ২, দ্বিতীয় সংস্করন, ডিসেম্বর ১৯৮৭

সম্পাদনা পরিষদ : mxivZ geviK, ঢাকাঃ বাংলাদেশ সিরাত মিশন, ১৯৮১

সম্পাদনা পরিষদ ঃ nhiZ gnv¤§‘ mvjøvjøvû Avjvqwn Iqv mvjøvg: Rxebx wek‡Kvl, (মূলঃ আফযালুর রহমান, অনু. ও সম্পাদনায় সম্পাদনা পরিষদ), ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯

সম্পাদনা পরিষদ ঃ Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২

সম্পাদনা পরিষদ ঃ msw ÿ ß Bmjvgx wek‡Kvl, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

হক, ড. মুহাম্মদ এনামূল ও লাহিড়ী, শিব প্রসন্ন ঃ evsjv GKv‡Wgx e¨enwwiK evsjv Awfavb, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯২

Board of Editors : *The New Encyclopedia of Britanica,* Chicago: Macropaedia, 15th Edition, 1995

Board of Editors : *Encyclopedia of Islam,* Leiden: Brill, 1971

Board of Editors : *The Encyclopaedia of Religion,* New Yorks: Macmillan Publishing Company, 1987

Cowan, J. M : *Arabic-English Dictionary,* New York: Spoken Language Services, 1976

Edward, William Lane : *An Arabic English Lexicon,* Beirut, 1980

Gibb,A.R. & Kramers, J.H. : *Shorter Encyclopedia of Islam,* London: Luzac & Co., 1983

Penrice, John : *A Dictionary and Glossary of the Koran,* Dhaka: Academic Publishers, 1987

Rahman, Afzalur (ed.) : *Muhammad: Encyclopedia of Seerah,* London, 1989

M‡elYv cÎ-cwÎKv

সম্পাদক ঃ AMcw_K, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৯৯৫

সম্পাদক ঃ gwmK cw_ex, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সংখ্যা ৮, বর্ষ ২৮, ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক ঃ BmjwgK dvD‡Ûkb cwÎKv, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বর্ষ ৪৬, সংখ্যা ৩, ২০০৭

সম্পাদক ঃ gwmK AvZ-ZvnixK, রাজশাহীঃ হা.ফা., বর্ষ ২, সংখ্যা ৩, ১৯৯৯

সম্পাদক ঃ gwmK gvCbj Bmjvg, চট্টগ্রাম, জানুয়ারি ২০০৬

সম্পাদক ঃ gwmK cilqvbv, ঢাকাঃ সেপ্টেম্বর ২০০৯

সম্পাদক ঃ gwmK g‘xbv, ঢাকাঃ বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৫, ডিসেম্বর ২০০৯

সম্পাদক ঃ wmivRvg gbxiv, ঢাকাঃ হাইকোর্ট মাজার প্রকাশনী, জুলাই ২০১৬

সম্পাদক ঃ gwmK cw_ex, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৮, ২০০৯